বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ৯ই আশ্বিন ১৩৮৮ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৮১	২য় সংখ্যা

"বিপ্লব সফল করে তুলতে হলে তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। প্রথমতঃ উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ যে উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং তৃতীয়তঃ বিপ্লবের দিকে জনগণের সমর্থন থাকা আবশ্যক।"

—নেতাজী

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী

নীরেন দাসগুপ্ত

বাঘা যতীন

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

যতীশ পাল

কম্পোজীটরের দোষে বিশেষ সংখ্যায় শহীদদের নাম ভুল লেখা হয়েছে, আমরা দুঃখিত। তাই আবার আজ

সম্পাদকীয়

বাংলা বন্ধ

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট দলগুলি 'এসমো' ও মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ১১ই সেপটেম্বর বন্ধ্ ডেকেছিলেন। বলা বাহুল্য, তাদেরই দলীয় সরকার এ বিষয়ে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। লক্ষণীয় যে বন্ধের সাফল্যের জন্য জনগণকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ও দলীয় নেতারা।

একটু সমীক্ষা করলে এটাই প্রমাণিত হবে যে এই পদক্ষেপটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দায়িত্বের কথাটা তারা বেমালুম চেপে দিয়েছেন। বন্ধের কুফলটা কি তাও তাদের বিবেচনাধীন ছিল না। এই বন্ধের ফলে যে রাজ্যের আর্থিক ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় একশত কোটি টাকা, হাজার হাজার দিন-এনে-দিন-খাওয়া মানুষ অর্দ্ধাহারে, এমন কি, অনাহারে থেকেছেন, এটাও তাদের বিবেচ্য বিষয় ছিলনা। যে জনগণকে তারা অভিনন্দন জানাবার অভিনয় করেছেন, তাদের মতামত নিতে পারলে, আর যাই হোক্, তারা বন্ধের উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাবেন না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল যে এই রাজ্যের সরকার এই বন্ধের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেছেন। যার কোন সমর্থন থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের লোকেরাই ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন হবার পর, শুধু মাত্র তাদের দলের প্রতিই তাদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ থাকেই। সর্বশ্রেণীর মানুষের স্বার্থ তাদের রক্ষা করতে হয়। একমাত্র দলীয় স্বার্থ রক্ষার কাজ চলে একনায়কতন্ত্রে। গণতন্ত্রে নয়। তবে কি বর্ত্তমান সরকার শুধু তাদের দলগুলিরই সরকার। অন্যদের তাদের কাছ থেকে কিছু পাবার নেই। এই পরিচয়ই কি রাখতে চান পশ্চিমবঙ্গ সরকার?

এই বন্ধকে স্বতঃস্ফূর্ত বলে অভিহিত করা শুধু একটি অমৃত ভাষণ-ই নয়। একে রাজনৈতিক অসাধুতা ও চতুরালির লজ্জা প্রকাশ বলে মনে করেন বহু চিন্তাশীল মানুষেরা। অফিস আদালত খোলা থাকবে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু যাদের হাতে দরজার চাবি, তারা অনুপস্থিত ছিল দলীয় প্রশ্রয়ে। যাকে সরকারী প্রশ্রয়ও বলা যেতে পারে।

কিছু কিছু জায়গায় জোর করে ইচ্ছুক কর্মীদের কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। এবং সংঘর্ষের ফলে জীবনহানিও ঘটেছে। প্রাইভেট্ বাস চালকদের পুলিশ প্রহরা দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। রাজ্যের ট্রাম বাস স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে কৌশলের দ্বারা। বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী প্রমোদ দাশগুপ্ত লোককে ভয় দেখিয়েছেন ট্রেনে চলাচল না করতে। লাইনের উপর পিকেটিং করে, শেষ পর্যান্ত ট্রেন চলাচল ব্যাহত করে, স্বতঃস্ফূর্ততার চরম নিদর্শন রেখেছেন বিমান চলাচলকে ব্যাহত করতে, এদের কর্তৃপক্ষের পুলিশী সাহায্যের দাবীকে নস্যাৎ করেছেন। এর পরও যারা বলতে চান যে বন্ধ স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে, তাদের মস্তিষ্কে ধূসর পদার্থের অভাব, না তৃতীয় শ্রেণীর চালাকি, এ সম্বন্ধে

মানুষের মনে প্রশ্ন জাগলে কি বলার আছে ? সরকারের বিরোধী দলগুলি যে হঠকারিতা দেখিয়ে একটা মারদাঙ্গার পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দেননি এজন্য তারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু এবারকার বন্‌ধের জের এগারোই সেপ্‌টেম্বরেই শেষ হবে না। 'এসমো' ত লোকসভার আইন হিসাবে গৃহিত হয়েছে। বন্‌ধের দিন যারা রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শে কাজে যোগ দেননি, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কি হবে ? কেন্দ্রীয় আইনকে কি রাজ্য সরকার ও এখানকার বামফ্রন্ট দলগুলির প্রভাবাধীন কর্মচারীরা কি অমান্য করবেন ? তারা কি মনে করেন সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন ? এখানকার সরকার ও বামফ্রন্ট দলগুলি সংঘর্ষের পথই বেছে নিয়েছেন ?

'এসমো' র বিরুদ্ধে মতামত জানাবার জন্য পথও ছিল। অত্যাবশ্যক সংস্থায় কাজকর্ম ব্যাহত হবে, ধর্মঘট করে নানা তুচ্ছ কারণে, দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিঘ্নিত হবে, এই কি এদের বক্তব্য ? শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট করার অধিকার স্বীকার করতে কোন আপত্তি নেই কারো। কিন্তু অগণিত মানুষের অধিকার বিসর্জন দিয়ে তাকে মেনে নেওয়া হবে এটা আশা করা বৃথা।

কোন শ্রমিক নেতার এই কথা বলার কি সাহস আছে যে তারা শ্রমিকদের পুরাপুরি কাজ করতে হবে এবং তাদের অধিকার আদায় করার জন্য আপ্রাণ লড়াই করে যাবেন তাদের ন্যায্য প্রাপ্তি আদায় করে দিতে ? সেটা কেন তারা পারেন না সেটা আজ সাধারণ মানুষও বুঝে ফেলেছেন। শ্রমিকদের স্বার্থটাই এদের নিকট মুখ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য হল দলীয় প্রভাব বৃদ্ধি করার। লোকেরা মনে করে এই mass এর ব্যবসায়ে কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হন। যুক্তির পথে চলতে এবং সমগ্র দেশের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে নীতি নির্দ্ধারণ এবং কর্মসূচী গ্রহণ করবেন এরা, এ আশা করা কি একেবারেই দুরাশা ?

বন্‌ধের কিছুদিন আগে থেকে এবং পরেও এ রাজ্যের সরকার ও বামফ্রন্ট দলগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ বাধাবার চেষ্টা করছেন বলেই বহু লোকের বিশ্বাস। এটা ত অদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সন্দেহ নেই। ভারতের সাংবিধানিক কাঠামোতে রাজ্যের সরকারের বিদ্রোহ করার কোন আইন সঙ্গত অধিকার নেই। গণতন্ত্রের বুলির আড়ালে একাজ করা অগণতান্ত্রিক, সংবিধান বহির্ভূত ও দেশের স্বার্থ হানিকর। একাজ কোন সভ্য সরকারই করেন না। তবে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এই রকম চাতুরির মাধ্যমে যদি বরখাস্ত হবার পথ প্রশস্ত করতে চান, তবে সে কথা আলাদা। যে জনসমর্থনের বড়াই এখানকার বামফ্রন্ট দলগুলি অহরহ প্রচার করেন, তবেত স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেই নতুন নির্বাচনের মুখোমুখি হয়ে, তাদের প্রভাব প্রতি প্রতিষ্ঠার পরিচয় রাখতে পারেন। তাতে অবশ্য নির্বাচনের বরখাস্তের ঘটনাকে মূলধন করে প্রচারাভিযান চালাবার সুযোগটা নষ্ট হয়। যাই হক, যে পথে তারা চলেছেন, তাকে আগুন নিয়ে খেলা করবার সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে কি ? একথা মনে রাখা ভাল, যে আগুন একবার জ্বালিয়ে দিলে তাতে কে পুড়বে ও কে অক্ষত থাকবে, সে কথা বলা শক্ত। সুস্থ মানসিকতার প্রত্যাশা করা কি একেবারেই দুরাশা ?

——

বর্তমান বিশ্বে যুদ্ধাতঙ্ক ক্রমবর্দ্ধমান

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

কেবলমাত্র ভারতই নয়, অন্যান্য বহুদেশই বিশ্ব-পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবার আশঙ্কায় সবিশেষ উদ্বিগ্ন। এবম্বিধ উদ্বেগের সম্ভাব্য কারণও বহুতর দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভীষণ সংহারক রূপ আজো মানুষের মনে দারুণ আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ঐ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ ধন-সম্পত্তি ও জীবন হারায়। কত সহস্র লোক আহত হয়ে বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু হয়। মানুষের বহু দিনের সাধনায় ও অজস্র শ্রমে তৈরী নানা ধরণের আধুনিক শিল্প সংস্থা ও কল কারখানা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। স্থাপত্য শিল্প, ললিত-কলা প্রভৃতি বিনষ্ট হয় শত্রু পক্ষের বিশাল বোমার আঘাতের পর আঘাতে। মানব সভ্যতা ক্ষত বিক্ষত হয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। হিরাসিমো ও নাগাসাকিতে যে ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী আনবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত, আহত বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু করে দেওয়া হয়, তার নজির ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি। আনবিক সমরাস্ত্রের ভয়ে সারা বিশ্ব তাই সদা সশঙ্কিত। এর ভয়াবহ ক্রিয়া কলাপ যে কি দারুণ মারাত্মক বিপদজনক ও ক্ষতিকারক তা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। ফলে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টির মত মনুষ্যত্বের ধ্বংসকারী ভীষণ অবস্থা সৃষ্টিতে কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানব গোষ্টীই সহজে আর রাজী হবে না, আত্মহননের বা আত্মবিলোপের বিপদজনক চিন্তায় মগ্ন হয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভবিষ্যতে যাতে আর ঐরূপ মারাত্মক সংঘর্ষ জাতিতে জাতিতে বা এক-দেশের সহিত অপর দেশের আর না ঘটে এবং পারস্পরিক মতবিনিময় ও আলাপ আলোচনার ও সহ অবস্থানের নীতির মাধ্যমে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি বিরাজ করে; সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই সন্ত্রস্ত-ক্লান্ত বিশ্বের অধিকাংশ দেশই সোৎসাহে U. N. O বা সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ তৈরী করে বিশ্বে শান্তিকে স্থায়ীকরণের শুভ-প্রেরণায়। U. N O. প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল প্রারম্ভে কিন্তু দুই বৃহৎ ও প্রচণ্ড শক্তিমান রাষ্ট্র যথা মার্কিণ আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া কার্যকালে 'ভেটো' প্রয়োগের যে বিশেষ অধিকার নিজেদের মধ্যেই কেবল ভাগ করে নেয়, সেই অসম ব্যবস্থাই বিশ্বে বর্তমানে সংকট সৃষ্টিতে সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত দুই বৃহৎ রাষ্ট্রই সমগ্রবিশ্বের শান্তিকে আজ পুণরায় বিঘ্নিত করতে সচেষ্ট দেখা যায়।

আজ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সমরাস্ত্রে সজ্জিত ও বলীয়ান। আনবিক পরমানবিক ও অন্যান্য অধুনা আবিস্কৃত মারণাস্ত্রে, ক্ষেপনাস্ত্রে ও অতি দ্রুতগামী বোমারু বিমান শক্তিতে এবং নৌ-অস্ত্র সজ্জায় উক্ত দুই দেশই শ্রেষ্ঠ। নিউট্রন বোমা সর্বাধুনিক ভয়ঙ্কর ব্যাপক ক্ষতিকারক মারণাস্ত্র, রাশিয়া নিউট্রন বোমা প্রস্তুত, পরীক্ষা ও আপন ভাণ্ডারজাত করে রেখেছে ইতিপূর্বেই। মার্কিণ প্রেসিডেন্ট মিঃ রেগন সম্প্রতি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিপদজনক নিউট্রন বোমা তৈরীর তোড়-জোড়ে ব্যস্ত বলে দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছেন। এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মিঃ ব্রেজনেভ রাশিয়ার মিত্র রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ও রাশিয়ার তাঁবেদার দেশ-গুলির সঙ্গে আলোচনায় বসতে উদ্যোগী বলে

সংবাদে প্রকাশ। উক্ত মানব সভ্যতা বিনাশকারী সমরাস্ত্রগুলি সীমিত করার একান্ত দরকার বিশ্ব শান্তি নিশ্চিতকরণে, অথচ উক্ত দুই রাষ্ট্রই সেই অগুভ শক্তি বৃদ্ধিতে আরো অধিক মনোযোগী দেখা যায়। রাষ্ট্রসংঘ অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি নিয়ন্ত্রণে সময়ে সময়ে সক্ষম দেখা যায়, কিন্তু মার্কিণ সোভিয়েট দেশকে কোনক্রমেই সংযত ও সংহত করতে U. N. O এখনো সক্ষম নয়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া U.N.O কে মোটেই আমল দেয় না, ফলে U O সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ বলে কার্যকালে দেখা যায়। আমেরিকা, তার দোসর চীন ও অন্যান্য তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে বিশেষ করে পাকিস্তানকে আধুনিক সমর সাজে সজ্জিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে আপন স্বার্থ ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশায়। মার্কিণ সমরাস্ত্র, ট্যাঙ্ক, এফ-১৬ বিমান ও আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ইত্যাদি পাকিস্তানকে দেওয়া হচ্ছে সম্প্রতি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কেন? পাকিস্তান যে ঐ সব মারাত্মক অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবেনা তার গ্যারান্টি কোথায়? ভারতকে আপন অস্তিত্ব ও বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দেবার কারণে যথা সময়ে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হতেই হবে, তা সে যত ব্যয়-সাধ্যই হোক না কেন অথবা দুরূহ কঠিন কাজই হোক না কেন। প্রয়োজন বোধে ভারতকে তার মিত্র রাষ্ট্রের নিকট থেকে সম্ভাব্য সকল প্রকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্য গ্রহণ করতেই হবে আত্মরক্ষার তাগিদে।

সমগ্র বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে, এককথায় সর্বত্রই দারুণ রণ ঘন্ ঘনা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পর্যায় ছাড়িয়ে আসল যুদ্ধের অবস্থায় এসে তা থমকে দাঁড়িয়ে কিছুটা ইতঃস্তত করছে যেন বিশেষ এক সংকেতের অপেক্ষায়। সঠিক পর্যবেক্ষণ শক্তি যাদের আছে, তারা সহজেই বুঝবে যে পুনরায় সর্বাত্মক যুদ্ধের দারুণ আশংকার যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে। এই বিপদজনক পরিস্থিতিতে কেউ-ই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না যদি সে যথার্থরূপে সচেতন থাকে। একমাত্র পাগল অথবা নির্বোধ নিজ অজ্ঞানতা বশতঃ স্থানুর মত চুপ্ চাপ্ বসে থাকতে পারে। আধুনিক ও অত্যাধুনিক যুদ্ধ কৌশলই হচ্ছে যে যে দেশকে আক্রমণ করার তোড়জোড় শুরু হয় হয় সেই দেশের কিছু লোভী ও বিশ্বাসঘাতক মানুষকে উৎকোচে বা বা উপঢৌকনে বশীভূত করে ঐদেশের অভ্যন্তরভাগে তাদের দিয়ে পঞ্চম বাহিনীর বা বিশ্বাস ঘাতকের কাজে লাগিয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ পূর্বাহ্নে যোগাড় করা। সামরিক লক্ষ্য বস্তুগুলির অবস্থান যুদ্ধাস্ত্র নির্মানের কারখানার অবস্থিতির সঠিক স্থান নির্ণয়ের জন্য তার প্রকৃত ম্যাপ ও অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সামরিক ও অসামরিক তথ্যগুলি উক্ত পঞ্চমবাহিনীর লোকজনের মাধ্যমেই যোগাড় করা হয় এবং ইহাই সাম্প্রতিক সমর রীতিনীতির এক নম্বর কৌশল বা প্রকৃত প্রস্তাবে সবিশেষ মূল্যবান।

একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে মধ্যপ্রাচ্যে, ভূমধ্য সাগর এলাকায় চীনা দরিয়ায়, ভারত মহাসাগরে, লাদাক-গিলগিট প্রভৃতি পাহাড়ী এলাকায়, কাবুলে, কান্দাহারে, খাইবার গিরিবর্তে, ওদিকে আরব সাগর এলাকায়, পারস্য উপসাগরের সকল প্রবেশমুখে, ইটালির দক্ষিণ উপকূলে, ভারতের উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে, কৃষ্ণসাগর এলাকায়, ক্যাসপিয়ান সাগরে, বাল্টিক উপসাগরাঞ্চলে : এক

কথায় সারা বিশ্বের প্রায় সব সম্ভাব্য কয়টি সামরিক দিক থেকে মূল্যবান এলাকায় বা তৎ সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে সামরিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইরাক ইরাণের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ লেগে গেছে। ইরাণ আবার ইস্‌রাইলের নিকট থেকে যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্য পাচ্ছে। সৌদি আরব আর ইস্‌রাইলের লড়াই স্থিতাবস্থায় উপস্থিত হলেও উভয়পক্ষের শত্রুতা বর্তমানে যেন চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলি সবাই বলবেঁধে একযোগ হয়েও ইস্‌রাইলের সঙ্গে সম্মুখ সমরে পরাস্ত হয়েছে বার বার। ক্ষুদ্র ইস্‌রাইল আমেরিকার বিশেষ সাহায্য-পুষ্ট ও আমেরিকান অস্ত্র বলে বলীয়ান। কাম্‌-পুচিয়াকে নিয়ে রাশিয়া কি খেলা না খেলাচ্ছে, যার ফলে চীনারা এখন আর কামপুচিয়ার শুভাথী নয়। পৃথিবীতে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বহু ছোট ছোট রাষ্ট্রই নানা দলে বা নানা মতে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ফলে তাদের কাছে আমেরিকা ও রাশিয়া নানা রঙ ছুতোয় টোপ্‌ ফেলছে ঘন ঘন এবং নানা কূট-নীতির চালে তাদের কুক্ষিগত করার তালে উভয়েই সদা প্রস্তুত নিজ নিজ স্বার্থে, যদিও উভয়েই মুখে জনকল্যাণের মধুর বুলি আওড়াতে বেশ যত্নবান। সারা বিশ্ব উক্ত দুই মহা পরাক্রমশালী মারাত্মক মারণাস্ত্রের অধিকারী রাষ্ট্রগুলির ভয়ে সদা সশঙ্কিত। যুদ্ধ শুরু করতেও এরা দুজন সক্ষম আবার যুদ্ধ নিবা-রণ করতেও এরা দুজনই একমাত্র ভরসাস্থল।

চীন পবিত্র ভারতভূমি গ্রাস করে রেখেছে, সীমান্ত বিরোধের মিথ্যা ছলনার আশ্রয়ে ইতি-পূর্বেই। ভারত তার নিজস্ব এলাকা প্রত্যর্পণের জন্য চীনা রাষ্ট্রনায়কদের কাছে সবিনয়ে বহু আবেদন করেছে বিগত কয়েক বছর ধরে, অথচ তার কোন সুমিমাংসা হয় নি আজো। কিন্তু সুদীর্ঘ কাল পরে অতি সম্প্রতি চীনা বিদেশ মন্ত্রী হুয়াংহুয়া ও অন্যান্য চীনা রাষ্ট্রনায়করা উক্ত সীমান্ত বিরোধের ফয়সালা করার জন্য নিঃসর্ত আলোচনায় বসতে এখন রাজি বলে ভারতকে জানিয়েছে এবং এই শুভ সঙ্কল্পের মূলে যে আমেরিকার সুপরামর্শ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমেরিকা অতীতে যত ভারত বিরোধতাই করুক না কেন, বর্তমানে তার সম্বিৎ ফিরেছে আত্মস্বার্থে। সে ভারতকে তোয়াজ করে বদলে আনতে উদগ্রীব, কারণ তার ধারণা চীন ভারত পুনঃমিতালি ব্যতিত সে চীনের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায় করতে পারবে না একদিকে, আর অপরদিকে চীন-ভারত বৈরীভাব রাশিয়ার পক্ষে অনেক কূটনৈতিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিৎ করবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগন ভারতের বন্ধুত্ব কামনা করে রাশিয়াকে কোনঠাসা করার কূটমতলবে, কিন্তু ভারতের ওপর কিছু মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে তবেই তার বন্ধুত্ব লাভ সম্ভব বলে রেগন বিশ্বাস করে। রেগনের বদ্ধ মূল ধারণা যে, ভারত বোধ হয় রাশিয়ার দিকে কিছু বেশী ঝুঁকি আছে এবং সেই বিশ্বাসের কারণেই আমেরিকা ভারতকে সহজভাবে কাছে টেনে নিতে নিজে সাহস পাচ্ছেনা। তাই তার দোসর চীনাদের দিয়ে কূট-নীতির সাহায্যে ভারতকে রাশিয়া বিরোধী করার চক্রান্ত রচনায় সাহসী হয়েছে আমেরিকা বর্তমানে। ভারত কিন্তু কোন মতেই নেহেরুজীর জোট-নিরপেক্ষতার নীতি ছেড়ে একচুলও এদিক বা ওদিকে ঝুঁকে পড়বে না।

ভারত রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়ের সঙ্গেই সম দূরত্ব রেখে তার পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনায়

(এর পর ১০ম পৃঃ)

ভারতে সমাজবাদের জন্ম

—নয়ন দাস

দুটি বছর খুব ঘটনাবহুল। ১৯২৮-৩০। ঘটনাগুলি এক নতুন অধ্যায়ের ইশারা মাত্র। হয়ত এক নতুন যুগেরও বা। ওই সময়ের যুব আন্দোলন, বিভিন্ন সত্যাগ্রহ আন্দোলন, গ্রামীণ অসন্তোষ এবং সর্বোপরি Independence for India League এর আন্দোলন উচ্চমানের সমাজ সচেতনতার আভাস। I. F. I. L. ই ছিল বস্তুত: নতুন জাগরনের প্লাটফরম। সুভাষচন্দ্র বোস ও পণ্ডিত নেহরু এর অবিসম্বাদি নেতা। এরা কোন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করার আশু প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেননি, স্বাধীনতার স্বরূপ কী সে প্রশ্নটিও তাদের মনে ছিল। ভইকম (Vikom) সত্যাগ্রহ, বন্দবিলা সত্যাগ্রহ ও সর্বোপরি বাঙ্গালী সত্যাগ্রহ কৃষক অসন্তোষের স্ফুরণ মাত্র। তিনি কামগার ইউনিয়নের ও বাংলার পাটকর্মীদের সংগ্রাম শ্রমিক অসন্তোষের প্রকাশ। এ ছাড়া ভগৎসিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বৈপ্লবিক সংগ্রাম যুব জাগরণের বলিষ্ঠ প্রকাশ। ব্যাপক আন্দোলন না হলেও বন্ধুবর যতীন দাসের দীর্ঘদিনের আমরণ অনশন ও তার স্বেচ্ছায় আত্মদানও এক ধরনের আন্দোলন। যতীনের মৃতদেহ নিয়ে লাহোর থেকে কলকাতা পর্যন্ত যে অগণিত জনতার স্বত:স্ফূর্ত উচ্ছ্বাস তোলার নয়।

এরই অনিবার্য ফলশ্রুতি ১৯৩০এর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতি। কিন্তু জাতির নেতা এবং ওই আন্দোলনের নেতা স্বয়ং গান্ধী। গান্ধীর কর্ম-কৌশল অপূর্ব। ২৬শে জানুয়ারীর স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠ এক বিচিত্র অভিব্যক্তি। ২৬শে জানুয়ারী প্রস্তুতি হওয়ার সাথে সাথে সারা ভারতব্যাপী জাতীয় পতাকার অপূর্ব সমারোহ। একান্তভাবে ইংরেজের পেটোয়া মানুষ ছাড়া সকলের বাড়ি, দোকান ও অফিসে স্বাধীন ভারতের পতাকা সগৌরবে উড্ডিন। গান্ধী আবির্ভূত হলেন স্বত:স্ফূর্ত মহড়ায়। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় লবণ আইন ভাঙার প্রস্তাব দেন গান্ধি। লবণ আইন ভাঙার সার্থকতা কেউ উপলব্ধি করেন নি। এমন কি জওহরলালও নয়। গান্ধী জানালেন আইন ভাঙবেন তিনি স্বয়ং। তাতে ওয়ার্কিং কমিটির চিন্তা কোথায়? সেনগুপ্ত আপন গোষ্ঠী সভায় জানালেন লবণ আইন ভাঙার কথা। তিনি আমাদের কাছে তাঁর হতাশার কথা জানালেন। আমরা ভাবলাম—ছাত্রদের ধর্মঘট ডাকা হল না—আইন ব্যবসায় বয়কট করার কথা নাই—এ কেমন আন্দোলন! ১৯২১ সালের চিন্তা আমাদের মনে। যখন আন্দোলন সুরু হল সেনগুপ্ত সভাই লবণ আইন ভাঙলেন ছাত্রদের সভায় বাজেয়াপ্ত পুঁথি দেশের ডাক পড়ে।

গান্ধী কিন্তু রওনা হলেন ৭৯ জন যাত্রী নিয়ে ১২ই মার্চ। যাত্রীদলের সম্মুখে গান্ধী। 'আলো হাতে চলিয়াছে আধারের যাত্রী রোজ ১০ মাইল করে পথ পরিক্রমা। ২০০ মাইল গিয়ে সমুদ্র। ৬ই এপ্রিল সরকারী ভাবে আইন ভাঙলেন গান্ধী।

১২ই মার্চ সারা ভারতবর্ষে আন্দোলনের নামগন্ধ নাই, চলেছেন গান্ধী। একদিন যাচ্ছে আন্দোলন বেড়ে উঠছে। দ্বিতীয় দিনে দেশের সাড়া দ্বিগুণের চেয়েও বেশী। ২০ দিন পরে সারা

ভারতবর্ষে প্লাবন বয়ে গেল। দিনের পর দিন এই আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান রূপ নিরীক্ষণ করেছি আমি। লুকিয়ে দেখেছি। কারণ পার্টির নিষেধ। পার্টি তখন সরকারি ভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। অনুশীলন দল আন্দোলনের পক্ষে রয়েছে কিন্তু প্রথম সারির কোন নেতা গ্রেপ্তার বরণ করবেন না। ভাব হল দেখা যাক কী হয়। যুগান্তর কিছুটা এগিয়ে। তারা কেবল পূর্ণদাসকে ছেড়ে দিলেন আন্দোলনের জন্যে। না দিয়ে উপায় ছিল না। কারণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্তৃত্ব তাদের হাতে। তাদের সিদ্ধান্তও দেখা যাক্ কী হয়। সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণ গুহ, ত্রৈলক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী রবি সেন কেউ সত্যাগ্রহের জন্য মনস্থির করেন নি। এক বিরাট গণ আন্দোলন প্লাবিত করছে সারা ভারতবর্ষকে কিন্তু দুটি বিখ্যাত বিপ্লবী দল ঠিক মনস্থির করতে পারেন নি। একের বেশীর ভাগ গ্রেপ্তার হলেন ১৯শে এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর।

দুটি বড়দলেরই বিশেষ অংশ নেতৃত্বের উপর বিশ্বাস হারিয়ে কিছু কর্মী direct action এর জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তারাও প্লাবনের মুখে দাঁড়াতে পারেনি। ব্যতিক্রম চট্টগ্রামের দল। তারা Ester Rising কে আদর্শ করে শুক্রবার সার্থক-ভাবে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন।

গান্ধি কিন্তু আন্দোলন থামালেন না। এবার তার সম্মুখে চৌরিচরার মত কোনকিছুই বাধা সৃষ্টি করেনি। পেশওয়ারের উন্মত্ত জনতার হিংসা। শোলাপুরে সাথক অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে সহর দখল, মেদেনীপুরের সংহিস আন্দোলন কোন কিছুই গান্ধিকে নিরস্ত করতে পারেনি। সারা ভারতবর্ষের প্লাবন বিরাট, ভয়ংকর। ওই তরঙ্গ রুদ্ধ হলনা। সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এমন ভাবে আর কখনো সাড়া দেয়নি। আন্দোলন বসল। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের পর মুক্তি পেলেন নেতৃবৃন্দ।

ব্রিটিশ শ্রমিক দল নির্বাচনে জয়লাভ করে আহ্বান জানালেন কংগ্রেসকে রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্যে। গান্ধী বৈঠকে গেলেন। কিন্তু সন্ধি হল না। আবার সংগ্রাম শুরু।

এবারকার সংগ্রাম আরো ব্যাপক আরো গভীর। বিপুল সংখ্যায় যোগ দিল কৃষকরা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী। উকিল ব্যারিষ্টাররা ছাড়লেন না। কিন্তু আন্দোলন এগিয়ে চলে। গান্ধী দেখা করতে চেয়ে-ছিলেন লর্ড উইলিংডনের সাথে। বড়লাট দেখা না করে গ্রেপ্তার করে গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে।

নেতৃত্ব বিহীন এ আন্দোলন no rent no tax campaign এর রূপ নিল। কৃষক সাধারণের দুর্গতির সীমা রইল না! জোত জমা ক্রোক, গৃহ দাহ নিত্যদিনের ঘটনা। চরম নির্যাতনের স্বীকার হল দেশের অগণিত মানুষ।

এই দুটি আন্দোলনের আবির্ভাবে সৃষ্টি হল এক নতুন ভারতবর্ষ। নির্যাতন নিপীড়নের জারক রসে সিক্তিত হল স্বাধীনতা আন্দোলন। আন্দোলনের পরাজয়ের জন্য কোন অনুশোচনা নাই। জাতি যে লড়াই করেছে তাই হল বড় কথা। এর জন্যে প্রচণ্ড গর্ববোধ মানুষের চিত্তে। প্রশ্ন উঠল জাতির নেতৃত্ব চরম মূল্য দিতে রাজী কিনা। প্রশ্ন উঠল জাতীয় আন্দোলনের নিচের তলায় যে গণ সকরণ ও জাতীয় নেতৃত্বের শিখর দেশ এক সুরে বাঁধা কিনা। যদি

এক সুরে বাঁধা না হয় তা হলে কর্তব্য কি? বস্তুত: ১৯২১ নেতৃত্বের সঙ্গে জওহরলালের উপস্থিতির সত্ত্বেও ৩০-৩২ সালের নেতৃত্বের কোন মৌলিক ব্যবধান ছিল না। ওই নেতৃত্ব আসলে নতুন প্রগতিশীল জন শক্তি বিন্যাসের সুরে বাঁধা ছিল না।

এই বৈপরীত্য দূর করার জন্য সৃষ্টি হল কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি। আসলে নাশিক জেলে তরুণ বন্দীদের ভেরী সুরু হয় জাতীয় আন্দোলনের মূল্যায়ণ। নাশিক জেল ছাড়া অন্যান্য বন্দী নিবাসে হয়েছে গতির মূল্যায়ণ। এরা সকলে কংগ্রেস কর্মী, কংগ্রেস কর্মীদের বন্দী নিবাস ছাড়া বিপ্লবীদের ভেরীও শুরু হয় আত্মসন্ধান। দেওলী বরসা ও হিজলী বন্দী নিবাসে বিপ্লবীদের ভেতর শুরু হল আত্ম সমীক্ষা। কংগ্রেসী বন্দী নিবাস ও বিপ্লবী বন্দীনিবাসের ভেতর একই জিজ্ঞাসা স্বাধীনতার স্বরূপ কি? এ নিয়ে তাত্ত্বিক তর্কের সীমা ছিল না।

১৯৩২-৩৩ সালে নাসিক জেলে তরুণ কর্মীদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, ইউসুফ মেহেরআলী, এস, এম, যোশী, এন, জি গোরে অচ্যুত পট্টবর্ধণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কারা প্রাচীরের অন্তরালেই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে বাহিরে গিয়ে সমাজবাদী দল রচনা করতে হবে। বিপ্লবী বন্দীরাও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিলেন। ওই সকল তরুণ কংগ্রেস কর্মীরা সারা ভারত ঘুরে ঘুরে সমধর্মীদের জোগাড় করে পাটনায় জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনের সভাপতি ব্যাপারসী বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ বিদগ্ধ পণ্ডিত আচার্য নরেন্দ্র দেব। আচার্যদেবের সঙ্গে উত্তর প্রদেশের আর একটি সমাজবাদিগোষ্ঠী মিলিত হয়। তাদের ভেতর ছিলেন অনুশীলন সমিতির উত্তর প্রদেশের অধ্যক্ষ সভা ও দামদর স্বরূপ সেঠ, চন্দ্রভানু গুপ্ত, ফরিদ আনসারী, সম্পূর্ণানন্দ ও বিহারের যোগেন্দ্র মুকুল প্রভৃতি। ১৯৩৪ সালের জুন মাসে ওই সম্মেলনে জন্ম নিল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল।

কলকাতায় গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পণ্ডিত নেহেরু ও সমাজবাদ সম্পর্ক ব্যাপক আলোচনা করেন। প্রবন্ধ লেখিকা প্রচুর। উত্তর প্রদেশের কর্মীদের নিয়ে Studv ' ircle করেন। কার্য পরম্পরায় মনে হল যে নেহেরু ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল একই অক্ষরেখায় দাঁড়িয়ে।

কিন্তু মোটামুটি ভাবে তিনি সমর্থন করতেন ওই তরুণ দলটিকে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গোড়াতে মার্কসবাদ লেনিনবাদ মতবাদ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু এর সকল সভ্য মার্কসবাদী ছিলেন না। জয়প্রকাশ নারায়ণ মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব সভ্য। আচার্য নরেন্দ্র দেব ও তাঁর প্রভাবে দল গ্রহণ করে মার্কসবাদ লেনিনবাদ। খুব অল্প-দিনের ভেতরই সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এর প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে তিনজন তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে আহ্বান জানান পণ্ডিত নেহেরু। ওই তিন জন সভ্য আচার্য নরেন্দ্রদেব জয়প্রকাশ ও অচ্যুত পট্টবর্ধণ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য হল। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ আসন গ্রহণ করেন জাতীয় আন্দোলনের শিখর নেতৃত্বে। খুব স্বাভাবিক ভাবে জাতীয় বিপ্লবের নেতৃত্বে এলেন সমাজবাদ নেতৃত্বে। এতে প্রমাণিত হল যে জাতীয় বিপ্লব সম্পূর্ণ করা সমাজবাদ বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ। জাতীয় বিপ্লব সমাজবাদ বিপ্লবের একটি অংগ মাত্র।

বিপ্লবীরা অন্যদিকে ত্রিশ দশকের গোড়া থেকেই

যে আত্মানুসন্ধান শুরু করে তার অনিবার্য ফলশ্রুতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এ মতবাদে ছিল অনুশীলন সমিতি। তারা একদিনে সবাই মিলে সমাজবাদী হয়নি। আর তা সম্ভবও নয়। এর জন্যে তাত্ত্বিক বিতর্ক হয়েছে প্রচণ্ড। অনুশীলন দল ধীরে ধীরে গ্রহণ করেছে মার্কসবাদ। বিচিত্রভাবে গড়ে উঠেছে এ মতবাদ। একদিকে তাত্ত্বিক আলোচনা, অন্যদিকে কর্মনীতি। কর্মনীতির দিক দিয়ে সমিতি কেবল মধ্যবিত্ত বুদ্ধি জীবিদের ভেতর বন্দী হতে চাইল না। গণ আন্দোলনের চরম সার্থকতা উপলব্ধি করে অনুশীলন দল। সার্থক গণআন্দোলনের জন্যেই প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক মতবাদ। তত্ত্ব ও কর্মনীতির গঙ্গা যমুনা সংযোগ হয়ে রূপনিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ।

এ মতবাদে পৌছাতে অনুশীলন দল কারাভ্যন্তরে অনেককাল সময় নিয়েছে—এবং তা খুব যুক্তিযুক্ত হয়েছে। বিষদভাবে পড়াশোনা, খুটিনাটি আলোচনা করে এই উত্তরণ। বিশেষ দ্রষ্টব্য জাতীয় বিপ্লবী দল সম্পূর্ণভাবে সমাজবাদী দলে রূপান্তরিত হল। জাতীয় বিপ্লব সমাজবাদী বিপ্লবের অনিবার্য পদক্ষেপ এ মতবাদে অনুশীলন দল ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের অগ্রগতি প্রায় অনুরূপ।

বিপ্লবী বন্দীনিবাসে আরো একটি ধারা ছিল। তা হল কম্যুনিস্ট দল। কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯২৫ সাল থেকেই ভারতবর্ষে রয়েছেন কাজ করে এসেছে, এ ধারাটা মূলত Trade union আন্দোলনকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছে। এ ধারাটি জাতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনকে বর্জন করেই অগ্রসর হয়েছে অথবা জাতীয় বিপ্লবকে এড়িয়ে অগ্রসর হতে চেয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টি essentially শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি এই ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি'র মতবাদ। জাতীয় বিপ্লব বুর্জোয়া আন্দোলন অতএব ওই রাস্তা কম্যুনিস্টদের পথ নয়। তার জন্যে বুর্জোয়া জাতীয় বিপ্লব সম্পর্কে কম্যুনিষ্টদের অনীহা সর্বজন বিদিত।

এই বিশ্লেষণ আংশিক (partial) সর্বজনিক নয় একথা অনেক কম্যুনিষ্টরা স্বীকার করেছেন উত্তর কালে। এই জন্যে দুটি ধারার একান্ত মিল হয়নি। কখনো কখনো এরা সংগ্রামী হয়ে কাজ করতে চেয়েছে বিশেষ করে কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম অধিবেশনের পর, তখন তারা Congress Socialist Party তে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবস্থা বেশীদিন চলেনি।

একথা অনস্বীকার্য যে কংগ্রেস সমাজবাদি দল ও জাতীয় বিপ্লবী অনুশীলন দলের সমাজবাদে উত্তরণ জাতির বিপ্লবের এক সমৃদ্ধ অধ্যায়। জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তিভূমির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদি দলের আবির্ভাব।

কিন্তু কম্যুনিস্ট দলের জন্ম আলাদা। ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট পার্টি হতই। এর জন্যে সামাজিক শক্তি বিন্যাসের রদবদলের প্রয়োজন ছিল না। কম্যুনিস্ট পার্টি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের শাখা। এর জন্ম লগনে কয়জন বৃটিশ কম্যুনিস্টদের অবদান অনেক। জন্ম লগনে তারা সরাসরি তৃতীয় আন্তর্জাতিকতার শাখা ছিল না। কম্যুনিষ্টদের জন্য অনুরূপ সামাজিক শক্তি বিন্যাসের প্রয়োজনেই। এংগোলা, মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া, দক্ষীণ ইয়ামেন বা আফগানিস্থানে কোথাও সুসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী নাই। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে। দেশে সচেতন শ্রমিক আন্দোলনের ফলে নয়।

১৯৩৪-৩৫ সালে যুগান্তর বা বিপিন গাঙ্গুলীর

গোষ্ঠি নিজস্ব কোন ধারায় অগ্রসর না হয়ে জেলে Communist Consolidation এ যোগ দেয়। অনুশীলন দলের অংশবিশেষ মূল দলের অনিবার্য পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা না করে সরাসরি Communist Consolidator এ যোগ দেয়। তারা ধৈর্য ধরলে অনুশীলন সমিতির কী পরিণতি হত তা অনুমান করা শক্ত। কিন্তু তা হতে পারেনি। সহিষ্ণুতা, বা পরিণতির জন্য ধৈর্য ধরে থাকা অনেক পরিণত বুদ্ধির পরিচয়। এবম এ সম্পর্কে আলোচনা বৃথা।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির জন্মলগ্ন থেকে ভারতবর্ষে সমাজবাদি আন্দোলনের সূচনা। পণ্ডিত নেহেরু তোমাদের দিকে অনেক ভরসা দিলেও গান্ধীর অনুমতি ছাড়া কিছু করতে সক্ষম ছিলেন না। নেহেরুর এ দুর্বলতা সর্বজন বিদিত। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলে যেতে চাননি অন্য কারণে। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু যদি পাল্টা সমাজবাদী দলের নেতা হতেন—তাহলে ভারতবর্ষের রাজনীতি আর একটা নতুন অধ্যায় শুরু হত। কিন্তু তা যায়নি। পণ্ডিত নেহেরু গান্ধীর সৃষ্টি। তার আওতার বাইরে পণ্ডিত নেহেরু গেলে কী হত বা হতে পারত, সে আলোচনা নিরর্থক। ইতিহাসের গতিছন্দ খুব জটীল। দুরদর্শী গান্ধী যেদিন কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করে প্রায় জোর করে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি করলেন নেহেরুকে সেদিনই তিনি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতি নির্দেশ করেছেন। চতুর জওহরলাল গান্ধীকে না ছেড়ে তার ভবিষ্যৎ গড়েছেন। আমরা সেই সৃষ্টি অনিচ্ছুক উত্তরাধিকারী।

(৮ম পৃ: শেষাংশ)

পূর্ববৎ ব্রতী থাকবে। কারণ ভারত মূলতঃ ভারতপন্থী, সে রাশিয়াপন্থীও নয় বা আমেরিকাপন্থীও নয়। সে তার নিজস্ব পন্থায় চলবে, কারো প্রভাবাধীন হয়ে কোনদিনই চলবে না বা চলবার বাসনাও ভারত রাখে না। ভারত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেরও ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করেই তার বৈষয়িক, বাণিজ্যিক ও আর্থিক উন্নয়নের পথ ধরেই অগ্রসর হতে সদা প্রস্তুত। তবে বর্তমান বিশ্ব যেরূপ অগ্নিগর্ভ ও ভয়াবহ আকার দিন দিন ধারণ করছে তাতে ভারতও যুদ্ধাতঙ্কে ভুগছে। সে কারণ তার দেশরক্ষা ব্যবস্থায় আরো অধিক তৎপরতার প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় হয়। জাগ্রত ভারত সে বিষয়ে বেশ সচেতন ও সদা সতর্ক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের এক শ্রেণীর অধিবাসী আমেরিকাপন্থী ও অপর শ্রেণীর অধিবাসী রাশিয়াপন্থী যদিও তারা সমগ্র দেশবাসীর সংখ্যানুপাতে নিতান্ত নগণ্য বা মুষ্টিমেয়। তবুও তারাই দেশবাসীকে বিপথগামী করার মানসে মাঝে মাঝে নানা জিগির তোলে।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে ছুটি থাকায় বিপ্লবী বাংলার পরবর্তী সংখ্যা আগামী ২৪ অক্টোবর, ১৯৮১ তারিখে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক : বিপ্লবী বাংলা

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation in Making" গ্রন্থ থেকে অনূদিত]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

দ্বৈত শাসন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার মনে আছে, টাউন হলের এক সভায় সংরক্ষিত বিষয়ের কোন সরকারী কাজের জন্য মন্ত্রীদের আক্রমণ করে বক্তৃতা করা হয়, অথচ এই সরকার এই কাজের বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোন আলোচনাই করেন নি। তা করতে তারা বাধ্যও ছিলেন না। কয়েকজন বক্তা—তাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকও আছেন তাদের বক্তৃতায় এতদূর পর্যন্ত যান যে তারা আমাদের পদত্যাগ দাবী করে বসলেন। তারা ভুলে গেলেন যে আমাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন গুরুতর অন্যায় করা হলে আইনসভায় নিন্দাসূচক প্রস্তাব পালন করে আমাদের পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য আইনের ব্যবস্থা রয়েছে।

সভার অদ্ভুত আচরণের বিষয়টি হল এই যে একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের যারা ঐ আদেশ দিয়েছিলেন তাদের পদত্যাগ দাবী না করে মন্ত্রীদের যাদের সঙ্গে ঐ আদেশের কোন সম্পর্ক ছিল না, তাদেরই পদত্যাগ দাবী করা হয়। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের গুরুভার প্রাপ্ত মন্ত্রীদের প্রতি ভারত ভূমিতে ন্যায় বিচারের এই হল স্বরূপ।

এই দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়ে বাংলার কতিপয় ব্যক্তির মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যারা সহজেই ডায়ার্কিকে নিন্দা করে আসছেন, আর যে অবস্থার মধ্যে তারা সে নিন্দাকার্য চালাচ্ছেন তারও পরিচয় মেলে।

আমার মনে হয় এটা আর কিছুই নয়, চরম পন্থীদের 'শাসন সংস্কার ধ্বংস হোক'—এই পুরানো জিগীরকেই নতুন আবরণ লাগিয়ে জাগিয়ে তোলা। যেহেতু সেই পুরানো জিগির এখন আর চলে না, সেই হেতু তাদের রাজনীতির খেলার স্বার্থে তাকে নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে পূর্ণশাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভারতের কোন কোন অংশে কতিপয় মন্ত্রী পদত্যাগ করে ডায়ার্কি সম্পর্কে তাদের যে অভিমত তারা ব্যক্ত করেছেন তাও এই নতুন জিগিরের গুরুত্ব কিছুটা বাড়িয়ে তোলে। আমাকে যেন ভুল বোঝা না হয়। আমি এক মুহূর্তের জন্যও জোর দিয়ে বলছিনা যে ডায়ার্কি একটা সাময়িক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু। অন্য প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে আমার তেমন বিশেষ ধারণা নেই, কিন্তু বাংলা দেশ সম্পর্কে বলতে পারি যে এখানে ডায়ার্কি কিছুটা প্রয়োজনীয় কাজ করেছে এবং সম্ভবত আরও বেশী কাজ দেখাতে পারত যদি অর্থ সংস্থানের কঠিন বিধি বিধানের সম্মুখীন না হতাম।

কলকাতা মউনিসিপ্যাল এক্টের কথা উল্লেখ করতে পারি, এই এক্ট কলকাতাকে গণতান্ত্রিক মিউনিসিপ্যালিটি দিয়েছে। এর মূল্য যে কতখানি সে কথা বাদ দিলেও খরাজিষ্টদের বিচার কোণ থেকেও বলা যেতে পারে এই আইন ভাল আইনই হয়েছে। কারণ তারাই এর বেশীর ভাগ সুবিধা গ্রহণ করেছেন, এবং তাও এক্ষেত্রে ভাঙ্গার জন্য নয় কাজ করার জন্যই। এই আইনের আওতার মধ্যে থেকে তারা যে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন, তাই প্রমাণ করে যে এই আইনের ব্যবস্থার প্রতি তাদের সমর্থন আছে। আমার বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে ডায়ার্কি তাদের এই আইন দিয়েছে সেই ডায়ার্কিকে কোন চিন্তার সামঞ্জস্যে এমন কি লোক দেখানো ভাল মানুষটার জন্য তারা নিন্দা করতে পারেন? যারা সরকারের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ প্রকাশে অতি উচ্চ কণ্ঠ তারাই এখন সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় উচ্চপদ দখল করে বসে সরকারী নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিয়েছেন। আমি মনে করি এতৎ সম্পর্কীয় প্রকৃত ঘটনা ও অবস্থার কথা বিবেচনা করলে একথা বলা সমীচীন হবে না যে বাংলাদেশে ডায়ার্কি তার নিজের আইন সম্মত কাজের ক্ষেত্রে নিষ্ফল হয়েছে।

বিষয়টিকে আর একটু তলিয়ে দেখা যাক্। এই বাংলা দেশে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রকে ভারতীয় করণ সম্পর্কে যে বিবিধ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা এই দ্বৈত-শাসন, ডায়ার্কির মধ্যেই প্রথমে প্রবর্তন করা হয়। এই বাংলায় ভারতীয় ম্যাডিকেল সার্ভিসে সরকারী নিয়োগ ৪২ থেকে কমিয়ে ২৪ এ আনা হয়েছে: মফঃস্বলে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা এবং আয়ুর্বেদীয় ঔষধের গবেষণা সম্পর্কে উৎসাহ দান করা হচ্ছে; এই দ্বৈত শাসনের মধ্যে প্রত্যেক বিভাগে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের উন্নতি বিধান হয়েছে; সর্বশেষে স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, রোগের চিকিৎসা এবং অন্যান্য হস্তান্তরিত বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এগুলি কি কিছুই নয়? কী বলা যায় এ সম্পর্কে?

(চলবে)

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা
মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

-ত্রিশ টাকা

১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাবীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস – ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। সৌদানী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বোমার সংগ্রাম কাহিনী—.৯০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৮০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৭০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১০। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ১২। স্বরাজের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, দেশ যাদের তোলেনি (১)—১.০০, ১৪। দেশ যাদের তোলেনি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। ছাত্রদের চর্চা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

বৈপ্লবিকী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ৭ই কার্ত্তিক ১৩৮৮ ২৪শে অক্টোবর ১৯৮১	৩য় সংখ্যা

সঙ্কীর্ণ আদর্শ, ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য, তুচ্ছ সাবধানতা ও ভীরুতা এবং অদূরদর্শী ও সাহস পরাঙ্মুখ নেতাদল—এ সকল হেয় উপাদান কখনও জাতীয় শক্তি গড়বার উপযুক্ত সামগ্রী হতে পারে না।

—শ্রীঅরবিন্দ

সম্পাদকীয়

অগ্নিগর্ভ বিশ্ব পরিস্থিতি

মানুষ তার সৃষ্টির প্রথম থেকে ক্রমবিকাশের পথে ধাপে ধাপে নানাভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে। নতুন করে সমাজচেতনা, জেগেছে তার মানসলোকে, ন্যায়নীতি, প্রেম ও অন্যান্য মানবীয় মূল্যবোধকে সে জীবনের আদর্শ বলে শুধুই গ্রহণ করেনি, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে এসেছে। মানুষের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের পার্থক্য গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। মানুষ সভ্য হয়েছে, মানুষ উচ্চাদর্শ অনুসরণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছে সর্বাঙ্গীণ ক্রমোন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছতে। ভুল-ত্রুটি যে হয়নি, আদর্শচ্যুতি যে ঘটেনি তা নয় এবং সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ তার উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করে, জীবনের যাত্রাপথে অগ্রগতিও লাভ করে চলেছিল। হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি প্রভৃতির মত রিপুগুলিকে দমন করে মানুষ চেয়েছিল পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য স্থাপন করতে। এজন্যে ভগবান বুদ্ধ সুখ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, যিশুখৃষ্ট মানব কল্যাণের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, গৌরাঙ্গদেব পথে পথে জীবোদ্ধারের জন্য, প্রেমের রাজত্ব স্থাপন করার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছেন, সর্বমানবের কল্যাণ যজ্ঞের অন্যতম পথ প্রদর্শক পরমহংসদেব নিজের জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত করেছেন সে সব মানুষই এক, সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমেই লোকশিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ কণ্ঠকণ্ঠে বাণী প্রচারিত করেছেন মানুষকে নির্ভীক হতে, সেবাব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করতে। কত শহীদ আত্মদান করছেন সমষ্টির কল্যাণের জন্য কত অসংখ্য ত্যাগব্রতী দেশপ্রেমিকরা অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করেছেন, দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য। অন্যান্য দেশেও এই ইতিহাস আছে, তবে কম বা বেশী তার পরিধি ও বিস্তৃতিতে।

কিন্তু আজ বিশ্ব পরিস্থিতি ত অগ্নিগর্ভ। ছিন্নমস্তার মত নিজ রক্তপান করার জন্য একদল মানুষ, দুর্ভাগ্যক্রমে যাদের হাতে পরম শক্তিশালী রাষ্ট্রের দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়েছে, যেন ক্ষিপ্ত, মরীয়া হয়ে উঠেছে, একদল পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার মধ্যে মরণ ঝাঁপ দেয় অন্তিমকালে সেই ভাবে। এরা বুঝছে না বা বুঝতে পারছে না যে গোটা পৃথিবীই যদি ধ্বংস হয়, তবে উস্কানিদাতারা বা অংশগ্রহণকারীরা কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না। দৃষ্টিশক্তি কি এদের নষ্ট হয়েছে? মস্তিষ্কে ধূসর পদার্থ কি একদম উবে গিয়েছে যে মনুষ্য জাতির রক্ত নিয়ে হোলি খেলতেও বিবেকের দংশন অনুভব করছে না?

বিশ্ব পরিস্থিতির একটু সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করলেই বক্তব্যটা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। আফগানিস্তান নিয়ে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল, আজও তা মোচন সম্ভব হয়নি। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করে, এই মরণ যজ্ঞে ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে আমেরিকা, তার বশংবদ দোস্ত পাকিস্তান এবং নতুন আবিষ্কৃত বন্ধু চীন। উত্তেজনা প্রশমনের কোন প্রচেষ্টাই নেই। অধিকন্তু নিজ নিজ মতলব হাসিল করার জন্য অশুভ শক্তির সঙ্গে আঁতাত করতেও চীন পরাঙ্মুখ নয়। এই কমিউনিজমের নমুনা? এক কমিউনিষ্ট দেশ, অন্য একটি কমিউনিষ্ট দেশকে খতম করার জন্য আদর্শ, শুভ নীতিবোধকেও জলাঞ্জলি দিতে হবে? এতে কোন পক্ষের পরিণাম মঙ্গলজনক হবে, এটা যেন ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতিকে একটা আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে না। গোটা পশ্চিম এশিয়ার আকাশ বাতাস ছাইয়া আছে চরম বিপন্নতার বেড়াজালে জড়াইয়া আছে সুদান, ইজরায়েল, লিবিয়া, সউদি আরব। মিশরে আগামী মাসে আমেরিকা 'ওয়ার গেমস্' বা লড়াইয়ের খেলা শুরু করিবার ব্যবস্থা স্থিরীকৃত করিয়াছে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বিশ্বের উপর মোড়লী করার অধিকার কে দিল, জানা যায় না। এই সব স্বেচ্ছা নিযুক্ত অভিভদের হাত থেকে পৃথিবীকে পরিত্রাণ করার সময় ও প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভূত হচ্ছে।

কিন্তু কে দেবে সে পথের নিশনা? যে সব দেশকে এই সব শক্তিশালী দেশ গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে, তাদের নিজেদেরও এই ক্রমবর্ধমান সঙ্কটে (যাকে ধ্বংসের পূর্বাভাস বলা যেতে পারে) থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের তাবেদার হয়ে এবং তাদের পক্ষপুটে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতিতে ভ্রান্তপথ অনুসরণ করলে, তাদের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে না কাজেই 'তোমরা হাত উঠাও আমাদের দেশ থেকে', নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি মত চলতে দাও আমাদের' এই আওয়াজ তুলতে হবে বাঁচতে হলে। ছোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সামিল হয়ে, পৃথিবীকে অনিবার্য ধ্বংস থেকে বাঁচাবার সঙ্কল্প গ্রহণ করে, সংঘর্ষের পথকে এড়িয়ে চলবার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে পারলে, তবেই বিশ্ব এবং মানব জাতির ভবিষ্যৎ নিরাপদ হতে পারে। এইসব এত যুগ ধরে মানুষ যে অগ্রগতির সোপান তৈরী করে এসেছে, যার মাধ্যমে মানুষ আজ চাঁদে যাচ্ছে, প্রকৃতির উপর বিশেষভাবে কৃতিত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে বহুদিনের তপস্যা ও সাধনার মাধ্যমে, সেই অমূল্য সম্পদকে যারা চিরতরে বিনষ্ট করে দিতে চলেছে, তারা সর্বতোভাবে ত্যাজ্য, বর্জনীয় এবং নিন্দনীয়। নিজেদের কল্যাণেই সমগ্র বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে, বিশ্বমানবতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, মানবীয় মূল্যবোধকে বাঁচাতে।

বিপ্লবী ব্যারিষ্টার পি, মিত্র স্মৃতিরক্ষা কমিটি

৩৫, ক্যানিংহাম রোড, নৈহাটি. ২৪ পরগণা।

সুধী, আগামী ৩১ শে অক্টোবর ১৯৮১ শনিবার অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রমথনাথ মিত্রের (ব্যারিস্টার পি, মিত্র) ১২৮তম জন্ম বার্ষিকী। প্রমথনাথের জন্মস্থান নৈহাটি। ঐদিন অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় নৈহাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণে তাঁর মূর্তির পাদদেশে এবং পরে পৌরসভা হলে এই বিপ্লবী মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বাঙলার বহু প্রবীণ বিপ্লবী ও সংগ্রামী যোগদান করবেন। এই অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি আন্তরিক ভাবে কামনা করি। ইতি—১৮, ১০, ৮১

নিবেদক—

গোপাল বসু
সভাপতি

বিমলকান্তি চক্রবর্তী
সম্পাদক

জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ
সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্ব

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পৃথিবী চলমান-গতিশীল। সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও এক অমোঘ প্রাকৃতিক বিধানে সদা আবর্তিত হচ্ছে। সেই আবর্তনের বিরাম নেই কোন সময়েই। গতিই জীবনের লক্ষণ, আর গতি হীনতাই মৃত্যু। এই গতির কিন্তু একটা নিয়ম আছে, যা বিশ্ব-প্রকৃতির দ্বারা সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির সন্তান মানুষ এবং মানুষ শ্রেষ্ঠ সন্তান, যেহেতু মানুষেরই বিচার বোধ (যাকে ইংরাজিতে Rationality বলে) আছে। অন্যান্য জীব জন্তু, গাছপালা বা আর কোন প্রকৃতির সন্তানদের উক্ত বিচার-বোধ নেই। তারা Instinct বা সহজাত আবেগ দ্বারা পরি-চালিত হয় এবং এটাই তাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা।

মানুষেরও আবেগ বা ভাবাবেগ আছে, কিন্তু সর্বোপরি সে বিচারবোধের দ্বারা চালিত হয়। বিচার-বোধ বা বিচার করার শক্তি মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে পেয়েছে এবং সে কারণেই মানুষ প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। তাই তার দায়-দায়িত্বও অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশী। মানুষই 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' বলে একদিন উচ্চারণ করেছিল এবং ঐ মহামূল্যবান ভাবধারাকে সঞ্জীবিত করার জন্য বুকের তাজারক্ত দিয়ে মানুষই প্রমাণ করেছিল যে আত্মস্বার্থের চেয়ে স্বদেশপ্রেম অনেক উর্দ্ধে এবং তা সর্বকালে বরণীয়-স্মরণীয় এক মহান আদর্শবাদ, যার ছত্র ছায়ায় মানুষ বার বার মাথা সুউচ্চে স্থাপিত করে সংগ্রামে অংশ নিয়েছে, আত্ম-হুতি দিয়েছে ও জয়যাত্রাকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে যুগ হতে যুগান্তরে, কাল হতে কালান্তরে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন তথা শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে ভারত বাসীদের কঠিন নির্য্যাতন, কারাবরণ, গুলির মুখে ও লাঠির আঘাতে মৃত্যুবরণ, ফাঁসির মঞ্চে জীবনাহুতি প্রভৃতি বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। বৃটিশ কায়েমীস্বার্থের আনুকূল্যে এদেশের অর্থ-নৈতিক জীবনে দারুণ দুর্যোগের ও দুর্দ্দশার সৃষ্টি হয়। বৃটিশ বণিকরা বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের আশায় এদেশে এসেছিল ও ফলে উক্ত রূপ বিপর্যয় ঘটে সারা ভারতে। 'বণিকের মান দণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দেয় রাজদণ্ড রূপে' বেনিয়ার জাত ইংরেজ এদেশকে শোষণ করে শাসনের নামে এবং তাতেই তাদের গর্ব কত

ক্রমে ভারতবাসীরা আত্ম সচেতন হতে থাকে। উক্ত শাসনরূপী শোষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার সাধনা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই। ১৮১৭ সালে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় রাজা রামমোহন, রাজা রাধাকান্তদেব, বৈদ্যনাথ মুখোপা-ধ্যায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, জাষ্টিস্ হাইড্ ইষ্ট, ডেভিড হেয়ার ও তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিও প্রভৃতি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় ও সাহায্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু কলেজেই প্রথম এদেশে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রেরা ও অন্যান্যরা যথা :—রাম গোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন,

নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সেকালের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ ১৮৪৯ সালে রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু অ্যাডাম্ সাহেবের সাহচর্য্যে বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠন করেন—ভারতীয়দের ন্যায় সঙ্গত অধিকার ও ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলবার মহৎ উদ্দেশ্যকে ফলবতী করবার তীব্র বাসনায়। এরপর জনজাগরণের অধ্যায় শুরু হয় ধীরে ধীরে। ভারতে নব জাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন সবে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল শহরে দেহরক্ষা করেন, কিন্তু তাঁর ভারতীয় বন্ধু ও অনুগামীরা এদেশে তখন নানা সংগঠনের মাধ্যমে জনজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুতে ক্রম অগ্রসরমান। ফলে রাজার স্বপ্ন সার্থকতার পথে জোর কদমে এগিয়ে যেতে থাকে।

যশোহরে বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস দু-ভাইয়ের নেতৃত্বে প্রায় পঞ্চাশলক্ষ চাষী একযোগে বাধ্যতামূলক ক্ষতিকর নীল-চাষ বন্ধ করে ১৮৪৬ সালে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর দীনবন্ধু মিত্র, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নীলচাষ বিরোধী প্রচার কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হবে। ফলে অচির কাল মধ্যে নীল চাষ এদেশে বন্ধ হয় ও চাষীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সে সময়ে নীলকর বিরোধী আন্দোলনের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় হরিশ্চন্দ্র অকালে মারা যান এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করার জন্য ভারতবন্ধু লঙ্ সাহেবের জেল হয়। ফলে ছড়া বের হয় 'নীল করে সোনার বাংলা করলো যে ছারখার। অসময়ে হরিশ মল লঙ্ এর হ'ল কারাগার॥

ইতিমধ্যে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। ফলে ব্যারাকপুর লাট বাগানে সিপাহী বিদ্রোহের স্থানীয় নায়ক বীরমঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়। ঐ বিদ্রোহ-ই ভারতে ইংরাজের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে ধরা হয়। অবশ্য এর পরও বহু এরূপ সশস্ত্র বিদ্রোহ বা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ভারতে সংঘটিত হয়েছে জাতীয় মর্য্যাদা ফিরে পাবার আশায়। ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই নীল বিদ্রোহ এদেশের সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে চাষী, রায়ত ও দরিদ্রদের মনে অকূত বল ভরসা এনে দেয়। তারা সত্য জাগ্রত মানুষের পর্য্যায়ে উন্নিত হয় এবং আলস্যত্যাগ করে দেশকর্মে সামিল হতে শুরু করে। জাতীয় উজ্জীবনের এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে যাঁরা স্বদেশবাসীকে উদ্বীপিত করেন— তাঁরা হলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিগম্বর মিত্র বিদ্যাসাগর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, বিপিন পাল মাইকেল মধুসূদন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, কবি রঙ্গলাল দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি এবং আরো অনেকে যথা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রায় সকল সদস্য ও ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় সকলেই। সে এক মহাজাগরণের শুভ মুহূর্ত যার ফলে একটি নিদ্রোত্থিত জাত সহসা জেগে ওঠে ও স্বাধীনতা পাবার আকাঙ্খায় উদগ্রীব হয়ে দিন গুনতে থাকে যে, কবে কখন সেই স্বাধীনতা আসে যার পবিত্র পরশে ভারত আবার জগৎসভায় তার পুরাতন নির্দ্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ আসনটি পুনরায় ফিরে পাবে

১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটে বেশ দ্রুতগতিতে। ১৮৭২ সালে পাঞ্জাবে 'রামেশীয়-বিদ্রোহ' অনুষ্ঠিত হয়, ফলে ইংরাজ রাজশক্তি বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং ঐ বছরই ভারতে জাতীয়তাবাদের জনক সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত করে শাসক ইংরাজ রাজশক্তি। পাঞ্জাবের ঐ সশস্ত্র বিপ্লবে ভারতীয় বীর স্বদেশ প্রেমিক গণ অমিত বিক্রমে বৃটিশের বন্দুক, কামানের গোলা-বারুদের সম্মুখীন হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন, কিন্তু নতি স্বীকার করেন না। ভারতবাসীকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথের নিশানা তাঁরা দেখান, যার ফলে পরবর্তীকালে আরো বহু ঐরূপ বিপ্লব সংঘটিত হবার প্রেরণা যোগায়। ১৮৭৭ সালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও তৎপূর্বে ১৮৭৬ সালে ভারতে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে প্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে ও রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির সাহচর্যে। ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশকরেন ১৮৭২ সালে এবং 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তিনি যে ওজস্বিনী ভাষায় দেশবাসীকে জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে লেখনী সঞ্চালন করেন তা অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে দিকে দিকে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্খায় ভারতীয়রা অধৈর্য্য হয়ে ওঠে এবং স্বাধীন সত্তার সঞ্চার হয়। শিক্ষিত জনমানসে। বঙ্কিমের লেখনী পরবর্তী কালে আরো স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোবার প্রতিশ্রুতি এনে দেয় জাতীয় জীবনে। ১৮৮২ সালে 'আনন্দ মঠ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ ঋষি বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষা নেয় এবং প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে ওঠে ভারতবাসীর মন। পরাধীনতার জ্বালা অসহ্য মনে হয় সকলের তখন। সারা দেশে এক নূতন প্রেরণায়, নূতন ভাবধারায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাব জেগে ওঠে যার তুলনা ইতিহাসে বিরল। ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়ের লেখণীও জাতীয় জাগরণে কম সহায়ক হয়নি। তাঁর তৎকালীন লেখা যেন জ্বলন্ত কামানের গোলা। বৃটিশ রাজন্য বর্গ ব্রহ্ম বান্ধবকে কিছু কম নির্যাতীত করেনি। নানা ভাবে তাঁকে বিপদগ্রস্থ করে ইংরেজের শাসক শ্রেণী, তিনি কিন্তু কিছুতেই দমেন নি। ১৮৮২ ৮৩ সালে ইলবার্ট বিল নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধ ও দারুণ বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এই বিল নিয়ে আন্দোলনের সময়ে স্যার সুরেন্দ্র নাথ চরম মূহুর্তে বৃটিশ বিচারকের অন্যায় তথা অবিচারের কথা প্রকাশ ও মন্তব্য করেন এবং সর্ব্ব ভারতীয় স্তরে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হয়—

১৮৮৩ সালে রামতনু লাহিড়ীর নেতৃত্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে। এর কিছু পরেই অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। ইতিপূর্বে শিবাজীর আদর্শ অনুকরণে মারাঠা বীর বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে পার্বত্য উপজাতীয়দের এক কাট্টা করে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ১৮৭৮ সালে, যা ফাড়কে বিদ্রোহ বলে পরিচিত। ১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো থেকে ভারতে ফিরে এসে বিপ্লব আন্দোলনে উৎসাহ যোগাতে বদ্ধ পরিকর হন। ভারতে পরবর্তীকালে যেখানে যত সশস্ত্র বিপ্লব বা অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছে সেখানেই স্বামীজির অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও সমর্থন বিপুল সাহস ও সম্মোদনা সঞ্চার করেছে। পরবর্তী কালে তাঁর সুযোগ্যা শিষ্যা মিস্ মারগারেট নোবেল অর্থাৎ ভগ্নী নিবেদিতা ভারতে বিপ্লব আন্দোলনে সক্রীয় সহযোগিতা করেছেন স্বামীজির দ্বারা আদিষ্ট হয়ে। স্বামীজি ও নিবেদিতা বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতে বিপ্লব আন্দোলন গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত

হয়ে হাজার হাজার তরুণ এবং কয়েক শত তরুণী বিপ্লবের বন্ধুর পথে পা বাড়াতে সাহসী হয় নিষ্ঠা ও কর্তব্য বোধের সঙ্গে।

জননেতা সুরেন্দ্র নাথের নেতৃত্বে ১৮৭৬ সালে 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতায় কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। 'ভারত সভাই' জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত। ভারত সভার নেতারাই জেলায় জেলায় ভারত সভা গঠন করে জমিদারদের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ করার সৎসাহস যোগান ও তাঁরাই আসামের চা-বাগান গুলিতে কুলিদের সংগঠিত করে অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং প্রতিকার মানসে সংগ্রামে প্রেরণা দেন। স্যার সুরেন্দ্র নাথই ছিলেন এর প্রাণ পুরুষ, তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে দিকে দিকে। ফলে সাধারণ মানুষ ঐ সব আন্দোলনের সমিল হয় বিপুল উৎসাহে। জাতীয় চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ তখন কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতে দেখা যায়। বোম্বাই, পুনা, লাহোর, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও উত্তর-ভারতের প্রায় সকল স্থানেই তা বিস্তার লাভ করে।

পশ্চিম ভারতে তখন ফিরোজ শাহ মেহতা, এম, জি রানাডে, বদরুদ্দিন তায়েবজী, কে, টি তেলাং, গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে প্রভৃতির নেতৃত্বে ও সাহচর্যে ভারতীয়দের মধ্যে গণ জাগরণের সূত্রপাত হয়। বিলাতে খাস ইংলণ্ডে সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা দাদা-ভাই নৌরজী তখন ভারতীয়দের প্রকৃত অভাব, অভিযোগ, দুঃখ ও দারিদ্রের চরম দুর্দশার কথা বেশ জোর দিয়ে প্রচারে নেমে পড়ল। তাঁর ঐ প্রকার প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল আশু প্রতিকার সাধন।

১৯৯৭ সালে ২২শে জুন পুনা শহরে দামোদর, বাসুদেব ও বালকৃষ্ণ চাপেকর ভ্রাতৃত্রয় বৃটিশ প্লেগ চিকিৎসক ষ্ট্র্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টকে গুলি বিদ্ধ করে হত্যা করেন ভারতীয় নারীর ও ভারতবাসীর আত্মসম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার্থে। ফলে ঐ তিন ভাইয়েরই ফাঁসি হয় যারবেদা জেলের ভিতরে ১৮৯৯ সালের ১৮ ই এপ্রিল' ৮ ই মে এবং ১২ ই মে তারিখে। সারা মারাঠা জাতি বৃটিশের ওপর এর প্রতিশোধ নেবার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথে তৈরী হতে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দ ঐ বছর পুনায় পৌঁছেই মারাঠা বীর বিপ্লবীদের কাছে জানতে চান যে, চাপেকার ভ্রাতৃত্রয়ের স্বর্ণ মূর্ত্তি তৈরী হয় নি কেন? স্বামীজীর ঐ একটি কথায় মারাঠারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং স্বামীজিকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা শীঘ্রই এর প্রতিবিধান মানসে বৃটিশ শক্তিকে ভারত ছাড়া করবেই।

১৯০২ সালে ভারতের প্রথাত বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন ব্যারিষ্টার পি, মিত্র। ভগ্নী নিবেদিতা, চিত্তরঞ্জন দাস সুবেন ঠাকুর, এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঐ সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং এর উদ্যোক্তা অরুণ দলকে তাঁরাই প্রচুর উৎসাহ দেন। অত্যন্ত বেদনার কথা যে, ঐ বছরই স্বামীজি দেহ রক্ষা করেন মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে।

১৯০৮ সালের গোড়াতেই বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব দেয় 'কার্জন' সাহেব, যদিও ১৯০৫ সালের ১০শে জুলাই তারিখে বৃটিশ সরকার বঙ্গ ভঙ্গের স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং ১৬ ই অক্টোবর বাংলার অঙ্গচ্ছেদ করার জন্য লর্ড কার্জন সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হলেন। ফলে সারা বাংলায় ঐ দিন অরন্ধন ও রাখীবন্ধন উৎসবের মাধ্যমে প্রতিবাদ জ্ঞাপন হল। বাঙ্গালীরা স্যার সুরেন্দ্র নাথের নেতৃত্বে,

রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য স্বদেশ প্রেমিক নেতাদের সাহচর্য্যে দুর্জয় সংকল্প নিয়ে বঙ্গ ভঙ্গ রদ্ করার জন্য প্রবল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও পরিশেষে বঙ্গ ভঙ্গ রদ্ করতে সমর্থ হয়, সারা দেশের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় ও কৃচ্ছ সাধনের ফলে।

ইংরাজ রাজশক্তি সেইদিনই ও পরবর্ত্তি কালে বাংলার মানুষের সংঘশক্তি ও প্রতিরোধ শক্তিকে ভয় করতে শুরু করলো। ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় বঙ্গ ভঙ্গ রদ্ কালে তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা 'সন্ধ্যা' প্রকাশ আরম্ভ করেন রবীন্দ্রনাথ গান বাঁধেন

'বাংলার মাটি বাংলার জল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান
বাংলার ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক হে ভগবান'

ইত্যাদি।

১৯০৬ সালে বাংলার বিপ্লবীদের আত্মপ্রকাশের কথা যুগান্তর কাগজের মাধ্যমে মার্চ্চ মাসে প্রচারিত হয়। ইংরাজের টনক নড়ে, ঢাকার নবাবের সহায়তায় ইংরাজ রাজ পুরুষরা মুস্লিম লীগের পত্তন করে—উদ্দেশ্য হিন্দু বাঙ্গালীর সঙ্গে মুসলমান বাঙ্গালীর বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি। Divide and Rule Theory যোগে ঐ ১৯০৬ সাল থেকেই ইংরাজরা ভারতবাসীকে শাসন ও শোষণ করতে শুরু করে সু কৌশলে। মুসলমান ভাইয়েরা তখন ইংরাজের কূট কৌশলের মধ্যে যে দুরভিসন্ধি ছিল তা গোড়ায় বুঝতে পারেন নি। ফলে বহু দুর্ভোগ ভুগ্তে হয়েছে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই। বাংলার বিপ্লব-বাদকে স্তব্ধ করার জন্যই ইংরাজ ঐ হীন পথ বেছে নেয়। তবুও বিপ্লব আপন পথেই অগ্রসর হতে থাকে এবং তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে।

ইংরাজের শতচেষ্টা ম্লান হয়ে যায় বিপ্লবীদের কূট কৌশলের কাছে, এর কারণ বিপ্লবীরা ছিলেন দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত মহৎ প্রাণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষের দল, যাঁরা জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করেছিলেন ও যাঁদের চিত্ত ছিল ভাবনা হীন দুর্জয় সাহসে ভরা।

১৯০৮ সালে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি মজফরপুর শহরে কিংস্ ফোর্ড সাহেবের গাড়ীতে বিধ্বংসী বোমা বর্ষণ করে ইংরাজকে সচকিত করেন। প্রফুল্ল আত্মহত্যা করে শহীদ হয়, ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ঐ বছরই শ্রী অরবিন্দ বারীন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্যরা আলিপুর বড়যন্ত্র মাম্লায় গ্রেপ্তার হন ও বিচারাধীন বন্দী হিসাবে জেলে থাকেন বিশ্বাসঘাতক আশুতোষ বিশ্বাস বিপ্লবীদের হাতে মৃত্যু বরণে বাধ্য হন ও খোদ লণ্ডনে কার্জ্জন ওয়াইলীকে বিপ্লবীরা হত্যা করেন ১৯০৯ সালে এর পর ১৯১২ সালে ভারতের বড় লাট হার্ডিঞ্জকে দিল্লীর চাঁদ্নিচক্ এলাকায় করোনেশন মিছিলের মধ্যে হত্যার উদ্দেশে বোমা মারেন স্বয়ং রাসবিহারী বসু। বড় লাট প্রাণে বেঁচে যান কারণ তিনি তখন হস্তি পৃষ্ঠে মিছিলে ভ্রমণরত ছিলেন। বসন্ত বিশ্বাস ও অবোধ বিহারী, রাসবিহারীর দুই বিশ্বস্ত অনুচরও ঐ ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। অবোধ ও বসন্তের ফাঁসি হয়। রাসবিহারী পলাতক হন। রাসবিহারী যে কত কৌশলী ও উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তা বৃটিশ শক্তি তখন জান্তে পারেনি। পরে যখন তিনি পি, এন্, টেগোরের ছদ্ম নামে ভারত থেকে জাপানে চলে যান ও জাপানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন তখন ইংরাজ গুপ্তঘাতক দিয়ে তাঁর প্রাণ সংহারের চেষ্টা করে বৃটিশরাজ শক্তি।

রাসবিহারী কিন্তু অনেক পরে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন সুভাষ চন্দ্রের হাতে আপন কার্যভার সানন্দে অর্পণ করে ১৯৪১ সালে জাপানেই। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষ রাসবিহারীর সাহায্য ও সহযোগিতায় মুগ্ধ হন জাপানে। দুই মহানায়ক অন্তর স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত ও কর্ম্মসূত্রে সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষপাতি ছিলেন বরাবর। ফলে সুভাষ রাসবিহারীকে জাপানে কাছে পেয়ে নিজেকে ধন্য ও সফল মনে করেন।

১৯১৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে এদেশ থেকে বৃটিশ সৈন্যদের ইউরোপে পাঠান হয় দলে দলে। বৃটিশের অধীন ভারতীয় সৈন্যদের অধিকাংশই এদেশে রয়ে যায়। ফলে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী সেই সুযোগ নিয়ে প্রতিটি সৈন্য শিবিরে যোগাযোগ করে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন বিপ্লবী সহকর্ম্মীবৃন্দের সাহায্যে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিনঠিক হয় ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ সালে। সিংগাপুর থেকে কোয়েটা পর্য্যন্ত এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি বৃটিশ সেনা শিবিরে বিদ্রোহ ঘোষিত হবে ঐ দিনটিতে একই সময়ে। বাংলা, আসাম ও ওড়িষ্যার সর্ব্বাধিনায়ক স্থির হলেন বাঘা যতীন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে অন্যান্য এলাকার অন্যান্য বিপ্লবী নেতাগণ দায়িত্ব নিলেন। রাসবিহারী বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে এসে বেশ আশ্বাসিত হলেন। কিন্তু ঐ সশস্ত্র অভ্যুত্থান শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল, কারন সেনাশিবিরের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে সব ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয় সরকারের কাছে পূর্ব্বাহ্নে।

কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে যায় বিপ্লবীদের মধ্যে, গা ঢাকা দিতে থাকেন তখন বিপ্লবীরা। তবুও বহু বিপ্লবী ধরা পড়েন তাঁদের ফাঁসি দেয় ইংরাজ বিপ্লবীকে নির্ব্বাসনও দেওয়া হয়। বাঘাযতীন ও আরো অনেকে ধরা পড়েন নি তখন।

১৯১৫ সালের ৯ ই সেপ্টেম্বর প্রখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে বুড়ি বালামের তীরে চাষখণ্ড প্রান্তরে বৃটিশ রাজ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন চার সহচর অনুগামী বৃন্দের সাথে। চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ, বাঘা যতিনের সঙ্গে সংগ্রামরত অবস্থায় স্যার চার্লস টেগার্টের সশস্ত্র বাহিনীর উপর গুলি বর্ষণ করেন অমিত বিক্রমে। কিন্তু উক্ত রক্ত তীর্থে প্রচুর রক্ত স্নাত অবস্থায় বিপ্লবী পক্ষদের মধ্যে কেউই শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন না। ফলে বালেশ্বরে বুড়ি বালামের তীরে নব-ভারতের হলদি ঘাট সৃষ্ট হয়, আর পরম শ্রদ্ধের আমাদের অগ্রজ বিপ্লবী পক্ষক শহীদ হন তথায়। বালেশ্বরের ঐতিহাসিক মহারণ শেষ, কিন্তু যে শহীদ পক্ষক তথায় বুকের তাজারক্তে ধরণী রঞ্জিত করে জাতির জীবনে নব-অধ্যায়রচনা করে গেলেন তা কি কখনও কোন স্বদেশ প্রেমিক ভারতীয় ভুলবে, না ভুলতে পারবে? বাঘাযতীন ও তাঁর চার সহ-বিপ্লবীকে দেশ কোনদিনই ভুলবেনা, বরং ঐ শহীদ পক্ষকের স্মৃতিকে মানুষ চিরদিন সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম জানাবে। তাঁরা যে স্মরণীয়, তাঁরা যে বরণীয় জাতীর জীবনে চির ভাস্বর।

ভবানি
আজও তোমায় স্মরি

কামাক্ষা রায়

ভবানি, তোমাকে আমি কি বলে সম্বোধন করব। ভাই, বন্ধু—না তুমি তার অনেক উর্দ্ধে। তুমি একজন বিপ্লবী কুল প্রধান। (তুমি বিপ্লবী কুলের অভিমন্যু। অভিমন্যু সপ্তরথী ব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করে যুদ্ধ করেছিল, আর তুমি শত শত রথি পরিবেষ্টিত গভর্ণর এণ্ডারসনকে আক্রমণ করেছিলে। যখন কুখ্যাত এণ্ডারসন বাঙ্গলার বিপ্লবী কুলকে ধ্বংসের মুখে এনে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল ভবানি তখন তুমিই বিপ্লবী গোষ্ঠীর মুখ রক্ষা করেছ, মান, মর্য্যাদা রক্ষা করেছ—যেমন করেছিল অভিমন্যু। তুমি আমাদের বিপ্লবীকুলের অভিমন্যু।)

তোমার নিখুঁত চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, সাহস, মেধা সবই আমাকে মোহিত করেছিল, আকৃষ্ট করেছিল। জয়দেবপুরের যুবক এবং বালক বৃন্দ যখন প্রায় সবাই আমার ভাই ও বন্ধু, তুমি তখনও দূরে, অনেক দূরে। যখন নিকটে আসলে তখন অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ-মাতৃকার পাদমূলে জীবনদান করে চলে গেলে। তোমাকে ধরে রাখা যায়নি, ধরার চেষ্টাও করিনি। কিন্তু আজ তোমাকে ধরার চেষ্টা করছি—এই ছোট্ট লিখনির মধ্যে। সেজন্যই তোমার জীবন কাহিনী লিখিবার প্রয়াস।

(ভবানির আদি নিবাস বরিশাল জেলায় বানরী-পাড়া গ্রামে। পিতার নাম ৺বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম দময়ন্তি দেবী। বসন্ত বাবু ঢাকা ভাওয়াল পরগণার জমিদারদের নিকট আত্মীয় ছিলেন। সে সূত্রে তাহারা জয়দেবপুরের রাজ-বাটীতে বসবাস করতেন।) বড় কুমারের স্মৃতি রক্ষার্থে একটা মন্দির তৈরী করতে আমি জয়দেব-পুরে যাই ১৯২৯ সালে। তখন ভবানি ক্লাশ সেভেন্ এর মেধাবী ছাত্র, ক্লাশ-এর কাষ্ট বয়। কুশলী খেলোয়াড়, ফুটবল ও ক্রিকেটে সমপারদর্শী। চরিত্রবান ও নিষ্ঠাবান, সংগঠনিক শক্তি অদ্ভুত। ক্লাশ সেভেন্, এইট-এর ছাত্ররা ও'র কথায় উঠে বসে।

এসবই আমাকে মুগ্ধ করেছে. আমাকে সন্ধান দিয়েছে 'এই অনুন্নত (নৈতিক) গ্রামে. অনুর্ব্বর জায়গায় যদি কিছু ফসল তুলতে চাও, তাহলে ভবানিকে তুলে নাও। রবি ভট্টাচার্যকে পূর্ব্বেই দলে টেনে নিয়েছিলাম। ও'র সাহায্যে ভবানিকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলাম—হাতি দিয়ে হাতি ধরার ফন্দি। তাই রবিকে শিখিয়ে দিয়ে ছিলাম—সে যেন স্নানের অছিলায় আমার ঘরের নিকট যে জলের কল আছে সেখানে নিয়ে আসতে। ভবানিকে ধরা যায় না, কিন্তু ধরতে হবে। যখন ওরা স্নানে আসত আমিও তখন স্নানের অছিলায় সেখানে যেতাম। বলতাম তোমাদের স্কুল আছে, তোমরা আগে স্নান কর।' এমনি করে কয়েকদিন চলার পর রবিকে শিখিয়ে দিলাম সে (রবি) যেন মাঝে মাঝে ভবানির সাথে স্নান করতে না আসে। একদিন সে সুযোগে বললাম 'ভবানি তুমি কোন ক্লাশে পড়? ফুটবল না ক্রিকেট খেলতে ভালবাস?' ইত্যাদি। এ ভাবেই প্রদীপে আলো জ্বাললাম। সে আলো ৩।৪ বৎসর জ্বলেছিল। তেলের অভাবে নেভেনি, সে নিজেই নিভিয়ে চলে গেছে।

জয়দেব পুরের অনেক ছেলে আমাদের দলের (I, V) সভ্য হয়েছে. তারা সবাই আমার ভাই ও বন্ধু। সকলে স্নেহের ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ।

সবাইকে নৈতিক চরিত্রের অবদান—ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে কত প্রয়োজন তাহা ভবানি ছেলেদের বুঝাতে লাগল। ভবানি দেশের স্বাধীনতার জন্য পাগল যেমন ৺শ্রীচৈতন্য হয়েছিল ৺কৃষ্ণ নামে।

ভবানি রবিদের গ্রুপ-এর সাথে মাঝে মাঝে গোপনে মিলিত হতাম। তাদের বুঝান হত—স্বাধীনতা অর্জনের পথ খুব কষ্টকর। সে পথে আলো নেই আছে শুধু অন্ধকার, সুখ নেই আছে শুধু দুঃখ, নিদ্রা নেই আছে বিনিদ্র রজনি। আরও আছে ধরা পড়লে পুলিশের অকথ্য নির্যাতন এবং অত্যাচার।

ভবানি কথা বলার চেয়ে কাজ করাটাই পছন্দ করত বেশী। একদিন ভবানির হাত কাটা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম 'কি হয়েছে?' ভবানি নীরব কিন্তু মুখে হাসি—হাসি তার কৃতকার্যের জন্য। রবি চট করে উত্তর দিল 'দাদা সেদিন (আপনি পুলিশ নির্যাতনের কথা বলার পর ভবানি বাড়িতে নিজের হাত ছুরি দিয়ে কেটে সে কত স্থানে লঙ্কা বাটা দিয়ে পরীক্ষা করেছে তার সহ্য করার ক্ষমতা। সে সফল হয়েছে 'দাদা'।) শুনে ভবানির মাথার উপর হাত দুখানা রেখে ৺ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে ছিলাম সে যেন সব কাজে সফল হয়।

জয়দেবপুরের নিকট প্রায় চারিদিকে জল ঘেরা একটী জঙ্গল ছিল, বেশি বড় নয়। সেখানে আমাদের লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ইত্যাদি শেখান হত। ভবানি শুধু ফুটবল ক্রিকেট খেলাতেই পারদর্শী ছিল না—অল্প দিনের মধ্যেই লাঠি ও ছোরা খেলায় পাকা হয়ে উঠল। এই স্থানটী ভবানিই নির্বাচিত করেছিল কয়েকদিন পর ভবানি জিজ্ঞেস করল 'দাদা জায়গাটি আপনার পছন্দ হয়েছে? উত্তরে ওকে জানিয়েছিলাম যে শুধু লাঠি ছোরা খেলার উপযুক্ত গোপন জায়গা বলেই পছন্দ হয়নি ইহার পরিবেশ এত সুন্দর যে ভবিষ্যতে আমাদের জীবিতকালে দেশ স্বাধীন হলে এখানে একটা আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলব যেখানে স্থান হবে 'হেড নোটস্'-দের। ভবানি আজ তুমি নেই, দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু বিভক্ত। খুজিব গভর্ণমেন্টের আমলে সে আদর্শ গ্রামের স্বপ্নকে একটু রূপ দিবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ব্যর্থ, আজও তোমার সিলেকসন্, অফ স্পট্-এর কথা ভুলতে পারিনি, তুমি কবি ছিলে, স্রষ্টা ছিলে স্রষ্টা ছিলে তাইত নিখুঁত স্থান নির্বাচন। ভবানি অনেক কবিতা লিখেছিল, লিখতে ভাল লাগত। লেবং স্যুটিং এ যাবার পূর্বে সে সব ওর এক বন্ধুর নিকট রেখে দিয়েছিল, কিন্তু সে বন্ধুটি সব নষ্ট করে দিয়েছে।

ভবানি জয়দেব পুরের সংগঠন শেষ করে মন দিল আরও দৃষ্টি গ্রামের দিকে যেখানে দুটী হাইস্কুল ছিল, একটির নাম কালিগঞ্জ এবং অপরটি কালিগঞ্জ ৮। ৯ মাইল দূরে, যেতে হয় একটা বড় বিলের ধার দিয়ে। শুনেছি রাত্রি বেলা ভূতের ভয়ে সে বিলের ধার পাশ দিয়ে কেহ যেতে সাহস পেত না এমন কি স্থানীয় জেলেরা রাত্রে মাছ ধরতে সাহস পেত-না। আর আমাদের বিপ্লবী বালক ভবানি (তখন অষ্টম, নবম শ্রেণীর ছাত্র) কখন একা, কখনও সাথী নিয়ে রাতের অন্ধকারে, নির্জ্জন পথে মিলিয়ে যেতো। নিদ্রিত পিতামাতা, ঘুমন্ত গ্রাম ও জাগ্রত পুলিশ কেহই জানতো না কোথায় গেল। সেখানে কাজ সেরে অতি ভোর বেলা ফিরে আসত, কেউ জানতে পারত না তার গতিবিধি। এমনি করে রাতের পর রাত কেটে, ভূতের রহস্য ভেদ করে গড়ে তুলল সে ছটি গ্রামে বি, ভি, পার্টির ছটি কেন্দ্র।

১৯৩২ সাল। অবিভক্ত বাঙ্গলা দেশের বিপ্লবী-দের কাজকর্ম দমন করতে না পেরে 'ব্রিটিশ গভর্ণ-মেন্ট' অত্যাচারী গভর্ণর 'স্যার জোন্ ইনডারসন্'কে নিয়ে এল বাঙ্গলা দেশে তখন অন্যান্য বিপ্লবীদের দলের (বি, ভি) অনেকে বহরমপুর 'ডিটেনসন্ ক্যাম্প' এ আবদ্ধ। আণ্ডারসন্-এর বিজয় গৌরব সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে আর ভারতের বিপ্লবী-দের জয় যাত্রা স্তব্ধ, দেশবাসীর আশা সুদূর পরাহত।

এণ্ডারসনের অত্যাচারের নিকট যদি বিপ্লবীরা পরাজয় স্বীকার করে নেয় তাহলে ভারতে বিপ্লব আন্দোলন একশত বৎসর পিছিয়ে যাবে, স্বাধীনতার আশা ভারতবাসীর মন থেকে মুছে যাবে। বিপ্লবীরা সেই মৃত-প্রায় আশাকে জীবন ফিরিয়ে দিতে চায়। মুমূর্ষ আশা থেকে তারা অংকুরিত করতে চায় নূতন আশা, যে আশা ভারতীয়দের মুখে হাসি এনে দিবে। তারা চায় ভারতের বিপ্লব ধারা প্রবাহিত থাকবে এবং সে ধারায় ভারতে ব্রিটিশ শাসন ধ্বসে বিলীন হয়ে যাবে।

এরূপ চিন্তাধারার বশবর্ত্তী হয়ে আমিও ৺জ্যোতিষ বাবু [গুহ] জেলে বসে ঠিক করেছিলাম আণ্ডারসন কে হত্যা করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে এবং কোন পথে ? এ আলোচনার কিছুদিনের মধ্যেই সুযোগ এসে গেল। ৺ জ্যোতিষ বাবু কলকাতার স্বগৃহে অন্তরীণ হলেন। ৩।৪ মাস পরে আমিও ঢাকার স্বগৃহে অন্তরীণ হলাম। অন্ত-রীণাবস্থায় মাঝে মাঝে রবি ও ভবানীকে ডেকে জয়দেবপুরে দলের সংগঠন কার্য কেমন চলছে তাহার খোঁজ খবর নিতাম।

ইতি মধ্যে কলকাতায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন জ্যোতিষ গুহের নেতৃত্বে দারজিলিং-এ আণ্ডারসনকে হত্যা করার নিখুঁত পরিকল্পনা ঠিক হয়ে গেল। রবি ও ভবানীর উপর সে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হল। ওরা সে শুভ কাজে চলে যাবার পর মধু ব্যাণার্জি আমার বাড়ী এসে জানাল যে দারজিলিংয়ে গভর্ণর এণ্ডারসনকে হত্যা করার জন্য রবি ও ভবানীকে পাঠান হয়েছে। সময়াভাবে আপনাকে পূর্বে জানানো সম্ভব হয়নি। এ খবর জানবার ৫।৬ দিন পর পত্রিকা মারফৎ জানতে পারলাম গভর্ণর এণ্ডারসনকে লেবং ঘোড়দৌড় মাঠে গুলি করা হয়েছে।

This is the most splendid and glorious action of the revolutionaries. It has defaced the other actions. ইহা অতর্কিত আক্রমণ নয়, মাঠে, ঘাটে, নির্জ্জন স্থানে একাকী শত্রুকে আক্রমণ নয়, এ যে সম্মুখ সমরের আহ্বান। Being guarded by few hun-dreds of British and Indian soldiers and also plain clothed police men এণ্ডারসন প্রতি পদক্ষেপে বিপ্লবীদের জানাচ্ছে— 'where are those terrorists ? come and have courage to get a blow.'

বিপ্লবীরা এণ্ডারসনের সে দাম্ভিক আস্ফালনকে বৃথা যেতে দেয়নি। কেহ ভাবতেও পারেনি এরূপ দুর্ভেদ্য বেষ্টনী ভেদে এণ্ডারসনকে হত্যার চেষ্টা করা সম্ভব। হ্যাঁ তাও সম্ভব হয়েছে। বীর বিপ্লবী অভিমন্যু [ভবানি] তুমি ব্যূহ ভেদ করে এণ্ডারসনকে হত্যা করতে পারনি কিন্তু পরাজিত করেছ। এণ্ডারসন তোমার ভয়ে দৌড়িয়ে লোকের মধ্যে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল। ১৭/১৮ বৎসরের বালক ভবানি ও রবি তোমরা ধন্য, শত শত সৈন্য পরিবেষ্টিত লেবং মাঠের পরিবেশ তখন

ভয়ঙ্কর বহাবহ। তা দেখে এবং পরিণাম ভেবে তোমাদের মনে ভয় আসেনি, হাত কাঁপেনি তোমরা দু'জনে বিপ্লবীদের বিজয় পতাকা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছ বিপ্লবীকুলের গৌরব আরও উজ্জ্বল করেছ।

(ঘটনা ঘটার পর যখন ভবানি ও রবি ধৃত ও আবদ্ধ তখন তাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন হয়েছে তাহার কোন পরিমাপ নেই। ভবানি ও রবি তোমরা সেখানেও অজেয়। বিশেষ করে (ভবানির গৌরব একটুকুও ম্লান করতে পারেনি)।

লেবং স্যুটিং এর পর পুলিশ আমাকে ধরে সেই কেস্-এর সাথে জড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু প্রমাণা ভাবে ছেড়ে বিনা বিচারে জেলে আটকিয়ে রাখল। ৫। ৬ বৎসর পর মুক্তি লাভ করে কলকাতায় আসি। ১৯৩৯ সালে পার্কসার্কাস এলাকা দিয়ে যাচ্ছি। প্রখর রৌদ্র নির্জ্জন পথ তবুও একটি সম্বোধন 'কামাখ্যা বাবু' কাণে ভেসে এল পিছন ফিরে দেখি ঢাকার অবসর প্রাপ্ত পুলিশ ডি, এস, পি (আই বি) জিতেন বাবু (ঘর)। অনেক অনুরোধ করে তার ঘরে এনে বসালেন। তিনি জানালেন যে তিনিই লেবং স্যুটিং কেস-এর তত্ত্বাবধান করেছেন গভর্ণর-এর পক্ষ থেকে। তার অভিজ্ঞতার কথা শুনালেন, আমি খুব আগ্রহ সহকারে শুনলাম। একবার জিজ্ঞেস করলেন 'কামাখ্যা বাবু ভবানিকে কি দিয়ে এবং কেমন করে তৈরী করেছিলেন। আমি শুনে প্রশ্ন করলাম 'কেন'। উত্তরে ভবানির শৌর্য্য, বীর্য, সহ্য ক্ষমতা অনেক কিছু শুনালেন। নানা প্রকার অত্যাচার করেও (তার মুখ থেকে একটী কথা বের করা যায় নি)। বিচার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বিচারকও নাকি হাবভাবে জানিয়েছে ভবাণি যদি কৃত কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাহলে ফাঁসির পরিবর্ত্তে জাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে দুঃখ প্রকাশ স্বীকার করার ভার দেওয়া হল জিতেন বাবুকে। অনেকবার বোঝান ও অনুরোধ করা সত্বেও ভবাণি রাজি নয়। জিতেন বাবু নাছোড়বান্দা। শেষে একদিন ভবাণি জিতেন বাবুকে কথা দিলেন যে সে দুঃখ প্রকাশ করবে। সকলেই খুসী বিশেষ করে জিতেন বাবু। যথা সময়ে court বসল। Judge আসলেন—ভবাণিকে জিজ্ঞাসা করলেন 'Are you sorry উত্তরে ভবাণি কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে উত্তর দিল 'yes i am sorry—i am sorry, i could not kill Anderson' 'আমি মাথা নত করে, শ্রদ্ধা জানিয়ে court থেকে বেরিয়ে আসলাম) বললেন জিতেন বাবু।

স্বাধীনতা লাভের কয়েক বৎসর পর যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে পশ্চিম বাঙ্গলায়। সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার পূর্ত মন্ত্রি। বিচক্ষণ, চিন্তাশীল, এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মন্ত্রি। তিনি অবিভক্ত বাঙ্গলা দেশের বিপ্লবী শহীদের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কাজ হাতে নিলেন। সাথে সাথে শহীদদের দেশবাসীর নিকট স্মরণীয় করবে উদ্দেশে কিছু নামী দালানের নাম বদল করে শহীদের নামে উৎসর্গ করতে মনস্থ করলেন। সেই জন্য তিনি সেই কুখ্যাত গভর্ণর এণ্ডারসনের নামে বিখ্যাত "এণ্ডারসন হাউস" টীর নাম পরিবর্ত্তন করে "ভবাণি ভবন" নাম রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন সে উপলক্ষে শহীদের জন্ম, মৃত্যু, বয়স ইত্যাদি স্মৃতি ফলকে লিখিবার প্রয়োজন। ভবাণির বয়স নিয়ে একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়াতে

[এর পর ১৫ পৃঃ দেখুন]

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল

গুণদা মজুমদার

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থানে অধিকার করে আছে। কেতাবী ধারায় এ পার্টির জন্ম হয়নি বলে অনেক বিরূপ সমালোচনা পার্টিকে শুনতে হয়েছে। বিরোধিতা শুধু দক্ষিণপন্থী নয়, বামপন্থী সাম্যবাদী দল (কম্যুনিস্ট পার্টি) বিশেষ ভাবে করেছে। তবুও এর গতি ও প্রকৃতি সর্বদাই বৈপ্লবিক রূপ নিয়েছে। বৈপ্লবিক আদর্শ হতে পার্টি কখনই সরে আসেনি।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের জন্মবৃত্তান্তর আগে দেশে কি আবহাওয়া ছিল সেটা জানার দরকার। ৬।৭ বছরের আগেকার ইতিহাস অর্থাৎ ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক। ভারতের একমাত্র শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেসে আগেও নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা ছিলেন। কিন্তু ১৯২১ সাল থেকে গান্ধীজী যখন কংগ্রেসকে জনগণের সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার করে গড়ে তুললেন তখন জাতীয় আদর্শ বা উদ্দেশ্য নিয়ে একটা বড় তর্ক উঠল। ইংরাজদের কাছে পূর্ণ স্বরাজের দাবী তার আগে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হতে সামগ্রিকভাবে করা হয়নি। সশস্ত্র বিপ্লবীদের সে দাবী বরাবর ছিল। তিলক ও Swarj is my birthright বলে-ছিলেন। দেশবন্ধু বলেছিলেন সাদা চামড়ার বুরোক্রাটদের বদলে বাদামী চামড়ার বুরোক্রাট আমরা চাইনা। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার আওয়াজ কংগ্রেস থেকে তখনও সামগ্রিকভাবে তোলা হয়নি। ১৯২৮ সালে ইংলণ্ড হতে যখন সাইমন কমিশন এল তখন কংগ্রেস কমিশন বয়কট করল। ভারতবর্ষের নতুন সংবিধান গড়ার জন্য এই কমিশন। কংগ্রেস পালটা আর একটা কমিশন গঠন করল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে নেহরু কমিশন গড়া হল; তাতে কংগ্রেস ছাড়া অন্য অ-কংগ্রেসী নেতারা ছিলেন। আর যুব-প্রতিনিধি ছিলেন দুজন জওহর-লাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু। নেহরু কমিশনের জানান হল, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ পেলেই হবে। তাঁদের বক্তব্য ইংলণ্ডের ডোমিনিয়ন থাকলেও, দেশ চালনার সব দায়িত্ব দেশের লোকেরা পাবেন। দুই যুব নেতা এই রিপোর্টে প্রথমে সই করেননি। জহরলালকে বোঝান হল বার মাসের মধ্যে ইংরেজ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস না দিলে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করা হবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তখন কমিশন রিপোর্টে সই করলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কিছুতেই সই করলেন না। এ ঘটনা ঘটে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন যখন বসে। তার পরের বছর লাহোরে অধিবেশন বসে।

১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কংগ্রেস ইংরাজদের কাছ হতে কোন সাড়া শব্দ পেলনা। তখন ১লা জানুয়ারী ১৯৩০ তারিখে কংগ্রেস হতে ঘোষণা করা হয়, পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের এবং ভারতবাসীদের লক্ষ্য।

এই ইতিহাস বলার কারণ হচ্ছে কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্বের এক শক্তিশালী অংশ ইংরেজের সঙ্গে আপোষ রফায় সব সময় রাজী ছিলেন। এঁরা সব উকীল ব্যারিষ্টার, জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ী। কংগ্রেসকে চিরকাল এঁরাই চালিয়ে এসেছেন। ইংরেজদের সঙ্গে রফা করে ক্ষমতার বড় অংশ পাবার জন্য এঁরা ব্যাকুল ছিলেন। তখন কংগ্রেস ছিল

আবেদন-নিবেদনের সভা। কিন্তু ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন ভারতের বিশাল জনসমুদ্রকে যখন কংগ্রেস ডাক দিল, তখন কংগ্রেসের চেহারা অনেক পালটিয়েছে। অনেক সশস্ত্র বিপ্লবী কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, অনেক ছাত্র ও যুবা আন্দোলনে সামিল হয়েছে। সুতরাং এই নতুন জনশক্তি এক দিকে এবং আর একদিকে আপোষ মনোভাবাপন্ন বেশ কয়েকজন বেড়া। নতুন জনস্রোত আবার ১৯৩০ সনে লবণ সত্যাগ্রহ সংগ্রামে কংগ্রেসের মধ্যে এল। ১৯৩১ সালে লণ্ডন হতে গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকের শেষে বিফল হয়ে যখন ফিরলেন তখন ইংরাজ আর কালবিলম্ব করেনি। ভারতের মাটিতে পা দিতে না দিতে গান্ধীজি ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতার করা হল। দেশময় আইন অমান্য আন্দোলন চলল এবং লক্ষ লক্ষ নরনারী এই সংগ্রামে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলেন। কংগ্রেসের ভেতর তখন এক নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়েছে। জনগণ সারা দেশে জেগে উঠে সংগ্রাম চেয়েছেন। সেই সব দরিদ্র চাষী মজুরের শক্তিকে প্রকৃত অগ্রাহ্য করে এমন কোন নেতা কংগ্রেসে নেই। তাই ১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেসে চাষী মজুরদের দাবীর কথা প্রথম স্বীকৃত হল।

সুতরাং আবেদন-নিবেদনের পালা থেকে বদলাতে বদলাতে কংগ্রেস সম্পূর্ণ এক নতুন রূপ দিয়েছে, গরীব ভারতবাসীদের সমস্যার কথাও ভাবতে শিখেছে। কিন্তু কংগ্রেসের জন্ম ধনী সম্প্রদায়ের নেতারা তখনও জাঁকিয়ে আছেন। যতই তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে অবস্থান করুন দেশের মধ্যে এক নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৩০ এর সময় এবং তার আগেই দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচেষ্টা খুব দানা বেঁধে উঠেছে যতীন দাসের ৬৪ দিন অনশনে আত্মত্যাগ চট্টগ্রাম সংগ্রাম ভগৎ সিং-এর ফাঁসী এবং বাংলা ও অন্ধ্র প্রদেশে অগণিত যুবকদের অসীম সাহসের সঙ্গে ইংরেজদের মোকাবেলায় দেশের রাজনৈতিক আবেগ এক বিরাট ঘূর্ণী ঝড় উঠেছে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কৃষক আন্দোলন ১৯৩৪ এর আগে শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি ১৯৩০ এর আগেই মীরাটে কমুনিষ্ট ষড়যন্ত্র মামলা চলেছে।

এই নানা দ্রুত ঘটনায় যুবকদের মধ্যে এক নতুন চেতনা আসে। স্বাধীনতা শুধু ইংরেজি নবীশ বাবুদের জন্য নয়। আসল স্বাধীনতা তখনই সফল হবে যখন দেশের কোটী কোটী গরিব দেশবাসী অভাব অনটন ও দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবেন। মীরাট ষড়যন্ত্রের আগেই দেশে সমাজতন্ত্রের কথা কয়েকজন পুরাতন স্বাধীনতা সংগ্রামী বলতে শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামী বিবেকানন্দর ভ্রাতা। ১৯২৮ সালে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি (A.B.S.A.) স্থাপিত হয়েছে প্রধানত—সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্ররা এই সমিতি গড়েন। জবাহরলাল ও সুভাষচন্দ্র দুজনেই এই সমিতি গঠনে সাহায্য করেন। পরে ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে দেশব্যাপী জন-সংগ্রামে এই ছাত্র সমিতি বিশেষ ভূমিকা এবং বাঙলাদেশে সংগ্রামে তাদের সংখ্যা সর্বাধিক হয়।

সেই সময় ডঃ ভূপেন দত্ত এই সব নবীন যুবকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৩২ সনের শেষে এবং ১৯৩৩ সনে ছাত্রনেতারা দুটী পত্রিকা বার করেন। A B S A তখন

আইনত নিষিদ্ধ। প্রথমটি শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত ভাবীকাল (মাসিক পত্র) এবং দ্বিতীয়টি Voice of youth (সাপ্তাহিক) শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। উভয় পত্রিকায় রাজনৈতিক আলোচনা প্রাধান্য পেত এবং Voice of youth পত্রিকায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথা বেশি থাকত।

দেশের এই আবহাওয়ায় ১৯৩৩ সালের শেষে নাসিক জেলে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুৎ পটবর্ধন, ইউসুফ মেহের আলি, মিনু মাসানী ও অশোক প্রভৃতি এক সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা ঠিক করলেন কংগ্রেসের মধ্যে এবং সংগ্রামের সঙ্গে এত বেশি সাধারণ মানুষ এসেছেন যে তাঁদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমাজতান্ত্রিক দল গড়া অত্যন্ত জরুরী। এই কয়জন যুবক নেতাদের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ আগে আমেরিকায় থাকতে কমুনিস্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি দেশে ফিরে জওহরলাল নেহরুর পরামর্শে এ আই সি সিতে একটা শ্রমিক বিভাগের দায়িত্ব নেন। জয় প্রকাশ কমুনিস্ট হলেও তখনকার রীতি অনুযায়ী লন্ডনের C P G B (Communist Parts of Great Britain) এর অধীনে ছিলেন না। তাছাড়া ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি কলেজ ত্যাগ করে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার বাইরে চলে গেলেন। পরে তিনি আমেরিকায় ৭ বছর কাটিয়ে দেশে ফেরেন। জন সংগ্রামে যোগ দিয়ে দেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে তিনি আগেই যুক্ত ছিলেন। তখন সব কমুনিষ্টরা কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রাম বর্জন করেছে। ১৯৩০ ও ১৯৩২ এর সংগ্রামে বা ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় সংগ্রামে তাঁরা যোগ দেননি। (ক্রমশ)

[১২ পৃ: শেষাংশ]

সুবোধ বাবু আমাকে ডাকালেন শান্তি গাঙ্গুলী মারফৎ তিনি প্রশ্ন করলেন (ভবাণি নিজে তাহার বয়স ২০ বৎসর বলে গেছে) আপনি কি মনে করেন।' আমি উত্তরে বললাম যে এত বয়স ওঁর ছিলনা।

কারণ সে matric পরীক্ষা দিয়ে lebong স্কুটিং এ যায়। সে হিসাবে তাহার বয়স ১৬ এর বেশী হওয়া উচিত নয়। সে ক্লাশের প্রথম, ও দ্বিতীয়, ছিল, কাজেই ওঁর বয়স ১৬ ১৭ বৎসরের বেশী হতে পারে না, তাহলে সে ২০ বৎসর বলেছে কেন? ভবাণি, তুমি এ রহস্য কাহাকে বলে যাওনি, সবাইকে ফাঁকি দিলেও আমাকে ফাঁকি দিতে পরনি। তুমি আমার মুখেই শুনেছিলে (যে ১৮ বৎসরের নীচে হলে অপরাধী নাবালক বলে গণ্য হয় এবং ফাঁসি হয় না) শুধু আমাদের নয়, বৃটিশের আইনকেও ফাঁকি দিয়ে চলে গেছ। ভবাণি তুমি মহান, খাটী বিপ্লবী, তোমার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যান্ত কোথাও দুর্বলতা নেই। সে সফলতার জন্য তুমি ব্রত গ্রহণের পর থেকেই সাধনা করেছ, আরাধনা করেছ! হে শহিদ বিপ্লবী কুল, আজ আমাদের বলার কিছু নেই, আছে শুধু একটী অনুরোধ তোমরা আবার ভারত ভূমিতে জন্ম নেও এবং ভারত মাতাকে রক্ষা কর।

"আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে মরব না, ভাই মরব না।।

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী দিব্যেন্দু বসুর জীবনাবসান

গত ১৯ সেপ্‌টেম্বর '৮১ সন্ধ্যায় প্রবীণ বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী দিব্যেন্দু বসু পরলোক গমন করেছেন। দিব্যেন্দুবাবু ছিলেন অকৃতদার।

স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্তের বাটাজোর গ্রামে ৪ঠা আষাঢ় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে দিব্যেন্দুবাবু জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে বরিশালের বিপ্লবী নায়ক মনোরঞ্জন গুপ্তের সংস্পর্শে এসে তিনি বৈপ্লবিক রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত হন। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও অনন্য সাধারণ বৈপ্লবিক চরিত্রের আধার শ্রদ্ধেয় সত্যরঞ্জন বক্সীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং আমৃত্যু তাঁকে শিক্ষাগুরুর মর্যাদা দিয়ে গেছেন।

৩৭ নং হ্যারিসন রোড (মহাত্মা গান্ধী রোড)-এর বাড়ী এবং দিব্যেন্দুবাবু ছিলেন সহ অর্থবোধক। এই পান্থনিবাসটি একদা ছিল বহু জঙ্গী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামীদের আনাগোনার এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয় স্থল। এই বাড়ীর ১২ নং কামরায় কাজী নজরুল ইসলাম এবং মজাফ্ফর আমাদের 'লাঙ্গল' পত্রিকার সূত্রপাত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ এই বাড়ীতে কত যে আলোচনা বৈঠক, সভাসমিতিতে মিলিত হয়েছেন তার কোন হিসাব নিকাশ নেই। সব আলোচনা বা পরিকল্পনাই যে বাস্তবে রূপ নিয়েছে—এমন নয়, তবে সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই ৩৭ নম্বরের বাড়ীটি।

ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সংযোগ সমিতি, ইন্দোভিয়েৎনাম সলিডারিটি কমিটি, জাতীয় সংহতি পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবী সঙ্ঘ প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় এই বাড়ীতে এখনও স্থাপিত আছে।

শেষ জীবনে প্রধানত দিব্যেন্দু বাবুর আগ্রহ ও অর্থানুকূল্যে গরিফায় (নৈহাটীর নিকট) গঙ্গাতীরে একটি 'ওল এজ্‌ হোম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের সহৃদয় বন্ধু ও সহকর্মী দিব্যেন্দু বসুর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর বিদেহী আত্মার ঊর্ধ্বগতি কামনা করি।

RegdNo.R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—ডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভা...
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাণীন ঘোষ

খেয়ালী—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "ত্রিশ বছর ওপাশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৩.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির ৫৭ বছর—২.০০, ৪। পৌরাণী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—৫০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—
৮। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মা ও বোন—৭০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—৫০, ১১। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—৫০
...রতের অবজারভার ও ভগিনী নিবেদিতা—৭৫, ...দেশ বন্ধুর ডায়েরি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বন্ধুর ডায়েরি (২)—২.০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাসিম এতা প্রচেষ্টা—৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—...৫, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৫০, ২০। ...যুগ-চর্চা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ... কলিকাতা-৭০০০০৭
শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ১৪ই কার্ত্তিক ১৩৮৮ ৩১শে অক্টোবর ১৯৮১	৪র্থ সংখ্যা

"আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের যুবকেরা যদি সংঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক অত্যাচার ও দেশের অনাচার নিবারণের জন্য বদ্ধ পরিকর হন তাহা হইলে অনতিবিলম্বে আমাদের সামনে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।"

—নেতাজী

সম্পাদকীয়

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি নানা দিক্ দিয়ে এমন শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে যত অস্বাভাবিক কিছু ঘটুক না কেন, মানুষ তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হয়না। বরং এটাই স্বাভাবিক পরিণতি, এমনি একটা হতাশার মনোভাবের শুধু সৃষ্টিই হয়নি, উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বর্তমান প্রশাসনে এর থেকে পরিত্রাণ নেই, এটা যেন ধরেই নিয়েছে। বিদ্যুৎ সঙ্কট হোক, পরিবহন সমস্যা হোক, খুন খারাপি, চুরি ডাকাতি ছিনতাইয়ের ঘটনাই হোক, এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু করবে না। করতে চায়না। কিছু প্রতিষেধাত্মক ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছেনা এবং হবে না, এটাই সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে পরিণত হতে চলেছে। অথচ প্রশাসক দল ও গোষ্টীরা আগামী নির্ব্বাচনে ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য সমস্ত মনোযোগ, শক্তি সামর্থ্য অর্থ ব্যয় করতেই একান্ত ব্যস্ত, তাদের জনপ্রিয়তার জয়ঢাক পেটাতে অশোভনভাবে নিযুক্ত। চিন্তাশীল মানুষেরা, এমন কি জনসাধারণও মনে করেন এরাজ্যে প্রশাসন যন্ত্র একদম পঙ্গু এবং এখানকার ক্ষমতাসীন দলগুলি জনস্বার্থের চেয়ে দলীয় এবং গোষ্ঠী স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছেন। অতীতদিনে যে মুনাফাশিকারী, ধনী ও বণিক গোষ্টির বিরুদ্ধে অহরহ শ্লোগান, শোভাযাত্রা, কলকারখানা বন্ধের মাধ্যমে অর্থ-নৈতিক জীবন বিপন্ন করে তোলা হত, গত সাড়ে চার বছরের মধ্যে শ্রীমুখ থেকে এদের বিরুদ্ধে একটা কটু কথাও কেউ শোনেন নি. কিছু কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা। এই সর্বনাশা পরিস্থিতির চরম পরিণাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে। এ রাজ্যটা যেন লুঠেরা, মুনাফাশিকারী, কালোবাজারীদের স্বর্গে পরিণত হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিলে বাজারের অবস্থা কাহিল হবে, এমন কথা এই প্রগতিশীল জনদরদী মন্ত্রীদের মুখেই শোনা যায়।

এই রাজ্যে কেরোসিন বন্টনের ব্যাপারে যে সঙ্কট অহরহ সৃষ্টি হয়, সেটা নাকি মাস্তানদের দৌরাত্মেই ঘটছে, এই নির্লজ্জ উক্তি খাদ্য মন্ত্রীর মুখে শোনা যাচ্ছে। এমন অদ্ভুত কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন মন্ত্রীত্বে আসীন একজন মন্ত্রী। চোরাবাজারীদের কিছু বলা যাবে না, কারণ তাতে সরবরাহ বিঘ্নিত হবে, কেরোসিন পাওয়া যাবে না কারণ সেখানে মাস্তানদের অপ্রতিহত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই যদি রাজ্যের প্রশাসনের অবস্থা হয় তবে ও সেটা তাদের শোচনীয় ব্যর্থতারই নগ্নতম পরিচয়। কিন্তু

প্রশ্ন থেকে যায় যে রাজ্য সরকার যদি এতই অসহায় হন, তবে এত মন্ত্রী অমাত্য, মোটা মাইনের সরকারী অফিসার, কর্মচারী, জনসাধারণের রক্তজল করা টাকায় পোষণ করার কি যুক্তি থাকতে পারে? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের, নানা দল ও গোষ্ঠী এই টাকার প্রতিপালিত হতে পারে, কিন্তু তাতে জনসাধারণের সান্ত্বনা কোথায়?

দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী তরফে মূল্যহার বাড়ানোর জন্য হচ্ছে, এটা অবশ্যই স্বীকার্য। কেন্দ্রীয় সরকারী নীতি এজন্য কিছুটা দায়ী, এ কথাও মেনে নিতে হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের কি কিছুই করণীয় নেই এই ব্যাপারে? রাজ্য সরকার ত তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না, সেই বস্তা পচা কৌশলের অবতারণা করে যে কেন্দ্রীয় সরকারই এজন্য দায়ী সর্বতোভাবে। করের হার ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হারের মধ্যে এই আকাশ-পাতাল পার্থক্যের কি কৈফিয়ৎ দেবার আছে তাদের? সর্ব্বভারতীয় স্তরে দেখা যাচ্ছে যে মুদ্রাস্ফীতির হার নিম্ন মুখী। সরবরাহের অভাব নেই বহু ক্ষেত্রে। তবে কোন্ অর্থনীতির মানদণ্ডে এই লাগাম-ছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে সমর্থন করা যায়? তা ভিন্ন ভারতের অন্যান্য রাজ্যে মূল্যমান নীচুর দিকে, অনেকক্ষেত্রে উচ্চহার দমিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই শোচনীয় হাল কেন? এই কি 'বিপ্লবী' সরকারের পরিচয়? কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বহুক্ষেত্রে সরবরাহের কোন ঘাটতি নেই! কাজেই অতি মুনাফা লোভীরা বাজারে জোগানের আকস্মিক কোন ঘাটতির সুযোগে বা গোপনে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে, বাজারে আগুন লাগাচ্ছে বিনা বাধায়, বিনা প্রতিরোধে, বিনা শাস্তিভোগের দরুণ।

এ কথা আজ অনস্বীকার্য্য যে অপরাধীরা কোন শাস্তি পাবার সম্ভাবনা না থাকলে এবং শিথিল ব্যর্থ প্রশাসন যন্ত্রের অকর্মন্যতা দেখলে এমনিই হয় সব দেশে সব সময়ই। এই রাজ্যের মানুষের অশেষ দুর্গতি ভোগ এই জন্যই ঘটছে বলে মনে করছেন দেশের মানুষ। এই রাজ্যের বিপ্লবী সরকার, বাজারে আগুন লাগার ব্যাপারে কিছু প্রতিষেধক এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ত গ্রহণ করছেই না, মুখে বা খবরের কাগজের মাধ্যমে বিবৃতির মাধ্যমে কোন শব্দও করছেন না। তাঁরা অতিমুনাফা লোভীদের গায়ে হাত দিতে কোন ভাবেই আগ্রহী নন বলেই মনে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে গালাগালি দেওয়া, যত দোষ নন্দ ঘোষের উপর চাপাবার হীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া ব্যতীত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের যেন কিছুই করবার নেই। এমন শোচনীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনগত দেউলিয়াপনার নজীর খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু জনতার আদালতে উপস্থিত হওয়ার সময় খুব বেশী দূরে নয়। শেষের সেদিনটা হবে ভয়ঙ্কর, একথা স্মরণে রাখলে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই মঙ্গল।

———

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির দশ বছর পূর্ণ হল

কালীপদ সরকার

১৯৮১ সালের ৯লা আগস্ট ২০ বছর মেয়াদী ভারত-সোভিয়েত শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তির দশ বছর পূর্ণ হয়েছে। চুক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে ভারতকে লাভ ও ক্ষতি উভয় পরিনামেরই সম্মুখীন হতে হয়েছে। কোন দিকে পাল্লা ভারী সে কথা বলা শক্ত এবং সম্ভবত: সে বিচারের সময় এখনো আসে নি। তবে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে অসমানের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রকৃতি ও পরিনাম ফল ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির ফলশ্রুতিতে প্রকৃতই বিদ্যমান। এই চুক্তি প্রথম জনের কাছে অপরিহার্য এবং দ্বিতীয় জনের নিকট প্রত্যাশিত। তাই চুক্তি নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া যতটা সরব ও উল্লসিত, ভারত ততটাই নীরব ও নিস্প্রভ। অন্যভাবে বলা যায় যে, চুক্তিটি রাশিয়ার পক্ষে কূটনৈতিক জয়, ভারতের ক্ষেত্রে প্রায় আত্ম সমর্পণ তুল্য।

রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় দুটি দেশ দুই পৃথক জগতের পথচারী। বিশ্ব-কমিউনিজমের উত্তাল যৌবন পর্বে অ কমিউনিস্ট ভারতের সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি ছিল কল্পনার অতীত। ক্রুশ্চভ এবং ব্রেজনেভের অ কমিউনিস্ট দেশগুলির সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির কথা তখন কেউ ভাবতেও পারত না। গণতান্ত্রিক বিবর্তনের পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন সম্ভব এই থিসিস প্রচার করায় দুই বিশিষ্ট-বলশেভিক তাত্ত্বিক বার্ণস্টেইন ও কাউটস্কিকে প্রতি বিপ্লবী বলে লেনিন দল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। লেনিনের মতে সশস্ত্র বিপ্লব এবং যুদ্ধের অপরিহার্যতা হল কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার মৌল নীতি। রাশিয়ার ক্ষমতা দখলের পর লেনিনের নির্দেশ ছিল Purge the insects, যার মানে হল বুদ্ধিজীবী, কবি, দার্শনিকদের পোকা মাকড়ের মত পিষে শেষ কর। তখন লেনিনের বয়স ছিল ৪৭, ট্রটস্কির ৩৮, স্তালিনের ৩৭, জিনোভিয়েভ ও কামানেভের ৩৪।

কাল পরিবর্তন ও শোধন বাদের ধাক্কায় কমিউনিজমের যৌবন বেগ কমেছে এবং লাল চীনের অভ্যুদয়, রুশ-চীন ঐতিহাসিক সীমান্ত বিরোধ ও আণবিক বোমা কমিউনিস্ট বিশ্ব বিপ্লব ভাবনায় পরিবর্তন এনেছে। আন্তর্জাতিক দৃষ্টি বর্তমানে জাতীয় স্বার্থ-চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। সেই কারণেই কমিউনিস্ট দুনিয়া অ-কমিউনিস্ট দেশগুলির কাছাকাছি হয়েছে! ভারত সোভিয়েত মৈত্রী, চীন-মার্কিন সমঝোতা, পাকিস্থান-চীন মৈত্রী প্রভৃতি আদর্শ বিপরীত কূট নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন তার দৃষ্টান্ত।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পটভূমি কি ছিল তা সকলেরই জানা। এক সর্বনাশা চক্রান্তের বেড়া জাল থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে নির্বান্ধব ভারতকে ১৯৭১ সালে সোভিয়েতের প্রসারিত বন্ধুত্বের হস্তকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। ভারত-বিরোধী সেই চাক্রান্ত আবার নতুন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্থান ও চীনের যোগ সাজসে গভীরতার আকৃতি নিয়েছে এবং সেই কারণে ভারত-সোভীয়েত মৈত্রীর প্রয়োজনও অপরিহার্য হয়ে আছে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত তার রাজনৈতিক আদর্শ, অর্থনৈতিক বিকাশ ও স্ব-নির্ভরতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই হাত বাড়িয়েছিল। এমন কি অতীতের তিক্ততা ভুলে ভারত ব্রিটেনের বন্ধুত্বও চেয়েছিল। ভারতের এই প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থও হয় নি তখন। কিন্তু যে দিন ভারত যুক্তরাষ্ট্র সংগঠিত কমিউনিস্ট বিরোধী সামরিক জোট সিয়াটো ও সেন্টো-তে যোগ দিতে অস্বীকার করল এবং নিজেকে জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করল, সে দিন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুবর্তী পশ্চিমী দেশগুলি ভারতকে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করল। 'যে আমার সাথে নেই সে আমার বিরুদ্ধে'—এই কূট-বুদ্ধি মার্কিনী জোটকে প্রভাবিত করল।

শক্তি সামর্থ্যে না হলেও ভারত আয়তনে এবং লোক সংখ্যায় একটি বড় রাষ্ট্র এবং ভৌগলিক কারণে দক্ষিণ এশিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। ভারতের স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি ঘোষণার মধ্যে অযৌক্তিকতা ছিল না। কিন্তু ভারতের দৃষ্টি ভঙ্গির সম্যক মূল্যায়ণ না-করে, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বশক্তি সুলভ অহমিকার দ্বারা চালিত হয়ে, ভারতকে জব্দ করে দলে ভিড়ানোর কার্যে লিপ্ত হল। সুরু হল পাকিস্থানকে অঢেল অস্ত্র সাহায্য দিয়ে ভারতের প্রতিযোদ্ধা করে তোলা এবং ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করা। কাশ্মীর প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগামীদের বার বার পাকিস্থানকে সমর্থন ছিল অপর এক মারাত্মক ভারত বিরোধিতা। এই সব অমিত্র সুলভ মার্কিনী তৎপরতা ধীরে ধীরে ভারত-মার্কিন সৌহার্দ্যকে নিষ্প্রভ করে ছিল এবং ভারতকে সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে এগুতে অনুপ্রাণিত করল।

রাশিয়া অন্যদিকে ভারতের অনুকূলে ভেটো প্রয়োগ দ্বারা কাশ্মীর প্রশ্নে স্থিতাবস্থা আনল এবং বিরোধের বিষয়টি দুই দেশের মধ্যে আপস আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার পথ করে দিল। সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে তার আবশ্যক মত অস্ত্র শস্ত্র, প্রযুক্ত এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে লাগল।' এই ভাবে ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার বন্ধন গড়ে উঠল। স্রোত যদি ভিন্ন মুখী হয়ে থাকে তবে তার জন্য দায়ী কি যুক্তরাষ্ট্র নয়?

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি ভারতের জোট নিরপেক্ষ ভাবমূর্তিকে বিবর্ণ করেছে এবং জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র পুঞ্জের আন্দোলনকে একান্ত ভাবে দুর্বল করে দিয়েছে। পঞ্চাশ ও ষাট দশকের নেহেরু, টিটো ও নাসের পরিকল্পিত জোট নিরপেক্ষ জোট এখন কার্যতঃ কবর শায়িত। বাস্তবকে অস্বীকার করে ছায়াময় ভাবাদর্শ নিয়ে যে বেঁচে থাকা যায় না এই অমোঘ সত্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া ভারতের পক্ষে আর কি করার ছিল? জোট নিরপেক্ষ অপর রাষ্ট্রগুলিও হয়ত সেই কথাই ভাবছে।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর লাভ-ক্ষতির বিচার যে কালোচিত নয় সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তারাপুর পরমাণু চুল্লীর জন্য শোধিত ইউরেনিয়াম সাপ্লাই বন্ধ করা, পাকিস্থানকে প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে মারমুখী করে তোলা-প্রভৃতিকে এ প্রসঙ্গে মনে করতে হয়। অপর দিকে ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আলোচ্য মৈত্রী চুক্তি যে যথেষ্ট অবদান যোগায় তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

মৈত্রী বন্ধন দুই অসমানের মধ্যে হলেও,

ভৌগলিক ও সামরিক কূট-কৌশলের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে রাশিয়ার নিকট ভারতের মৈত্রী ও ও সহযোগিতা কম মূল্যবান নয়। একথা ঠিক যে ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত যতটা সোচ্চার হয়েছিল, আফগানিস্থানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সে তার দশ ভাগের এক ভাগও প্রতিবাদ মুখরতা দেখায় নি। অনেকে মনে করেন যে আফগানিস্থানের ব্যাপারে ভারতের আধা নীরবতা-সোভিয়েত হস্তক্ষেপের পিছনে নৈতিক সমর্থন দিচ্ছে। কারণটি কি অমূলক?

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির ফলে ভারতে কমিউনিস্টদের প্রভাব প্রতিপত্তি কি বাড়ে নি? এই প্রশ্নটি অনেকের মন অধিকার করে আছে। বিষয়টি লঘু নয় মোটেই। ভারতে রাষ্ট্র ধর্ম বলে কিছু নেই, জাতীয়তাবাদেরও উল্লেখ নেই সংবিধানে, সেখানে যা আছে তা হল সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা—এক কথায় কমিউনিজমের বীজ ছড়ানোর উপযোগী উর্বর ক্ষেত্র। এমন সুযোগ থাকলে কে আর সেখানে ফসল না বুনে ছাড়ে। ভারতের কমিউনিস্টরাও তাই করছেন বৃহত্তম কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব এবং তার উপর নির্ভরতা ঠিক মৌসুমী বৃষ্টির মতই তাঁদের চারা-গুলিকে সজীব ও সতেজ করে তুলছে। ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি আর কত ধকল সইবে। এক হিসাবে মুসলমান ও খৃষ্টান নৃপতিদের শাসনে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যতটা না বিপন্নাপন্ন হয়েছিল, ভারতীয় ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নীতি তাকে তার চেয়ে অধিকতর প্রমাদ প্রবাহে নিমজ্জিত করেছে।

তাই দেখা যায়, গত চৌত্রিশ বছরে দেশ সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে নি, বিচ্ছিন্নতাবাদের আক্রমণে জর্জরিত, এবং নৈতিক মূল্যমানের অবক্ষয় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। এই ধরণের সামাজিক বিপর্যয় যে কমিউনিজম বিস্তারের সহায়ক তা কে অস্বীকার করতে পারে?

পণ্ডিত নেহেরু ছিলেন মনে প্রাণে সমাজ তান্ত্রিক অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট। সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর নেহেরু এবং তাঁর পররাষ্ট্র মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন এক যোগে যে পররাষ্ট্র নীতির গোড়া পত্তন করেছিলেন তাই যথাকালে ভারতকে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষপুটে আশ্রয় নেবার পথ করে দিয়েছিল। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি তারই পরিণত ফল। ইতিহাসের গতিপথ যেমন অজ্ঞাত, তেমনি বিস্ময়কর, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী শেষ পর্যন্ত ভারতকে কোথায় নিয়ে যাবে তা কেউই এখন বলতে পরে না।

●

ভ্রমসংশোধন : 'বিপ্লবী বাংলা'র গত ২৪শে অক্টোবর '৮১ সংখ্যায় কামাক্ষা রায় রচিত 'ভবানি আজও তোমায় শক্তি' প্রবন্ধটির শেষে উদ্ধৃতিটি মুদ্রণ প্রমাদ বশতঃ ভুল ছাপা হয়েছে। ওটি হবে

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে মরব না, ভাই মরব না।'

এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। —সঃ বিঃ বাঃ

অলোক সরকারের হত্যার তদন্ত চাই

বিশেষ সংবাদদাতা

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী কালীপদ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র অলোক সরকারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড রাজ্যের জনসাধারণের সামনে এক বিশাল জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। আইন ও সত্যের খাতিরে এই হত্যাকাণ্ডের আশু পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক দুর্গা পূজার অব্যবহিত পরেই নিউ জলপাইগুড়িতে রেলকর্মী অলোক সরকার দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এই ঘটনার কিছুদিন আগে রেলের ঐ একই সেকশনের জনৈক কোরম্যানও দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত ও মারাত্মক ভাবে জখম হন। তাঁর স্ত্রী ঘটনাস্থলে থাকায় কোন রকমে তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়। ভদ্রলোক বর্তমানে হাসপাতালে আছেন

মৃত অলোক সরকার নিউ জলপাইগুড়ির রেলকর্মীদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। কর্তব্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। সম্প্রতি নিউ জলপাইগুড়ি সেকশনে কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেওয়ায় উক্ত কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এই বিক্ষোভ ক্রমশঃ ভীতি প্রদর্শন, কাজকর্মে বাধাদান ও রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। অলোক এ বিষয়ে একটি সুষ্ঠু মীমাংসা চেয়েছিলেন এবং বিক্ষুব্ধ কর্মীদের সাথে কাটিহারে রেল কর্তৃপক্ষের বোঝাপড়ার জন্য একটি বৈঠকেরও আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু উক্ত কর্মীরা সেই বৈঠকে যোগদান করেননি, বরং সেকশনের সমস্ত কর্মীদের সাধারণ ধর্মঘট করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকেন। মূলতঃ অলোকের প্রেরণায় শ্রমিকেরা এই ধর্মঘটের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করেন। প্রসঙ্গতঃ '৭১ সালের রেল-ধর্মঘটের সময়েও এই অলোক সরকার ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জংশন নিউ জলপাইগুড়িতে রেলের কাজকর্ম অনেকাংশে চালু ছিল।

অলোকের হত্যার পিছনে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে স্থানীয় মানুষেরা মনে করছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে পূর্বোক্ত কোরম্যানকে লেখা অলোকের একটি চিঠিতেও এই সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। তাতে অলোক লিখেছিলেন 'কোন অন্যায়ের কাছে আমি নতি স্বীকার করবো না। আমি জানি, আমি আজ ওদের শিকার।' কোরম্যান ভদ্রলোকের সহিত অলোকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হাসপাতালে তাঁর কাছে যখন অলোকের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছয় বেদনার্তভাবে তিনি মন্তব্য করেন—'আমিই ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী! আমাকে এতো ভালবাসতো বলেই ওকে যেতে হলো।'

অলোক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আই, এন, টি, ইউ, সি র একজন সক্রিয় সদস্য ছিল বলে তাঁর পিতা কালীপদবাবু মন্তব্য করেছেন। মৃত্যুর পরে তাঁর কোয়ার্টারে গিয়ে কালীপদবাবু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একটি সযত্নরক্ষিত ছবি, আই, এন, টি, ইউ, সি-র চাঁদার রসিদ ইত্যাদি পেয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়নগত রাজনৈতিক

বিদ্বেষই অলোকের হত্যার পেছনে কাজ করছে বলে অনেকে মনে করছেন: এবং এই কারণেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই হত্যার তদন্তের ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীনতার আশ্রয় নিয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। শুধু অলোকের হত্যাই নয়, পূর্বোক্ত ফোরম্যানের উপরে আক্রমণের ঘটনায় যারা লিপ্ত ছিল, তাদের বিরুদ্ধেও পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

বৃদ্ধ কালীপদ সরকার আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিপত্নীক এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর আশা-আকাঙ্ক্ষার অবলম্বনকে মৃত্যু এসে নিয়ে গেল। একদিন পরাধীন দেশের স্বাধীনতার জন্য যিনি সর্বস্ব পণ করেছিলেন আজ স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক বিদ্বেষ তাঁর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে গেল। সাংবাদিকরা তাই যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন যে আপনি কি চান? তাঁর বেদনার্ত উত্তর, কোন সরকারী ব্যবস্থাই তো আর আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা শাস্তি পাক্ এটা আমি অবশ্যই চাই, যাতে এইভাবে আর কোন অলোককে তার বৃদ্ধ পিতামাতার কোল ছেড়ে চলে যেতে না হয়।'

●

একটি বিশেষ আবেদন

দেউলী বন্দীনিবাসের ডেটিন্যুদের সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার একটি প্রচেষ্টা হচ্ছে। যাঁরা ১৯৩২ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে ঐ বন্দীনিবাসে ডেটিন্যু ছিলেন সেই সব জীবিত বন্ধুদের নিকট আবেদন জানাই, তাঁরা নিজ নিজ নাম, বর্তমান ঠিকানা এবং কবে উক্ত বন্দী-নিবাসে কতো দিনের জন্য আবদ্ধ ছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ যতো শীঘ্র সম্ভব নিচের ঠিকানায় জানিয়ে এই পরিকল্পনায় সহযোগিতা করুন।

ইতি

অনিল চট্টোপাধ্যায়

আহ্বায়ক

বিপ্লবী বাংলা

৪, বল্লভ দাস ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৭

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত কয়েকদিন আগে মিশরে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত তাঁর নিজ দেশের গোলন্দাজ বাহিনীর কুচ্‌কাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ কালে হঠাৎ ঐ বাহিনীরই কয়েকজন আততায়ীর আকস্মিক গুলি বর্ষণের ফলে সাংঘাতিক ভাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণে বাধ্য হন। ঐ ঘটনায় তাঁর সঙ্গে আরো প্রায় দশ-বার জন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার ও সরকারী প্রধানেরা নিহত হন। এই সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের পশ্চাৎ পট উৎঘাটিত হলে জানা যাবে যে, কোন না কোন বিদেশী গোয়েন্দা চক্রের নিষ্ঠুর গোপন হাত এর মূলে ছিল। বর্তমান পৃথিবীতে দুইটি বিশেষ শক্তিমান ও দারুণ কৌশলী এবং বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন গোয়েন্দাচক্র সর্ব্বদা বিভিন্ন রাষ্ট্রে কর্ম তৎপর। কে, জি, বি ও সি, আই, এ নামেই এরা বিশ্ব বিখ্যাত। কে, জি, বি হচ্ছে রাশিয়ার গোয়েন্দা চক্র, আর সি, আই, এ হচ্ছে আমেরিকার গোয়েন্দা চক্র। উভয় গোয়েন্দা চক্রই সবিশেষ সক্রিয় নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্র নায়কদের পরামর্শ মত। দুই বৃহৎ শক্তিমান ও বলদর্পী রাষ্ট্রই অন্যান্য জোট-নিরপেক্ষ ছোট, মাঝারি ও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গুলিকে ছলে, বলে ও কৌশলে আপন আপন তাঁবে আনার জন্য উক্ত গোয়েন্দা চক্রের মাধ্যমে গোপনে ও সুকৌশলে খবরাখবর রাখে এবং প্রয়োজন বোধে নানারকম চাপ সৃষ্টি করে, এমন কি হত্যাকাণ্ডে উস্কানী দিতেও কসুর করে না।

উভয় গোয়েন্দা চক্রের উস্কানীতে বা অন্যান্য আঁতাতে বা হীন চক্রান্তকারী যোগ সাজসে ইতিমধ্যেই অনেক রাষ্ট্রের প্রধানরা হয় রাষ্ট্র ক্ষমতা চ্যুত হয়েছে আর না হয় আকস্মিক মৃত্যু বরণে বাধ্য হয়েছে। কোথাও সি, আই, এ মার্কিন দেশের ও মার্কিন জাতির স্বার্থে অন্য দেশের ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়েছে, আবার কোথাও কে, জি, বি সোভিয়েট দেশ ও জাতির স্বার্থে অনুরূপ ভাবেই অগ্রসর হয়েছে অপর রাষ্ট্রের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে। বিশ্বের ছোট-খাট রাষ্ট্র প্রধানরা ও উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্র নায়ক গণ বর্তমানে বেশ সশংকিত হয়ে পড়েছেন উক্ত গোয়েন্দা চক্রের মারাত্মক কার্য্য কলাপের ফলে, যা আকস্মাৎ দেশে দেশে হয় অভ্যুত্থান ঘটায় আর না হয় নিধন যজ্ঞ চালায়। মিশরের ঘটনা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের মনে।

তাঁরা এই দুঃখজনক মারাত্মক ঘটনাকে বেশ গুরুত্ব দিয়েই এর সম্বন্ধে আগাগোড়া সংবাদ সংগ্রহে অত্যন্ত যত্নশীল দেখা যায়। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন; অথচ বাস্তবে দেখা যায় যে, কোন কোন বৃহৎ ও শক্তিমান রাষ্ট্র মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের জন্য সদা প্রস্তুত আত্মস্বার্থে। এই হীন ও মানবতা বিরোধী মনোভাব যদি এভাবে বাড়তেই থাকে, তবে অদূর ভবিষ্যতে একদিন না একদিন সমগ্র মানব জাতি ধ্বংসের গভীর গহ্বরে বিলীন হতে বাধ্য হবে এবং উক্ত উভয় বৃহৎ রাষ্ট্রের কর্ণধাররাই সেকারণে সর্ব্বাংশে দায়ী হবে। আত্মস্বার্থে মরীয়া রাশিয়া ও আমেরিকা সম্প্রতি যে ক্ষতিকর মনোভাব নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে সদা যুযুধান ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মাধ্যমে তা প্রকৃতই সমগ্র মানবজাতীর পক্ষে চরম বিপদ জনক আকার ধারণ করবে সর্ব্বাত্মক তৃতীয়

বিশ্ব যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে অনতি বিলম্বে। রাশিয়া ও আমেরিকা পরস্পরকে দোষারোপেই সদা ব্যস্ত।

কোন মতেই এরা পরস্পরকে সহ্য করতে রাজি নয় ফল যে কি বিষময় ও কত ভীষণ এবং কিরূপ ভয়ঙ্কর হতে পারে তা এরা উভয়েই জানে, কারণ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে এরা উভয়েই একজোট হয়ে জার্মাণী ও জাপানের সঙ্গে সর্ব্বাত্মক ভয়াবহ লড়াই-য়ের সামিল হয়ে প্রচুর ধন-সম্পত্তি ও মহামূল্য প্রাণ বলি দিতে বাধ্য হয়েছিল। সে দুঃখজনক অভিজ্ঞতার স্মৃতি কি আর এঁদের উভয়ের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় না? মনে হয় সব জেনে বুঝেও এরা উভয়েই মরণ খেলায় পুনরায় মেতে উঠতে চায় চরম স্বার্থান্ধ হয়ে ও ভবিষ্যতের ভয়াবহ পরিণতির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, যা সুস্থতার লক্ষণ নয় কখনই। দুইটি বৃহৎ রাষ্ট্রই নিজ নিজ ইজম্ নিয়ে এতই বিভ্রান্ত ও অস্থির যে তারা কেউই মাথা ঠিক রাখতে সক্ষম নয়। ফলে বিশ্বে অশান্তি ও অমঙ্গলকে এরা উভয়েই গায়ের জোরে স্থায়ী করতে বদ্ধ পরিকর।

অনর্থক জিদের বশবর্তী হয়ে এরা শান্তিকর্মী রাষ্ট্রগুলির শান্তিভঙ্গ করতে একটুও বিচলিত নয় কেন? শক্তি মদ-মত্ততা এদের উভয়কেই উদ্যত করেছে, যার ফলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে এরা হিংসার আশ্রয় নিয়েও আত্ম প্রচারের চিন্তায় মশগুল সতত।

আনোয়ার সাদাতের এই শোচনীয় ও অকল্পনীয় মৃত্যু কোন সামান্য ঘটনা নয়, বরং তা রোমাঞ্চকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত এক উল্লেখ যোগ্য দুর্ঘটনা যার পশ্চাতে কে, জি, বি র হাত আছে বলে অনেকেই সন্দেহ করে এবং সেই সন্দেহের মূলে যে কিছু জোরাল যুক্তি আছে তা পরিবর্ত্তী কালে আমেরিকার হঠাৎ মিশরের রাজনীতির ব্যাপারে স্বত প্রণোদিত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সতর্কবাণী উচ্চারণ ও রোষ প্রকাশ প্রমান করে বলে অনুমিত হয়। আনোয়ার সাদাতের সমর্থকদের পশ্চাতে আমেরিকা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে, যা রাশিয়ার গাত্র দাহের প্রধান কারণ হয়। রাশিয়ার এই আচরণ বিশ্ববাসীকে সন্দিগ্ধ কোরে তোলে এ ব্যাপারে। সাদাতের জনপ্রিয়তা ও কর্ম্মকুশলতা এবং কিছুটা মার্কিণ ঘেঁসা নীতির জন্যই বোধ হয় কে, জি, বি সাদাতের বিরুদ্ধে মিশরের গোলন্দাজ বাহিনীর লোকদের ভুল বুঝিয়ে বা উৎকোচদানে অথবা ক্ষমতা করায়ত্ব করিয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে কার্য্যোদ্ধারে তৎপর হয় বলে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে, বিশেষ করে মিশরবাসীরা। রাশিয়ার আফগানিস্থানে সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করা যেমন আমেরিকা বরদাস্ত করতে নারাজ, তদ্রুপ রাশিয়াও মধ্য প্রাচ্যে মার্কিন আনবিক অস্ত্রবাহী বিমান ও জাহাজ চলাচলকে সুনজরে দেখে না। উভয়েই পরস্পর কেদারুণ সন্দেহ করে এবং সমরাস্ত্র নির্ম্মান প্রতিযোগিতায় এরা পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ফলে হিংসায় এরা উভয়েই প্ররোচনা দেয় আপন আপন রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের দুরভিসন্ধিমূলক অভিপ্রায়ে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে অনবরত।

ফলে উক্ত দুই বৃহত রাষ্ট্রের আওতার বাইরে থাকতে চায় শান্তিকামী দেশ গুলি, তবুও তারাও মাঝে মাঝে এদের রক্ত চক্ষুর দাপট সহ্য করতে বাধ্য হয়, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাষ্ট্র বলেই। বলবানের হাতে দুর্ব্বলের নিপীড়ন ঘটে সর্ব্বকালে

সর্ব্বদেশে এবং তাহাই যেন স্বাভাবিক বলে ভ্রম হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের অনতিকাল পরে বহু ছোট ও বড় দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ঐ সকল দেশের অধিকাংশই বর্ত্তমানে হয় উন্নতিকামী আর না হয় উন্নয়নশীল। ফলে তারা কোন ক্রমেই সর্ব্বায়ক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে রাজি নয়, নিজ নিজ দেশের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকে অব্যাহত রাখার মহান উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ক্রয় করতে ও তা ভাণ্ডারজাত করতে বাধ্য হচ্ছে যুদ্ধাতঙ্কের আশংকায়।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড বেলজিয়াম, চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, কেনাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশগুলি আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মানে বিশেষ দক্ষ বলিয়াই, তারা অপরাপর দেশগুলিকে ঐ সব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ কোরে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করছে। ঐ সব সমরাস্ত্র, ক্রমে বাধ্য হচ্ছে ইস্রায়েল, ইরাণ, ইরাক, ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, আরব রাষ্ট্র সকল, মিশর, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত প্রভৃতি উন্নতি ও কামী ও উন্নয়ন শীল দেশগুলি বর্ত্তমান অবস্থার চাপে পড়ে। ফলে ঐ সকল দেশের বৈষয়িক উন্নতি রীতিমত ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছে ক্রমশই। বৃহৎ দুই রাষ্ট্রই এর জন্য নীতি গত ভাবে দায়ী, অথচ উভয়ের মধ্যে কেউ-ই আনবিক মারণ অস্ত্র নির্ম্মান বন্ধ করছে না, উপরন্তু তারা আনবিক যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মান নিষিদ্ধ করণে একমত হয়ে বিশ্ব শান্তিকে নিশ্চিৎ করার কোনওরূপ উদ্যোগ আয়োজনে মোটেই তৎপর নয়।

বর্ত্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই আনবিক সমরাস্ত্র নিষিদ্ধ করণের স্বপক্ষে, তথাপি উক্ত ৪৬৮ বৃহৎ রাষ্ট্রই এ ব্যাপারে উদাসীন এখনো। তারা নিজ নিজ জোট তৈরীতেই সদা ব্যস্ত এবং নিজ জোট মধ্যস্থিত রাষ্ট্র গুলিকে বিভিন্ন ধরণের মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত করণে বিশেষ সচেষ্ট হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, পূর্ব্বজার্ম্মেনী কামপুচিয়া, আফগানিস্তান, ভিয়েৎনাম, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক অভিভাবকও অর্থনৈতিক মদৎ দাতা হচ্ছে রাশিয়া; আর পাকিস্তান, ইসরায়েল, বাংলা-দেশ, তাইওয়ান, ফিজি, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, পশ্চিমজার্ম্মানী, মিশর, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণকোরিয়া, জাপান, ইটালি প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক সুহৃদ হচ্ছে আমেরিকা। ফলে যে কোন কারণে যদি একবার রণং দেহি বলে হুংকার দেয় রাশিয়া অথবা আমেরিকা, তখন ঐসব দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য আরো বহু দেশই অনিচ্ছা সত্বেও যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে, এমনকি জোট নিরপেক্ষ ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক রাষ্ট্রই সে সময়ে নীরব দর্শক হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, বরং তারাও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে আপন আপন দেশরক্ষার তাগিদে। জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে এবং ভারত সে বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন, তাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সারা বিশ্বময় রণ দামামা ধ্বনির সংকেত পেয়েই বিভিন্ন জোট বদ্ধ ও জোট নিরপেক্ষ দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে যুদ্ধাতঙ্ক প্রশমিত করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দেশে দেশে ঘন ঘন সফর রত। তাঁর এই মহতী প্রচেষ্টাকে ফলবতী করার জন্যই তিনি সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণে উদগ্রীব দেখা যায়।

(এর পর ১৬ পৃঃ দেখুন)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

— জনৈক স্বাধীনতা সংগ্রামী

এ সত্য অনস্বীকার্য যে সর্বভারতীয় স্তরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই প্রথম এবং একমাত্র নেতা, যিনি অতীত দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অর্থ-নৈতিক দুর্দশা মোচনের জন্য, সম্মান ভাতা দেবার পরিকল্পনা করেছেন এবং তাকে বাস্তবায়িত করেছেন। যাদের প্রভূত ত্যাগস্বীকার, অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন ভোগের মধ্য দিয়েই দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, স্বাধীন ভারতের তৎকালীন ক্ষমতা প্রাপ্ত নেতারা তাদের প্রতি জাতীয় কর্তব্যের কথা স্মরণে রাখেন নি এবং তাদের জীবনের প্রান্তসীমায় কিছুটা স্বস্তিভোগ করার ব্যবস্থার কথাও ভাবেন নি। অবশ্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একথা অনেকাংশে প্রযোজ্য যে মইয়ের সাহায্যে তারা উপরে ওঠে তাদের কথা বেমালুম হজম করে ফেলে। কিন্তু ভারতীয় নেতাদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমই লোকে আশা করে। তখনকার নেতাদের মধ্যে একটা মানবীয় মূল্যবোধের চেতনা ছিল, দুর্গত জনগণের জন্য, সত্যিকারের দরদও ছিল এবং দেশপ্রেমের নিষ্ঠাও ছিল। তা ভিন্ন, যাদের অবদান ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হতনা, তারাত অনেকেই তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের সহকর্মী ও সহযোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, এ অবশ্য কর্তব্যের প্রতি তাদের যথাযথ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি। যাহ'ক, শ্রীমতী গান্ধী একটা জাতীয় কর্তব্য পালন করে, সকলকেই অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ থেকে মুক্ত করেছেন এবং সেজন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু কোন কোন দল নিছক দলবাজীর খাতিরে, এই পরিকল্পনাকে বানচাল করতে চেয়েছিলেন। মোরারজী সরকার ত শোনা যায় এই সম্মান ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থাটাকে অচল করতে চেয়েছিলেন। আমাদের চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতালাভ হয়েছে যে কেন তারা এই অপকর্ম করতে উদ্যত হয়েছিলেন তার স্বপক্ষে কোন যুক্তি তুলে ধরতে পারেন নি। জনতা সরকার ইতিমধ্যে একটী অপকর্ম অবশ্য করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী দের মধ্যে একটা ন্যক্কার জনক শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর দেশপ্রেম, নির্যাতন ভোগ, ত্যাগ তিতিক্ষাকে কোন তৌলদণ্ডে তারা পরিমাপ করেছিলেন, তার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতেও পারেন নি। যুক্তি তর্কের কোন ধার তারা ধারেন নি। কিছু লোকের তদ্বির তদারকে তারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

অবশ্য এর পেছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল বলে অনেকে সন্দেহ করেন। শ্রীমতী গান্ধী যে কাজই করুন না কেন, তা যত ভালই হোক্ না কেন, এমন কি সেটা জাতীয় কর্তব্য পালনের অঙ্গীভূত হলেও, তাকে নস্যাৎ করতে হবে অন্ধ বিদ্বেষের তাড়নায়। আর একটা কারণ বলে যেটা অনেকেই সন্দেহ করেন সেটা হল কিছু লোকের আবদার রক্ষা করে, রাজনৈতিক সমর্থককে পাকা করা। রাজনীতির ঘোরালো আবর্তে পড়ে, বর্ণাঢ্যতার ছাপ যখন একান্ত ভাবে তাদের ভাবমূর্তিকে মলিন করে দিল, দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থাটাকে প্রায় পঙ্গু করে দিল, তখন তারা অর্থাভাবের অজুহাতে, ক্রমবর্দ্ধমান মুদ্রাস্ফীতির চাপে দুর্দশাগ্রস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান ভাতার পরিমাণ এক কপর্দকও বাড়ান নি। অথচ পর পর দুটি সরকারের আমলে

রাজকোষ ত প্রায় শূন্য করে দিয়েছিলেন।

শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু ক্ষমতায় ফিরে আসার পরই এই জাতীয় পরিকল্পনাকে শুধু পুনরুজ্জীবিতই করেন নি। সম্ভবমত ভাতার পরিমাণও বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেজন্য গোটা দেশের সমূহ ক্ষতি হয়েছে, এমন কথা কেউ বলেন নি এবং এমন চিত্রও দেখা যায়নি।

এই পরিকল্পনাকে রূপায়ণ করতে অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলি যথাসাধ্য করলেও একমাত্র ব্যতিক্রম হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারই এ ক্ষেত্রে একটা রেকর্ড স্থাপন করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য এরা কিছুই প্রায় করেন নি। এমন কি কেরলের মত ক্ষুদ্র রাজ্যেও মাসিক দেড়শত টাকা ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও দিয়েছেন। অন্যান্য প্রদেশের ক্রিয়াকর্মও এ বিষয়ে প্রশংসা জনক।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেন এই দুর্বোধ্য অনীহা? এরা নিজেরা ত কিছুই করেনি। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাকে রূপায়ন করতে পর্বত প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করছে। কেউ কি ভাবতে পারেন যে গত একবছর ধরে, অফিস বদলের অজুহাত দেখিয়ে কোন ফাইল নাড়া চাড়া হয়নি। Dog in the manger policy আর কাকে বলে? নিজেরাও কিছু করব না। কেন্দ্রকেও কিছু করতে দেব না, এটা ত রীতিমত অসুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ বলে মনে করছেন অনেকেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যাপারে একটা কৈফিয়ৎ দিতে স্থায়ত: ও প্রশাসনগত ভাবে বাধ্য বলেই আমরা মনে করি। জনমানসে যে ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে যে এরা সম্মানভাতা পরিকল্পনাটিকে অকেজো করে দিতে চান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এবং সেজন্যই এরা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' নীতি গ্রহণ করেছেন। এরা যে না জেনে কিছু করছেন, তা নয়। মুখ্যমন্ত্রীকে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে, বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যানকেও দেওয়া হয়েছে, রাজস্বমন্ত্রীকেও মৌখিক ও লিখিত প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে দেখা সাক্ষাৎ করাও হয়েছে। কিন্তু এরা নির্বিকার, নীরব, উদাসীন। অবশ্য প্রকাশ্যভাবে 'দেবেন না' বলেও কোন কথা বলেন নি। টাকার অভাব কোন কৈফিয়ৎ নয়। অন্যান্য রাজ্য যা করেছে এরা কেন তা পারবেন না সেটা সহজবোধ্য নয়। তা ভিন্ন, সর্বস্তরে সীমাহীন ভাবে খরচা করা যাচ্ছে এবং হচ্ছে, শুধু এদের বেলাতেই নিঃসম্বল? এটা সামর্থের ব্যাপার যতটা নয়, অনীহা তার থেকে শতগুণ বেশী। এই জন্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে বহু লোক মনে করেন।

যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায়, যে সাময়িক আর্থিক অসুবিধা আছে (অবশ্য দীর্ঘ সাড়ে চার বছরের মধ্যে কোন পরিকল্পনা করা সম্ভব হল না এটা মেনে নেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই) কিন্তু যে সমস্ত দরখাস্তগুলি এখানে জমা পড়ে আছে এবং অনুমোদিত হলে যে দায়ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন।

সেখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, দরখাস্তগুলি স্পর্শ করা হচ্ছে না কেন? অথচ এর জন্য এখানে একটি কমিটিও আছে এবং সেজন্য সরকারের পয়সাও প্রচুর ব্যয় হচ্ছে। তাদের 'ঠুঁটো জগন্নাথ' করে বসিয়ে রাখা হচ্ছে কেন? কমিটি যদি কাজ করার সুযোগ না পায়, তবে সে কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হবে না কেন? না এদের এই কীর্তিটাকে বানচাল করার জন্য এদের বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে? এটা তো

মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধের পর্য্যায়ে পড়ে বলে বহু চিন্তাশীল মানুষ মনে করেন। আমরা ভেবে অবাক হই যে এই কমিটিতে বহু সম্মানিত স্বাধীনতা সংগ্রামী সদস্য আছেন। তাদের কি কোন বিবেক দংশন হচ্ছে না, না তারা কোন মন্দ অভিসন্ধির শিকার হয়েছেন - অন্যান্য প্রদেশ কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভাতা পাচ্ছেন নিয়মিতভাবে আর যে প্রদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী-দের সংখ্যা বিরাট, তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করছেন কারা? বাংলা, তথা বাঙ্গালীর এটা দুরপনেয় কলঙ্ক। পেনসন্ বোর্ডের সদস্যদের থেকে এটা আশা করা কি খুবই বেশী যে তাদের কাজের সুযোগ না দিলে, তারা কমিটী থেকে পদত্যাগ করবেন? তাঁরা কি এটা বুঝতে পারছেন না যে এই অশোভন দীর্ঘ সূত্রতার ফলে, তারা নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনার শিকার হচ্ছেন এবং তাদের অতীত দিনের সম্মান ও মর্য্যাদা হারাচ্ছে?

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মূলে একটা বিশেষ মানসিকতা কাজ করছে বলে অনেকে মনে করেন। বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়কদের অনেকেরই রাজনৈতিক জীবন সুরু জনযুদ্ধ আন্দো-লনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। অনেকেই মনে করেন যে যারা Post Independent Patriot, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর কোন শ্রদ্ধা নেই। নেই তাদের জন্য কোন দরদ। ইংরেজ সরকারের পক্ষপুটাশ্রয়ে থাকার জন্য, তাদের যারা বিরুদ্ধতা করেছে, তাদের সমুচিত শিক্ষা দিতেই কি এরা আগ্রহী? সম্প্রতি স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর উদ্যোগে বৃদ্ধ বয়সে চিকিৎসা ও তৎ সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে। অবশ্য এটা এখনও পর্য্যন্ত প্রস্তাব পাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে কতদিন লাগবে, সেকথা কেউ বলতে পারেন না। একটা কথা অবশ্য খুব জোর দিয়েই বলা যায় যে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে হতে, বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আর এ সাহায্য দিতে হবে না। সময় অপহরণ করার মূলে এই মানসিকতাও কাজ করছে নাকি?

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান দেখালে, নিজেরাই নিজেদের সম্মানিত করতেন। মুক্তিপাগল একদল মানুষ যখন জীবন পণ করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তখন তারা কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করেন নি। কোন দল কবে অনুকম্পা করে সামান্য ভাতা দেবেন, এটা তাদের হিসাবের মধ্যেই ছিল না। আজও কোন রাজ্য সরকার কিছু ভাতা না দিলেও তারা সকলে হাসিমুখেই সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করবেন। কিন্তু কথা ত সেটা নয়। জাতীয় কর্ত্তব্য বলে এই বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেদের জন্য যে সম্মান ভাতার পরিকল্পনা করা হয়েছে সর্ব-ভারতীয় স্তরে, তাকে বানচাল করার অধিকার কোন রাজ্য সরকারেরই নেই জাতীয় জীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কোন রাজ্য-সরকার যদি যমেচ্ছাচারীপণা করেন। তবে সহ্য করা উচিত হবে না। প্রয়োজন হলে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন করতে হবে এই অবিচার অনাচারের বিরুদ্ধে। ঘটনার গতি প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দলমত নির্বিশেষে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্মান ভাতাকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অধিকার বলে চিহ্নিত করেছেন। সেই অধিকারকে যারা ক্ষুণ্ণ করছেন তাদের বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে যে এই অপকর্ম করলে, কারো পরিত্রাণ নেই। (ক্রমশঃ)

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল

শুধদা মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাঁদের বক্তব্য কংগ্রেস জমিদার ও ধনী শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান. এদের সঙ্গে কমুনিস্টরা যোগ দিতে পারেনা। দেশের অগণিত জনসাধারণ যে সংগ্রামে স্বেচ্ছায় গিয়ে অনেক দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করেছে, সেই জনসাধারণ থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জয়প্রকাশ এই ভ্রান্তি সংশোধন করতে বললেন. স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বড় আকারে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই একমাত্র সংস্থা যে দরিদ্র জনসাধারণকে এই সংগ্রামে আনতে পেরেছে। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের ভূমিকা সামান্য নয়। তাই সমস্ত স্বাধীনতা কামী কর্মীর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া। সমাজতান্ত্রিক রাজ্য গড়ার জন্য কংগ্রেসের ভেতর থেকেই কাজ করতে হবে, কংগ্রেসের মধ্যে কোটী কোটী জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনা করতে হবে। পৃথক ভাবে সমাজতান্ত্রিক দল গড়লে সাগ্রামী জনসাধারণ হতে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। ভারতের কমুনিস্ট পার্টি স্বতন্ত্রভাবে কোন গণ-সংগ্রাম স্বাধীনতার জন্য গড়ে তোলেনি বা কখনও চেষ্টা করেনি। সুতরাং কংগ্রেসের বাইরে আলাদা আন্দোলন গড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের গতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা যাবে না। কমুনিষ্টরা কংগ্রেস বর্জন করে যে মারাত্মক ভুল করেছিল সেটা সংশোধন করতে হবে। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই সমাজতন্ত্রের লড়াই চালু করতে হবে। সেজন্য এঁরা ঠিক করলেন, নতুন সমাজতান্ত্রিক দলের নাম হবে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বা কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল।

এই ভাবনা অন্যান্য প্রদেশে সমাজতন্ত্র প্রেমী নেতাদের মনেও এসেছিল। আচার্য নরেন্দ্রদেব ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের সঙ্গে পুনার কাছে জেলে ছিলেন। আচার্য নরেন্দ্রদেব পুরাতন নেতা শুধু নন, পাণ্ডিত্যে বৈপ্লবিক চিন্তায়, স্বচ্ছ যুক্তি ও আপোষহীন সংগ্রামে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি জেল থেকে বার হলে জয়প্রকাশ ও বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে কথা বলে সবাই একত্রে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ার পরিকল্পনা নিলেন। ১৯৩৪ সালের মে মাসে পাটনায় প্রাথমিক সভা হয়, তারপর মাস তিন বাদে বারাণসীতে ভগবানদাসের পুত্র শ্রীপ্রকাশের বাড়ীতে সাংগঠনিক সভা বসে। তারপর ১৯৩৪ সালে অক্টোবর মাসে যখন কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন বম্বেতে বসে তখন কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রথম সাধারণ অধিবেশন একই সাথে বম্বেতে হয়।

কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের নেতৃত্ব দখল করার জন্য গড়া হয়নি। সমাজতান্ত্রিক ভাব ধারা কংগ্রেসের একটা বড় অংশে যাতে চালু হয়, সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির জন্ম। যাতে কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতার জন্য দলাদলিতে যুক্ত হয়ে আসল উদ্দেশ্য নষ্ট না হয়, সেজন্য প্রথম অধিবেশনে ঠিক হয় যে কোন সভ্য কংগ্রেস সংগঠনে কোন পদের জন্য লড়বেন না। এই সিদ্ধান্তে সামান্য কয়েকজন নেতা খুশী হতে পারলেননা এবং সোস্যালিস্ট দল ছেড়ে দিলেন। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বহু পরে এ বাধা অবশ্য তুলে দেয়, কিন্তু গোড়ায় সতর্ক না হলে পার্টিকে কংগ্রেসের দলীয় বিবাদে জড়িয়ে পড়তে হত। তাই

হোক, পার্টির প্রথম বিবৃতি (Manifesto) তে বলা হয়, পার্টি মার্কসবাদে বিশ্বাস করে, কিন্তু ভারতীয় কমুনিষ্টদের মত গণ সংগ্রাম বা কংগ্রেস বর্জনে বিশ্বাস করে না। বিবৃতিতে এও বলা হয় যে, কংগ্রেস নেতৃত্বে বুরজোয়া প্রাধান্য থাকলেও সংগঠনের মধ্যে বহু সংগ্রামী দরিদ্র নারী পুরুষ সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন। সুতরাং কংগ্রেসকে বর্জন করে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন হলে সমাজতন্ত্রবাদের ক্ষতি হবে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিকে শ্রমিক ও কৃষকদের আলাদা আলাদা সংগঠনে তাদের নিজ নিজ স্বার্থ সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে হবে। সেই সব প্রতিষ্ঠান মারফৎ তাদের দাবী আদায়ের জন্য তাঁরা সংগ্রাম চালাবেন এবং পার্টি ঘনিষ্ঠভাবে সেই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

শ্রমিক শ্রেণী ক্রমশঃ নিজেদের মধ্যে আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান চালালে তাদের নিজ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন ভারতবর্ষে তিনটি বড় ট্রেড ইউনিয়ন। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি তাদের একত্রিত করল। নতুন করে সারা ভারতবর্ষে কৃষক সভা গড়ে তুলতে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি বড় ভূমিকা নিয়েছিল। স্বামী সহজানন্দের মত একজন বিপ্লবী কৃষক নেতাকে এই সংগঠনে আনা হল। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ কৃষক সমিতিগুলি খুব শক্তিশালী হল এবং চাষীদের দাবী আদায় করতে কৃষক সমিতি বহু সংগ্রাম চালাল। সুতরাং কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি শ্রেণী সংগঠন গড়ায় বেশ মন দিল এবং দেশে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করল।

এই সঙ্গে ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালে পার্টি শ্রেণী সংগঠনের জন্য কমুনিষ্ট ও অ-কমুনিষ্ট শ্রেণী স্বার্থরক্ষাকারী কর্মীদের টেনে আনল। দু চারজন কমুনিষ্ট কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে আলাদা ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু গোঁড়া কমুনিষ্টরা তখনও কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিকে গালাগালি দিয়ে চলেছেন। তারপর ১৯৩৬ সালে মসকোতে কমিউনিষ্টদের যখন সোস্যালিষ্টদের সঙ্গে কাজ করার জন্য united front এর কথা স্বীকৃত হয়, তখন ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টি তা মেনে নেয় এবং কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে এগিয়ে আসে। জয়প্রকাশ নারায়ণ বরাবর আশাবাদী। তিনি কমুনিস্টদের বললেন, ভারতবর্ষে মার্কসপন্থীরা দুটি ধারায় চলেছে। এক ধারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হয়নি, আর এক ধারা যোগ দিয়েছে। এই দুই ধারাকে এক করে ভারতবর্ষে একটি মাত্র সাম্যবাদী পার্টি গড়া হোক, এবং উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় ও শুভ ইচ্ছায় এটা সম্ভব। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে দলে দলে যে কমুনিস্টরা এলেন তা নয়। শুধু বাংলায় দীর্ঘদিন আটক বন্দী থাকার পর যে সব সশস্ত্র বিপ্লবী প্রধানত অনুশীলন এবং যুগান্তর পার্টির সভ্যরা কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে আসতে চাইলেন। যুগান্তর পার্টির কর্মীরা অনেকে জেলে থাকা কালে কমুনিস্ট হয়েছিলেন, অনুশীলন পার্টির অধিকাংশই জেলে কমুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণের মহৎ আদর্শ কমুনিষ্ট পার্টি বিশ্বাস করত না। তারা নতুন পার্টিকে দখল করতে চেয়েছিল এবং পার্টির পুরাতন কর্মীদের নিজেদের দলে টানতে চেয়েছিলেন। যেমন প্রখ্যাত মানবেন্দ্র নাথ রায় তাঁর অনুগামীদের কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে পার্টির নেতৃত্ব দখল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশ্য জেল থেকে বেরিয়ে যাঁরা কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে

বোঝাপড়া করতে চেয়েছিলেন এবং সকল অনুগামী-দের কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি হতে সরিয়ে নিয়ে আসেন। ১৯৩৮ সালে যখন কমুনিষ্ট পার্টির আসল উদ্দেশ্য বোঝা গেল, তখন কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি কমুনিস্টদের প্রবেশ পথে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করল। তারপর ১৯৩৯ সালে ইউরোপে লড়াই শুরু হওয়ায় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে কমুনিস্ট পার্টি যখন জন-যুদ্ধের দোহাই দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করল, তখন আর সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে কোন যোগাযোগ রইল না।

(ক্রমশ:)

(১০ পৃ: শেষাংশ)

সম্প্রতি মেক্সিকোর কানকুনে পৃথিবী ব্যাপী অর্থ-নৈতিক শীর্ষ সম্মেলন বসেছে, সেই মহা-সম্মেলনে তিনি যোগদান করে তথায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগনের সাথে ও চীনা রাষ্ট্র প্রধান ঝাও জিয়াংয়ের সাথেও পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা চালিয়েছেন পৃথিবীর শান্তিকে স্থায়ী করার আন্তরিক আগ্রহে। বেশ সৌহার্দ পূর্ণ আবহাওয়ায় উক্ত উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য ও যুক্তি গুলি শ্রবণ করেন। খুবই আশার কথা এই যে, খুব সম্ভব ঝাও জিয়াং ও মি: রেগন ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আকাট্য যুক্তি জালকে ছিন্ন করার প্রচেষ্টা না চালিয়ে বিশ্ব শান্তি অব্যাহত রাখার জন্য উভয়ের আলোচিত পথে ও মতে সচেষ্ট হবেন, বিশ্ব মানবের কল্যাণ চিন্তায়। শ্রীমতী গান্ধীর এই শুভ ও মানব কল্যাণকামী সাধু প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে সারা বিশ্বের প্রকৃত শান্তিকামীরা আশা পোষণ করে। হিংসার এই উন্মত্ত তাণ্ডব ও জাতিতে জাতিতে অহেতুক রেষারেষী যা বিগত কয়েক বছর ধরেই ক্রমবর্দ্ধমান তা অচিরে শান্ত হলেই পৃথিবীর মানুষ স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলে বাঁচবে আর কিছু কাল।

বিশ্ব শান্তির জন্য শ্রীমতী গান্ধীর ললিত বাণী যথেষ্ট সমাদৃত সারা পৃথিবীতে কোথাও তা ব্যর্থ পরিহাসে পর্যাবসিত নয়—এটাই সুখের কথা, আশা-ভরসার কথাও বটে, উৎকণ্ঠিত বিশ্ববাসীর কাছে। রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খীরা ছাড়া এদুনিয়ার সকল সাধারণ মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে সকল প্রকার হিং-সার বিরোধী। তারা একমাত্র খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারে কতকটা অজ্ঞানিত ভাবে হিংসাশ্রয়ী নিত্য জৈবিক প্রয়োজনে; কিন্তু যুদ্ধ তারা কেউই চায় না কোন সময়েই। তবু যুদ্ধ বাঁধে মাঝে মাঝে মানুষের সর্ব্ব-নাশ সাধনের নিমিত্ত। কোন কোন দেশের রাষ্ট্রনায়ক তাঁর নিজদেশের কিছু বিশেষ সুবিধা আদায়ের জন্যই ভুল পন্থায় অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। অপর দেশ তাতে বাধা দেয়, সেই দেশের স্বার্থহানির ভয়ে। এর ফলই নিত্য নিষ্টুর দ্বন্দ্ব দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে শুরু হয়, যার শেষ পরিণতি যুদ্ধ, যদিও যুদ্ধকে এড়াতে চায় প্রতিটি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন দেশ, বিগত, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহ মারাত্মক পরিণাম স্মরণ কোরে। তাই মনে হয়, শেষ পর্য্যন্ত হিংসায় উন্মত্ত বর্ত্তমান পৃথিবী হিংসার ক্ষতিকর পন্থ সম্পূর্ণ পরিহার কোরে বিশ্ব শান্তির পথকে বেছে নেবে, আপন আপন দেশবাসীর স্থায়ী কল্যাণ চিন্তায় ও বৈষয়িক উন্নতিকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে।

●

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা
বাষ্মাষিক :—৮.০০ টাকা
মূল্য—৩০ পয়সা

30

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিময় রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

ভাজীব সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—২০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। পেঁহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৩০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১০। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৫০ ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, জেল থানার ডায়েরি (১)—৮.০০, ১৪। জেল থানার ডায়েরি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—৯.০০, হাসির ছড়া প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৫.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বলরাম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

সৈয়দ মুজী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বলরাম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকা
এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ২১শে কার্ত্তিক ১৩৮৮ ৭ই নভেম্বর ১৯৮১	৫ম সংখ্যা

আমি দিব্যচক্ষে দেখেছি, তোদের ভিতর অনন্ত শক্তি আছে। সেই শক্তি জাগা। ওঠ, ওঠ, লেগে পড়, কোমর বাঁধ। কি হবে দুদিনের ধন মান নিয়ে ?....আমি মুক্তি-ফুক্তি চাইনা !... ....একটা মানুষ তৈরী করতে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

—স্বামীজী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবাংলা কি ধ্বংস হবে ?

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, ও কৃষিশিল্প ক্ষেত্রে এবং জনজীবনের সর্ব্বস্তরে যে বিরাট ধস নেমে আসছে ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে, সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির এখনই মোকাবিলা করতে না পারলে, নবজাগরণের পথিকৃৎ, বহু সাধক, মহামানবের পবিত্র জন্মভূমি, বহু শহীদের ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশপ্রেমের তপস্যা ও সাধনার কর্মক্ষেত্র, বহু গুণী জ্ঞানীদের অবদানে সমৃদ্ধ এই বঙ্গভূমি যে অনতিকাল মধ্যে মরুভূমিতে পরিণত হবে, এই আশঙ্কাই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গ তো ভারতের মানচিত্র থেকে মুছে যাবে। গোটা বাঙ্গালী জাতটাই পঙ্গু হয়ে পড়বে।

জাতির জীবনে উত্থান পতন থাকেই। কিন্তু আবার একদিন লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়, মানুষের অনলস প্রচেষ্টা ও আদর্শনিষ্ঠার মাধ্যমে। কিন্তু বর্তমান অবস্থার মারাত্মক দিক হল যে একদল ক্ষমতালোভী মানুষ প্রশাসন যন্ত্র অধিকার করে নিজ নিজ দল ও গোষ্ঠীর তাৎক্ষণিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অগণিত মানুষের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে চলেছে বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে। জন কল্যাণ সাধনের এতাবৎকাল স্বীকৃত নীতি ও পথ থেকে এরা বিচ্যুত, প্রশাসনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বলে কিছুই নেই। এতদিন বিরোধীপক্ষভুক্ত থাকার জন্য সম্ভব অসম্ভব নানা রকমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনমানসে একটা ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কার্যকালে যখন শাসন ভার নিতে হয়েছে, তখন চারিদিক অন্ধকার দেখছে এবং অপটু দৈত্যের সাঁতার শেখার মত হাত পা ছুঁড়ছে এলোপাথাড়ি, কিন্তু প্রকৃত অগ্রগতি করা সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে, পশ্চিমবঙ্গের সব অসুবিধা, অনগ্রসরতা এককথায় দুর্গতির জন্য, পূর্ব্বেকার সরকার পক্ষের উপর দোষারোপ করে প্রথমদিকটায় বাজীমাৎ করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সময় পেয়েও, উন্নতি তো দূরের কথা, অবনতির শেষ ধাপে এগিয়ে চলেছে এবং রাজ্যের মানুষের চরম দুর্ভোগ ও দুর্গতির সৃষ্টি করছে এবং এখনও করছে। এই বক্তব্যের সমর্থনকারী দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। তবুও দুচারটির উল্লেখ করলে বক্তব্যটা আরোও পরিস্ফুট হবে।

দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি শোচনীয়। সেজন্য কৃষি ও শিল্প দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। নতুন কলকারখানা খোলার কোন সম্ভাবনা নেই, ফলে রাজ্যের বেকার সমস্যা ক্রমবর্দ্ধমান। শিল্পাঞ্চলে দায়িত্ব জ্ঞানহীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে, উৎপাদন ব্যাহত। অল্পকিছু দিন আগেই বিজনেস্ ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকাটির একজন রিপোর্টার গত সপ্তাহে ডি. পি. এলের ভিতরে গিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যে অবস্থা দেখে এসেছেন, সেটা পড়লে মনে হবে কোন আরব্য উপন্যাস পড়ছি। 'অধিকাংশ সাধারণ কর্মী অনুপস্থিত, মেসিন চলিতেছে যেন একটা ভূতুড়ে কারখানা। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে তাস খেলা চলিতেছে' এবং আরো অনেক কথা। কোন সভ্য দেশে কোন সরকার থাকলে এ অবস্থা হতে পারে, এটা কল্পনাতীত আসানসোলে প্রশাসকদের বিশেষ একটা দলের ভ্রান্তনীতি ও বাধাদানের ফলে, সেখানে কয়েকটি নতুন

কয়লাখনি খোলা সম্ভব হলনা এবং এজন্য পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ করা প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা বিহার রাজ্যে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হলেন কেন্দ্রীয় সরকার। এই কুচক্রীর দলই আবার একদিন ধুয়া তুলবে কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের ভুয়া অজুহাতের। এই রাজ্যের কত বেকারের চাকুরীর সংস্থান হলনা এবং 'রয়েলটি' বাবদ রাজ্যের কত লক্ষ টাকা লোকসান হল। তার কৈফিয়ৎ কি?

কৃষিক্ষেত্রে দলবাজির যে নগ্ন প্রকাশ ঘটছে, তাতে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ব্যাহত হবেই। সম্প্রতি মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের ১৪টি গ্রামের মধ্যে যে অরাজকতা চলছে, তার নজীর নেই। দলের শাসন না মানলে, তারা একঘরে, জোর করে তাদের জমি দলীয় কর্মীদের নির্দেশমত তাদের পছন্দমত লোকদের নামে রেজেস্ট্রী করতে হচ্ছে। থানায় ডায়েরী করে কোন ফল পাওয়া যাচ্ছেনা, কোর্টের আদেশ অমান্য করে বেশ বহাল তবিয়তে আছে দলের কর্মীরা। ডেবরার ঘটনা বহু ঘটনার এবং ব্যাপক অরাজকতার একটি নমুনামাত্র। সারা পশ্চিমবাংলার গ্রামে গঞ্জে এই অবস্থা। সি, পি, আই (এম) যা খুসী করার যেন সর্ব্বস্বত্ব ভোগ করছে। কথায় কথায় খুন করা হচ্ছে, চোখ উপড়ে ফেলা হচ্ছে, আগুন দেওয়া হচ্ছে। জমি সংক্রান্ত কোন আইনের ধার এরা ধারে না। 'জমি দখল করে নাও, ডাক পড়লে মিটমাট হলে যাও' এই কার্জীর বিচারই চলছে সর্বত্র। কারা একাজ করছে, সকলেই তা জানে। বামফ্রন্ট সরকার কয়েকটি দল নিয়ে গঠিত। প্রশাসনিক বৃন্দাবনে সি, পি আই এম ও একমাত্র শ্যাম। অন্যরা তো সভাসুন্দরের ভূমিকা পালন করে মিটিং এর আসরে। জনগণের এই বিশ্বাস কি ভিত্তিহীন?

অর্থনীতির দিকটায় নজর দিলে কি শোচনীয় চিত্র ফুটে উঠছে। তিনশত কোটি টাকার ওভার ড্রাফট নেওয়া হয়েছে। তবুও টাকার অভাবে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বন্ধ। কোটি কোটি টাকার কোন হিসাব পাওয়া যাচ্ছেনা গ্রামপঞ্চায়েত থেকে। পুরসভাগুলিতে কুড়ি কোটি টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন পুরসভায় সরকারী অর্থের অপব্যয় ও দুর্নীতি সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে রাজ্যসরকারের কাছে। এজন্য নাকি তারা তদন্তও করবেন। কিন্তু সে ত মৃত্যুর পর ডাক্তারীর ব্যবস্থা করার মত। অথচ এ রাজ্যের অর্থ মন্ত্রী নিজেকে একজন ভয়ঙ্কর অর্থনীতি বিশারদ বলে দাবী করেন। ভারত সরকার বিদেশ থেকে মোটা টাকা ঋণ নেবার চেষ্টা করছে, তার সর্ত্তগুলি প্রকাশ করার জন্য এই মন্ত্রী মহাশয়ের যতটা উৎসাহ ও মনোযোগ, তার কিছুটা এই রাজ্যের আয়ব্যয়ের সমতা রাখার জন্য ব্যয় করলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটা অনেক উপকৃত হত।

সর্ব্বত্র একটা অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। যে ক্ষমতা ছিল এদের হাতে, তার সদ্ব্যবহার যা করা হয়েছে, তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে। এরাই আবার রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য উর্দ্ধবাহু হয়ে অর্বাচীনের মত দাবী করছে। কোনদিকেই নজর দেওয়া এদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছে বলে মনে হয়। এ রাজ্যের সমস্যা থেকে এখন কেরালার সমস্যা নিয়েই এরা বেশী বিব্রত ও ব্যস্ত। এর ফল আরো খারাপ হবে। এই শোচনীয় অবনমনের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ জানালেই চলবে না, একে প্রতিরোধ করতে হবে। নতুবা পশ্চিমবঙ্গের সমূহ সর্বনাশ হতে বাধ্য। সমস্ত চিন্তাশীল ও দেশপ্রেমিক মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

কেরলের ঘটনা ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা

—কলম বোধ

কেরল মন্ত্রীসভার পতনের পর, পশ্চিমবঙ্গের সি. পি. এম. নেতারা মুখে যা-ই বলুন মনে মনে অত্যন্ত শংকিত হ'য়ে পড়েছেন। কেরলের কংগ্রেস (স) যে সত্যি সত্যিই মন্ত্রীসভা থেকে সমর্থন তুলে নেবে, এমনকি কেরল কংগ্রেস (মানি)-ও যে একই পথে যাবে এটা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সি, পি, এম-এর সর্বভারতীয় নেতারাও মনে করেছিলেন কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্যই সম্ভবতঃ কংগ্রেস (স) মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে আসার হুমকী দিচ্ছে। ওরা আবেদন-নিবেদন করবে, শেষ পর্যন্ত সামান্য কিছু দাক্ষিণ্য দেখিয়ে আর সর্বভারতীয় স্তরে 'বাম-গণ-তান্ত্রিক ঐক্য' নামক তুরুপের তাসটি দেখিয়েই ওদের ঠাণ্ডা রাখা যাবে। এই বিশ্বাসেই মুখ্যমন্ত্রী নায়নার মন্ত্রীসভা থেকে কংগ্রেস (স)-এর পদ-ত্যাগের পরেও বেশ জোর গলায় বলেছিলেন যে তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবেই। কিন্তু পুরো হিসাবটাই শেষ পর্যন্ত গোলমাল হয়ে গেল।

টিকে থাকার সবরকম চেষ্টা করেও কেরলের নায়নার মন্ত্রীসভাকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হল, যা সি, পি, এম, এর কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

কেরলে যা ঘটলো তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বলা যায় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একাধিক ঘটনাবলীর এক অমোঘ পরিণতি মাত্র। কেরল মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত দলগুলির মধ্যে সি, পি, এম-এর সদস্য সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক—কেরল বিধান-সভাতেও তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। সদস্যসংখ্যার নিরিখে কংগ্রেস (স) এর স্থানে ছিল দ্বিতীয়। অন্যান্য দলগুলির মধ্যে কেরল কংগ্রেস (মানি) ছাড়া বাকিরা ছিল একান্তই নিষ্প্রভ, যাদের না ছিল একলা লড়বার শক্তি, না ছিল প্রতিবাদের ক্ষমতা। ফলে সহস্র অন্যায় অবিচার সহ্য ক'রেও তাদের সি, পি, এম-এর 'গার্জিয়ানশিপ' মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

নামে 'কোয়ালিশন' সরকার হলেও কেরল মন্ত্রী-সভায় গরিষ্ঠতার জোরে সি, পি, এম-এর মতামতই প্রাধান্য পেতো। ২য় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে মন্ত্রীসভায় কংগ্রেস (স) এর চারজন প্রতিনিধি থাকলেও সরকার পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিভাগে যথা প্রশাসন, অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরে সি, পি, এম নেতৃত্বেরই প্রাধান্য ছিল। এইসব দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ অধিকাংশ সময়েই মন্ত্রীসভার অন্য শরীকের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই নেওয়া হতো —এবং বিক্ষোভটা মূলতঃ সঞ্চিত হয়েছিল এই কারণেই। বিশেষ ক'রে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জমছিল ক্রমাগতঃ। পুলিশ ও প্রশাসনকে নিছক দলগত স্বার্থে ব্যবহার করতে কেরলের সি, পি, এম নেতৃত্ব স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে—এই অভিযোগ মন্ত্রী-সভার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ দলই একাধিকবার করেছে। শুধু বিরোধীপক্ষ কংগ্রেস (ই) দলেরই নয়, সরকারের মধ্যে থাকলেও অন্যান্য দলগুলির সমর্থক ও কর্মীদের উপরেও সি, পি, এম-এর দমন পীড়ন নিয়ে আলোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী ওঠা সত্ত্বেও এইসব দমনপীড়নের ধারা অব্যাহত ছিল। বিশ্বের অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশগুলির মতোই ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমার ক্ষুদ্ররাষ্ট্র কেরলেও শাসক সি, পি, এম

দল দমনপীড়নের মাধ্যমে শরিক দল গুলি বিশেষতঃ জাতীয়তাবাদি দলগুলিকে একেবারে নিষ্ক্রীয় ও অক্ষম করে ফেলার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এমতাবস্থায় শুধু মাত্র টিঁকে থাকার তাগিদেই মন্ত্রীসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া ছাড়া কংগ্রেস (স) অথবা কেরল কংগ্রেস (মানি)-র সামনে আর কোন পথ ছিলনা।

নায়নার মন্ত্রীসভা পতনের পর কেরলে সি, পি, এম বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি ও বামফ্রন্ট এর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দলের সমর্থনে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টার প্রধান অংশীদার রাজ্যের কংগ্রেস [ই] দল, বিধানসভায় সদস্যসংখ্যার দিক দিয়ে তাঁদের স্থান তৃতীয়। এই দলের নেতা করুণাকরণ ও কংগ্রেস [স] নেতা দামোদরণ ইতিমধ্যেই নতুন সরকারের সম্ভাবনা নিয়ে অন্যান্য দলের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সি, পি, এম নেতারা এই প্রচেষ্টাকে 'অগণতান্ত্রিক' আখ্যা দিয়ে কেরলে এখনই অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দাবী জানিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেছেন, কেন্দ্র এসম্পর্কে যে নিষ্ক্রিয়তার আশ্রয় নিয়েছেন তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অভিসন্ধি মূলক, এবং কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বাধীন একটি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যই নাকি তাঁরা এবম্বিধ আচরণ করছেন। কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নায়নার-ও ঐ একই মত ব্যক্ত করেছেন।

বিগত বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যই কিন্তু এখনই কোন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে ভরসা পাচ্ছেননা। কারণ রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফলাফল তাঁদের অনুকূলে না ও যেতে পারে বলে তাঁরা আশংকা করছেন। তাই এই বিধানসভার স্বাভাবিক মেয়াদ পর্যন্ত সুষ্ঠু প্রশাসন চালাবার জন্য একটি সরকার গঠন করার প্রতিই তাঁদের আন্তরিক আগ্রহ। এই পরিস্থিতিতে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেস (ই) যদি একটি বিকল্প সরকার গঠনের প্রয়াস চালায়, রাজনৈতিক ভাবে তা' অবশ্যই সমর্থন পাওয়ার যোগ্য। কারণ রাজনীতিতে সুযোগের সদ্ব্যবহারই হলো সবচেয়ে বড়ো কৌশল। কংগ্রেস (ই)-র পরিবর্তে সি, পি, এম যদি আজ বিরোধী পক্ষে থাকতো, তো তারাও এই একই প্রচেষ্টা চালাতো। একে 'অগণতান্ত্রিক' আখ্যা দেওয়া কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়, এবং রাজনৈতিক 'দেউলিয়া পনা'রই পরিচয় আসলে সরকারে থাকাকালীন যে সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় সরকারের বাইরে থেকে তার সমালোচনা করা ছাড়া অন্য কোন কাজ থাকেনা। নিজেদের ঘর গুছোতে গিয়ে দলবাজী এমন চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে কেরলের সি, পি, এম নেতৃত্ব ভুলেই গিয়েছিলেন বিরোধীপক্ষে থাকার অবাঞ্ছনীয়তার কথা। তাই সেই সম্ভাবনা দেখা যেতে তাঁরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সি, পি, এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার আজ যে পথে চলেছেন তাঁদেরও এই কথাটি স্মরণে রাখা উচিত যে জাগ্রত গণতন্ত্র কোন 'আগ্রাসন' কেই ক্ষমা করেনা। এই রাজ্যের বিধানসভা ও সরকারেও সি, পি, এম, দলেরই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা গত চারবছরের রাজত্বে স্বেচ্ছাচারীতায় পরিণতি লাভ করেছে। রাজ্যের প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে দলীয় আধিপত্য চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। প্রশাসন ও পুলিশী

ব্যবস্থা, প্রকৃতপক্ষে, একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। রাজ্য সরকারের একজন কনিষ্ঠ মন্ত্রীও সম্প্রতি আক্রান্ত হয়েছেন। সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের জনজীবন আতংকে পংঙ্গু হয়ে পড়েছেন। আইন আদালত অসহায় দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। 'জনতার আদালত' এর নামে শাসক দলভুক্ত সুযোগ-সন্ধানীরা হতে মাথা কাটছে। রাজ্যের বৃহত্তম বিরোধীদল হিসাবে কংগ্রেস (ই) জনসাধারণের ক্ষোভ ও হতাশাকে কাজে লাগাতে পারেনি—জন গণেশের ধিক্কারকে তারা রাজ্যব্যাপি আন্দোলনের মাধ্যমে রূপ দিতে পারছেনা। যেটুকু বা প্রতিবাদ হচ্ছে, পুলিশ ও ক্যাডার বাহিনীর সাঁড়াশী আক্রমণের মাধ্যমে সি, পি, এম, তাকে দমন করছে। অন্যদিকে প্রচারের ক্রমবর্দ্ধমান আঙ্গিক বহির্ভারতের সামনে সুনিপুণভাবে তুলে ধরছে এই রাজ্যের সরকার কতো সফল, তাঁদের শাসনকাল পশ্চিমবঙ্গে কি গৌরবময় স্বর্ণযুগ এনে দিয়েছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হলো বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দলগুলির, যাদের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর, এস্, পি, প্রধান।

কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের নিয়ম অনুসারেই সি, পি, এম, এর আজ্ঞাধীন ছোট খাটো বামপন্থী দলগুলিকে ধীরে ধীরে গ্রাস ক'রে নিতে চাইছে, তাঁদের উপরে অবাধে চলছে দমন-পীড়ন। ছোট ছোট দলগুলির নীচের তলার কর্মীমহলে হতাশা ও বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। সি, পি, এম, কর্মীদের হাতে তারা গ্রামে গঞ্জে প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছে—কিন্তু প্রতিবাদ জানানোর কোন উপায় নেই। কারণ ছোট ছোট দলের বড়ো বড়ো নেতারা মন্ত্রীত্ব, ক্ষমতা এবম্বিধ হাজারো লোভে নিজেদের একেবারে বিকিয়ে দিয়েছেন। অন্ততঃ টিঁকে থাকতে হলেও সরকারী ক্ষমতার যতোদূর সম্ভব সদ্ব্যবহার করে নেওয়া প্রয়োজন—এই সত্য তাঁরা শিখেছেন 'বড়দাদা' সি, পি, এমের কাছ থেকেই। একমাত্র বহু পুরোনো একটি বামপন্থী দল এস, ইউ, সি, নিজের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এবং বিধানসভার চারটি আসনও ছিনিয়ে এনেছে।

এমতাবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গেও যদি কেরলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় তা হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেরল সরকারের পতন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত একাধিক ঘটনার অমোঘ পরিণতি মাত্র। পশ্চিমবঙ্গেও এই প্রকার অসংখ্য ঘটনা ঘটছে যা কার্যকারণ সম্পর্কে কেরলের পরিণতিকেই ত্বরান্বিত করছে। যদিও সরকারের পতন ঘটানোর মতো ক্ষমতা এই রাজ্যের সম্মিলিত বিরোধী পক্ষের পক্ষেও সম্ভব নয় (যেহেতু বিধানসভায় সি, পি, এম, এর একারই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে) কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে বিরোধী জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট ক্ষমতা দখল করতে পারে। গত ৭৭-এর সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সি. পি, এম, শতকরা মাত্র ৩৪ ভাগ ভোট পেয়ে অন্যান্য বামপন্থী দলের সহায়তায় সরকার গড়েছিল, পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদী দলগুলি একত্রে অনেক বেশী ভোট পেলেও ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণে ক্ষমতা দখল করতে পারেনি। এ ক ক ভা বে নয়, সমষ্টীগতভাবে জাতীয়তাবাদী দলগুলির শক্তি ছিল অনেক বেশী যদিও তাকে কাজে লাগানো যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচনে যদি এই বিরোধী ভোট ভাগ না হয় প্রতিটি বামফ্রন্টী প্রার্থীর বিরুদ্ধে যদি মাত্র একজন ক'রে জাতীয়তাবাদী প্রার্থী দাঁড় করানো যায় তবেই সি. পি, এম, এর আগ্রাসনকে রোধ

(এর পর ৯ পৃঃ দেখুন)

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল

গুপলা মজুমদার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি একদিকে যেমন কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়ন জোরদার করতে ব্যস্ত তেমনি আর একদিকে কংগ্রেসের মারফৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে আর এক বড় অধ্যায় সৃষ্টি করতে মন দিল। পার্টী গড়ার সময় জবাহরলাল নেহেরু জেলে. এবং সুভাষচন্দ্র অসুস্থ শরীরে ইউরোপে। নেহরু ১৯৩৫ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে এবং ১৯৩৬ সালে ফৈজপুরে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সমাজতন্ত্রের কথা বলেন। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ফৈজপুর কংগ্রেসে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি কংগ্রেসে নেবার জন্য প্রস্তাবও পাশ হয়।

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭ সালে দেশে ফিরে কংগ্রেসের কাজে মন দিলেন। তাঁর সঙ্গেও সোস্যালিষ্ট নেতারা কথা বললেন। কিন্তু এই দুই নেতাকে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে আনা যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। অবশ্য উভয়ের সঙ্গে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টীর নেতাদের যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল। ১৯৩৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের পর জবাহরলাল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি হতে তিন নেতাকে তিনটি বিভাগের দায়িত্ব দিলেন। ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া বৈদিশিক বিভাগ। ডঃ জেড এ আহমদ অর্থ-নৈতিক বিভাগ এবং ডঃ আশ্রফ রাজনৈতিক বিভাগ নিলেন। তাঁরা সকলেই কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা হিসাবেও কাজ করবেন। এ নিয়ে কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃত্বে মতভেদ হওয়াতে তাঁরা পরে বিভাগগুলি ছেড়ে দেন। কিন্তু তাঁরা আকাকালীন প্রতি বিভাগে এক নতুন বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তন করেছিলেন।

ফৈজপুরের পর হরিপুরায় গুজরাটে ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি হলেন। দেশে তখন কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন বেশ জোরদার হয়েছে। কংগ্রেস অধিবেশনে তার প্রভাব দেখা গেল। পরের বছর কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় দেখা গেল পুরাতন নেতারা সুভাষ চন্দ্রকে দ্বিতীয়বার আর চাইছেন না। পর পর দুবছর জবাহরলাল কংগ্রেস সভাপতি আগেই হয়েছেন। সুতরাং নজিরের অভাব নেই। সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার সভাপতি করার প্রস্তাবে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি পূর্ণ সমর্থন জানান। অন্যান্য বামপন্থী শক্তিও মত দিল। বিপক্ষ সীতারামাইয়াকে গান্ধীজি প্রকাশ্যে সমর্থন জানালেন। তিনি তখন কংগ্রেসের সদস্য নন। ১৯৩৪ সালেই কংগ্রেস সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। সুতরাং যে সংস্থার সদস্য তিনি নন, তার সভাপতি নির্বাচনে তিনি কেন মতামত দিলেন, সে তর্ক না তুলে বলা যায় সুভাষচন্দ্রের পুনরায় নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী প্রকাশ্যে মত দিয়েছিলেন। তা স্বত্বেও সুভাষচন্দ্র জিতলেন। ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। কংগ্রেসে ভীষণ সঙ্কট। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সব সদস্য পদত্যাগ করলেন। সদস্যরা সকলেই এক এক প্রদেশের গণ্যমান্য নেতা। তাঁরা চাপ দিলেন সুভাষচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে যেন গান্ধীজীর পরামর্শ নেন। এরই নাম পন্থ প্রস্তাব। দু পক্ষ সম্মুখ সমরে নামলেন। কংগ্রেস ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাবে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট

পার্টির নেতারা এই সঙ্কট মোচন করতে অন্য নেতাদের অনুরোধ করলেন। গান্ধীজি তখন রাজকোটে স্থানীয় রাজার বিরুদ্ধে অনশন করছেন। এদিকে সারা পৃথিবীতে থমথমে ভাব। হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে নিয়েছেন, অষ্ট্রীয়ার দিকে পা বাড়িয়েছেন। ব্রিটীশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন হিটলার তোষনে ব্যস্ত। যে কোন মুহূর্তে লড়াই শুরু হয়ে যাবে। স্পেনে হিটলার আর মুসোলিনী নির্ব্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কোকে অস্ত্র জোগাচ্ছে। সব ক্ষেত্রেই রাশিয়া নিষ্ক্রীয়। ভারতবর্ষের মহা সুযোগ উপস্থিত।

ইংরেজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের শেষ সংগ্রামে নামতে পারবে। সারা দেশে সেই সংগ্রাম ছড়িয়ে দিতে হবে। এত বড় সংগ্রাম চালাতে শক্তিশালী সংগঠন দরকার। ১৯২১ হতে ১৯৩৯ এই আঠার বছর কংগ্রেস অনেকগুলি সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সভায় (Central Assembly) তে কংগ্রেস বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। সুতরাং জাতীয় সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের বিকল্প ১৮৮৫ হতে ১৯৩৯ এই ৫৪ বছর অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এই জাতীয় মর্যাদা পায়নি। দেশ যখন বিশ্বযুদ্ধে তার স্বাধীনতার সঙ্কল্প রূপায়িত করার সুযোগ পাচ্ছে তখন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে সে বরণ করে নেবে? কংগ্রেস ভেঙে টুকরো হলে কয়েকমাসের মধ্যে যুদ্ধ যখন বাধবে তখন শক্তিশালী নতুন জাতীয় প্রতিষ্ঠান কি গড়ে উঠতে পারবে? তাছাড়া বামপন্থীদের চেষ্টায় ও আন্দোলনে শ্রমিক ও কৃষকদের যখন কংগ্রেসের মধ্যে আনা হয়েছে, তাদের দাবী অনেকটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কি সম্পূর্ণ দক্ষিণপন্থীদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত হবে? সুতরাং জাতীয় স্বার্থে, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়োজনে কংগ্রেসকে টুকরো হতে দেওয়া বোকামি। পন্থ প্রস্তাব যতই নিন্দনীয় হোক, দক্ষিণ পন্থীদের যত দোষই থাকুক, জাতীয় স্বার্থ ও সংগ্রামের প্রয়োজন কি সেটা দেখাই প্রধান কর্তব্য। দু পক্ষকে বোঝান যখন সম্ভব হল না তখন জাতীয় স্বার্থে নিরপেক্ষ থেকে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ঠিক নেতৃত্বই দিয়েছিল। তারপরের তিন বছরের ঘটনা সেই প্রমাণই দেয়।

ত্রিপুরীর পর কলকাতায় এ আই সি সির সভা বসে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে জবাহরলাল নেহরু আর জয়প্রকাশ একবার চেষ্টা করলেন সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি রেখে সর্ব্বসম্মত এক ওয়র্কিং কমিটি যেন গঠন করা যায়। গান্ধীজীও তখন সেখানে উপস্থিত। মিটমাট অনেকটা হয়েছিল, সামান্য কারণে তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। তারপরে কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হলেন এবং নতুন সংস্থা ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি গড়লেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ছাড়ার পর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বামফ্রন্টে যোগ দিলেন। সেখানে কৃষক মজুর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও আছেন। উদ্দেশ্য বামফ্রন্ট থেকে জাতীয় সংগ্রামের জন্য কংগ্রেসকে চাপ দেওয়া। ১৯৪০ সালে রামগড়ে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন ও ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম অধিবেশন বসে। বিশ্বযুদ্ধ তখন লেগে গিয়েছে। যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার শুরু করা হবে কিনা এই নিয়ে কিছু দ্বন্দ্ব ওঠে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট অনেক নেতা ও গণসংগঠন গুলি পুণরায় মুক্তি সংগ্রামের জন্য চাপ দিলেন। জনগণ কি চায়,

গান্ধীজী ভাল বুঝতেন। নেতাদের সকলকে সংগ্রামমুখী না দেখে ১৯৪১ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করলেন—'লড়াই মে এক আদমি নেহি, এক পয়সা নেহি'। Not a Bhai Not a Pie তারপর ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' প্রচণ্ড সংগ্রাম। সে সংগ্রামে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি যে বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছিল তা সকলেই জানেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'ভারত ছাড়' করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে Do or Die সংগ্রামের ডাক কংগ্রেস হতে না এলে সারা দেশে এ সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়তনা সে সংগ্রামের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা কম্যুনিস্ট পার্টী করেছিল। সুতরাং ত্রিপুরীতে কংগ্রেস সংস্থাকে দ্বিধা বিভক্ত না করতে দিয়ে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা প্রমাণ হয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর ব্যক্তিত্ব, ত্যাগ, বীরত্ব এবং একান্ত দেশভক্তি নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকে কংগ্রেসের সমকক্ষ প্রতিষ্ঠান করতে পারেন নি। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধিতা করার যে অখণ্ড রেকর্ড কম্যুনিস্ট পার্টী রেখেছিল, তার ওপর ভরসা করে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই ভারতের শেষ সংগ্রামে অগণিত জনসাধারণের শক্তি পেতেন না।

ত্রিপুরীর সময় থেকে সুভাষচন্দ্র বলে আসছিলেন বিশ্বযুদ্ধ আগত, এখন ব্রিটীশ সরকারকে নোটিশ দেওয়া হোক। তাঁর সে সঙ্কল্প সাধনে কংগ্রেসের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। তিনি ভারতে না থেকে বাইরে গিয়ে যে অতুলনীয় সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন এবং আজাদ হিন্দফৌজকে ঐক্য ও শক্তিকে বলশালী করেছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাইত সফল করেছিল। ভারত থেকে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টীর নেতা জয়প্রকাশ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করেছিলেন। কংগ্রেসে থেকেও বিপ্লবী সংগ্রামে যে যোগ দেওয়া সম্ভব তা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি প্রমাণ করেছে।

১৯৪৫ সালে জাপান পরাস্ত হবার পর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি কৃষক শ্রমিককে সংগঠিত করে আবার নতুন উদ্যমে শেষ সংগ্রাম করতে দেশের নানাস্থানে প্রচার চালাচ্ছিল। এদিকে বৃটেনে লেবার পার্টি শাসনে এসে ভারতবর্ষ থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়া তার আগেই অর্থাৎ ১৯৪৮ আগষ্ট মাসের আগেই কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে একটা রফায় ক্ষমতায় পেতে অতিশয় ব্যগ্র হয়ে পড়েন। তারফলে দেশ ভাগকে তাঁরা মেনে নেন। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বের কাহিনী ও সশস্ত্র সংগ্রামের কথা দেশে তখন ভালভাবে পৌঁছায়নি। যখন সবাই জানলেন তখন দেশময় এতবড় উত্তেজনা দেখা দেয় যে ব্রিটিশ সরকার আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

স্বাধীনতার পর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি কংগ্রেস হতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং সোস্যালিষ্ট পার্টি নাম নেয়। তার আগে ১৯৪৬ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ জেল থেকে বার হবার পর, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি দেশের ও বিদেশের পরিস্থিতি আলোচনা করে। বিদেশের পরিস্থিতি আলোচনায় একটা ব্যাপারে সোস্যালিষ্ট পার্টির সদস্যদের বিচলিত করে। পার্টি প্রথমেই মার্কসবাদকে মেনে নেয়। কিন্তু মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের প্রধান দেশ রাশিয়ার সাম্যবাদ যে ভাবে চলছিল, তার বিচার করে দেখা যায়, কি পার্টির মধ্যে কি জনগণের মধ্যে রাশিয়ায় কোন গণতন্ত্র নেই। ষ্টালিন সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন, এবং লেনিনের সহকর্মী সমস্ত বিপ্লবী নেতাদের একে একে স্বতন্ত্র

করেন। বিখ্যাত নেতা ট্রটস্কি নিজের দেশ ছেড়ে মেক্সিকোতে গিয়েও পরিত্রাণ পাননি। তাঁকে কুড়াল দিয়ে হত্যা করা হয়। জনসাধারণকে আতঙ্কে রাখা হয়, প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করতে থাকে।

সামান্য দাবী নিয়ে সরকারের কাছে কেউ প্রতিবাদ জানাতে পারবেন না। প্রতিবাদের সামান্য আভাস পেলেই সাইবেরিয়ায় নির্বাসন। ষ্ট্যালিনের এই অমানুষিক নির্মম অত্যাচারের কথা ক্রুশ্চেভ ১৯৫৩ সালে প্রকাশ্যে বলেন। তার আগে ১৯৪৬ কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি এই বিষয় তোলে এবং প্রকাশ্য বলে যে সাম্যবাদে গণতন্ত্র, জনগণের স্বাধীনতা নির্মূল করা হয়, যে সাম্যবাদ মানুষের কোন উপকারে আসে না। সেইজন্য গণতন্ত্র বা জনসাধারণের মৌলিক অধিকারের ওপর জোর দিয়ে বলা হয় যে সমাজবাদকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদে রূপায়িত করতে হবে। পার্টির লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। একথা এখানে বলা দরকার সোস্যালিস্ট ইন্টার ন্যাশানাল বা কমুনিষ্ট ইনটার ন্যাশনাল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টী কখনও যোগ দেয়নি। স্বতন্ত্রভাবে দেশের ও জনগণের স্বার্থে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টী তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে চালিয়েছে। এ বিষয় চীনের কমুনিস্ট পার্টীর সঙ্গে কিছুটা মিল কয়েক দূর পর্যান্ত আছে বিশেষত স্বতন্ত্রভাবে চলার দিক দিয়ে।

১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টী বর্ত্তমান ছিল। তারপর সোস্যালিস্ট পার্টী কি করেছে সে অন্য কাহিনী। এখানে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টীর ইতিবৃত্ত দেওয়া হচ্ছে সুতরাং ১৯৪৮ সালের পরের ঘটনা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই তবে একটা কথা এখানে বলা দরকার। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টী যে গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তার সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টাকে চালিয়েছেন, সেই নিষ্ঠা, ত্যাগ ও আন্তরিকতা পরবর্তীকালে বড় একটা দেখা যায়নি। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টীর সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্বে কখনও কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি। তাঁরা সকলে একত্র হয়ে যদি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পর জনসাধারণকে চালিত করার সুযোগ পেতেন তাহলে দেশের এই দুরবস্থা হয়ত হতনা। কারণ, ঐ রকম চরিত্রের বিপ্লবী নেতাদের সমন্বয় পরে অন্য যে কোন পার্টীতে বিশেষ দেখা যায়নি। যাক, তবুও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা যে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তারজন্য পার্টির নেতা ও কর্মীদের আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পারি।

●

(৪র্থ পৃঃ পর)

সম্ভব। কেরল সেই শিক্ষাই দেয়। কেরলে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক শক্তি সরকার গঠন করুক বা না-করুক, সমবেত পদত্যাগের মাধ্যমে সেখানকার কংগ্রেস (স) ও কেরল কংগ্রেস [মানি] অন্ততঃ এ'সত্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে জাতীয় অথবা প্রাদেশিক যেকোন স্তরে বৃহত্তর আদর্শের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে দেশ ও দশের স্বার্থে তা সত্যিকারের কল্যাণ সাধন করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের আগামী বিধানসভা নির্ব্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদী দলগুলির এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE G. A. BRANCH

No, Health / GA / 8803 / 9M-3 / 80 Pt. I. Calcutta the 21 St. Oct. 1981

From : Dy. Secy to the Govt. of West Bengal

To : The Director of Health Services, West Bengal.

Subject : Scheme for Providing facilities of medical attendance and treatment to the freedom fighters by the State Government.

MEMORANDUM

The undersigned is directed to say that Govt. had under consideration a scheme for providing facilities of medical attendance and treatment to the freedom fighters free of cost for sometime past.

2. After careful consideration, the Governor has now been pleased to order that the freedom fighters shall be entitled to the benefits of medical attendance and treatment in respect of themselves only as follows :—

a) Free-medical attendance and treatment in a State Govt. hospital or in a State aided hospital including accommodation in a paying bed, diagnostic examinations like pathological, bacteriogical, radio logical and other methods of examinations for the purpose of diagnosis as are considered necessary by the authorised medical attendent and are carried out in a hospital. All medicines, diet, vaccines sera etc. required for the treatment of the freedom fighter as are pre cribed by the attending physician will normally be supplied free of charge by the hospital where treatment is received.

b) Re-imbursement of the cost of

i) Denture, if any,

ii) Spectacleles, if any,

iii) Medicines, vaccines, sera or other therapeutic substances excluding those supplied free of cost in a State or State ided hospital.

3. a) In cases where the facilities of free medical attendance and treatment mentioned at para 2 above are rquired to be availed of by the freedom fighters in State aided hospitals necessary permission shall have to be obtained from the D. H. S., West Bengal in the cases of hospitals situated in Calcutta and from the concerned C. M. O. H., in the cases of hospitals situated in the districts.

b) The authorities of the State aided hospitals where the freedom fighters receive such medical attendance and treatment mentioned as aforesaid shall submit detailed reports in respect of the expenditure involved in connection with the treatment or the freedom fighters at their hospital and shall be entitled to receive an equal amount of money from Govt over and above the annual grant received by them from Govt.

4. The following categories of persons will be regarded as freedom fighter for the purpose of being entitled to the benefits of medical attendance and treatment as sanctioned in this order :—

a) Recipient of Tamrapatra.

b) Recipient of Political Sufferer's Pension from Govt.

c) Such persons who are recommended for grant of such benefit by any eligible freedom fighter or any recipient of political sufferer's Pension or Tamrapatra who suffered imprisonment for a minimum period of 5 (five) years by giving details regarding his (i. e. of the person recommended) participation in the freedom struggle.

5. All concerned are being informed.

Sd/- Deputy Secretary.

No. Health / GA / 8803 / 9M-3 / 80 Pt I/1 ( )

Copy forwarded to the :—

1) ——————————Deptt of this Govt.
2) Director of Information and C. A., West Bengal,
3) Chief Engineer, Public Health Engineering, West Bengal,
4) Chief Inspector and Secy , Smoke Nuisances Commission, West Bengal,
5) Director, Drugs Control, West Bengal,
6) Director of Ayurveda, West Bengal,
7) Director of Homoeopathy, West Bengal,
8) Director, School of tropical Medicine, Calcutta

for information.

Calcutta,
the 21 St Oct. 1981

Sd, Deputy Secretary.

No. Health / GA / 8803 / 9M-3 / 80 / Pt / 2 (

Copy forwarded to the :—

1) Superintendent, Medical College Hospitals, Calcutta
2) Superintendent, N. R. S. Medical College Hospital, Calcutta,
3) Superintendent. R G Kar Medical College Hospital, Calcutta.
4) Superintendent, Calcutta National Medical College Hospital, Calcutta,
5) Principal-Supdt., Bankura Sammilani Medical College Hospital. Bankura,
6) Surgeon-Supdt , S. S. K. M. Hospital, Calcutta,
7) Superintendent, Bhangur Institute of Neurology, Calcutta,
8) Superintenden, Sambhu Nath Pundit Hospital, Calcutta.
9) Medical Superintendent, Lady Dufferin Victoria Hospital, Calcutta,
10) Superintendent, M. R. Bangur Hospital, Calcutta,
11) Superintendent I D Genl. Hospital, Beliaghata,
12) Superintendent Dr B. C. Roy Chest Sanatorium, Dhubulia,
13) Superintendent, Netaji Subhas Sanatorium, Kalyani.

14) Superintendent, M. R. Bangur T. B. Sanatorium, Digri, Midnapore.
15) Superintendent, Dr B. C. Roy Memorial Hospital for Children, Narkeldang , Cal.
16) Superintendent, B. C. Roy Polio Clinic and Hospital, for Crippled Children, Beliaghata.
17) Superintendent, Hospital for Mental Diseases, Gobra, Calcutta.
18) Principal Supdt, Dr. R. Ahmed Dental College Hospital, Calcutta.

for information. Sd/—Illegible.
Assistant Secretary.

Calcutta the 21 st Oct. 1981
No. Health / CA / 8803 / 9M-3 / 80 / Pt. 1/2 (

Copy forwarded to the :—
1) Chief Medical Officer of Health.——————
2) Sub-Divl. Medical Officer, ——————
3) Superintendent, ——————
(of all grant-in-aid Hospitals)

for information.
Calcutta.
the 21 st Oct. 1981

Sd/—illegible
Assistant Secretary.

পরলোকে প্রখ্যাত বিপ্লবী ফণী মজুমদার

আমরা অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে মাদারীপুরের (অধুনা বাংলাদেশ) প্রখ্যাত বিপ্লবী ফণীভূষণ মজুমদারের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছি। ফণীবাবু দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালের তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। পরিণত বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন, সন্দেহ নেই। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশেই তাঁর কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ দেশের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল, তাঁর মৃত্যুতে আমরা স্বজন বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি।

ফণীবাবু অবিভক্ত বাঙলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট পুরোধা। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যেক স্তরেই তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং এজন্য দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল সক্রিয় এবং বৈশিষ্টপূর্ণ। ভারতবর্ষের ছোট বড় স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন কোন পর্যায় নেই, যেখানে ফণীবাবু ছিলেন অনুপস্থিত। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

দেশবিভাগের পর তিনি ওপার বাঙলা ছেড়ে আসেন নি। ওখানকার নিপীড়িত জনসাধারণের সেবাতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এজন্য তাকে কারাবাস ও প্রচুর লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, তিনি এদেশে চলে এলে, বিশেষ সম্মান লাভ করতে পারতেন।

ফণীবাবু ছিলেন মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল ও নিষ্ঠাবান একজন দেশপ্রেমিক। তিনি ছিলেন একজন অজাতশত্রু দেশসেবক। তাঁর অভাব দুই বাংলার মানুষই বিশেষভাবে অনুভব করবে। আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি।

ফণীবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গকে আমরা সমবেদনা জানাই এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

——

RegdNo.[redacted].24511/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক [redacted] ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক ঃ—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

সম্পাদক—
শ্রীশা[redacted] রায়চৌধুরী

।। সম্প[redacted]ন্নমণ্ডলী ।।

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

[redacted]

30

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস[redacted]

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—[redacted]

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। ষড়যন্ত্রে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। গৌরাঙ্গী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৮০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, দেশ যাদের ভোলেনি (১)—১.০০, ১৪। দেশ যাদের ভোলেনি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১০ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

নৈখেল লাইব্রেরী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ ৫ই ডিসেম্বর ১৯৮১	৯ম সংখ্যা

সঙ্কীর্ণ আদর্শ, ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য, তুচ্ছ সাবধানতা ও ভীরুতা এবং অদূরদর্শী ও সাহস পরাঙ্মুখ নেতাদল—এ সকল হেয় উপাদান কখনও জাতীয় শক্তি গড়বার উপযুক্ত সামগ্রী হতে পারে না।

—শ্রীঅরবিন্দ

সম্পাদকীয়

আসামের প্রান্তরেই সমাধি রচনা হোক সব অশুভ শক্তির

বিগত কয়েক মাস ধরে হঠাৎ একদল ভুঁইফোড় ছাত্র ও যুবকেরা বিদেশী বিতাড়নের নামে আসামে যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল, ভারত-সরকার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার একটা সমাধান খুঁজে পেতে যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে ইতিহাস-খ্যাত রবার্ট ব্রুসের রেকর্ডও তার কাছে মলিন হয়ে গিয়েছে। দেশের লোক বুঝতে পারছে না, আলোচনার নৌকা কোন চড়ায় ঠেকেছে এবং কার দায়ভাগ সেক্ষেত্রে সমধিক। বহুবার নিশ্চয়ই পরের পয়সায় একদল লোক দিল্লীতে গিয়েছে, জামাতা আদরে আপ্যায়ন লাভও করেছে। সরকারপক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এরা দিল্লীতে আলাপ আলোচনার সময় যে সব ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী হয়, আসামে ফিরে এসেই তার বিপরীত কথা বলে এবং সব আলোচনাকে ব্যর্থ করে দেয়। সুতরাং একথা বলা ভুল হবে না যে এদের পরামর্শ-দাতারা আসামেই অবস্থান করেন এবং তারাই কলকাঠি নাড়ছেন। এরা শুধুমাত্র গ্রামোফোন রেকর্ডের হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস্ প্রতিধ্বনিত করার জীবমাত্র। এরা কারা? এদের কি খুঁজে পাননি ভারত সরকার? অর্থ সাহায্য তা বটেই, তদুপরি গাড়ী, পেট্রল আপেল, সন্দেশ উদারহস্তে আন্দোলনকারীদের জোগান দিয়েছেন কারা? ধনিক সভার সভাপতি শ্রীহরলালকা এবং সুতা ব্যবসায়ী সভাপতি শ্রীঝুমরমলকে এবার সরকার নিবারক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রেপ্তার করেছেন। এটা আসাম আন্দোলনের মোকাবিলা করার একটি নতুন পদক্ষেপ। সূত্র যখন ধরেছেন, আরো একটু জোরে টান দিলেই অনেক হরলালকা এবং ঝুমরমল এর সন্ধান পাওয়া যাবে। অনেকদিন ধরে এই সন্দেহ জনমনে দানা বেঁধে উঠছিল, একদল কু-মতলবী ব্যবসায়ী নিজেদের একচেটিয়া কারবার পোক্ত করার জন্য, অন্য সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং টাকা পয়সা দিয়ে একদল বিপথগামী অর্বাচীন যুবককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন। এ সন্দেহ এখনও আছে যে এরা ভারতের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টি করে ফয়দা তুলতে বদ্ধ পরিকর এবং হয়ত এজন্য বিদেশ থেকে বেশ কিছু 'ইনাম'ও মিলছে। এদের সহায়তা করছেন কোন কোন রাজনৈতিক দল, তাদের ক্ষুদ্র হীন দলীয় স্বার্থ সাধনের জন্য। দিল্লীতে এদের ক্রীড়নকেরা যুক্তি, বিশ্লেষণ ও বুদ্ধিদৃপ্ত আলোচনা সভায় এদের কু-কর্মের প্রসার কার্য্য ব্যাহত করার মত কাজ করে, তখনই এই পর্দার আড়ালের জীবেরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আবার এই চক্ষুলজ্জা যুবকদের বিপথে চালিত করে।

এ সত্য আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করতে কোন দ্বিধা থাকা উচিৎ নয় এবং একটি দিন ও দেরী করা উচিৎ নয়।

বিলম্ব করার জন্য এরা আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে। ক্ষমাকে এরা দুর্বলতা মনে করছে এবং স্পর্দ্ধাও সহ্যের সীমা অতিক্রম করতে চলেছে। এরা ত 'রণং দেহি' মূর্তি ধরতে চায়। 'রাস্তা রোখো' বলে যে আন্দোলনের সৃষ্টি এরা করতে চায়, তাতে শুধু আসাম প্রদেশই ধ্বংস হবে না, উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষদের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। তৈল উৎপাদন ও সরবরাহ ও ব্যাহত হবে। চা রপ্তানি বিঘ্নিত হবে এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ থেকে গোটা দেশ বঞ্চিত হবে। আসামের মধ্য দিয়ে সতর্ক পরিবহণের ব্যবস্থার দ্বারা অন্যান্য রাজ্যগুলিকে অত্যাবশ্যক পণ্যাদি সরবরাহ করা হয়। আন্দোলনকারীরা সরবরাহ অবরোধ করলে তো এই রাজ্যগুলির অধিবাসীরা অনাহারে মৃত্যুমুখে পড়তে বাধ্য হবে। এটা তো মানুষ খুনের পর্যায়ভুক্ত অপরাধ। এদের সঙ্গে আপোস করার কোন কথাই উঠতে পারে না।

ভারত-সরকারের ধৈর্য্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তারও একটা সীমা থাকা উচিৎ। এই দেশদ্রোহী আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাস করতে না পারলে, তার কু-ফল তো সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। অন্যান্য রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী মানুষের ধারণা হবে ভারত-সরকার দুর্বল। এই সুযোগ পুরামাত্রায় গ্রহণ করতে উদ্যোগী হবে, অন্তস্থানের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, আঞ্চলিকবাদীরা, এক কথায় দেশের ঐক্য ও সংহতি-বিনষ্টকারী শক্তিগুলি। এদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করলে, অন্তস্থানের অশুভশক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করা দুরূহ হয়ে পড়বে। কেন ভারত-সরকার গ্রহণ করবেন এই পথ?

আসাম সমস্যা সম্বন্ধে তিনটি কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ যেটা ভারত-সরকার এদের বলেছেন। বিদেশী নির্ণয়ের ভিত্তিবছর হবে ১৯৭১, পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে, আন্তর্জাতিক চুক্তি মান্য করা হবে, আসামে যারা নিজেদের শ্রম দিয়ে, ঘর্ম দিয়ে, রক্ত দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের পুনর্বাসিত করেছেন, মানবতার দৃষ্টি নিয়ে তাদের বাস্তু-ত্যাগী করার বিষয় বিচার বিবেচনা করতে হবে। সহজ সরল কথায় এই বক্তব্য রাখতে হবে। এতদিন কি আলোচনা হয়েছে এবং এই দেশদ্রোহীরা একবার রাজী হয়ে, হঠাৎ আবার কবে গররাজী হয়েছে, সে সম্বন্ধে একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে দেশের মানুষকে প্রকৃত অবস্থা জানিয়ে দিতে হবে। এর ফলে আন্দোলনকারীদের স্বরূপ জনসমক্ষে পরিস্ফুট হয়ে পড়বে এবং সব দেশপ্রেমিক মানুষ এদের ধিক্কার দেবে, এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার কাজে বিভিন্ন রাজ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে। এরা দেশের মানুষের কল্যাণ চায় না, ব্যক্তিগত সুবিধা-সুযোগ পেতে দেশদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও কোন প্রকার বিবেকের দংশন অনুভব করে না। নানা প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ে থাকতে চায় নিছক

ব্যক্তিগত লাভের লোভে। কোন কোন রাজনৈতিক দল বর্তমান সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে ক্ষমতা দখল করতে ও দ্বিধা করে না। সর্বোপরি পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ ভারত বিদ্বেষ পোষণ করে, যারা ভারতকে সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিমতী হতে দিতে চায় না, তারা তো এ কাজে সব রকম পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ সাহায্য দেবেই। কাজেই এই গুরুতর পরিস্থিতির মোকাবিলা না করতে পারলে, ভারতের সর্বপ্রকার অগ্রগতি ব্যাহত হবে। এই সমস্যাকে ভারতের জীবন মরণ সমস্যা বলে গ্রহণ করতে হবে এবং তার সমাধানও খুঁজে পেতে হবে। এটাই বর্তমান নেতৃত্বের প্রধানতম কাজ। আসামের যে সব মানুষ হিংসার পথ অবলম্বন করে, ভারত-সরকারকে তাদের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য করতে চায়, যার পরোক্ষ প্রভাব অন্যান্য স্থানের বিচ্ছিন্নবাদীদের প্রশ্রয় দান, তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করেই সকল অশুভ শক্তিকে এখানে ও অন্যত্র নির্মূল করতে হবে। এর অন্য কোন বিকল্প নেই।

দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক চান যে আসামের প্রান্তরেই সমাধি রচনা হোক সব বিচ্ছিন্নতাবাদী অশুভশক্তির। সমস্ত মানুষ দেখে শিখুক যে দেশদ্রোহীতার সঙ্গে কোন আপোষ নেই, দেশদ্রোহীদের কোন ক্ষমা নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। এই সবল, পরিচ্ছন্ন, দৃঢ় নেতৃত্বই দেশ প্রত্যাশা করে।

BENOY-BADAL-DINESH DAY

Baleswar Martyrdom Remembrance Committee invites you to pay homage to the sacred memory of the martyrs—Benoy Bose, Badal Gupta and Dinesh Gupta in front of their portraits at the Writers Buildings (1st floor) on Tuesday, the 8th December, 1981 at 12 Noon in observance of the 51st anniversary of their heroic fight for freedom of India.

Yours faithfully,

(Prabhangsu Dhar Choudhury)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী (২)

—জনৈক স্বাধীনতা সংগ্রামী

একপক্ষ কাল আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান ভাতার দরখাস্তগুলি সমীক্ষা করার ব্যাপারে, রাজ্য সরকারের অনীহা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এতদিন পরেও অবস্থার কোন উন্নতিসাধন করা ত হয়নি, বরং যে জোট পাকিয়েছে সেই জট খুলবার কোন প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়নি সব ব্যাপারটা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। অবশ্য ইতিমধ্যে যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থার কথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ঘোষিত হয়েছে, সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু মূল গলদ দূর করার ব্যাপারে, কোন ব্যবস্থাই হয়নি। অধিকন্তু ইতিমধ্যে আমাদের নিকট যে সব খবর এসেছে, সেটা রীতিমত উদ্বেগজনক।

১৯৭০ সালের পর ১৯৭৪ সালের মধ্যে যে সব আবেদন পত্র জমা পড়েছে, তার মধ্যে একটা বিপুল অংশ এখনও অমীমাংসিত পড়ে আছে। নতুন স্কীমে যে সব দরখাস্ত পড়েছে, তার সংখ্যা নাকি বিরাট। কিন্তু সংখ্যার আধিক্য ত কোন কাজের অগ্রগতির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনা একথা কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষই দাবী করবেনা যে যত দরখাস্ত পড়েছে, তার সবগুলিই মঞ্জুর করতে হবে। অনেকেই চাহিদামত সবগুলি পূরণ করতে পারবেনা। প্রধান আলোচ্য বিষয় হল যে সব দরখাস্ত বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে আছে। গত এক বছরের মধ্যে যেগুলি সমীক্ষা করা হয়েছে তার সংখ্যা নাকি একশত খানাও হবেনা। এই সব কর্মপদ্ধতিতে কাজকর্ম চলতে থাকলে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সব দরখাস্তগুলিতে হস্তক্ষেপই করা হবেনা। কেন এমন অঘটন ঘটছে, তার প্রধান কারণ নাকি অফিস স্থানান্তর করে, দীর্ঘ এক বছরের মধ্যে এই দপ্তরটিকে একটা কার্যকরী রূপ দেওয়া হয়নি। অথচ এজন্য সাধারণ মানুষের রক্তজল করা টাকা খরচ করতে কোন বাধা হচ্ছে না। পার্ট মিত্র অমাত্য সেক্রেটারী, কারনিক, এমন কি পেনসান্ বোর্ডের সদস্যদের জন্য নিয়মিত পয়সা খরচ করার কোন ত্রুটি হচ্ছে না। যে উদ্দেশ্যে এদের জন্য অর্থ ভাণ্ডার থেকে অর্থব্যয় করা হচ্ছে, সেই উদ্দেশ্যই যদি সাধিত না হয়, তবে এই খরচ করাটা অযৌক্তিক ও ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ। কাজ কর্ম শুরু হলে, আইনের ব্যাখ্যা ও নির্দেশ নিয়ে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় এবং বাধাবিঘ্নের মোকাবিলা করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু আবেদন পত্রগুলি যদি বস্তাবন্দীই থাকে, পরীক্ষা নিরিক্ষা করা না হয়, তবে ত অনাদি অনন্ত কালেও এর নিষ্পত্তি হবেনা।

কাজ হবে না, কাজ করতে দেওয়া হবেনা, এমতাবস্থায় সরকার থেকে এদের টাকা নেবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার থাকতে পারেনা। কাজ না করে পারিশ্রমিক নিলে ত এটা প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে। দিনের পর দিন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অফিসে ছুটতে হচ্ছে এবং এক একবার এক এক-রকম কৈফিয়ৎ শুনে ফিরে আসতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে রাজ্য সরকার দয়া করে এদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম, এখানে বোর্ড গঠন করা হয়েছে তাদেরই নির্দেশে এবং প্রত্যেক দরখাস্ত তাদের মন্তব্য সাপেক্ষে বিচার বিবেচনা করেন কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার যদি একাজ করতে অক্ষম হন বা অনিচ্ছুক

হন তবে সেকথা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিতে তারা বাধ্য। অন্যথায়, বিনা কাজে পারিশ্রমিক নিলে তাদের খাড়া করে রাখা উচিত কিনা সেকথা ভেবে দেখার সময় এসেছে উভয় সরকারের। তা না করা হলে গৌরী সেনের টাকা আত্মসাৎ করার প্রত্যবায় ঘটবে এক্ষেত্রে।

যারা দরখাস্ত করেছেন, সময়ের মধ্যে তাদের একটা জবাব পাওয়া উচিৎ। সে কাজ করা হচ্ছে না, অথচ নিত্য নূতন যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে মৌখিকভাবে। লিখে পড়ে কিছু জানান হচ্ছেনা। সেটা হলে আবেদনকারীরা প্রকৃত অবস্থাটা জানতে পারেন এবং ভুলত্রুটি সংশোধন করতে পারেন সম্ভাব্য ক্ষেত্রে। আমাদের নিকট খবর আছে যে দুজন পেন্সন ভোগী 'কো প্রিজিনার সার্টিফিকেট' দেওয়া সত্বেও তাদের বলা হচ্ছে এম, এল, এ বা এম, পি, (কো-প্রিজিনার হতে হবে তাদেরও) থেকে সার্টিফিকেট আনতে হবে।

বর্তমান সরকার এবং পি এস পি বোর্ডকে সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে যে এত দিনের এই প্রচলিত নিয়ম কেন্দ্র প্রত্যাহার করেছেন। অন্যথায় এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে নিজেদের গাফিলতি ঢাকার জন্যই এই কৈফিয়ৎ চালু করা হচ্ছে এবং এই দাবীর মারফৎ নিজেদের অলসতা, অকর্মন্যতা ঢেকে রাখার কাজ করা হচ্ছে। যার যা খুসী, তিনি সেই মত কোন দাবী করতে পারেন না। একাজ করছেন বিশেষ ভাবে আমলারা। কোন ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা একমাত্র পি এস পি বোর্ডের। সরাসরি আমলারা শেষ কথা বলতে পারেন না আইনসঙ্গত ভাবে। এই ভাবে বলতে থাকলে। লোকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হতে বাধ্য যে কারো নির্দ্দেশে আমলারা এই স্কীমটাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। বোর্ডের অস্তিত্ব থাকার কোন যুক্তি নেই বলেই মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন। সেটা বোর্ডের মেম্বারদের পক্ষে গৌরবজনক হবে বলে আমরা মনে করিনা।

কেন্দ্রে ও রাজ্যস্তরে যারা এতদিন একাজ করে এসেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত এই বিভাগে কাজ করছেনা। নবাগতদের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সমগ্র পরিস্থিতিটা অনুধাবন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং সেই জন্যই এই বিপত্তি ঘটছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অবহিত করে কাজ করতে অগ্রসর এবং আগ্রহশীল হলে, এই সমস্ত বাধা দূর করা খুব কঠিন কাজ নয়। এ জন্য প্রথম উদ্যোগ নিতে হবে বোর্ডের সদস্যদের। রাজ্যস্তরে এবং কেন্দ্রীয় স্তরে সামনাসামনি আলাপ আলোচনার দ্বারা এই বাধার বিন্ধ্যাচলকে অতিক্রম করা যায় সহজেই। সমগ্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে। সমীক্ষা ও বিচার বিবেচনা করাও সহজ হবে নিশ্চয়ই। এর ফলে নিতানতুন দাবী পূরণ করার কথা বলে আবেদন কারীদের হয়রানি করার পরিমাণও কমবে। বোর্ডের সদস্যরা সকলেই প্রবীণ এবং অনেকে বয়সের ভারে শ্লথগতি সম্পন্ন হয়ে পড়েছেন। অনুপস্থিতির সংখ্যাও কম নয়। সে ক্ষেত্রে আরো নতুন লোক নিয়োগ করতে হবে সর্বস্তরেই। অন্যথায় সমগ্র পরিকল্পনাটাকেই বানচাল করে দেওয়া হবে, এবং সে কাজ হবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং হৃদয়হীন। এ অবস্থা চলতে দেওয়া উচিৎ হবে না, না রাজ্যের পক্ষে, না স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষে। রাজ্যের কিছু মানুষ যদি অর্থনৈতিকভাবে কিছু উপার্জন করেন, তবে রাজ্যের অর্থনীতির উপর একটা সুফল নিশ্চয়ই পড়বে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও এই অচলাবস্থার অবসান

ঘটাতে বদ্ধ পরিকর হতে হবে এবং তাদের ন্যায্য দাবীকে যারা নস্যাৎ করে দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে একটা মোকাবিলা করতেই হবে

বোর্ডের সদস্যদের নিকট আমাদের অনুরোধ আছে। তারা ত বায়ুভুক নিরাশ্রয় নয়। কেন্দ্রীয় সরকার যখন তাদের অনুমোদন ব্যতীত কোন আবেদন মঞ্জুর করেন না, তাদের সেজন্য একটা সংবিধান সম্মত ক্ষমতা আছে। আমলারা যদি প্রথম ধাপেই আবেদনপত্র বস্তাবন্দী করে রাখে। এবং আবেদনকারীদের তাদের খুসীমত দাবী পূরণ করতে বলে, তখন তার একটা সুরাহা করা তাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। সে কাজ না করলে, তাদের কোন অস্তিত্ব রাখার পক্ষে যুক্তি থাকতে পারে না স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যদি এমতাবস্থায় ভাবে যে তারা শুধু তাদের দৈনন্দিন ভাতা সংগ্রহ করার জন্য ওখানে 'ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন, তবে তাদের পক্ষে বলার কিছু থাকতে পারে না। এদের মধ্যে অনেকেই প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সেজন্য দেশের লোক তাদের সম্মানের চোখে দেখে। কিন্তু এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যদি তারা কোন পদক্ষেপ না করেন, তবে নিশ্চয়ই তাদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে এবং নিন্দাবাদ শুনতে হবে। আমরা এটা চাই না। আমাদের এমন খবরও আছে যে কেন্দ্র কোন এম, পি কোন আবেদনকারীর সম্বন্ধে জানতে চাওয়ার পর কেন্দ্র থেকে সেই আবেদন পত্রগুলি চিঠিপত্র লিখে এমন কি টেলিগ্রাম করেও কোন জবাব পাচ্ছেন না। এ কাজে তাদের কি কোন ভূমিকা নেই? তারা কি দারুভূত শালগ্রাম শিলার মত অচল, অনড় হয়ে থাকবেন? তাদের কাছে আর একটি বিশেষ অনুরোধ রেখে, আজকের নিবন্ধ শেষ করতে চাই।

এম, এল এ বা এম, পি দের যাদের আবেদন কারীদের সঙ্গে জেলে সহাবস্থান করেছেন) সার্টিফিকেট দাখিল করার সর্তটির বিলুপ্তি ঘটাতে চেষ্টা করতে হবে। এই সর্ত পালন করা বর্তমানকালে সম্ভব নয়। তিরিশের দশকের সময়ই এদেশে ব্যাপকভালাভ করেছিল স্বাধীনতা আন্দোলন। তখনকার দিনের এম, এল, এ রা দীর্ঘদিন গত হয়েছেন। সার্টিফিকেট দিতে হলে, তাদের প্রায় একশত বছর বেঁচে থাকতে হত। কিন্তু চিত্রগুপ্তের হিসাব অনুসারে সে কাজ অসম্ভব। তা ভিন্ন, বর্তমান এম, এল এ বা এম, পি দের তখন অনেকেরই জন্ম হয়নি বা বার্থ-ডে-ডিউটি পরে ঘুরে বেড়াতেন তখন। অনেকেই আবার স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করে 'জনযুদ্ধ' করেছেন। সুতরাং সে সর্ত পালন করা প্রায় অসম্ভব বহুক্ষেত্রে, তার উপর নির্ভর করলে, সম্মানভাতা না দেওয়ার একটা কৌশলে পরিণত হবে মাত্র। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে শ্রীমতী গান্ধী এজন্য সম্মানভাতা পরিকল্পনা চালু করেন নি। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শেষ বয়সে কিছু পরিমাণ অর্থসাহায্য দেওয়াটা একটা জাতীয়কর্তব্য বলে মনে করেছেন। সুতরাং এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে নিশ্চয়ই সুফল মিলবেই। প্রয়োজন শুধু অভিজ্ঞতা লব্ধ অসম্ভাব্যতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা? এজন্য চিঠিপত্র লিখে কাজ করতে গেলে অনেক দেরী হবে সরকারী ফাইল চালাচালির ধারা অনুযায়ী। এদের দ্বারা অনুমোদিত কিছু আবেদন পত্র মঞ্জুর হতে দেরী হচ্ছে বলে আমরা শুনেছি। সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। আগেকার সরকারের আমলে যেমন করা হত। বোর্ডের দু একজন সদস্য আমলাদের দু একজনকে নিয়ে দিল্লী যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমরা কি এই পদক্ষেপ তাদের থেকে আশা করতে পারি না? আরো কিছুদিন অপেক্ষা করার পর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তরফ থেকে যথাকর্তব্য নির্দ্ধারণ করতে হবেই। আমরা এখনও প্রত্যাশা করি সংশ্লিষ্ট পক্ষ তাদের যথাকর্তব্য পালন করবেন।

গণতন্ত্রের বিপদ

কালীপদ সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৬৯-এর যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাত মাস প্রশাসনে এমন দিনও কাটেনি যেদিন শারিকা সংঘর্ষে কেউ হতাহত হয় নি। ছোটখাটো সংঘর্ষের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। তেমন সংঘর্ষ যে কত তার সংখ্যা জনসাধারণ জানতে পারে নি। তবুও সাধারণ মানুষ ভাবতে শুরু করল, 'দেশের এ কি হল, কাদের আমরা ভোট দিয়ে গদিতে বসেয়েছি।'

যুক্তফ্রন্টের পায়ের তলা থেকে দ্রুতগতিতে মাটি যখন সরে যাচ্ছিল এবং সংঘর্ষও হত্যার রাজনীতির নাটের গুরু সি, পি, এম-এর প্রতি ফ্রন্টের অপর শরিকরা প্রকাশ্যে দোষারোপ করছিল, তখন সি, পি, এম নেতৃবৃন্দের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব হল না।

২০ শে সেপ্‌টেম্বর (১৯৬৯) বর্ধমানের এক জনসভায় সি, পি, এম নেতাও ফ্রন্টের ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী হরে কৃষ্ণ কোঙার বললেন, 'বন্ধুগণ, রক্তপাত দেখে ভয় পেয়ো না। সম্প্রতি ফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে যে সংঘর্ষ ও খুনোখুনি চলছে তা হল শোষণমুক্ত নতুন সমাজের জন্মকালীন প্রসব বেদনা।' একথা আগেই বলা হয়েছে।

প্রসব বেদনা বেড়েই চলল। জাতক মানুষ না মুষল হবে তা জানা না গেলেও প্রসূতি জননী যন্ত্রনায় অস্থির হলেন।

২০ শে সেপ্‌টেম্বর বরানগরে সি, পি, আই ও সি, পি, এম সমর্থকদের মধ্যে আর এক দফা লড়াই হল। আহত হলেন ছয় জন।

হটাৎ হানাহানির ঢেউ লাগল উত্তরবঙ্গে। সেখানকার ক্যাডাররা ভাবল, যা রে সব বাহবাটাই দক্ষিণ নেবে! তবে আমরা আছি কিসের জন্য? যেমনই ভাবা, সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু।

২২ শে সেপ্‌টেম্বর, সি, পি, এম ও ছাত্র পরিষদের মধ্যে ক্লাব সম্পর্কিত এক বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাধল আলিপুর দুয়ারে। ছাত্র পরিষদ থানায় আশ্রয় নিলে অপর পক্ষ তীর ধনুক বর্শা ও হাতবোমায় সজ্জিত হয়ে থানা আক্রমণ করল। থানার পুলিশ গুলী চালালে দুজন আহত হলেন আর বোমায় জখম হলেন ছয়জন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হল।

তীর ধনুকের লড়াই হলেও মনে করবেন না যে, যোদ্ধারা বন্য আদিবাসী। এদের সকলেই ছিল মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরের যুবক। ঘটনার পর স্থানীয় বিধান সভার কংগ্রেসী সদস্য পিযুষ মুখার্জি এবং একজন আর, এস, পি নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে বললেন, সি, পি, এম-এর জোর জবরদস্তি করে দলের শক্তি বৃদ্ধি চেষ্টাই হাঙ্গামার মূলে।

ঐ দিনই পশ্চিমদিনাজপুরের নান্দোই গ্রামে সি, পি, এম সমর্থক জনতা কর্তৃক জোর করে ফসল কাটার সময় জমির মালিক গুলী চালায়। পুলিস গ্রামের পাঁচজন সম্পন্ন কৃষককে গ্রেপ্তার এবং তাদের বন্দুক গুলি বাজেয়াপ্ত করে। বিরোধীয় জমি মালিকের নামে যথারীতি রেকর্ড করা এবং চাষে থাকলেও, তাকে বেনামী বলে শ্লোগান তোলা হয়।

কলকাতায় বিড়লা প্রাসাদের সামনে এই সময় বিড়লা শিল্প কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকগণ মালিকের

উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে। ২১ শে সেপ্‌টেম্বর পুলিস অ্যাক্শানকে সমর্থন করে যুক্ত-ফ্রন্টের পুলিস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু সাংবাদিকদের বলেন যে, প্রাইভেট ঘরবাড়ির সামনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করলে পুলিসী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে যে কেউ পুলিসের সাহায্য চাইবে, তাকেই দেওয়া হবে।

চমৎকার কথা! কিন্তু গরিব চাষী, শ্রমিক, গ্রামবাসীদের বাড়ি যখন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা আক্রমণ করছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং বাড়ির মানুষকে ঘর থেকে টেনে এনে তার মা বোনের সামনে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করছে তার বেলা? বিপ্লবের প্রসব বেদনা বুঝি শুধু তাদের জন্যই বরাদ্দ! জ্যোতিবাবু উচ্চ শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। রাজ্যবাসী তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাঁর কাছে নিগৃহীত মানুষ যদি দল নিরপেক্ষ সুবিচার ও সমদৃষ্টি চায় সেটা কি খুব বেশি কিছু?

যুক্তফ্রন্টের সকল নেতাই কিন্তু বুঝছেন, জাহাজ তাঁদের সাগর জলে লুকানো গোপন পাহাড়ের দিকে দুরন্তবেগে ছুটে চলছে। অসহায় নাবিকদের মত হায় হায় করা ছাড়া কিছুই বোধহয় করার নেই তাঁদের!

২৩ শে সেপ্‌টেম্বর শীতলপুর কয়লাখনিতে দুদল শ্রমিকের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। তিন ব্যক্তি সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন। কিছু বাড়ি ঘরেও লুটপাট চলল।

ঐ তারিখেই আসানসোলে সি পি এম-এর শ্রমিক ইউনিয়নের ক্যাডারদের সহিত স্থানীয় সি আর ও ক্যাম্পের কর্মীদের সংঘর্ষে কম করে ৪৬ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে একজন পরে মারা যান।

ভারতীয় খনি শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও সি পি আই নেতা কল্যাণ রায় এম পি এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বললেন, 'আসান-সোল-রাণীগঞ্জ এলাকায় আইন শৃঙ্খলা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। চঞ্চল উপত্যকার ডাকাতদল সৃষ্টি অরাজকতার সঙ্গেই শুধু এর তুলনা করা চলে। পুলিসের কাজ হয়েছে লাশ কুড়িয়ে বেড়ানো এবং রক্ষার বদলে বিপন্নদের স্থানান্তরে পালাবার পরামর্শ দেওয়া।' জনৈক সাংবাদিকের স্বগত উক্তি—, 'একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে।'

কংগ্রেস অনেকদিন চুপ করে থেকে, ২৯ শে সেপ্‌টেম্বর রাজ্য কমিটির সভায় রাজ্যব্যাপী যুক্ত-ফ্রন্টের কয়েকটি শরিকদলের হিংসাশ্রয়ী ও সন্ত্রাসমূলক কাজের কঠোর সমালোচনা করে। নিন্দা প্রস্তাবে বলা হয়, ফ্রন্টের শাসনকালে দাঙ্গা হাঙ্গামা, ডাকাতি এবং খুন জখম নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিসমন্ত্রী জ্যোতিবসুর বিরুদ্ধে দলীয় স্বার্থে আসামীদের ছেড়ে দেবার অভিযোগও করা হয় উক্ত প্রস্তাবে।

অন্যদিকে নকশালরা সুযোগ বুঝে আবার আত্ম-প্রকাশ করে। তাদের দল সি পি আই (এম এল) মূলতঃ সি পি এম-এর স্লিপ্‌লিন্টার গ্রুপের দ্বারা গঠিত। ২৭ শে সেপ্‌টেম্বর তারিখে মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুরে নকশালদের হাতে খুন হলেন এক সম্পন্ন কৃষক। তার ভাই বাধা দিতে গিয়ে আহত হলেন। নকশালরা তাদের বন্দুক, টাকা পয়সা এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করল। গ্রামের উপর বিষকৌড়া চাগিয়ে উঠল এবার।

শরিকী সংঘর্ষ নিয়ে ফ্রন্টের অনেক নেতারই মন খারাপ। ১লা অক্টোবর কলিকাতায় সংঘর্ষ নিবারণ করে উপায় নির্ধারণের জন্য যুক্তফ্রন্টের একটি সভা বসে। সভায় ফ: ব: নেতা নির্মল বসু দলগুলির সভা ও মিছিলে তীর ধনুক প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করার জন্য প্রস্তাব দেন। বাংলা কংগ্রেস, এস এস পি এস ইউ সি এবং পি এস পি-র প্রতিনিধিরা শ্রীবসুর প্রস্তাব সমর্থন করেন। সি পি এম-এর প্রতিনিধি সরোজ মুখার্জি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, অস্ত্রসহ মিছিল নিষিদ্ধ করলে জোতদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে। সভায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হল না। ফ্রন্টের শরিক দলগুলিকে নিজ নিজ সমর্থকদের সামাল দেবার পরামর্শ দিয়ে সভা ভঙ্গ হল।

দুশ্চিন্তা ছোট দলের, বড় দলের এতে কোন ক্ষতি নেই। হানাহানি চললে পরে ছোট দলের সমর্থকরা নিজেদের দল ছেড়ে বড় দলে নাম লেখাতে বাধ্য হবে। এটাই ত যুক্তফ্রন্টের মার্কিস্ট কৌশল। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিক্রা যবন'—এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা ছোটরা মর্মে মর্মে বুঝতে পারল।

পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তি বাড়তে থাকল। গান্ধী-পন্থী, দেশপ্রেমিক এবং নির্ভীক যোদ্ধা চিরকুমার অজয়কুমার চঞ্চল হলেন। তিনি মার্কসবাদী বন্ধুদের অনেক ভাল কথা বললেন, কিন্তু কে শোনে তাঁর সদুপদেশ। ক্ষমতার ফেনিল মদমত্ততায় সি পি এম তখন উদ্বেল। অজয়বাবুর অবস্থা হল, পড়েছি যবনের হাতে খানাখেতে হবে এক সাথে' র মত।

১লা অকটোবর, শরতের স্নিগ্ধ সায়াহ্নে যুক্তফ্রন্টের নেতারা যখন সহর কলিকাতায় রমা নিকেতনে গরম চায়ের আসরে বসে শরিকী সংঘর্ষ সম্বন্ধে আলোচনারত, তখন সহর থেকে খুব দূরে নয় জয়নগর থানার তিলি গ্রামে চলছিল এস ইউ সি এবং সি পি এম সমর্থকদের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধে শহীদ (?) হলেন সি পি এম এর আবু জাকের নস্কর। ঐ সময় বারাসতে মাণিক বর নামে এক যুবককে একাকী পেয়ে তার বিরুদ্ধ দলের মস্তানরা পিটিয়ে খুন করল। থানা নিকটেই, পুলিসের দেখা মিলল না।

৩রা অক্টোবর খিদিরপুরে দু দল শ্রমিকের মধ্যে ইউনিয়ন দখল নিয়ে দু দুবার সংঘর্ষ বাধে। একটা স্কুটার পোড়ে, বোমা ও ইটপাটকেল ছোঁড়াছুড়ি হয়। পুলিস কাঁদানো গ্যাস মেরে অবস্থা আয়ত্তে আনে।

পশ্চিমবঙ্গে সহসা দেখা দিলেন ত্রিভুবন নারায়ণ সিং, যিনি আট বছর পরে সেখানকার রাজ্যপাল হয়ে এসেছিলেন। যিনি তখন শ্রমিক নেতা এবং এস এস পি করেন। ৪ঠা অক্টোবর আসানসোলে এক শ্রমিক সমাবেশে ত্রিভুবনবাবু বললেন, কয়লা-খনি অঞ্চলে আইনের শাসন বলে কিছুই নেই। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস নীরব দর্শক, তারা সি পি এম কর্তৃক সন্ত্রাস সৃষ্টির সহায়ক। দুঃখের বিষয় যে, এতকাল কমিউনিস্টদের হিংসাশ্রয়ী কাজ ছিল জমিদার ও মালিকদের বিরুদ্ধে, এখন তা চলছে গরিব শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। এর ফলে শ্রমিক ঐক্য বিনষ্ট হবে এবং শ্রমজীবী মানুষের রুটির লড়াই ব্যাহত হবে। হায় ত্রিভুবন! রাজ্যপাল হয়ে কি করে সেসব কথা তুমি ভুললে?

(এর পর ১২ পাতায় দেখুন)

প্রশাসন কলুষিত এরাজ্যে

—বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনের পর দিন পশ্চিমবঙ্গে যে হারে ছিনতাই লুঠতরাজ, রাহাজানি, ডাকাতি, নরহত্যা, নারীধর্ষণ, বাড়ী চড়াও হয়ে খুন, সংঘবদ্ধ হামলা, বোমাবাজী, সমাজ বিরোধীদের দলীয় সংঘর্ষ, রাজনৈতিক হত্যা-কাণ্ড প্রভৃতি ভয়াবহ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হচ্ছে তা বিগত সাড়ে চার বছরের পূর্বেকার সকল রেকর্ডকে ম্লান করেছে, এ রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলেই। প্রশাসনের আইনসিদ্ধ নিয়ামকরা তাঁদের বিচার বুদ্ধি ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে কোন ভাবে সক্ষম হচ্ছেন না কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য ও সি, পি, এম দলের ক্যাডারদের দাপটে। সমগ্র রাজ্য-প্রশাসনকে এরূপ জঘন্য উপায়ে ইতি-পূর্বে কোন রাজনৈতিক দলই তাদের দলীয় আজ্ঞাবহ যন্ত্রে পরিণত করেনি বা তা করবার কোনরূপ প্রচেষ্টা চালাতেও সাহস করেনি। কমিউনিস্টরা যখনই যে দেশের বা যে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ছলে, বলে কৌশলে বা অন্য কোন উপায়ে দখল করেছে তখনই তারা সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিজেদের দলীয় শ্রীবৃদ্ধির গাজে লাগিয়েছে সুকৌশলে, আর অরাজকতা বা সহস্র রাজকতা সৃষ্টি করে দলের ক্যাডারদের হাতে সংবিধান বহিভূত ক্ষমতা তুলে দিয়েছে রাজনৈতিক মুনাফা অর্জ্জনের আশায়, যা প্রকৃত পক্ষে দেশের সর্বসাধারণের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর ও বিপদজনক।

যুক্তফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দলের শাসন কালেই পশ্চিমবঙ্গ সর্বপ্রকার বিপদজনক পরিস্থিতির কেন্দ্র ভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম হবার ফলে যা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বৈরতন্ত্রী শাসন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। বর্তমান সরকার এ রাজ্যে সি, পি, এম দলের ক্ষমতা বৃদ্ধির আশায় যে ভাবে সমগ্র পুলিস প্রশাসনকে নিষ্ক্রীয় ও স্বেচ্ছাকৃত ভাবে অকেজো করে রেখেছে তাতে পুলিসের পক্ষে চোর, ডাকাত, খুনী, ছিনতাইকারী, নারীধর্ষণকারী, লুটেরা ও সমাজ-বিরোধীদের সায়েস্তা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিসের মধ্যে বহু সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ অফিসার আজো আছে, কিন্তু পদে পদে সি, পি, এম দলের নেতা, এম, এল এ, এম, পি ও অত্যুৎসাহী ক্যাডারদের অযথা হস্তক্ষেপের ফলে ঐ সব অফিসারগণ আইনানুগ পুলিসি ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে অপরাধীরা পরমানন্দে অপরাধ অনুষ্ঠান করে চলেছে অবাধে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিসের নাকের ডগায়।

পুলিস বিভাগ অসহায় দর্শক হতে বাধ্য হচ্ছে সি, পি, এম দলের হটকারী দৌরাত্মের চাপে পড়ে, কারণ শাসক সি, পি, এম দল; যদিও নামে বাম-ফ্রন্ট আখ্যায় ভূষিত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক ও অন্যান্য ছোট বড় সর্বস্তরের প্রশাসকগণ সি, পি এম দলের সংবিধান বহিভূত হস্তক্ষেপের ফলে সরকারী কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে ও নিয়মানুসারে পরি-চালনায় অক্ষম দেখা যায়। উপরোক্ত কো-অর্ডি-নেশন কমিটির হুকুম তামিল করতে করতে তাঁরা প্রায় সকলেই নাজেহাল। যদি কোন অফিসার কিঞ্চিৎ সাহসী হয়ে সি, পি, এম দলের আজ্ঞাবহ হতে কোনরূপ অনীহা প্রকাশ করে, তবে সঙ্গে

সঙ্গে তাঁকে বদলি করা হয় এমন পাণ্ডব-বর্জিত স্থানে যেখানে তিনি তাঁর ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সম্পূর্ণ অপারগ হতে বাধ্য হন। সরকারের এই প্রতিহিংসাপরায়ণতাই অনেক সৎ ও কর্মঠ এবং সাহসী অফিসারকে প্রায় পঙ্গু করে রেখেছে। উপরোক্ত কারণে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ প্রশাসন, পুলিস-প্রশাসন ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগ বর্তমানে এমন পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেচে যে দল-নিরপেক্ষ সাধারণ মানুষ এই সরকারকে সকল রকম কর প্রদান করেও সরকারের কাছে ন্যায় বিচার বা আইনানুগ প্রাপ্য কাজ পায় না যা সরকারের পক্ষে গর্হিত অন্যায়।

সংবিধান মোতাবেক এরাজ্যে বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও জনগণই সরকারের প্রকৃত মালিক, কিন্তু এরাজ্যে যা সংঘটিত হচ্ছে তাতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে একমাত্র সি. পি, এম দলের লোকেরাই এরাজ্যে একনম্বর নাগরিক আর বাদ বাকীরা ছ নম্বর নাগরিক। এ সরকার শুধু সি, পি, এম দলের আদেশ মত কাজ করবে তা সে যতই নিষ্ঠুর বা পঅরাধ জনক হোক না কেন। ফলে এরাজ্যে সাধারণ মানুষ নানা ধরণের অসুবিধায় পড়ে সি, পি এম দলকে তথা বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কংগ্রেস (ই) দলের সাহায্য চাইছে। কংগ্রেস (ই) দলের ক্যাডারগণ যেরূপ পরস্পর বিরোধী আচার ও আচরণে লিপ্ত তাতে সেদিকেও আশা ভরসা খুব উজ্জ্বল নয় মনে হয়।

গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থ বাড়ীতে, শহরের ফ্ল্যাটবাড়ীতে ও বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যেরূপ ঘন ঘন ডাকাতি সংঘটিত হচ্ছে সশস্ত্র যুবকবৃন্দের দ্বারা তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে কোন প্রতিরোধ বা প্রতিকার করতে এখনো সক্ষম নয় কেন? এ রাজ্যে ট্রেন ডাকাতির মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়তির পথে অথচ সরকার এত নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় কেন? এ রাজ্যের অধিবাসীর ধন-প্রাণের রক্ষক কি এ সরকার নয়? সেটাও কি কেন্দ্রীয় সরকারের করণীয় কাজ?

রাজ্য সরকারের হাতে বর্ত্তমানে যে সব ক্ষমতা সংবিধান সম্মত উপায়ে আছে তাও তো কার্য্যকালে কোন ক্ষেত্রেই কার্য্যকর হয় না। খুন, রাহাজানি, সংঘবদ্ধ গুণ্ডামি দমন করার জন্য এরাজ্যের অধিবাসীরা কি কেন্দ্রের দ্বারাস্থ হবে? তা যদি একান্ত হতে হয় তবে এরাজ্যে মন্ত্রীদের বেতন, ভাতা, গাড়ী, টেলিফোন প্রভৃতি বাবদ মোটা মোটা টাকা দেবার দরকার কি? সবই যদি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, তবে রাজ্য সরকারের অনাবশ্যক অস্তিত্বের প্রয়োজনটাই বা কি? এ রাজ্যের মন্ত্রীরা জনগণের টাকায় পকেটভারী করে কি কেবলেই দলীয় সংগঠনকে জোরদার করার জন্য সেই জনগণেরই ওপর অত্যাচার ও অবিচারই চালিয়ে যাবে শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত? এ রাজ্যবাসীর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত প্রায়, তাই তারা সুষ্ঠু প্রশাসন চায়, পুলিসকে সক্রিয় দেখতে চায় ও সাধারণ প্রশাসনকে দল নিরপেক্ষ সুশাসনের প্রতীক দেখতে আগ্রহী। রাজ্য সরকার এখনো সংযত হউন, সংবিধান সম্মত পথে চলতে অভ্যস্ত হউন, নচেৎ এসরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী।

মন্ত্রীরা কেবল বড় বড় কথার ফুল ঝুরি ছড়িয়ে কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা দেখাতে যেরূপ অভ্যস্ত দেখা যায়, তাতে রাজ্যবাসী তাদের বরদাস্ত করতে ক্রমশ বিরক্ত হয়ে পড়ছে। এর পরিণাম ভয়ঙ্কর মারাত্মক

হওয়াও বিচিত্র নয়। ডাকাতি, নরহত্যা, নারীধর্ষণ ও যখন তখন যেখানে সেখানে সংঘবদ্ধ গুণ্ডামির প্রতিকার সাধনে যদি সরকার এতই অক্ষম তো সে সরকারের পক্ষে পদত্যাগই শ্রেয়, অন্যথায় পশ্চিম-বঙ্গের শান্তিপ্রিয় নাগরিক গণ এই অপদার্থ সরকারের পতন ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের জন্য প্রকাশ্য জন সমাবেশের ও সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে আর ইতঃস্তত করবে না।

সমগ্র প্রশাসনের প্রায় সর্ব্বস্তরে যে দুর্নীতি ও দলবাজী প্রায়শই প্রকট দেখা যায়, তারও নিরসন বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে জনস্বার্থে। সরকার কি কেবল নাগরিকদের কাছথেকে কর গ্রহণের যন্ত্র? সরকারের প্রাথমিক দায়-দায়িত্ব হচ্ছে এরাজ্যের সর্ব্বত্র বিঘ্নিত শান্তিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, অথচ সে ব্যাপারে সরকার আজো উদাসীন। এই উদাসীনতার অর্থ ক্লীব সরকার যার জনগণকে বিপদের সময়ে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। এরূপ ক্ষমতা হীন ক্লীব সরকারকে বা অবিবেচক সরকারকে জনগণ আর কত দিন এভাবে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে দিনের পরদিন সহ্য করবে? অসহ্য ব্যাপারকে অল্পদিন মানুষ সহ্য করে, কিন্তু চিরদিন তা করেও না বা তা পারেওনা।

(১ম পৃঃ পর)

ঐ একই তারিখে দিল্লিতে ফঃ বঃ নেতা অশোক ঘোষ পঃ বঃ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতির জন্য মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের দায়ি করে একটি বিবৃতি দেন। অশোকবাবু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বলতে কাদের কথা বললেন, তা স্পষ্ট বোঝা গেল না। কমিউনিস্ট মানেই ত মার্কসবাদী, মার্কসবাদী মানে যেমন কমিউনিস্ট। অশোকবাবুদের ফরোয়ার্ড ব্লক ত মার্কসবাদে বিশ্বাসী, তাহলে তাঁরা কি কমিউনিস্ট নন? না, তাঁরা কমিউনিস্ট বর্ণাশ্রমের 'ভঙ্গ-কুলীন'? কবিয়াল আনটুনি ফিরিঙ্গির গানটা মনে পড়ে গেল।

'খ্রীষ্টে আর কৃষ্ণে নাইরে কিছু ভিন্ন ভাই
নামের ফেরে ভোলে মানুষ তা বই আর
নয় কিছুই।'

ফঃ বঃ, আর এস পি, আর সি পি আই প্রভৃতি দল সব বুঝেও নিরুপায়। তাদের অবস্থা হল—

'প্রভুর দোসর নাই, উপায় কে করে
কাটনায় কড়ি কত যোগায় ওয়ারে।'

—কবিকঙ্কন চণ্ডী

(চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" এর থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

দ্বৈত শাসন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একসিকিউটিভ কাউন্সিলগুলি লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের ভোটের অধীন ছিল না। এই আন্দোলনটি ছিল সর্বব্যাপক এবং বেশ জোরদার। চরমপন্থী সংবাদপত্রগুলিই এই আন্দোলন সৃষ্টি করে। অংশত এই আন্দোলনের মূলে ছিল কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর্বেদনা, আর ছিল অংশতঃ নরম পন্থী দলের জয় গৌরব। সে জয় গৌরব চরম পন্থীদের অবিরাম বিরোধিতা সত্ত্বেও নরম পন্থীরা পার্লিয়ামেন্টের দ্বারা শাসন সংস্কার আইন পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হওয়ায় অর্জন করেছিল।

বেঙ্গল লেজিজলেটিভ কাউন্সিলের অল্প দিনের স্থিতিকাল মধ্যে পাঁচ পাঁচ বার বেতন কমানোর মোসন আনা হয়। কিন্তু প্রতিবারই তারা হেরে যান। তথাপি বিরোধী পক্ষীয়েরা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। মাত্র বার মাস আগে সমস্ত দেশ যে সর্বসম্মত মনোভাব ব্যক্ত করেছিল তাকে অগ্রাহ্য করেই তারা তাদের আন্দোলন চালাতে থাকেন। ঐক্যবদ্ধ ভারতের যে দৃঢ় ভিত্তিক জনমত গড়ে উঠেছিল, এক মুহূর্তের জন্য আমি সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই জনমতের বিরুদ্ধে একটিও বিরোধী মত তখন ধ্বনিত হয়নি।

১৯১৮ সালের সেপটেম্বর মাসে বোম্বেতে মিঃ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে পণ্ডিত মদন মোহন মালবা কর্তৃক আনীত নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। 'মন্ত্রীদের মর্যাদা ও বেতন এক্সিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যদের মর্যাদা ও বেতনের সমান রাখতে হবে।' অন্যান্যদের সঙ্গে মিঃ নেহেরু এবং মিঃ তিলক সে প্রস্তাব সমর্থন করেন।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত মডারেট পার্টির প্রথম সম্মেলনে রাইট অপারেশন মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—'মন্ত্রীদের এবং একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মর্যাদা ও বেতন একই রকম হওয়া উচিত।'

তার পরে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লিগও ওই অভিমত ব্যক্ত করে। ১৯১৮ সালের সেপটেম্বর মাসে বোম্বেতে তাদের বিশেষ অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন মাসুদাবাদের রাজা। অধিবেশনে মৌলভী ফজলুল হক প্রস্তাব করেন, 'মন্ত্রীদের পদ মর্যাদা ও বেতন একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের সমান হবে।' প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

আবার ইম্পেরিয়াল লেজিজলেটিভ কাউনসিলের বেসরকারী সদস্যগণের কমিটিও তাদের রিপোর্টে সুপারিশ করে বলেন—'বেতনাদি সম্পর্কে মন্ত্রীদের ও একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের একই পাদপীঠে স্থাপিত করা হোক।'

বেঙ্গল লেজিজলেটিভ কাউনসিলের বেসরকারী সদস্যগণ শাসন সংস্কার পরিকল্পনা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতেও তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে 'মন্ত্রীদের মর্যাদা, অধিকার এবং বেতনাদি প্রাদেশিক একসিকিউটিভ কাউনসিলের

সদস্যগণের সমান হবে।' তবে এ ব্যাপারে লণ্ডনে জয়েন্ট পার্লিয়ামেন্টারী কমিটির সমক্ষে বিশিষ্ট নেতাগণ যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা হল সবচেয়ে প্রামানিক ও শক্তিসাম্য। এখানেও আমরা লক্ষ্য করেছি সেই দৃঢ় ঐকমত্য যার বিরুদ্ধে কোন একটি বিরোধী মতই ব্যক্ত হয়নি। সেখানে মিঃ প্যাটেলের মত অসহযোগী এবং মিঃ শাস্ত্রীর মত সহযোগী ঐকমত্য প্রকাশের জন্য একই মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন সেখানে একথা আমরা বলতে পারি যে মন্ত্রীদের বেতন কমানোর এই যুক্তি সব চেয়ে দুর্বল ভিত্তির উপরই দাঁড় করান হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষে ডেপুটেশনের সদস্য মিঃ মাধব রাও এবং মিঃ প্যাটেল জয়েন্ট কমিটির সমক্ষে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তা হল এই—'বেতন ও মর্যাদার ব্যাপারে মন্ত্রীদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যের সমান পর্যায়ে রাখতে হবে।' চরমপন্থী সংবাদ পত্র সমূহ আমার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনেন যে আমি মন্ত্রীদের বেতন হ্রাসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আমার অতীত জীবনের নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছি, কেননা আমি ইতি পূর্বে সব সময়ই সরকারী কাজে খরচ কমানোর ও উচ্চহারে দেওয়া বেতনের পরিমাণ কমানোর কথা বলে এসেছি। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের সুবিধামত এই কথাটি ভুলে গেলেন যে এই একটিমাত্র বিষয়ে আমি একাই ব্যতিক্রম। জয়েন্ট পার্লিয়ামেন্টারী কমিটিতে আমি এই বিষয়টির উপর যে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম তা এখানে তুলে ধরছি। প্রশ্নোত্তরের আকারে তা হল এই রকম:

প্র: তুমি যদি মনে কর যে দ্বৈত শাসন প্রণালী নীতিগত ভাবে গ্রহণযোগ্য, তা হলে এমন কোন খুঁটিনাটি বিষয় আছে বলে কি তুমি মনে কর যার সংশোধন প্রয়োজন? তা যদি থাকে, তবে সেগুলি কী এবং তার সংশোধনের জন্য তোমার কি প্রস্তাব আছে?

উ: আমি অত্যাবশ্যক বলে যে গুলি মনে করি তা হল এই—

১) বাজেট তৈরীর আগে একটি সাধারণ তহবিলের সংস্থান রাখতে হবে এবং তার সঙ্গে সরকারের উভয় অংশের যৌথ বিচার বিবেচনার ব্যবস্থাও থাকবে।

২) জয়েন্ট রিপোর্টে সার্টিফিকেট করে কোন কিছু করার ক্ষমতা দেওয়ার যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সে অবস্থা ছাড়া অন্য অবস্থায় আইন সভায় বাজেট সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হবে তা, সংরক্ষিত বিষয় সম্পর্কেই হোক, কর্ম-কর্তা ব্যক্তিগণের উপর বাধ্যতামূলক হবে।

৩) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে মাত্র দুজন সদস্য থাকবেন, তার মধ্যে একজন হবেন ভারতীয়।

৪) পদ মর্যাদা, বেতন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিগণ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণের সমকক্ষ হবেন।

৫) সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত—উভয় বিভাগেই ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি থাকবে; আর থাকবে কতিপয় আণ্ডার সেক্রেটারী জয়েন্ট রিপোর্টে যা প্রস্তাবিত হয়েছে।

৬) প্রাদেশিক শাসন কার্য্যের জন্য কর ধার্যকরণ বিষয়টি হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এবং মন্ত্রীদের অনুমোদন ব্যতীত কোন কর ধার্য্যের প্রস্তাব আইন সভায় আনা চলবে না।

একই বেতনাদির ভিত্তিতে মন্ত্রী এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণ সম মর্য্যাদা সম্পন্ন হবেন—এটাই ছিল সারা ভারতের মনের কথা। আমি বিশেষ চিন্তা করেই এই অভিমত

ব্যক্ত করেছিলাম তা থেকে আমি কখনও বিচ্যুত হইনি। কতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি তার পদগুণে প্রাপ্ত কর্তৃত্ব ছাড়াও এক অদৃশ্য ক্ষমতা তার সহযোগী কর্মচারীদের ওপর প্রয়োগ করে থাকেন। সে ক্ষেত্রে এটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ত যে একই সরকারের সম ক্ষমতার অধিকারী এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে, তা হলে তার প্রয়োজনীয়তা ও কর্তৃত্বের পক্ষে এক বিপর্যয় দেখা দিত। অর্থ সংস্থান বিষয়ে যে অসুবিধার কথা বলা হয়েছে, তার গুরুত্ব তো আছেই কিন্তু এক্ষেত্রে তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আছে যা এই বৃহৎ ও অভিনব পরীক্ষার ফল কী দাঁড়ায় তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া ১৯১৮ এবং ১৯১৯ সালে সমগ্র ভারত ঐক্যবদ্ধভাবে যে অভিমত ব্যক্ত করেছে, ১৯২১ সালে সে অভিমত-কে কেন যে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হবে তার পক্ষেও কোন ক্ষীণতম যুক্তি প্রদর্শন করা হয়নি। কেবল মাত্র দলীয় মনোভাবই এখানে প্রবল, তাকে আবার শক্তিশালী করেছে ব্যক্তিগত ভাল-মন্দ বোধের আবেগ এবং শাসন সংস্কারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার প্রচ্ছন্ন বাসনা।

আমি মন্ত্রীর পদ কেন গ্রহণ করেছি, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য রেখেই এ অধ্যায়ের শেষ করতে চাই। এক শ্রেণীর চরমপন্থী সংবাদ পত্রের তরফ থেকে একটা রব তোলা হয়েছিল যে আমার মন্ত্রীপদ গ্রহণ করা সঙ্গত হয়নি। মিঃ সি, আর দাশ আমার বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় এই রবকে কাজে লাগিয়েছেন। আমার অপরাধের মাথা মুণ্ড হল এই যে আমি গভর্ণমেণ্টের একজন সদস্য। এই রবের বিরুদ্ধে আমার উত্তর আছে। আর সে উত্তর মতদ্বন্দ্বের অস্ত্রাগারে যত মোক্ষম অস্ত্র আছে তার যে কোন একটির মতই সুনিশ্চিত শক্তিশালী। সারাজীবন ধরে আমি ধাপে ধাপে পর্য্যায় ক্রমেই স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য চেষ্টা করে এসেছি। আমি যখন এজন্য কাজ করেছি প্রকৃতপক্ষে তখন ভারতে স্বপ্নেও কেউ একথা ভাবেনি। এ দেশ তখন পুরাতন পথেই চলতে অভ্যস্ত ছিল এবং পুরাতন প্রথা পদ্ধতি অনুষ্ঠান নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল।

আমি যখন এজন্য কাজ করি তখন সরকারও মনে করত যে এটা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। মাত্র দশ বৎসর আগে তৎকালীন অর্থ-মন্ত্রী স্যার উইলিয়াম মেয়ার ইম্পেরিয়াল লেজিজলেটিভ কাউন্সিলে আমার এই কর্ম প্রচেষ্টা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন যে আমি একজন ধৈর্য্যহীন আদর্শবাদী মানুষ। আমার সেই প্রয়াত বন্ধুর জন্য আজ শোক অনুভব করছি। আমাদের সেই নিরবচ্ছিন্ন দৃঢ় প্রয়াসের কালে আজ সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে—এমন কি সরকারেরও মনো-ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। ২০শে আগষ্টের ঘোষণা বাণী আমাদের সাফল্যের প্রতি শ্রদ্ধাই সূচনা করেছে।

(চলবে)

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address
Sri Parimal Ghosh	P O & P S.—Siliguri Dt Darjeeling.
,, Rajendra Prasad Ghosh	42/3, Ashokenagar, p, o, Ashokenagar, Dt. 24-Pars.
Smt. Aruna Dutta	R/o. Kamdahari (near Jora Mondia), p, o, Garia, p,s, Regent park-84
,, Binapani Bhattacharjee	p, o, Sodepur Palliaree, 'Hiramahal' Dt 24-Pargs.
Sri Pratulpati Lahiri	P-519/A, Panditiya Road, Extension, Calcutta-29.

AUGUST, 1981

Sri Hari Pada Maji	Vill. Tajpur, P, o, Sonakhli, Dt. Midnapore.
Smt. Kaushalya Upadhaya	Vill & p, o, Mallarpur, Dt. Birbhum,
Sri Jnanranjan Banerjee	'Ram Nilay' 24/96, Jessore Road, (96, Motilal Colony No. 1), Dum Dum, Cal-28.
Sri Satish Ranjan Bhattacharjee	75/1-A, College Street, Cal-73.
Smt. Saralabala Singh	R/o. H. N Sarkar Road, Basdroni Park, Dt. 24 pars.
Arati Rani Ghosh	Vill. Gobindapur, p, o. Rajkumar, Dt Bankura.

SEPTEMBER—1981

Smt. Prosad Bala Banerjee	Vill. Devipur, p. o. Raichak, Dt. Howrah.
,, Kironmoyee Dasgupta	p, o. & Vill. Bethuadahari, Dt. Nadia.
Sri Dhirendra Nath Thakur	17/A, Ostagar Lane, Cal-6
Smt. Santi Chatterjee	R/o. Harinath Sen Road, Vill. Dakshinpara, p. o, Barasat, 24-parg.
,, Asha Rani Chakraborty	Basersarak. P. S. Mogra. Dt. Hooghly.
Sri Ram Kamal Das	2, Amherst Row, Cal-9
,, Atul Chandra Das	Vill. Durgapur, p. o. Basantia, Dt. Midnapur.
Smt. Santi Chakraborty	R/o 8, Tarunpally, D. P. Nagar, Belgharia, Dt. 24 Parg.
Sri Sambhu Nath Chakraborty	Pratap Bagan, p. o, & Dt. Bankura.
,, Samarendra Ghosh Chowdhury	R/o. Paipara, P. S. Bongaon, Dt. 24-parg.
Smt. Shefali Chatterjee	168 Sarat Ghosh Gardan Road, Road, Cal-31
Sri Birendra Nath Shame	2/154, Sree Colony, Cal—47
Smt. Uahangini Bhattacharjee	127/1, Kamdia Road, P. S. Sibpur, Dt, Howrah.
Sri Jogendra Nath Dutta	R/o. Vill & p o. Fatapukur, Dt. Jalpaiguri.
Sri Harendra Kumar Dey	R o. Flat No H/15/550 Taherpur Colony, Taherpur, Dt. Nadia.
Smt Nirupama Kusari	Block D, Flat. 3, Sadhanpur Housing Estate, P.o. & Dt. Burdwan.
,, Anima Das	Station Road, p. o. & Dt. Midnapur.
,, China Sen Sarma	737/2, Ashokenagar, p. o. Ashokenagar, p, s, Habra, Dt. 24 Parg.
,, Minu Saha	Calcutta—9

Sri Bhim Bahadur Chatri R/o, Vill. Garh Kamalpur, p,o, Mohishadal, Midn pore,
,, Adhir Kumar Biswas R/o Qrt, No 24, po. Hindustan Cables, Dt. Burdwan.
Smt Lila Nandy R/o. Vill, & p o. Kodalia, Dt. 24 Parg.
Sri Debendra Kumar Choudhury No 3 Peary Mohan Road, Cal—27
Smt. Sadhana Chakraborty 30, N. B H Shibtola Lane, Mistryghat. Monirompore
p o, Barrackpore, 24 Prgs,
,, Priya Bala Paul 3 3C, Padmapukur Rd, p o. Regent Park, Cal—40
Sri Bhuban Mohan Dutta 11, Tarak Datta Road, Flat No 9. Cal-19
Sri Satyes Chandra Ghosh No, 87-C Ibrahimpur, Road cal—32
Sri Atul Chandra Parali Vill & p o, Kashinathpul, p s Daspur, Dt. Midnapore,
Smt Biva Chakraborty 381-A, Pamasrec Pally, Cal-60
Smt Nihar Bala Munsi Panpara, p o, Talpukur, p, s, Titagarh, Dt 24 pargs
Smt Nilima Gupta 13, Denesh Gupta Road, Calcutta—34
Smt. Kundamola Devi 19-A Tarak Dutta Road, p, s Karaya, Calcutta—19
Smt Satadal Mitra Majumder Viveknagar (R B, Avenue) p o, Bhadreswar, Dt Hooghly
Sri Aditya Nath Chakraborty Vill Shyam Sundarpur, p o, Daspur, Dt, Midnapore.
Smt Maya Rani Bhattacharjee 23, Sarat Bose Road p s, um D m Calcutta—65
Smt Durga Bala Paul w-o Late Netai Charan paul, Vill Mohan Matty Chak,
p o, Radhakantapur, Dt Midnapore,
Sri Pannalal Banerjee Boxi Bazar, Dt, Midnapore.
Sri Birendranath shome Calcutta—47
Smt. Bela Rani Devi w-o L. Jatindra Sekhar Burman, Cal-28
Santimoyee Devi Narendranath Chatterjee, Cal-20
, Niyoti Prova Bardhan Jatindra Mohan Cal-31
,, Amiya Rani Sen Chittaranjan Sen, Cal-10
,, Kamala Chakraborty Niripendra Kumar. Banipur, 24-prgs.
,, Kanakprova Barari Nalini Ch. 233, Kalighat Rd. Cal. 26
Sri Radhanath Bhunia Sripur Brinddbanchak, Midnapore
Smt. Padma Rani Mojee w/o. Sudhia Jimar, Midnapore
Kshitish Ch. Kanungo Kulti, Burdwan
Satyakinkar Chakraborty Gosai Bazar Town, Chandrakona, Midnapore
Atul Ch. Parali Kashinathpur, Midnapore
Sri Nihar Ranjan Bhattacharjee Sudhir Colony, 24-prgs.
Smt. Puspa Rani Chakraborty Cal-56
,, Maya Rani Chakraborty w-o L. Amalendu, Tatrganj, Nadia
,, Sudha Majumder Paresh Ranjan, Islampur W. Dinajpur
Sri Saroj Kumar Bose ,, Tarani Mohan, Howrah-5 (Restoration)

Regd No. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—ডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
কালীপদ সরকার
শ্রীভবেশচন্দ্র বক্সী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাণীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্র [illegible]—১০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির—২·০০, ৪। পৌরাণী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০, ৫। বাকেরী শতাব্দীবৃত্ত—১·২৫, ৬। কলকাতা বোমার সংগ্রাম কাহিনী—·৯০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও বোন—·৭০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬০ বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০, ১১ মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—·৫০ ভারতের অভ্যুত্থান ও ভগিনী নিবেদিতা—·৭৫, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স ডোসেসি (১)—১·০০, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স ডোসেসি ১৫। শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মদান—·৫০, ১৬ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১·০০, [illegible] হত্যা প্রচেষ্টা—·৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৯·০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—·৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

বৈশাখ শ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ১০ই পৌষ ১৩৮৮ ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮১	১২ সংখ্যা

UNIVERSITY CALCUTTA LIBRARY

"বিপ্লব সফল করে তুলতে হলে তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। প্রথমতঃ উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ যে উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং তৃতীয়তঃ বিপ্লবের দিকে জনগণের সমর্থন থাকা আবশ্যক।"

—নেতাজী

সম্পাদকীয়

একি শুনি আজি - - -

এদেশে বহুল প্রচারিত একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেটি হল 'একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে।' মন্থরাকে কুমন্ত্রণাদাত্রী এবং অঘটন পটিয়সী বলেই জানে সবাই। তার মুখে হিত কথা শুনলেই লোক বিস্মিত হয় এবং উপরোক্ত প্রশ্ন করে। পশ্চিমবাংলার মানুষ সি, পি, আই (এম)-কে অসুস্থ মানসিকতাগ্রস্ত বলেই জানে। তাদের মুখে হিত কথা শুনলেও, "একি কথা শুনি আজি সি, পি, এম-এর মুখে" এই প্রশ্নটাই জাগে। আধুনিককালে পশ্চিমবাংলার সি, পি, এম প্রভাবিত সিটু এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতাদের দ্বারা প্রচারিত একটি বিবৃতির ফলে এই ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর বেজে উঠেছে।

এরা এদের অনুগামীদের হালফিল কর্তব্যপরায়ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এরা এদের অনুগামীদের বলেছে "আফিসে, আদালতে (তথা সব কর্মক্ষেত্রেই) সময় মত এসো, জনগণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার বন্ধ করে তাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করো, কাজকর্ম করে, পুরা দায়দায়িত্ব পালন করে বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করো। দেশের লোক তাই অবাক হয়েছে।

বলা বাহুল্য এরা সকলেই কমিউনিষ্ট দলভুক্ত, যে কমিউনিষ্টরা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীতা করেছে এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে দায়িত্বজ্ঞানহীন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করে এখনও সমাজে, রাষ্ট্রে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করে আসছে। এরা শুধু সকলকে পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উত্তেজিতই করেছে। অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য পরায়ণতার যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, সেকথা ভুলিয়ে দিয়েছে। দাঙ্গাহাঙ্গামা করে, ট্রামবাস পুড়িয়ে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, মানুষ খুন করতেও এরা দ্বিধা করেনি এতটুকু। আরও ধাপ্পা দিয়েছে যে একবার কমিউনিষ্টরা যদি ক্ষমতা দখল করতে পারে, তবে ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু সেদিন এরা ভাবতেও পারেনি যে শুধু নেতিবাচক নীতির মাধ্যমে কোন মানুষেরই কোন কল্যাণ করা যায় না। দীর্ঘ সাড়ে চার বছর অসপত্ন ক্ষমতার অধিকারী হয়েও এরা বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। সমস্যার সমাধান যতটা করেছে, নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে অনেক বেশী পরিমাণে, এটা হৃদয়ঙ্গম করছেন সাধারণ মানুষেরাও। পশ্চিমবাংলায় এদের ব্যর্থতা আজ শোচনীয়ভাবে এবং নগ্নভাবে প্রকট হয়ে পড়েছে। কেউ কাজ করে না, কাজ না করেও ওভার টাইম ব্যবস্থার মত জঘন্য প্রথাকে পাকাপোক্ত করেছে। দফায় দফায় বেতন ও ভাতা বাড়িয়ে নিয়েছে

চাপ সৃষ্টি করে, রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা না করে। সর্বস্তরে দলবাজীর প্রশ্রয় দিয়ে কমিউনিষ্ট দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে কোন শাসননীতির ধার ধারে নি। সারা রাজ্যের মানুষের ধারণা হয়েছে যে এই রাজ্যে প্রশাসন বলে কোন জিনিষ নেই। লুটেরা, ঠ্যাঙ্গাড়েরা, দলীয় ক্যাডাররা (যাদের অন্য নাম মাস্তান বললেও ভুল বলা হবে না) জোরজুলুম করে সর্বত্র সবকিছু কবজা করতে, প্রচুর সুযোগ পেয়েছে। এ অবস্থায় যে প্রশাসন চলতে পারে না, দেরীতে হলেও নেতারা বোধহয় ঠেকে বুঝতে শিখছেন। বুঝলেন, কিন্তু অত্যন্ত দেরীতে। মানুষের নিম্নশ্রেণীর প্রবৃত্তিকে একবার প্রশ্রয় দিলে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ নয় এবং অনেক সময় আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। এই রাজ্যে তাই ঘটেছে এবং এর পরিসমাপ্তি কোথায় এবং কবে হবে, তা কেউ জানেনা।

ক্ষমতামদমত্ততা মানুষ এবং দলকে বিচার বিমূঢ় করে তোলে। ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে রক্তখাদক বাঘের মত তারা এগিয়েই চলে। একদিন যে হিসাব নিকাশ হতে পারে, সেকথা ভুলে যায়। ফ্রানকেনষ্টাইন যখন তাদের উপরই আক্রমণোদ্যত হয়, তখনই এদের সম্বিৎ কিছুটা ফিরে আসে। এই গণতান্ত্রিক দেশে পাঁচ বছর অন্তর যে গণ-আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, এই আশঙ্কাতেই বোধহয় এরা এখন ভাল ভাল কথা বলে কিস্তীমাৎ করতে চাচ্ছেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাস, খবরের কাগজের মাধ্যমে একটি মাত্র বিবৃতি দিয়েই পরিবর্তন যারা করতে চাচ্ছে, তারা কৃপার পাত্র। তবু যদি এদের নীতি আন্তরিকতাপূর্ণ হয়, কিছুটা সুফল পাওয়া যেতেও পারে। তবে কমিউনিষ্ট নেতাদের আন্তরিকতার উপর কেউ ভরসা রাখে না।

এই রাজ্যের প্রশাসকেরা এবং দলীয় নেতারা কাজ না করাটাকে আইন সম্মত করে দিয়েছেন। সরকার আইন করেছে যে যারা দলীয় কাজকর্ম করবে, তারা নামদই করেই দপ্তর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। দলীয় কর্মীরা ত বটেই, অন্যরাও কাজে ফাঁকি দেবার এই সুযোগ গ্রহণ করছে ও করবে পুরামাত্রায়। এ অবস্থায় কাজকর্ম ঠিক ঠিক ভাবে চলবে একথা যারা বলেন তারা ধাপ্পাবাজ এবং এই প্রচেষ্টাকে যদি কেউ কাণাকড়ি মূল্য দেন, তবে তিনি মহামূর্খ।

দেখে শুনে মনে হয়, বর্তমান প্রশাসক দল স্বখাত সলিলে ডুবে মরবে নিশ্চিতভাবেই। এই সর্বনাশা নীতির প্রবর্তক যারা, ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে, তারা জাহান্নামে যাক, সেজন্য এই রাজ্যের মানুষ কোন দুঃখবোধ করবে না। কিন্তু প্রশাসনের বর্তমান হাল বজায় থাকলে, গোটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটাকেও যে জাহান্নামে যেতে হবে, সেজন্য উদ্বেগ অনুভব না করে কোন নিরপেক্ষ, সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ থাকতে পারেন না। এইখানে এ রাজ্যের বিরোধী দলগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন এ রাজ্যের মানুষেরা একান্তভাবে। আমরা শুধু প্রশ্ন করব কবিগুরুর ভাষায়,—

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?"

কায়া ছায়া মায়া

সুবোধ মজুমদার

এ বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ যে, জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন দ্বারা পার্থিব বস্তু ও ঘটনাকে উপভোগ করা। প্রকৃত জীবন-মান হচ্ছে এই লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সমাবেশ। যতটা খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, ক্রীড়া, কৌতুক, আমোদাদি উপভোগ করা সুস্থ দেহ ও মনের জন্য প্রয়োজন তার ব্যবস্থাই সর্বোচ্চ জীবন-মানের নিদর্শন। কোন্ বিশেষ ব্যক্তির কোন্ ধরণের কতটা উপভোগের প্রয়োজন সেটা তার সহজাত চাহিদাই বলে দেয়। তার কম বা বেশী হলে তার মধ্যে দেখা দেয় অসুস্থতা। এই সহজ বাস্তব সত্যটা সকল মানুষই বোঝে।

কিন্তু বুঝেও সকল মানুষ এ-সত্যটা নিজের জীবনে মেনে নিতে পারে না। অধিকাংশ মানুষই নিজের অনিষ্ট হবে জেনেও এই সত্যটাকে উপেক্ষা ক'রে তার বিপরীত কাজ করে। তারা সর্বোচ্চ এবং সর্বোৎকৃষ্ট জীবন মান বলতে বোঝে যথাসম্ভব বেশী দ্রব্যের সমাবেশ এবং যথাসম্ভব বেশী সম্-ভোগের আয়োজন। ফলে দেখা দেয় দেহ-মনের অসুস্থতা এবং নিরানন্দ, নৈরাশ্য, অনিষ্ট কারীতা, আত্মহত্যা প্রভৃতি উপসর্গ। অপর দিকে দেখা যায় বিক্ষোভ, বুভুক্ষা ও সমাজ-বিরোধী সব কার্যকলাপ। তখন সমাজবাসী সাধারণ মানুষ ভুলে যায় যে তারাই হচ্ছে তাদের দুর্দশার জন্য দায়ী। কায়া ফেলে ছায়ার পেছনে, এবং শেষ পর্যন্ত ছায়া ফেলে মায়ার পেছনে ঘুরতে গিয়েই যে তারা নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে একথা ভাবতেও পারে না তারা। ধনীরাও ভুগছে, দরিদ্ররাও ভুগছে, এবং একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।

আমার সুখ আর শান্তির জন্য কী কী প্রয়োজন? —এই প্রশ্নটা কেউ করছে না নিজেকে। প্রত্যেকেই চায় যথাসম্ভব বেশী ভোগ্য দ্রব্য—আরও আহার্য সামগ্রী, আরও বস্ত্র, আরও আসবাপত্র, আরও জমি। এসবের জন্য চাই টাকা, আরও টাকা। চাই গাড়ি, আরও গাড়ি। তার জন্য টাকা, আরও টাকা। তারপরে টাকা ছেড়ে চাই, ব্যাংকে কত টাকা আছে, কত জমি বা অন্যান্য সম্পদ আছে নিজের নামে সেই হিসাবের ভাবনা ভেবেই খুসী হয়। দ্রব্য ছেড়ে টাকা, তারপর টাকা ছেড়ে, মালিকানার গর্ব। জীবন-সংগ্রাম পর্যবসিত হয় গর্বের আর দম্ভের সংগ্রামে। এই সংগ্রামের ফাঁদে পা দিয়েছে ধনী দরিদ্র সবাই। ধনী যেমন ধনের গর্ব করতে চায়, তেমনি দরিদ্রও আকাংখা করে ধনের গর্ব করতে।

তথাকথিত সর্বহারারা ক্রমশঃ হয়ে উঠেছে ধনিক সংস্কৃতিতে অভিষিক্ত মধ্যবিত্ত যাদের হাতেই প্রকৃত সর্বহারারা লাঞ্ছিত নিপীড়িত হয় সবচেয়ে বেশী। ট্রেড ইউনিয়নের কল্যাণে এবং মুদ্রাস্ফীতির দাপটে আজ চাষীরাই হয়ে আছে সর্বহারা। অবশ্য ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা এবং কারখানা শ্রমিকদের পদাংক অনুসরণ ক'রে তারাও ক্রমশঃ অভিষিক্ত হচ্ছে ধনিক-সুলভ অপসংস্কৃতিতে। তাদেরও মনে রয়েছে কীকরে ধনিক হয়ে মালিকানার গর্বে প্রতিবেশীকে খর্ব করা যায়। ধনিকরা যেমন নিজেকে অতিক্ষীত করতে চায় দ্রব্যে ভেজাল দিয়ে, শ্রমিক আর কর্ম-চারীরাও তেমনি নিজেকে অতিক্ষীত করতে চায় সেবায় ফাঁকি দিয়ে। উভয় কার্যেরই পরিণাম গণশোষণ। এই কার্যে কৃষকরা পিছিয়ে পড়ে সত্যিকার সর্বহারাতে পরিণত হয়েছে এবং হচ্ছে, কারণ সেবায় ফাঁকী দেবার সুযোগ তাদের খুবই কম। ক্ষেত-মজুরদের ফাঁকি দেবার সুযোগ থাকলেও জমির মালিকদের সুযোগ নেই। অপ-

সংস্কৃতির প্রভাবে প'ড়ে তারাও চায় কায়া ছেড়ে ছায়া ও মায়ার পেছনে ছুটতে, কিন্তু পারছে না সুযোগের অভাবে।

যদি সবার পক্ষে সম্ভব হতো মধ্যবিত্ত হওয়া তাহলেও বা কথা ছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। ধনিকদের গায়ে আঁচড়টিও যে পড়ছে না। মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা কিছুসংখ্যক শ্রমিককে নিম্ন বা উচ্চ মধ্যবিত্তে পরিণত করা হচ্ছে বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। ফলে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, আর দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হচ্ছে। কিছুসংখ্যক নিম্নবিত্ত শুধু দরিদ্রদের শোষণ ক'রে মধ্যবিত্ত হচ্ছে। বর্তমান স্বঘোষিত গণতান্ত্রিক সংবিধানটি এরকম যে ধনীদের আয় বা সম্পদ হ্রাস ক'রে বণ্টন-সাম্য ঘটানো যায় না, ধনীদের দ্বারস্থ না হয়ে নির্বাচনে জয় লাভ করা যায় না। দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী যে কোনো ক্ষমতাকাংখী নেতৃত্বেরই গোপন আঁতাত থাকে ধনিক-চক্র ও মালিক চক্রের সংগে। যে সব সর্বহারারা নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তে পরিণত হয়েছে তারাও চায় না বণ্টন-সাম্য, তারাও আনুগত্য সূত্রে আবদ্ধ থাকে সম্পদশালীদের সংগে, আর তারাই হচ্ছে বামপন্থী দলগুলির শক্ত মেরুদণ্ড। ফলে বামপন্থী ও স্বঘোষিত বিপ্লবী দলগুলি ক্ষমতাসীন দলের নিন্দা করে কিন্তু সংবিধান বদলাবার চেষ্টা করে না। ক্ষমতাসীন দল কোনো বৈপ্লবিক কাজ করতে চাইলে তারা বরং সম্পদশালীদের সংগে জোট বেঁধে তাতে বাধা দেয়। এটা নগ্নভাবে প্রকট হয়েছিল রাজস্ব ভাতা বিলোপ করার সময়।

শিক্ষা-ক্ষেত্রেও আমরা দেখি এই কায়া ছেড়ে ছায়া ও মায়ার পেছনে ছোটার রীতি। বিদ্যার পেছনে ছোটা ছেড়ে সার্টিফিকেটের পেছনে ছোটা, তারপর কৃত্রিম ও অন্যায় পথে সার্টিফিকেট অর্জন করে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা। তারপর শিক্ষার পরিবর্তে কুশিক্ষা দান এবং কুশিক্ষিতদের সার্টিফিকেট প্রদান, আর সে-সার্টিফিকেটের জোরে তাদের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসানো। তখন তারাই উদ্যোগী হয়ে কৃত্রিম সার্টিফিকেটের কালোবাজার সৃষ্টি করে, অবিদ্যা সমন্বিত পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে সমাজবাসীদের মূল্যবোধ, রুচিবোধ, নীতিবোধ সব ভেঙে পড়ছে। শিক্ষাক্ষেত্র ধুরন্ধরদের উপার্জন ক্ষেত্রে পর্যবসিত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রের অংগীভূত ক্রীড়াক্ষেত্রে ও আমোদ-ক্ষেত্রেও কায়াকে পদদলিত করে ছায়া ও মায়া প্রাধান্য বিস্তার করছে। কমনওয়েলথ টিম এবং পেলে যে কলকাতার মাঠে ভারতীয়দের চেয়ে উন্নততর ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেনি এই প্রত্যক্ষ প্রমাণিত সত্যটাও বহু ক্রীড়ামোদী অস্বীকার করে বহু সিনেমা-রসিক স্বীকার করে যে 'নায়ক' ছবি দেখে তারা আনন্দ বা চিন্তার খাদ্য কিছুই পায়নি, তবু তারা বলবে যে সিনেমাটা এত উঁচু স্তরের যে সেটা বোঝা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। নিজের প্রতি এই অনাস্থা ও অশ্রদ্ধাই মানুষকে তাড়িত করে ছায়া ও মায়ার পেছনে।

শুধু অর্থনীতি বা শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যে স্বাভাবিক বিপ্লব ব্যাহত হচ্ছে এবং অরাজকতা নেমে আসছে তার মূলে রয়েছে ছায়া ও মায়ার অনুগমন। বাস্তবকে উপেক্ষা করে যখনই আমরা ছায়ার অনুসরণ করি তখনই আমরা বিপ্লবকে ব্যাহত করে বিপর্যয়কে ডেকে আনি। বাস্তবকে উপেক্ষা করি আমরা প্রবৃত্তির তাড়নায়। আত্মবিশ্বাস, আত্মশ্রদ্ধা, আত্মসম্মানবোধ যত কমে প্রবৃত্তির তাড়না তত বাড়ে। ধরা যাক আমি একজন দোকানদার,

গ্রাহকরা আমাকে বিশ্বাস করে, এবং আমি ইচ্ছা করলেই গ্রাহকদের ঠকিয়ে উচিতের বেশী অর্থ উপার্জন করতে পারি। এরকম অবস্থায় আমার জৈব প্রবৃত্তি, অর্থাৎ দ্বন্দ্ববোধ ও সম্ভোগ-কামনা, আমাকে বলে যতক্ষণ ধরা না পড় ঠকিয়ে বেশী টাকা কামিয়ে সুখ সম্ভোগের পথ প্রশস্ত করো। আমার নীতিবোধ বলে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার সুযোগ প্রত্যেকের জীবনেই আসে, তখন প্রত্যেকেই যদি প্রতারণা করে তবে সমাজে নেমে আসবে ঘোর অশান্তি, আমিও ভুগব সেই অশান্তি। আমার মূল্যবোধ বলে আমার জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দ, আর আনন্দের উৎস হচ্ছে সততা, সরলতা, সংযম, ভালবাসা সহানুভূতি প্রভৃতির অনুশীলন। তাই সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন করতে হলে প্রবৃত্তিকে প্রভাবিত করতে হয় নীতিবোধ ও মূল্যবোধ দ্বারা।

কী উপায়ে? উপায় একটি মাত্রই আছে। তা হচ্ছে জীবনদর্শন। যে জীবনদর্শন নীতিবোধ ও মূল্যবোধের ওপর প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয় তার পক্ষে সম্ভব নয় প্রবৃত্তিকে শাসন করা। যে-জীবনদর্শন আনন্দময় ক্রমবিবর্তনকে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য মনে করে তার পক্ষেই শুধু সম্ভব প্রবৃত্তিকে শাসন করা। তার পক্ষেই শুধু সম্ভব দ্বারা ও মায়ার স্বরূপ উপলব্ধি করে কায়াকে যথা-যোগ্য মর্যাদা দেওয়া। তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই শুধু আমরা পারি বাস্তব-সম্মত জীবনমানকে শ্রদ্ধা করতে এবং সাম্যময় জীবন যাপন করতে।

আধুনিক কালের দার্শনিক চিন্তা প্রধানতঃ দুটি ধারায় বয়ে চলেছে। একটি ধারা হচ্ছে ইন্দ্রিয়-বাদী, অপরটি হচ্ছে চেতনাবাদী। ইন্দ্রিয়বাদ বলে: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জ্ঞান লাভ করার একমাত্র পথ, এবং প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে কর্ম করাই হচ্ছে সুখ লাভ করার একমাত্র উপায়। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বলে যে, কোনো প্রাকৃতিক সত্তাই এক সমান নয়, মানুষ একরকম হয় না, অতএব সাম্য বলে বাস্তব জগতে কিছু নেই। স্বভাবতঃই এই জীবনদর্শন সমাজ-জীবনকে সাম্যময় করে তুলতে পারে না।

চেতনাবাদ বলে: মানুষের জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে চেতনা, আর ইন্দ্রিয় ও যুক্তি হচ্ছে তার জ্ঞান লাভের যুগ্ম উপায় ও চেতনার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ দ্বারা প্রবৃত্তিকে পরিচালনা করাই হচ্ছে সুখ লাভের একমাত্র উপায়। চেতনাবাদ আরও বলে যে, বিশ্বজগতের সকল বিশেষের মূলে রয়েছে নির্বিশেষ, সকল অসাম্যের মূলে রয়েছে সাম্য, এবং সকল দ্বন্দ্বের লক্ষ্য হচ্ছে সমন্বয়। স্বভাবতঃই এই জীবন-দর্শন সমাজ-জীবনকে করে তুলতে পারে সাম্যময়।

সাম্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত মানুষের বাস্তবতা বোধ হয় অতিশয় সতর্ক ও সবল। তারা বিশেষকে, অসাম্যকে, দ্বন্দ্বকে শ্রদ্ধা করে নির্বিশেষকে, সাম্যকে, সমন্বয়কে লাভ করার জন্য। তাই তারা কায়াকে ছেড়ে ছোটে না ছায়া ও মায়ার পেছনে, সুখকে ভুলে গিয়ে ছোটে না সুখের উপকরণের পেছনে। স্বাভাবিক বিপ্লবকে ব্যাহত করে তারা ডেকে আনে না বিপর্যয়কে।

গণতন্ত্রের বিপদ

কালীপদ সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সহসা প্রবেশিলেন তথা দুই মহারথী. ভীমবাহু। 'কি সংবাদ শীলভদ্র. সেনানী বীমান ?' জিজ্ঞাসিলেন নেতা। 'সংবাদ কি কহিব রাজা সবই দুঃসংবাদ। দিকে দিকে হানাহানি, জ্বলিছে আগুন, নিগৃহীতের আর্তনাদ সহিতে না পারি।' 'কহ জগৎপতি মন্ত্রীবর, কি অভিমত তব ?'

'আর্য, আছে খুনোখুনী, আছে রক্তপাত, ক্রন্দন বিলাপ কিন্তু তুচ্ছ মানি তা সবে। হত্যার রাজনীতি জানি মোরা। কৌশলে প্রবেশিয়া বন্যুহুলে রক্তপুরে বধিতে নাহি লজ্জা মেঘনাদে। তবে চিন্তা মোর অনুক্ষণ, রাহু যেমতি গ্রাসে চন্দ্রে, তেমতি স্ব-গোত্র চমূদল গ্রাসিছে মোদের বিচরণভূমি একে একে।' 'ভাই' বুঝেছি তবে মর্ম ব্যথা। তবে তোমাদের পথ নহে মম পথ। এক সাথে থাকি দুজন, এক রক্ত বহে দোহার তনুতে, তবু নাহি চলি দুই জন হাতে হাত ধরি। ভাল কথা, কে তোমাদের মেঘনাদ ? বিপ্লবী ট্রট্স্কি ? শীলভদ্র তুমি বলো রাজার কর্তব্য কি এ ঘোর সংকটে।'

উত্তরিলা অরিন্দম সুগ্রীব প্রতিম শীলভদ্র, 'রাজা, জানো তুমি ভাল মতে মোর বীর্যবত্তা. স্বচক্ষে দেখেছ তাহা তাম্রলিপ্তি সংগ্রামে। এবে দেহ আজ্ঞা, যাই রণে। নাশিব অরাতিকুল অহিংস সায়কে।" "স্থির হও ক্ষনকাল। চিন্তিতে সময় কিছু চাহি। অহিংস বিপ্লবী আমি, শত্রু নাহি ভাবি কোনজনে। সত্য ভিন্ন নাহি অন্যবল। অস্ত্র মোর সত্যাগ্রহ, আর পারি রাখিতে সত্যের মান আত্মাহুতি দিতে।"

১৯৬৯ সালের রাজনৈতিক খুনোখুনির রোজ নামচা খোলার আগে হালফিল কিছু সমাচার পরিবেশন করে নেওয়া মন্দ নয়। কারণ ১৯৬৭-৬৯ সালে প: বঙ্গে যে বৃক্ষের চারা পোতা হয়েছিল গত চার বছরে তা ফলবান হয়ে উঠেছে এবং জনসাধারণ সে বৃক্ষের ফল আস্বাদনের সুযোগও পেয়েছেন।

গত ১২ই ডিসেম্বর (১৯৮১) প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর এক দিনের প: ব: সফরকালে বোলপুরে কয়েকটি মোক্ষম কথা বলেছেন, (১) ভোটের তালিকা সংশোধনের আগে প: বঙ্গে নির্বাচন নয়. ২) কোন দায়িত্বশীল সরকার কর্তৃক দিন আনা দিন খাওয়া গরিব লোকের জীবিকা-মারা হরতালের সমর্থন অভূতপূর্ব, ৩) প: বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার হরতালকে ছেলেখেলায় পরিণত করেছেন এবং ৪) এ রাজ্যে রাজনৈতিক হত্যা বেড়েই চলেছে ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি উদ্বেগজনক। প্রধানমন্ত্রী আর যা বলেছেন তা হল. তিনি বামফ্রন্ট সরকারকে ভাঙ্গছেন না, সে কাজ করবে রাজ্যের জনগণ যথা সময়ে।

কথাগুলি বামফ্রন্টের নিকট যতই অপ্রিয় হোক না কেন, তার সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবুও প্রতিবাদ করতে হবে, তাই মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে, এ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা বেশ ভালই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুখ্যমন্ত্রীর তুরুক জবাব শেষ হতে না হতেই তা মিলিয়ে গেল বহরমপুরের তাণ্ডবের ঘূর্ণি ঝড়ে। ইসলামপুরের পর পুলিস প্রশাসনের আর একটি ভাল কীর্তির সংযোজন হল চিত্রগুপ্তের খাতায়।

কনস্টেবল বীরেন দাসের মৃত্যু দুঃখবহ, কিন্তু বীরেন দাসের মত এ রাজ্যে প্রতিনিয়তই যে শত শত মানুষ খুন হচ্ছেন, সে সম্পর্কে পুলিস কি করছে, কয়টা খুনী আসামীকে পুলিস আদালতে তুলেছে,

তার জবাবদিহিও পুলিসকে অবশ্যই করতে হবে। সংবাদে প্রকাশ, বহরমপুর এলাকায় গত ৪।৫ মাসে জনা বারো খুন হয়েছে এবং পুলিস সে খুনের ফয়সলা করতে পারে নি এবং এই পুলিসী অকর্মণ্যতার ফলেই সমাজ দুর্বৃত্তদের সাহস বেড়ে গেছে। জন সাধারণের এই অভিযোগ কি অমূলক? সর্বত্রই পুলিস প্রশাসনের একই অবস্থা এবং মানুষের অভিযোগ ঐ একই। তবুও পুলিস মন্ত্রীর মুখ থেকে অহরহ শুনতে হবে এ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা উত্তম।

হত্যার ঘটনা অন্যরাজ্যেও আছে, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহারে। তবে সে সব হত্যার অধিকাংশই অ-রাজনৈতিক। সাধারণ খুন ও রাজনৈতিক কারণে খুনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। সাধারণ খুনী যখন অপরাধ করে তখন সে জানে সে অপরাধ করছে এবং তা করছে কোন না কোন ভাবে স্বীয় আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে। ধরা পড়লে সাধারণের দৃষ্টিতে নিন্দিত 'খুনী' অপবাদ ছাড়া আর কিছু সে পায় না, অধিকন্তু দণ্ডভোগ আছে, মৃত্যু-দণ্ডও অসম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে নরহত্যা করে অনেক ক্ষেত্রেই সে ভাবে, সে অপরাধ করছে না, সে একটি কঠিন কর্তব্য করল। দলের বাহবা পায় সে এবং ধরা পড়লে সে দণ্ড থেকে অব্যাহতিও পায়। এমন কি দণ্ডিত হলেও ছাড়া পায়। বর্ধমানের সাঁইবাড়ির হত্যাকাণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীর মুক্তিলাভ একটি বিরল দৃষ্টান্ত নয়, এমন দৃষ্টান্ত শত শত আছে। ভারতীয় দণ্ডবিধিতে কিন্তু সকল রকমের খুনই একই পর্যায়ে বিচারযোগ্য অপরাধ। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক কারণের অজুহাত তুলে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত অথবা দণ্ডিত ব্যক্তিদের বেকসুর খালাস দিয়ে একদিকে যেমন অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়েছেন, অন্যদিকে পুলিসের মনোবলও ভেঙ্গে দিয়েছেন। দলের স্বার্থে পুলিসকে নিষ্ক্রিয় করা অথবা কাজে লাগানোর পরিণাম হল পুলিসের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা। ইসলামপুর, বহরমপুর প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইতালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইংলণ্ড প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টি আছে, তারাও গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রাম করছে, কিন্তু তারা কি সেখানে সশস্ত্র সংঘর্ষ, হত্যা, লুট তরাজ, গৃহদাহ ইত্যাদি বর্বর কাজে নামে, না শ্রমিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক, অথবা চাষীর বিরুদ্ধে চাষী লেলিয়ে দিয়ে দলের শক্তি বাড়াতে তৎপর হয়?

সম্প্রতি পোলাণ্ডে ধর্মঘটী শ্রমিকদের শায়েস্তা করতে সামরিক আইন জারী হয়েছে, সৈন্য বাহিনীর গুলীতে বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে ৭৫০০০ ব্যক্তি। অবস্থা আয়ত্তে আনতে পোলাণ্ডের কমিউনিস্ট সরকারের সাহায্যে সোভিয়েত রাশিয়া বহু বিমান পাঠিয়েছে। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হয়ে পোল-সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে। ভারত পরের ব্যাপারে অযাচিত ভাবে নাক গলাতে চায় না, চায় সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান। কিন্তু সংসদে কমিউনিস্ট সদস্যগণ আগে ভাগেই পোল্যাণ্ডের শ্রমিক দমনমূলক সামরিক আইন-জারীকে স্বাগত জানিয়েছেন। মজার কথা হল, পোলাণ্ডে যা তারা সমর্থন করছেন, স্বদেশে তার বিন্দুমাত্র 'এসমোর' বিরুদ্ধে মহা গোরগোল তুলছেন। এই হল ভারতের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক চরিত্র ও স্বাদেশিকতার নমুনা!

এবার ১৯৬৯ সনে ফিরে আসা যাক। গান্ধী-পন্থী মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু ৩রা নভেম্বর বাঁকুড়ায়

অনুষ্ঠিত বাংলা কংগ্রেস সম্মেলনে শরিকী হানাহানি বন্ধ করে, যে যক্তিন দফা কর্মসূচী রূপায়ণের প্রতি-শ্রুতি দিয়ে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল তা পূরণের জন্য ফ্রন্টের শরিক দলগুলির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

গান্ধীজী বলেছেন, অহিংসার সর্বপ্রথম শিক্ষা হল বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি ভদ্র আচরণ করা। গণতন্ত্রও সেই কথা বলে। মুখ্যমন্ত্রী গান্ধীজীর নির্দেশ মেনেই চললেন। অবশ্য ফল তাতে কিছুই হল না।

৫ই নভেম্বর কোচবিহার জেলার সিঙ্গিমারিতে সশস্ত্র সি, পি, এম সমর্থকদের আক্রমণে সভায় যাবার পথে একজন ফ: ব: কর্মী নিহত এবং পাঁচজন আহত হন।

জনসংঘ সভাপতি অটল বিহারী বাজপেয়ী জগদ্দলের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলেন যে প: ব: সরকারের বিভাগীয় তদন্তে কোন ফল হবে না।

ডুয়ার্সের ক্রান্তিরহাট এলাকায় সি, পি, এম ও আর, এস পি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হলে কয়েকজন আহত হন। পুলিস ছয় জন আর-এস পি সমর্থককে গ্রেপ্তার করে।

ধূপগুড়ি এলাকায় সি-পি-এম ও এস, এস, পি জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হয়। বার গোরিয়া গ্রামে সি, পি, এম পন্থীরা এস এস পি সমর্থকের বাড়িতে আগুন লাগায়।

ঐ একই তারিখে বাসন্তী থানা এলাকায় সি-পি-এম এবং আর এস পি সংঘর্ষে, ভুবনমোহন বেনে (আর, এস, পি) নিহত হন, বহু বাড়িঘরে লুট তরাজ চলে এবং ছয়টি বাড়ি পোড়ে।

৪ঠা নভেম্বর বহু সংখ্যক সি, পি, এম সমর্থক বন্দুক, তরবারি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আর, এস, পি প্রভাবিত তালডা গ্রামে হানা দিয়ে লুটপাট চালায়। আর, এস, পি নেতা ভূধর হালদারের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

আক্রমণকারীরা চলে গেলে, বদলা নিতে আর, এস, পি জনতা সি, পি, এম অধ্যুষিত আমজোড়া গ্রাম আক্রমণ করে, পঞ্চায়েত অফিস, ম্যালেরিয়া নিবারণ কেন্দ্র ও রেশন দোকান সমেত অনেকগুলি বাড়িতে আগুন লাগায়।

ধান কাটা নিয়ে আর, এস, পি এবং সি, পি এম সমর্থকদের মধ্যে এ সময় রোজই দু একটা সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আর, এস, পি জনতা ক্যানিং-এর এক সি, পি, এম সমর্থক বড় কৃষকের বাড়িতে আগুন লাগায়। ৮ বছরের একটি বালক আগুনে পুড়ে মারা যায়।

ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা অঞ্চলে কৃষক ও ভাগচাষী সংগঠন ছিল এতদিন আর, এস, পি-র দখলে। গোসাবার হ্যামিলটন এস্টেটের ভাগচাষীদের আর, এস, পি সংগঠিত করে বছরের পর বছর লড়াই চালিয়েছিল। এই লড়াইতে বিব্রত হয়ে এস্টেটের মালিক হ্যামিলটন ট্রাস্ট ১৯৭৪ সালে ৫৫ হাজার বিঘা খাস জমি সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সরকার যার মালিকানা ভাগচাষী-দের মধ্যে বিতরণ করেন। আর, এস পি-র এই দুর্ভেদ্য দুর্গে যুক্তফ্রন্ট আমলে সি. পি. এম অনুপ্রবেশ করায়, উভয় দলের মধ্যে জোর সংঘর্ষ বেধে যায়।

উভয় দলই নিজেদের খাঁটি মার্কসবাদী বলে দাবি করে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে কিন্তু এদের মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা পড়েনা। কখনো তারা চাষী পক্ষে কখনো মালিক পক্ষের হয়ে হানাহানি নেতে নামে।

হরিখুড়ো কাজিসাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন এ কেমন ব্যাপার। কাজি জবাব দেন, আরে বাবা, 'যো বৃন্দাবনমে গৌ চরায়া, ওহি আরব দেশমে বকরি চরায়া। এই সা মাফিক ডিফারেন্স হ্যায়।'

সি-পি-এম এর সশস্ত্র হামলা বাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে, শিয়ারসোল কোলিয়ারির ১৫০০ শ্রমিক ৪ঠা নভেম্বর থেকে কাজ বন্ধ করে দেন। সি পি আই নেতা কল্যাণ রায় এ সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৭ই নভেম্বর বর্ধমানে সি. পি এম সমর্থকরা চাষী সংঘের মিছিল আক্রমণ করে। তিন জন আহত হন। পুলিস যাতে অবিলম্বে এ ব্যাপারে সক্রিয় হয় তার দাবি করে মিছিলকারীরা জেলা শাসকের অফিসে বিক্ষোভ জানায়, পুলিস বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠি চার্জ করলে ১৭ জন আহত হন।

৮ই নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা গ্রামে লোকসেবক ট্রাস্টের ৫০ বিঘা কৃষিভূমি সি, পি, আই সমর্থকরা জোর দখল করে। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ এই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। অহিংস প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়।

৯ই নভেম্বর হরিণঘাটার নিকট বিরোহী গ্রামে সি, পি, এম-এর লোকেরা সি, পি, আই কর্মী প্রমোদ রায়কে মারধোর করে এবং তার বাড়ির জিনিষপত্র তছনছ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু-দলের সমর্থকদের মধ্যে লড়াই বেধে যায়। পুলিস গুলি চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে।

১১ই নভেম্বর হাসনাবাদ থানার ভবানীপুরে জোর করে ধান কাটতে গিয়ে সি, পি, আই সমর্থকদের হাতে একজন সি. পি. এম সমর্থক নিহত ও ৪ জন আহত হন।

১৪ই নভেম্বর কলিকাতার হরিশ মুখার্জি রোডে সি, পি, এম সমর্থকদের দ্বারা একজন ফঃ বঃ (এম) কর্মী ছুরিকাহত হন। তাকে আশংকাজনক অবস্থায় শম্ভুনাথ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১৫ই নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার পঙ্কমী গ্রামে জোর করে ফসল কাটার ব্যাপারে সি. পি, আই অনুগামীদের হাতে দুজন সি, পি, এম সমর্থক আহত হন।

১৮ই নভেম্বর ২৪ পরগণা জেলার পালের চক পল্লীতে সি. পি. এম এবং এস ইউ সি জনতার মধ্যে সংঘর্ষে একজন এস. ইউ. সি সমর্থক খুন এবং দুজন সাংঘাতিকভাবে আহত হন।

ঐ দিন লক্ষ্মীকান্তপুরে এস. ইউ. সি ও সি, পি, এম জনতার মধ্যে আর একটি বড় রকমের সংঘর্ষ হয়। হানাহানিতে বন্দুক বর্শা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। আহত হন ৬০ জন। এস, ইউ, সি, সমর্থক বীরেন মণ্ডলের একটা চোখ নষ্ট হয়।

সংঘর্ষগুলির বিবরণ থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে ধরা যায় যে, সংঘর্ষগুলি মূলতঃ মার্কসবাদী দলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং প্রতিটি সংঘর্ষের সহিত সি. পি. এম জড়িত। এক হিসাবে বলা যায়, যুক্তফ্রন্টের শাসন ছিল অপর বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিপত্তি নষ্ট করে, বামফ্রন্টে সি, পি, এম-এর আধিপত্য লাভের সংগ্রামকাল। পুলিস বিভাগ হাতে রেখে সি, পি, এম যে এই সংগ্রামে অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের মার্কসবাদী অপর শরিকদলগুলির সি. পি, এম-এর উপর নির্ভরশীলতা তার প্রমাণ।

সি, পি. এম-এর লেজুড় না হয়ে এই বামপন্থী দলগুলির স্বাধীনভাবে চলার শক্তি নেই বললেই

চলে। কিছু ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রশ্ন ছাড়া মার্কসবাদী ক্ষুদে দলগুলির পৃথক অস্তিত্বের কোন সঙ্গত কারণও দেখা যায় না। কংগ্রেস (ই)-র সহিত অ কমিউনিষ্ট জাতীয়তাবাদী দলগুলির সমঝোতার অভাবের পিছনেও এই ব্যক্তি নেতৃত্বের প্রশ্ন বিদ্যমান। এই সমঝোতার অভাব পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম এর প্রভাব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

ভাগ্যিস কার্ল মার্কস বেঁচে নেই, নতুবা তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের শ্রেণী সংগ্রামের অভিনব চেহারা দেখে এবং তাঁর মতবাদের ভাষ্য বিশ্লেষণ পাঠ করে, তিনি হত চকিত হতেন এবং ক্ষোভে দুঃখে নির্ঘাৎ নিজের দীর্ঘ শ্মশ্রু উৎপাটন করতেন।

কমরেড প্রবর এস, এ, ডাঙ্গের জামাতা তি, এস, দেশপাণ্ডে ২৫ বছর কমিউনিষ্ট পার্টিতে ছিলেন। মার্কসবাদ নিয়ে তিনি অনেক পড়াশুনা করেছেন। মার্কসবাদের কথিত রূপ তাঁকে নিরাশ করে এবং মার্কসবাদ সম্পর্কে তিনি মোহমুক্ত হন। শ্রীদেশপাণ্ডে শেষে উপনিষদের বাণীর মধ্যে সকল বিশ্ব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান এবং 'বেদান্তের বিশ্ব' নামে একখানা গবেষণামূলক বই লেখেন। এই বইখানির জন্য তাঁকে কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়তে হয়।

সব কমিউনিষ্ট দলের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। সোভিয়েত রাশিয়া স্বীকার করে, তারা এখনো সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। চীন তো এখনো—প্রাইমারী স্টেজে। দিগন্ত রেখার মত লক্ষ্য ক্রমেই দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ভারতের কমিউনিষ্টরা সে তথ্য জেনেও, মুখ খুলতে চান না।

এ সম্পর্কে নেতাজীর অভিমত স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, 'Socialism in India did not derive its birth from the books of Karl Marx but from Swami Vivekananda's Gospel for the uplift of the poor or দরিদ্র নারায়ণ।'

'মানুষ নিজের সমাজের চেয়ে বড়, ধর্মের চেয়ে বড়, দেশের চেয়ে বড়। মানুষকে ছোট করে, খর্ব করে, পঙ্গু করে সমাজ বা রাষ্ট্র কোনদিন বড় হয় নি, হবেও না। অপরের গলায় পা না দিলে যদি নিজের শক্তি অনুভব করতে না পারা যায়, তাহলে বুঝতে হবে তার পতনের আর বড় বিলম্ব নেই।' ইতিহাসে এমন বহু উদ্ধত শক্তির প্রত্যাখ্যান ও বিনাশের তথ্য আছে। মার্কসবাদীরা সে কথা কখনো কি ভাবেন ?

২০শে নভেম্বর পাটমোহনা কোলিয়ারীতে সি, পি, এম সমর্থকদের বোমা ও বন্দুকের গুলীতে ১০ জন শ্রমিক আহত হন।

২১শে নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার ভাদুতালা গ্রামে সি পি আই এবং সি পি এম সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে পাঁচ জন জখম হন। ঝাড়গ্রামেও উভয় দলের মধ্যে আর একটি সংঘর্ষ হয়।

২৪শে নভেম্বর দুর্গাপুরের নিকট সি পি এম এবং কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে এক বড় সংঘর্ষ বাধে। ৮ জন সি পি এম সমর্থক আহত হন।

ক্যানিং-এর নিকট রোদখালি গ্রামে সি পি এম ও এস ইউ সি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ৮ ব্যক্তি আহত হন।

আসানসোলে শরিকী সংঘর্ষ চলাকালে ইস্টচোরা কয়লা খনিতে এস এস পি সমর্থক রামপ্রসাদ আহির বর্শাবিদ্ধ হয়ে খুন হন।

"Remember Heaven has an
avenging rod
To smite the poor is Treason
against God."
—Cowper.

হ য ব র ল

মলয় ঘোষ

এক যে আছে মজার দেশ
সবরকমে ভালো,
দিনে সেথায় জল থাকেনা
রাত্তিরেতে আলো।
কাজ না ক'রেও পয়সা মেলে
আছেন 'গৌরী সেন',
'কাজ করাটাই অপরাধের'
—সরকারী বিধেন।
যখন-তখন মিটিং মিছিল
রাওাবাজী চলে,
উপর তলার নেই পরোয়া
গণ-তন্ত্রবলে।
মশা-মাছির মতোন মানুষ
খুন ক'রছে যারা,
মজার দেশের বিধান মতে
'সম্মানিত' তারা।
চুরি করার অঢেল সুযোগ
'নাকা' অনেক পান,
'বেওসায়ী'দের মুখে মুখে
রাজারই জয়গান।
ধবুচন্দ্র রাজার দেশে
গবুচন্দ্রের দল,
ভিক্ষায়ে প্রতিপালিত
—'ভাতা'-ই সম্বল।
গড্ডালিকার স্রোতে ভেসে
শুধুই জীবন-যাপন,
'অন্ধকারের রাজা'র দেশে
কেউ কারো নয় আপন ॥

॥ উত্তরবঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্মেলন ॥

নিজস্ব সংবাদদাতা

গত ২৩, ১০, ৮১ তারিখে আলিপুরদুয়ার মাকউলির উচ্চতর বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ স্বাধীনতাসংগ্রামী সংগঠনের সম্পাদক শ্রীযতীশ দত্ত এবং প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানান উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসমীরেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তী। জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীযতীন মুখার্জী, শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী এবং তবলা সংগত করে সৌরভ চক্রবর্তী, চিত্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কুচবিহার জেলা শাখার সাধার সম্পাদক শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রমিকনেতা ফটিক চক্রবর্তী ও আরো অনেকে সভায়, ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধীতা করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যসরকার কর্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্য রাজ্যের মতো ভাতা না দেওয়ায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে নূতন কমিটিও গঠিত হয়।

সর্বশ্রী প্রফুল্ল ভৌমিক (সভাপতি), মুর্ছেদু ঘোষ ও গোবিন্দ দে (সহ-সভাপতি), যতীশ দত্ত (সাধারণ সম্পাদক), ধীরেন ঘোষ ও শিশির ঘোষ (যুগ্ম-সম্পাদক) সদস্যগণ—মাণিক চক্রবর্তী (জংশন) যতীন মুখার্জী, সুধীর সাহা চৌধুরী (কালসোটা থানা), সত্যরঞ্জন চ্যাটার্জী (কালচিনি থানা). বিনয় মজুমদার, চুনি দে ও দেবেন দাস (কুমার গ্রাম থানা), যতীশ সরকার (বীরপাড়া)।

উক্ত কমিটি আরো ৫ জন সদস্য গ্রহণ করতে পারবেন। সম্মেলন শেষে প্রীতিভোজে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। উপস্থিতির সংখ্যা ৭০ জন।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
'বিপ্লবী বাংলা' সমীপেষু—

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনসানের দরখাস্তগুলির প্রতি পশ্চিম বাংলার বামপন্থী সরকার যে রূপ তাচ্ছিল্য দেখাইতেছেন তার বিরুদ্ধে আপনারা যে রূপ তীব্র ও জোরালো প্রতিবাদ জানাইয়াছেন তাহার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশাকরি যে স্বাধীনতা সংগ্রামী সংস্থাগুলি বর্ষায় ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিতেছে তাহারা পরস্পরের মধ্যে রেষারেষী ও কলহ একটু কম করিয়া, এইদিকে মনযোগ দেবেন যাতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনসান পাবার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি হয়। আশা করি তাঁহারা এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন এবং কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন ও সমবেত ভাবে সক্রিয় ও জোরদার আন্দোলন আরম্ভ করিবেন।

এক বছরের উপর হইতে চলিল দরখাস্তের ফাইলই পাওয়া যাইতেছে না। আগে এক বা দুই সপ্তাহের নোটিস দিলে ও তদ্বির করিলে ফাইল পাওয়া যেত বছর খানেক যাবৎ, ফাইল উধাও বিশেষ তদ্বির তাগাদারও ফাইল অমিল, ফাইল না পাইলে তাহার বিচার কিরূপে হইবে?

অজুহাত দেখানো হইত তিনটি।

১। ফাইলগুলি ঠিকমত নাম্বার করিয়া সাজান নাই
২। স্থানাভাব
৩। কর্মী সংখ্যা কম।

১) ১৯৭২ সাল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনসানের দরখাস্ত অনুমান ১ লক্ষ (১০০,০০০) হইবে। তাহার মধ্যে ৪০০০০ এর পেনসান মঞ্জুর হয়েছে। যা রিজেক্ট হয়েছে বা pending তাহার সংখ্যা ৬০,০০০। নূতন পর্য্যায়ে দরখাস্ত পড়েছে বা পড়ছে তাও অনুমান ৪০,০০০। যে গুলি মঞ্জুর হয়েছে তা নিয়ে বিশেষ সমস্যা নেই সমস্যা বাকি একলক্ষ দরখাস্ত লইয়া। আগে ঠিকমত দরখাস্ত সাজান না হয়ে থাকে কেন হয় নাই কার গাফিলতিতে হয় নাই?

সে প্রশ্ন এখন তুলিয়াও জিজ্ঞাসা করা যায়, গত ২ বছরে কেন হল না? একলক্ষ দরখাস্ত কারীর নাম alphabetically, numercally, districtwise সাজাতে কত সময় লাগে? গাফিলতী ছাড়া আর কোন জবাব আছে কি?

২) স্থানাভাব। Writers Building-এর দোতালায় একটী বড় ঘরে অফিস ছিল। প্রায় ৫০ জন অফিসার কেরাণী ও সহায়ক ওখানে বসতেন ও কাজ করতেন, ওপরে করিডরে ফাইল সাজান থাকিত। সব ফাইল একসাথে নামাইয়া নাম্বার দিতে সত্যই স্থানাভাব ছিল কিন্তু তাহার প্রয়োজন কি ছিল? একসাথে ১০০০ করিয়া ফাইল নামাইয়া তাহাতে numerical, alphabetical এবং districtwise number দিতে ১০ জন কেরাণী সহায়ক যথেষ্ট, এগুলি আবার rack এ সাজাইয়া রাখার পক্ষে একদিনেই হতে পারে। তা হলেও ১০০ working day তে এটা শেষ হয়ে যেত। তারপর কোন applicant এনে তার ফাইল বড় জোর দশ মিনিটে বের করে দেওয়া যেত। এই কাজের জন্য writers এ ছোট দু খানা অতিরিক্ত ঘর পাওয়া যেত না? আবার বলব গাফিলতী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা।

৩) লোকাভাব। এজন্য ৬ জন নূতন লোক নিযুক্ত করা হল কিন্তু তাদের জন্য ছ খানা চেয়ার পাওয়া গেল না যে তারা বসেন সুতরাং তাঁরা চেয়ারের অভাবে বসিয়া কাজ করিতে পারিতেন না ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও মাসে মাহিনা পেতেন। Writers Building এ ছ খানা চেয়ারের অভাব! যেখানে কয়েক হাজার চেয়ার আছে চেয়ারের অভাবে বেঞ্চ বা টুল ও দেওয়া যেত। এর চেয়ে হাস্যাস্পদ যুক্তি কি হতে পারে?

মাস ছয় আগে থেকে কোন কোন ফাইলের খোঁজ ১৫ মিনিটে এমন কি ২। ৩ মিনিটেও পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু বাকী সব ফাইল বেপাত্তা। (ক্রমশঃ)

শিবনাথ ব্যানার্জী

চিন্তা করে দেখুন

শিক্ষা ও বিজ্ঞানে অনন্যসাধারণ অগ্রগতি হ'লেও জাতীয় কারণে রাশিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অধিক সন্তানের জননীদের বিশেষ উৎসাহ দিচ্ছেন। কিন্তু শিল্প ও আর্থিক স্বাচ্ছল্যে প্লাবিত সুইডেন তাদের জনসংখ্যাকে ·৫ শতাংশ থেকে এক শতাংশে উন্নীত করার জন্য জননীদের স্বপ্ন-সম্ভব সুযোগ দিয়েও ব্যর্থ হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে বৎসরে হাজার হাজার দত্তক গ্রহণ ক'চ্ছেন, এমনকি প্রতিবন্ধীকেও। ভারত থেকেও কয়েক সহস্র দত্তক সন্তান কহির্ভারতে যায়, যায় সুইডেনেও। অবিশ্বাস্য হ'লেও একথা সত্য যে কোন কোন তৈল সমৃদ্ধ দেশে বিবাহের সময় ৪০/৫০/৬০ হাজার ডলার যৌতুক দিয়ে ও সম্পন্ন সম্প্রদায় পর্য্যাপ্ত সংখ্যক স্ত্রী পাচ্ছেন না বলেই ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে সুকৌশলে নারী সংগ্রহের চেষ্টা কচ্ছে। পক্ষান্তরে ভারতের বৈষম্যভিত্তিক বিচিত্র সামাজিক পরিবেশে কন্যাপক্ষের পণপ্রথা একটা অবাঞ্ছিত সমস্যার রূপ নিচ্ছে।

মনে রাখা ভাল যে ১৯৭৫ সালের বিশ্বব্যাঙ্কের র‍্যাটিলাস অনুযায়ী সোভিয়েৎ যুক্তরাজ্যের মাথা প্রতি গড় জি এন পি ছিল ২৫৫৩, সুইডেনের ক্ষেত্রে ৮১৫০, কুয়েইৎ-এ ১৫১৯২, সংযুক্ত আরবে ১৩৫৯৯ এবং ভারতে মাত্র ১৪১ আমেরিকান ডলার।

সমাজের সার্থক মঙ্গলের উদ্দেশে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান-ভিত্তিক নির্দ্দেশ মেনে নিয়ে নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিম্বা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনিই বিচার বিবেচনা করুন—বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা বিশিষ্ট বিব্রত ভারতের পক্ষে বাৎসরিক ২·৫ শতাংশ জন্মহার চলতে দেওয়া কি উচিত হবে? অপরের অনুকরণ আমাদের পক্ষে অন্যায়। বংশরক্ষা আবশ্যক সত্য, কিন্তু সীমাহীন বংশবৃদ্ধি ক্ষতিকর, সমাজের পক্ষে বিপদজনক।

জন বিস্ফোরণ কি কখনও গণকল্যাণকর হয়? আপনার পরিবারকে সীমার মধ্যে রাখুন এবং সম্ভাব্য বিপর্য্যয় এড়িয়ে চলুন!

একটি স্বপ্ন

রাজর্ষী মুখার্জী

(বয়স : ১০ বৎ.)

গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। অগ্নিযুগের রক্ত-রাঙা ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় দিন। শুরু হয়েছে বিখ্যাত অলিন্দ যুদ্ধ! আমি চোখের সামনে দেখছি এই যুদ্ধের তিন মহান বিপ্লবী বীর—বিনয় বোস, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত খোলা পিস্তল হাতে ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে রত।

একে একে যুদ্ধের রক্তাক্ত মুহূর্তগুলি আমি শ্বাস বন্ধ করে চোখের সামনে কেটে যেতে দেখছি। শেষ পর্যন্ত বিনয় ও দীনেশ আহত এবং বাদল মৃত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। ব্রিটীশ পুলিশ তাঁদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, বালিশের পাশে 'আমি সুভাষ বলছি' বইটি পড়ে আছে। গতরাত্রে এই বই থেকেই মা আমাকে সেই মহান বিপ্লবীদের কথা শুনিয়েছিলেন। চোখ ভরে জল এলো। দুহাত জড়ো করে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম।

BENOY SARKAR INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

(Regd. Under Act XXI of 1860)

Regd. Office Acharya J. C. Bose Road, Cal-14
(Near Entally Market)
21D, South End Park, Cal-29
(Near Golpark) Phone : 46-8605

N O T I C E

Observance of the 95th Birth Day of Late Prof. Benoy Kumar Sarkar.

Date/Place	Time
On Saturday the 26th December, 1981 at the Regd. Office of the Institute.	3-30 P, M.

2. Inaugural meeting of the centinary celebration of revolutionary leaders Late Dr. Bhupendra Nath Dutta Late Virendra Nath Chatta-Padhyay. Inauguration by Revolutionary freedom fighter Sri Jagadish Chatterjee.

Date/Place	Time
On Sunday the 27th December, 1981 at the Regd. Office of the Institute.	3-30 P. M.

Purnendu Sen
(Genl. Secretary)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

শেষ কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি আমার স্বাস্থ্য কি করে এত ভাল রেখেছি এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করেছি সে সম্পর্কে অনেক বন্ধু আমাকে কিছু লিখে রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। আমার বয়স এখন ৭৪-এর শেষের দিকে; কিন্তু এখনও আমি বেশ ভাল স্বাস্থ্যই উপভোগ করছি এবং মনের দিক থেকেও আমার তৎপরতা সাবলীলতা অক্ষুন্নই আছে। বন্ধুরা বলেছেন আমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখলে তা কাজে লাগবে।

আমি আমার সারা জীবন ধরে এই নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করে এসেছি যে আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে স্বাস্থ্য রক্ষা করে চলা। অন্য যা কিছু সব স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। দেহ যন্ত্রটি যাতে তার কাজ সঠিক ভাবে করতে পারে সে জন্য তাকে সর্বক্ষণ সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখা দরকার। আমাদের দেশের সেরা পুরুষগণ অল্প কয়েকজন বাদে প্রায় সকলেই অপেক্ষাকৃত কম বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন, কৃষ্ণ দাস পাল, রাম গোপাল ঘোষ এবং আরও অনেকে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁদের অকাল মৃত্যু সেই প্রাচীন ল্যাটীন প্রবচনকেই দৃষ্টান্ত রূপে ধরে রেখেছে "ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন তারা অল্প বয়সেই জগৎ ছেড়ে চলে যান।" তারা দীর্ঘ দিন বেঁচে থেকে তাদের পরিণত বয়সের পরিপক্ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তাদের দেশ বাসীকে পরিচালিত করলে দেশবাসীরা কতই না উপকৃত হত।

আমার মতে স্বাস্থ্য ভাল রাখার প্রথম এবং অপরিহার্য সর্ত হচ্ছে নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করা। এই ব্যায়াম হবে পরিমিত, নীতি প্রধান, এবং ব্যায়াম করে মনে হর্ষের ভাব দেখা দিলেই তা পরিত্যাগ করতে হবে। অতিরিক্ত ব্যায়াম পরিহার করতে হবে, নতুবা তা ক্ষতি করবে। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে পেশী সমূহের মধ্যে যে স্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয় দৈহিক গঠন-প্রকৃতি তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সারা জীবন ধরে এবং এখনও আমি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে আধঘণ্টা এবং বিকেলে চা খাওয়ার পরে চল্লিশ মিনিট ব্যায়াম করি। বিকেলের ব্যায়াম অনেক সময় সভা-সমিতি বা বৈঠকী আলোচনার জন্য করে উঠতে পারিনে। তবে সে ক্ষেত্রে রাত্রের খাওয়ার আগে তা করতে ভুলিনে। আমার মতে পায়ে হাঁটা সব চেয়ে ভাল ব্যায়াম। এর সঙ্গে আমি যৌবনে ডাম্বেল ও মুগুর নিয়েও ব্যায়াম করতাম। প্রাতে খালি পেটে ব্যায়াম করাটা ভারতীয় প্রথা। মিস্ হ্যারিয়েট মারটিনিউও এই প্রথা অনুমোদন করেছেন। এই ব্যায়ামের সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন ও একান্ত আবশ্যক। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে আমাদের দেশের লোক সব সময় এ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে না। তাদের খাওয়ার ও নিদ্রার সময়টি নিয়মে বাঁধা নয়। তারা বুঝতে চান না যে শরীরটা একটা যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্রের মতই সুশৃঙ্খল ভাবে ও স্বচ্ছন্দে সে কাজ করে। তাকে দিয়ে স্বচ্ছন্দে কাজ

করাতে হলে তার প্রয়োজন, তার নিয়মের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

জীবনে আমার একটি মূলমন্ত্র আছে—যতদূর সম্ভব সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ও ডিনারে যোগদান না করা। 'শীঘ্র শীঘ্র শয্যাগ্রহণ শীঘ্র শীঘ্র গাত্রোত্থান'—কথাটি একটি সারগর্ভ উপদেশ। আমার বালক বয়সেই আমি টডের 'ষ্টুডেন্টস গাইড' পুস্তকে কথাটি পাঠ করেছি এবং এই উপদেশটি পালন করতে চেষ্টা করেছি। এমন কি গভর্ণমেণ্টের মেম্বার হিসাবে যখন আমাকে কোন সরকারী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হত তখনও আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করেছি। একবার লণ্ডনে লর্ড ষ্টাথকোনা সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদের এক ডিনার দেন। আমি সে প্রতিনিধিগণের মধ্যে একজন ছিলাম। বেষ্ট মাত্র ডিনার শেষ হবে টোষ্টের পালা শুরু হল, আমি চুপে চুপে সেখান থেকে চলে এলাম। ভাগ্যক্রমে আমি যেখানে বসেছিলাম তার কাছেই একটা দরজা খোলা রাখা হয়েছিল শুধু হাওয়া খেলবার জন্য। ডিনার আরম্ভ হওয়ার আগেই আমি তা লক্ষ্য করেছিলাম, এবং যেই মাত্র ডিনার শেষ হল আমি তাড়াতাড়ি করে চুপে চুপে সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। কেউ আমাকে দেখতে পেয়েছেন কিনা, জানিনা। তবে আমি রাত এগারটার মধ্যে আরামে শয্যা গ্রহণ করতে পেরেছি।

আর একটি ঘটনা। রাউলাট বিল নিয়ে ইম্পেরিয়াল কাউন্সিলের মিটিং হচ্ছে। ডিনারের সময় লর্ড চেমসফোর্ড সাময়িকভাবে সভার কাজ স্থগিত দেড় ঘণ্টার মধ্যে মেম্বারদের সকলকে পুণরায় আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে নির্দেশ দেন। যেইমাত্র লর্ড চেমসফোর্ড একথা ঘোষণা করলেন, আমি বললাম, 'হুজুর, আমার রাত নটায় শয্যা গ্রহণের অভ্যাস।' স্বভাবসিদ্ধ ঘোস মেজাজী লর্ড চেমসফোর্ড সদিচ্ছার সহিত বললেন, আচ্ছা, মিঃ বানার্জি, তোমাকে রেহাই দেওয়া গেল।' পরের দিন যখন দিন যখন আমরা পুনরায় মিলিত হলাম তখন জানতে পারলাম না যে সেই রাত্রে অন্য যারা আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভোট দেওয়ার জন্য ঘুম থেকে ডেকে তুলতে হয়েছিল। সকাল সকাল শয্যাগ্রহণে আমার এই অসংশোধনীয় অভ্যাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। এটা ১৮৯৭ সালের ঘটনা। গোখেল এবং আমি ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তখন লণ্ডনে ছিলাম। ডুকিলেন থিয়েটারে স্যার হেনরি আরভিং নেপোলিয়ানের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। গোখেল এবং আমি তখন হোটেল ভিক্টোরিয়ায় থাকতাম। আমাদের হোটেল থিয়েটারের বাড়ীর কাছেই ছিল। গোখেল হেনরি আরভিংয়ের 'নেপোলিয়ান' দেখার প্রস্তাব করলেন। গোখেলকে বললাম, 'আমাকে যদি বাস্তবিকই থিয়েটারে নিতে চান, তাহলে আমাকে আমার বিছানা থেকে ডেকে তুলে নিতে হবে এবং রাত এগারটার মধ্যে আমাকে হোটেলে ফিরতে দিতে হবে।'

(চলবে)

Regd. No. N. 24911/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক চাঁদা ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক ঃ—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

C/30

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। সৌদাগাঁ সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বাঘার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৮০ ৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ১২। ভারতের বিপ্লবীদের [redacted] ইতিবৃত্ত—.৭৫, ১৩। দেশ বাঁধের ভোজবাজি (১)—১.০০ দেশ বাঁধের ভোজবাজি (২)—১.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। লাজপত হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ২৪ শে পৌষ ১৩৮৮ ৯ই জানুয়ারী ১৯৮২	১৪ সংখ্যা

॥ এই সংখ্যায় ॥

সম্পাদকীয় / দিন আগত ঐ
বামফ্রন্টের পোড়ামাটি নীতি ....
কাণ্ডারী তোল পাল ....
দুর্নীতি এ রাজ্যে তুঙ্গে ....
গণতন্ত্রের বিপদ
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা

CALCUTTA UNIVERSITY

নিজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু শিব আছে—তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব।

—নেতাজী

সম্পাদকীয়

দিন আগত ঐ

আগামী ১৯শে জানুয়ারী ভারতব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা, 'এসমো' আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। 'এসমো' আইন শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার হরণ করবে, এই তাদের বক্তব্য। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই আইনের কোন প্রয়োগ আজো পর্যন্ত হয়নি। অত্যাবশ্যক সংস্থাগুলিতে নিছক দাবী দাওয়ার জন্য যখন তখন সব অচল করে দেবে একদল বিপথগামী শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত মানুষ, তাই বিনা প্রতিবাদে সব অবস্থায় মেনে নিতে হবে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করে, এমন অদ্ভুত আবদার শুধু এই দেশের একদল তথাকথিত শ্রমিক নেতাদের পক্ষেই সাজে। এদের কোন ন্যায় নীতিবোধ নেই কোন উচ্চাদর্শ, দেশের ভাল মন্দ এদের বিবেচনার মধ্যে নেই। এরা শুধু চায় 'যেন তেন প্রকারেণ' অশান্তি সৃষ্টি করে, অত্যাবশ্যক সংস্থায় উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে, নিরীহ সরল একদল মানুষকে ভুকপের ভয় করে নিজের এবং দলগত ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করতে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে এই সব নেতার জীবনে কোনদিন শ্রমিকশ্রেণীর মানুষদের শেখায়নি যে দাবীর সঙ্গে কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি শুধু অর্থহীন হয়ে পড়ে না, জুলুমবাজীতে পরিণত হয়। এর ফলে দেশের স্বার্থ বিপন্ন, এ কথা ভুলেও কেউ বলেনি কোনদিন এই সব লোকদের। শ্রমিকদের সঠিক কল্যাণও সাধিত হয় না এর দ্বারা, বরং তাদেরও ক্ষতি হয় প্রচুর পরিমাণে। এইসব কাজকর্মের ফলে, এরা দেশের অন্যান্য অংশের মানুষদের থেকে শুধু বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়ে না, তাদের বিরূপতা অর্জন করতে বাধ্য হয়। জনসংখ্যার তুলনায় শ্রমিকদের সংখ্যা তো নগণ্য। অধিকাংশের স্বার্থ বিপন্ন করে, কেউ নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ সাধন করতে পারে, ইতিহাস আজো পর্যন্ত তার সাক্ষ্য বহন করে না। শ্রমিক নেতারা এদেশে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া আদায় করার জন্য অনেক কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছেন, অনেক ঘর্ম বায় করেছেন, অবশ্য বিনা পারিশ্রমিকে কিনা, এটা আজ আর গোপনীয় ব্যাপার নয়। যে কোন দেশের শ্রমিকরা নিজ নিজ দেশের মনুষ্য-সমাজভুক্ত তাদের শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখাটাই একমাত্র কর্তব্য হতে পারে না, বৃহত্তর অংশের স্বার্থ দেখাটাও তাদের অবশ্য করণীয়। দেশের মধ্যে যাতে একটা সুস্থির পরিবেশ বজায় থাকে, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে যাতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বলিষ্ঠ হয়, দেশের মানুষের সার্বিক মঙ্গল সাধনার কর্ম-যজ্ঞের তারা শরিক হন, এই দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতার যদি তাদের অভাব ঘটে, এবং দিনে দিনে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে, অন্যায় অসঙ্গত একদেশদর্শী আবদারে পরিণত হয়, তবে তাদের দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হতেই হবে। এ কথাও তাদের স্মরণে রাখতে হবে যে দেশ-দ্রোহীদের কোন ক্ষমা কোন দেশে থাকতে পারে না এবং এদেশেও থাকবে না। কাজেই বুঝবার সময়

এসেছে যে নিছক টাকা-পয়সার জন্য ধর্মঘট করে, অরাজকতা সৃষ্টি করে, তাদের পরিত্রাণ মিলবে না। বৈজ্ঞানিক সত্য বলে যে প্রত্যেক কাজের একটি সমান এবং ভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়া আছে। রাজনীতি ক্ষেত্রেও এটা সত্য। শ্রমিকদের আমরা অনুরোধ করব, মতলববাজ রাজনীতিবিদ্‌দের খপ্পরে পড়ে, দেশের মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না, দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত হবার কলঙ্ক থেকে মুক্ত থাকার জন্য সচেষ্ট হোন। অন্যথায় তাদের ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হবে কৃতকর্মের জন্য।

এবারকার যে বন্‌ধ ডাকা হয়েছে, বলা হচ্ছে সেটা তাদের ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য। ধর্মঘট তো নিষিদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে অত্যাবশ্যক সংস্থাগুলিতে। তাদের জবাব দিতে হবে সোজা সরল ভাষায়, তারা কি চান অত্যাবশ্যক সংস্থার কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে দেশকে তারা পঙ্গু করে দিতে চান? মৌলিক প্রশ্ন এইটিই। তাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না রাজনৈতিক মুনাফা শিকারীদের পাল্লায় পড়ে তারা দেশের প্রভূত ক্ষতি সাধন করছেন। বহু ধর্মঘট হয়েছে শুধু আর্থিক সুবিধা আদায়ের জন্য। কিন্তু তারা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে তারা অর্থ প্রাপ্তির পরেও, পুরাপুরি কর্তব্য পালন করেছেন? একথা কেউ বলবে না যে শ্রমিকশ্রেণীর উপর অত্যাচার, অবিচার হয়নি বা তাদের মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য কোন ন্যায্য দাবী নেই। অত্যাচার অবিচারকে নিশ্চয়ই প্রতিহত করতে হবে, ন্যায্য দাবীও আদায় করতে হবে। সেজন্য তাদের সংঘবদ্ধ সংগঠনও গড়ে তুলতে হবে। তবে ধান্দাবাজ রাজনীতিবিদ্‌দের শিকার হলে চলবে না। এরা তাদের নিজ নিজ দলের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য, শ্রমিক সংগঠনগুলিকে বহুধা বিভক্ত করেছে। ফলে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তাদের দাবী পূরণও হয় না বহুক্ষেত্রে। যারা ধর্মঘটের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে, লে-অফ প্রয়োগ করতে সাহায্য করে, দীর্ঘদিন কর্মহীন অবস্থায় থাকার যে আর্থিক দুর্দশা তাদের ভোগ করতে হয়, তার এক অনুপরিমাণ অংশও কি এই নেতাদের এবং দলগুলিকে ভোগ করতে হয়? সাধারণ মানুষও মনে করে এই টানাপোড়েনের মধ্যে, শ্রমিকদের চরম দুর্ভোগের যখন কোন মীমাংসা হয়, তখন শ্রমিকরা কিছুটা লাভবান হলে, এদের লাভটা হয় আরও বহুল পরিমাণে। দুর্গতি ভোগের কোন অংশ না নিয়ে, এদের লাভটা তো পুরাপুরিই হয়। শ্রমিক শ্রেণীর মানুষরা কি এখনও এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না?

একটি বন্‌ধে কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে, তার ফলে দেশের সব মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ পথ পরিত্যাগ না করলে, শুধু সরকারপক্ষই নয়, সারাদেশের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে যাবেই এটা না বুঝলে নিজেরাই সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাঁকডাকটাই এব্যাপারে মাত্রাহীন। সরকারপক্ষ বন্‌ধ ডাকেন, এমন নজির এই পশ্চিমবঙ্গেই শুধু পাওয়া যায়। এরা কোন হিত কথায় কান দেবে না তা আমরা জানি। শুধু বলতে চাই পশ্চিমবাংলায় বন্‌ধের কালোছায়া সর্বস্তরে ঘণীভূত হচ্ছে। কৃষিকর্ম, শিল্প সংস্থা, বিদ্যুৎ বিভাগ, আইন শৃঙ্খলা প্রায় প্রত্যেক অত্যাবশ্যক বিভাগ ও এমনিতেই বন্ধ হয়ে আসছে। বন্‌ধ ডাকতে হলে ও এদের প্রশাসনের বিরুদ্ধেই বন্‌ধ ডাকতে হয়।

একটি বক্তব্য রেখেই নিবন্ধ শেষ করব। তারা ঘনঘন 'বন্‌ধ' ডেকে দেশের ক্ষতি করছেন। দেশের মধ্যে আরো দল ও ভিন্নমতাবলম্বী মানুষ আছে। তাদের এই অপকর্মে বাধা দেবার অধিকার আছে। এই বিভিন্নমুখী দলগুলির কাজের ফলে পশ্চিমবাংলায় আবার দাঙ্গা হাঙ্গামা হবার আশঙ্কা ও অমূলক নয়। মানুষের জীবন নষ্ট হতে পারে। ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় ধন সম্পত্তিও বিনষ্ট হতে পারে। সেই অত্যন্ত অশুভ এবং অসমর্থনযোগ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করার সিংহভাগ দায়িত্ব বর্তাবে এখানকার প্রশাসনের ও তাদের সংশ্লিষ্ট দলগুলিরই। এ দুর্ঘটনা ঘট্‌লে' কৈফিয়ৎ তাদের দিতেই হবে ইতিহাসের পাতায়।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সব নেতারা 'এসমো'র আসন্ন প্রয়োগের ভূত দেখিয়ে আকাশফাটা চিৎকার করছে. তাদের মধ্যে প্রধান শ্রমিক দরদী বলে পরিচয় দেয় কমিউনিষ্ট নেতারা। কোন কমিউনিষ্ট দেশে কিন্তু ধর্মঘটের অধিকার স্বীকৃত নয়। ধর্মঘট করলে কিভাবে সায়েস্তা করা হয়, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলছে পোলাণ্ডে। শ্রমিকদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য সামরিক শাসন প্রবর্তিত সে দেশে। এ দেশে কমিউনিষ্ট-তোতাপাখীরা কিন্তু সেই অমানবিক অত্যাচারের নির্লজ্জ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছে। ধর্মঘট পোলাণ্ডে যা অন্য কোন কমিউনিষ্ট দেশে নিষিদ্ধ, চলতে দিতে হবে শুধু ভারতবর্ষে, এমন অদ্ভুত নীতির কথা কেউ শোনেও নি, দেখা ত দূরের কথা। এদেশের শ্রমিক এইসব নেতা ও দলগুলির সামঞ্জস্যহীন, অযৌক্তিক, দ্বিমুখী নীতির তাৎপর্য্য অনুভব করবেন এটা কি খুব দুরাশা?

যখন তখন 'বন্‌ধ' ডেকে ছিনিমিনি খেলার ফলে যে আগুন জলবার আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেটা ঘটলে গণ আদালতে এদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার 'দিন আগত ঐ'। একমাত্র বদ্ধ উন্মাদ ও প্রশাসক দলগুলি ব্যতীত সব শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করছেন। পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক আকাশে "ন্যায়ের দণ্ড আসিছে নামিয়া।" "সাবধান, ওরে সাবধান" এই আমাদের বক্তব্য।

———

: রাজনৈতিক পর্যালোচনা :

বামফ্রন্টের পোড়ামাটি নীতি রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনছে

— মলয় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার বর্তমানে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ ক'রে চলেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এই পোড়ামাটি নীতি অনুসারে পলায়মান সৈন্যের দল তাদের চলার পথে যা কিছু পড়ে সবকিছু তছনছ ক'রে দিয়ে যায় যাতে অনুসরণকারী শত্রুপক্ষ কোন রসদ না পায়। খাদ্য, জ্বালানী, আশ্রয় এমন কি বনের গাছপালা পর্যন্ত পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানের বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই একই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন।

ধরা যাক্ শিক্ষাক্ষেত্রের কথা। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং সঠিক শিক্ষানীতির মাধ্যমেই একমাত্র একটি জনপদকে সুসংস্কৃত ক'রে তোলা যায়। বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষাবিভাগ তাঁদের অদ্ভুত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে আগামী অন্ধকারকে নিশ্চিত করে ফেলেছেন। প্রাথমিক স্তরে ইংরাজীর বিলোপ ঘটিয়ে, দেশবরেণ্য মহাপুরুষদের পরিবর্তে দলগত নেতাদের বাণী ও জীবনী শিক্ষাক্রমের তালিকাভুক্ত ক'রে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দলগত কাউন্সিল তৈরী করে, মাধ্যমিকে বর্ষগত বিন্যাসের প্রকারান্তর ঘটিয়ে, সংক্ষিপ্ত মেডিক্যাল কোর্স চালু করার নামে কিছু আধুনিক 'হাতুড়ে' তৈরীর প্রয়াস চালিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা যে 'বিপ্লব' সাধন করেছেন, তার 'প্রতিবিপ্লব' হিসাবে এক দীর্ঘস্থায়ী নৈরাজ্য আগামী দিনগুলির জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে।

রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে এই অবস্থাটা সবচেয়ে ভয়াবহ। শিল্পোৎপাদন সংস্থাগুলিতে ব্যাপক দলবাজীর অনুপ্রবেশে বস্তুতঃপক্ষে রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। নতুন কলকারখানা স্থাপন দূরে থাক, প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলিও একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—অথবা তাদের উৎপাদন কমে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। এক অভূতপূর্ব শিল্পনীতির সাহায্যে তাঁরা শিল্পের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ বাধিয়ে দিচ্ছেন, যার কুফল আগামী দিনগুলিতে এই রাজ্যে অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। বিদ্যুত উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিতে সংকীর্ণ গোষ্ঠীপ্রাধান্য বজায় রাখার কুশ্রী প্রবণতার ফলে বিদ্যুতের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যাচ্ছে, স্বয়ং বিদ্যুতমন্ত্রী অথবা শিল্পমন্ত্রীরও এ বিষয়ে যেন কোন মাথাব্যথাই নেই। কোটি কোটি টাকা খরচ ক'রেও সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে এই সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে বিদ্যুতের অভাবে রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পক্ষেত্রে (যাঁদের জেনারেটর বসানোর সংগতি নেই) এবং কৃষিক্ষেত্রের এক বিরাট অংশে হাহাকার শুরু হয়ে গেছে। উৎপাদনের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়িত্ব না নিয়ে শুধুমাত্র দফায় দফায় দাবি দাওয়া পেশ ও তা' আদায়ের নামে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ক'রে বামফ্রন্টের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি শিল্পশ্রমিকের মধ্যে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ ক'রে চলেছেন, তার কুফল আগামী দীর্ঘদিন এই রাজ্যের মানুষকে ভোগ ক'রতে হবে।

পুলিশ ও প্রশাসনে দলীয় কর্মীদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে ব্যাপকভাবে। পুলিশের বহুদিনের পুরানো ও সর্ববৃহৎ ইউনিয়ন 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এ্যাসোসিয়েশন'কে কোণঠাসা করার জন্য পুলিশের

মধ্যে পাল্টা ইউনিয়ন গড়া হয়েছে, যাকে মদত দিয়েছেন স্বয়ং পুলিশমন্ত্রী। এই পাল্টা ইউনিয়নের সদস্যরা শাসকদলের জোরে সর্বত্র যথেচ্ছাচার ক'রে বেড়াচ্ছে—ইসলামপুর ও বহরমপুরের ঘটনা যার নারকীয় নজীর। সামান্য কনস্টেবলের হাতে জেলার এস পি কেও অপমানিত হতে হয়েছে; ডি আই জি র অর্ডার অমান্য ক'রে অতি সাধারণ পুলিশ কর্মচারীও দলীয় তকমা বুকে এঁটে সদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারের সদর দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংস্ আজ পার্টিবাজীর মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বামফ্রন্ট তথা সি পি এম অনুবর্তী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা আজ যে কোন মন্ত্রীকে পর্যন্ত তাঁর কর্তব্য সাধনে বাধা দিতে সাহস পেয়ে গেছে। তাঁদেরই কোন কোন সদস্য এমন কি এ কথাও বলে বেড়াচ্ছেন যে, এই সরকারকে আমরাই বসিয়েছি, ইচ্ছে করলেই একে ফেলে দিতে পারি।—এর গূঢ়ার্থ অতি সহজেই অনুমেয়। নানারকম কারণ দেখিয়ে বেছে বেছে বিরোধী ইউনিয়নের সদস্যদের সাসপেণ্ড, বদলী প্রভৃতি শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, বস্তুতঃ পুরো প্রশাসনটাই আজ চলছে কো-অর্ডিনেশনের সদস্য ও নেতৃস্থানীয়দের খোয়ালখুশী মতো। এরই নগ্নরূপ গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদ সভাপতি ও সদস্যদের কাজকর্মে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। স্বয়ং পঞ্চায়েতমন্ত্রী পঞ্চায়েতের দুর্নীতির বিচারে সেল তৈরীর প্রস্তাব দিয়ে এখন হালে পানি পাচ্ছেন না—তাঁকে সি পি এম রাজ্য কমিটির সম্পাদকের তীব্র সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। কলিকাতা পৌরসভার ছ'-হাজার ক্যাডারের একটি জঙ্গীবাহিনী তৈরী করা হচ্ছে যারা পৌরসভার অন্তর্গত রাস্তা ও মাঠ ময়দান খোলা রাখার অজুহাতে বিরোধী দলগুলির মিটিং মিছিল ও প্রতিবাদকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেবে। রাষ্ট্রীয় পরিবহন, মিল্ক ডেয়ারী, হলদিয়া শিল্পক্ষেত্র, হোমগার্ড ও সিভিল ডিফেন্স, ডি পি এল, সাঁওতালদি, ব্যাণ্ডেল থার্মাল পাওয়ার প্রভৃতি বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র, জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে স্কুল বোর্ড ও প্রাথমিক এমনকি পৌর বিদ্যালয় গুলির পরিচালনসমিতিও নির্লজ্জ দলবাজীর হাত থেকে রেহাই পায়নি। প্রেসশিল্পে উদ্দেশ্যমূলক ধর্মঘট ঘটিয়ে কোটি কোটি টাকার বার্ষিক অর্ডার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সিনেমাশিল্পের শ্রমিকদের হুলনায় ভুলিয়ে প্রকারান্তরে মালিক-দের খুশি করা হয়েছে। এই সরকার এবং তার মূল শক্তি সি পি এম দল রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রে এমনভাবে নিজেদের লোক বসিয়ে যাচ্ছেন যে ভবিষ্যতে যে কোন বিরোধীদল যদি সরকার গঠন করেন, তবে প্রতিমুহূর্তে তাঁদের ধ্বংসমুখী 'স্যাবো-তাজ'-এর সম্মুখীন হতে হবে।

বামফ্রন্টের এই পোড়ামাটি নীতির আর একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন যখন-তখন রাজ্যে 'বন্ধ' ডাকা। যে কোন ইস্যুতে এই বন্ধ ডেকে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই হুমকী দিতে চান যে, ক্ষমতা থেকে অপসারিত হলে (তা সে যতো গণতান্ত্রিক উপায়েই হোক না কেন) তাঁরা বন্ধের মাধ্যমে সমগ্র পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন ও অগ্র গতিকে একেবারে 'বন্ধ' করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখেন।

বেকারভাতা, কৃষকভাতা, বৃদ্ধ ও বিধবাভাতা ও এইরূপ অসংখ্য ভাতা-দান-গ্রান্টের মাধ্যমে রাজ্যসরকার রাজ্যের উন্নয়ন খাতের টাকা অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন। ঠিকাদারেরা কাজ করে টাকা পাচ্ছেন না, তাই নতুন কাজ সব বন্ধ। ব্রিজ বাঁধা

হলোনা, রাস্তা চওড়া করা গেলনা, 'কমিউনিটি ল্যাট্রিন' আধখানা হয়ে রইলো। টাকার অভাবে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকায় সরকারী ত্রাণ পৌঁছলোনা। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গরীব শিক্ষক মাসের পর মাস মাইনে পেলেন না।

অথচ সরকারী কর্মচারীদের মাইনে বাড়ানো হলো দফায় দফায় কৃষির উন্নয়ন টাকার অভাবে করা গেলনা, অথচ নতুন পরিচালকদের উৎসাহদানের নামে সস্তা শ্লোগান সর্বস্ব ফিল্ম তৈরীর পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালা হলো। বামফ্রন্ট সরকারের চার বর্ষ পূর্তি উৎসবকে কেন্দ্র করে শুধু পাবলিসিটি খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হল, দিল্লীতে বিরাট প্যাভেলিয়ান করে প্রদর্শিত হলো এই সরকারের সাফল্য (?)। অথচ নতুন বিনিয়োগের অভাবে, নতুন নতুন কলকারখানা না গড়ায়, রাজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান শিক্ষিত বেকারেরা বাঁচবার মতো যা হোক একটা কাজ পেলনা। রিজার্ভ ব্যাংক থেকে নেওয়া ওভারড্রাফটের পরিমাণ প্রায় ২৫০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে অথচ সঠিক শিল্পনীতির অভাবে, কৃষি প্রকল্পের অভাবে রাজ্যের শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি শতকরা একভাগও। এসবই সেই একই সুনির্দিষ্ট পোড়ামাটি নীতির অনুসরণে অতি সুপরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছে। আগামী কোন সময়ে অন্য কোন সরকার যদি ক্ষমতায় আসেন তাঁদের ঘাড়ে চাপানো থাকবে কোটি কোটি টাকা ঋণের বোঝা আর পাহাড় প্রমাণ সমস্যার গন্ধমাদন। রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁরা যখন প্রতিমুহূর্তে এই সব সমস্যা আর আর্থিক দৈন্যের সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করবেন, বিরোধীপক্ষে থেকে তখন আজকের এই বামফ্রন্ট তথা সি পি এম তাঁদের ছিদ্রান্বেষণ করবেন, তাঁদের সাফল্য ব্যর্থতার চুলচেরা বিচার করবেন। সেই 'মহান' উদ্দেশ্যেই এই পোড়ামাটি নীতি। রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে নাস্তনাবুদ করতে বামফ্রন্টের এই 'অপকৌশল' সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বনাশ করবে, জনসাধারণ এঁদের চিনে রাখুন।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী

বরিশাল জেলার গৈলা নিবাসী এবং কলিকাতার বিখ্যাত স্পোর্টিং গুডস্ ব্যবসায়ী দাশগুপ্ত ব্রাদার্সের অন্যতম অংশীদার, বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র দাশগুপ্ত গত ৩১শে ডিসেম্বর, তাঁর চম্পাহাটির বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। বিপ্লবী শহীদ দীনেশ মজুমদার ও সুশীল দাশগুপ্ত এবং বিপ্লবী শচীন্দ্রলাল করগুপ্তের আত্মগোপন করলে, শ্রীশবাবু তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। প্রয়াত বিপ্লবীর স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

কাণ্ডারী তোল পাল অনুকূল হাওয়ায়

—সাংবাদিক

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্র-ক্ষমতায় ফিরে আসার পর কংগ্রেস (ই)-র প্রভাব যথেষ্ট বেড়ে গেলেও প: ব: প্রদেশ কংগ্রেস (ই) তার সুযোগ নিয়ে নিজেকে সুগঠিত করতে পারেনি। এই ক্ষমাহীন ব্যর্থতার মূলে ক্ষমতালোলুপ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব প্রাক্তন দুই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গণিখান চৌধুরী এবং পাঁজাকে ভালভাবে কাজ করতে দেয়নি। বর্তমান সভাপতি আনন্দগোপাল মুখার্জি কাজে হাত দিতে না দিতেই গ্রুপবাজি শুরু হয়েছে। দলের পক্ষে এ অবস্থা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

আনন্দগোপাল স্বনামধন্য বড় একজন দেশনেতা না হলেও, তিনি সফল কর্মীনেতা, সংগঠন বুঝেন এবং তৃণমূল স্পর্শী রাজনীতিক। তাঁর উপর ভরসা রাখা চলে। তবে মনে রাখতে হবে,

সময়া বহিয়া যায়
অনুকূল হাওয়ায়।

অনুকূল হাওয়া বলছি এই কারণে যে, বামফ্রন্ট সরকারের অপ-শাসন এবং সামগ্রিক ব্যর্থতা রাজ্যের সর্বত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। জন-সাধারণ ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল এবং দেশে বর্তমানে ইন্দিরা নেতৃত্বের বিকল্প আছে বলে মনে করে না। প: ব: রাজ্যে এই জন্য হাজার হাজার যুবক ও ছাত্র নিঃস্বার্থ দেশ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেস(ই)-র পতাকাতলে কাজ করতে প্রস্তুত।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন এবং উকীল বার কাউনসিলের নির্বাচনগুলিতে কংগ্রেস-ই সমর্থকদের বিপুল জয় অনুকূল হাওয়ার আর একটি দৃষ্টান্ত। এই নির্বাচনগুলিতে যারা অংশ নিয়েছেন তারা রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত মানুষ এবং সেখানে রিগিং-এর প্রশ্ন ছিল না।

চার বছরের বামফ্রন্ট শাসনের ব্যর্থতার কথা যে শুধু অ-বাম জনসাধারণই বলছে তাই নয়, ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে বামফ্রন্টের শরিকদলগুলির মধ্য থেকেও। সম্প্রতি দলগুলির যে সব সভা-সমিতি বসছে সেখানে ব্যর্থতার জন্য নেতৃত্বকে দায়ি করে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে। সি, সি, এম রাজ্য কমিটির সভার বিবরণ :

'সদ্য সমাপ্ত সি, পি, এম রাজ্য কমিটির বৈঠকে দল-নেতৃত্ব তীব্রতম সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। সেখানে ব্যর্থতা ও বিচ্যুতির অভিযোগ তোলা হয়। অভিযোগ করা হয়েছে, সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দলের বহু নেতা নিজেদের আচরণের দ্বারা জনগণ ও সাধারণ কর্মীদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। তাদের অনেকের আত্মীয়-স্বজনের আচরণের মধ্যেও অনেকগুলি অ-মার্কসীয় জঘন্য দিক ফুটে উঠেছে। মার্কসবাদী কমিউনিষ্টরা স্বার্থত্যাগী জনগণের দুঃখের অংশীদার—বহুক্ষেত্রে নেতাদের আচার আচরণ দেখে সাধারণ মানুষ তা ভুলতে বসেছেন।' (আ: বা: প/১২.৮১)

কিছুদিন আগে ফ: ব: রাজ্য কমিটির সভায় বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার কথা একটি প্রস্তাবাকারে স্বীকার করা হয়েছে। আর, এস, পি-র অভিমতও যে ভিন্নতর এমন মনে করার কোন সেতু নেই। সি, পি, আই বামফ্রন্ট সমর্থক অর্থাৎ 'সঙ্গে এসেছি মাত্র এই পরিচয়।' ফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় সি, পি, আই নেই। সি, পি, আই এবং সি, পি, এম-এর মধ্যে মৌলিক মত পার্থক্যও আছে।

১৯৭৭ সালে মার্কসবাদী বামফ্রন্টের যে ভাবমূর্তি ছিল চার বছর রাজত্ব করার পর তার অনেকটাই উবে গেছে বামফ্রন্টের কেন্দ্রবিন্দু সি. পি. এম যে পাইয়ে দেবার রাজনীতির দ্বারা সহরে চাকুরে বাবুদের দলে পেয়েছে, ঠিক সেই একই পন্থায় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উপর আধিপত্য লাভ করেছে। পাইয়ে দেবার রাজনীতি সকলকে খুশী করতে পারেনি, অসন্তুষ্টের সংখ্যা সুবিধাভোগীর চেয়ে অনেক বেশি। পঞ্চায়েতগুলি দুর্নীতির আখড়া, তাই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ পঞ্চায়েত প্রধান ও সভ্যদের ভাল চোখে দেখে না। পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি জেলা সফর করে যে রিপোর্টটি দলের নিকট দিয়েছেন তার কিছুটা নিয়ে উদ্ধৃত করছি।

'পঞ্চায়েত মন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে, বহু পঞ্চায়েত এমন সব কাজ করছে যাতে বামফ্রন্ট সরকারের মুখে চুনকালি পড়ছে। অধিকাংশ পঞ্চায়েত কোন নির্দেশ মানছে না। তিনি নিজে এবং রাজস্বমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী বার বার পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দিয়েছেন, কোথায় কি কাজ হচ্ছে, কাদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তার তালিকা যেন প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই নির্দেশ মানা হচ্ছে না।

জেলা সফরের সময় তাঁর কাছে বহু লোক অভিযোগ করেছেন, পঞ্চায়েত কোন কাজ করছে না। প্রধানরা মিটিং ডাকছেন না। সরকারী টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগও আছে। অনেক জায়গায় বিরোধী দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের মিটিং-এ ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রধানদের অপসারণের দাবিতে গণ-দরখাস্তও পেশ করা হয়েছে।' আঃ বাঃ ৫।১২।৮১

এ থেকে গ্রামের অবস্থা বোঝা যেতে পারে।

সি, পি, এম জনগণকে বত্রিশ দফা কর্মসূচীর ভাঁওতা দিয়ে পুনরায় ভুলাতে পারবে না। সি, পি, এম কর্তৃক বৈপ্লবিক শোষণমুক্ত সমাজগড়ার কথাও কেউ এখন ভাবে না। দলের শক্তি এখন বেতনভুক ক্যাডার এবং নানাভাবে আর্থিক সুবিধা-ভোগী সমর্থকদের উপর নির্ভরশীল। সমর্থকদের মধ্যে যেমন আছে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বড় কৃষক, তেমনি আছে বড় চাকুরে, ডাক্তার শিক্ষক প্রভৃতি।

সি, পি, এম কোনদিনই জনগণের পার্টি ছিল না। পার্টি সদস্য, ক্যাডার, অ্যাকসান স্কোয়াড এবং সমর্থকপুষ্ট সি-পি-এমকে প্যারা-মিলিটারি দল বলা সঙ্গত। সরকার হাতে পেয়ে এই সংগঠনকে পার্টি নিঃসন্দেহে আরো মজবুত করেছে। সি-পি-এম জনসমর্থন আদায় করে সন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা। এ জাতীয় দল চালাতে প্রচুর অর্থের আবশ্যক, সি-পি-এম কি ভাবে এই অর্থ সংগ্রহ করে পার্টির উচুতলার দুচার জন নেতাই শুধু তা জানেন। বড় বড় বাড়ি, গাড়ির বহর এবং আসবাব পত্রের জৌলুস পার্টির ভাল আর্থিক সঙ্গতির পরিচয় বহন করে।

তবে এসব দিয়ে মানুষের মন ভোলানো যায় না। রাজ্য প্রশাসন বেশ কিছুদিন হাতছাড়া থাকলে, সি, পি, এম-এর পক্ষে সন্ত্রাস সৃষ্টির কৌশলও কমজোর হতে বাধ্য এবং রিগিং মেসিনের কার্যকারিতার দ্বারা নির্বাচন লড়াও সম্ভব হবে না। এগুলি সবই কংগ্রেস (ই) র সুবিধার কথা, তবে অসুবিধাও যে নেই এমন নয়। সি, পি, এম দল হিসাবে সুসংহত এবং নির্বাচনের কৌশল যন্ত্রগুলি তার হাতের মুঠোয়। শাসন ক্ষমতা সাময়িকভাবে হাতছাড়া হলেও, ভোটার তালিকা, ব্যালট ছাপা প্রিসাইডিং ও পোলিং কর্মচারী প্রভৃতির ক্ষেত্রে সি, পি, এম তার প্রচ্ছন্ন অনুবর্তীদের এমনভাবে

বসিয়েছে যে নিরপেক্ষ কাজ পাওয়া খুবই দুষ্কর। পুলিসের মধ্যেও সি, পি. এম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস (ই) কি শুধু আলগা জনসমর্থনকে মূলধন করে সি, পি. এম-কে নির্ব্বাচনে হারাতে পারবে? জন সমর্থনই নির্বাচন লড়াই-এ প্রধানতম এবং শেষ কথা হলেও সংগঠন জোরদার না হলে জনতার অভিলাষকে কি রূপ দেওয়া সম্ভব? দলে ঐক্য চাই, শৃঙ্খলা চাই বলে চিৎকার করলেই কিন্তু ঈপ্সিত ঐক্য মেলে না। ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ আসে কাজের মাধ্যমে। গত দু-বছরে প: ব: প্রদেশ কংগ্রেস (ই) কি দলের কর্মীদের সামনে রাজ্যব্যাপী একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার উপযোগী কোন প্রোগ্রাম রাখতে পেরেছেন? এই দীর্ঘ সময়ে একটি কি দুটি রাজ্য কর্মী সম্মেলন কি করা যেত না।

সি, পি. এম সরকারের সন্ত্রাস রাজত্বে গণ-আন্দোলন করা যে সহজ নয়, গত ৩০শে মার্চের কংগ্রেস (ই) সমাবেশ এবং পরবর্তী বাংলা বন্ধ তার মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত। তাই বলে চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে বাণী ও বিবৃতি দিয়ে কি সাফল্যের পথে সংগঠনকে চড়িয়ে দিতে হবে সহর থেকে শুরু করে ব্লক ও গ্রাম পর্যায়ে।

বিচারশীল জনসাধারণ যারা ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অভিযোগে মুখর, তাদের পিছনে কংগ্রেস (ই) কে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। দূর গ্রামেও যাতে তারা নিজেদের অসহায় ও বিপন্ন মনে না করেন তার জন্য নির্ভীক সেবাব্রতী কর্মীদল পাঠাতে হবে। সন্ত্রাসের মোকাবেলায় চাই শৃঙ্খলা ও সাহস। কাজ অনেক, সামনে সময় কম। তাই বলেছি, সময় বহিয়া যায়। আশা রাখি ভবিষ্যতে, সত্যের জয় হবেই।

'যুগের ধর্ম্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া
দেবে তোমাকেই।'

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

বগুড়া জেলা নিবাসী বিপ্লবী সুধীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিকাতার নিজ বাসভবনে দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর। সুধীন্দ্রবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং কারাবাস ও নির্যাতন বরণ করেছিলেন। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

দুর্নীতি এরাজ্যে তুঙ্গে বর্তমানে

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেসী শাসনকালে ভারতীয় কামুনিষ্টরা কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল চালাত ও মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে তিলকে তালে পরিণত করার জন্য সর্ব্বত্র সুকৌশলে অবিরাম প্রচেষ্টায় রত থাকত। যেন তেন প্রকারেণ কামুনিষ্টরা কংগ্রেসের কাজের খুঁত ধরতো ও নিজেদের সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত ধোয়া তুলসীপাতার মত পবিত্র জ্ঞান করতো এবং তা প্রচারের জন্য যথাসম্ভব মিথ্যার আশ্রয় নিত। ঐটাই ছিল ওদের একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার, আর ঐ হাতিয়ার দিয়েই ওরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সদা-সর্ব্বদা জনগণের মনে বিরাগ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিল এতকাল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দল ক্ষমতার আসনে বসেই কিন্তু ন্যায় অন্যায় বোধ বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল মাত্র দলীয় লোকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চালায় ও সে প্রচেষ্টাকে সফল করার উদ্দেশ্যেই তারা ছোট বড় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজ দলের লোকদের নানাভাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে।

পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে পৌর সভা, জেলা পরিষদ, আর, টি, এ (R T A) অর্থাৎ বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি প্রভৃতি যান বাহনের পারমিট দান কেন্দ্রও অনুরূপ ক্ষমতার প্রতিটি কেন্দ্রেই সি, পি, এম দলের নেতারা তাদের সদস্য ও কট্টর সমর্থক দেরই মাত্র ক্ষমতার শীর্ষ আসনে বসিয়ে এ রাজ্যে দুর্নীতিকে তুঙ্গে তুলে ধরেছেন দলীয় অর্থভাণ্ডার স্ফীত করার মহৎ উদ্দেশ্যে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু বলে যে একটা বহু প্রচলিত কথা আছে না, তাই হয়েছে বর্ত্তমানে। দলপতি প্রমোদবাবু দলীয় লোকদের দুর্নীতির সম্বন্ধে বহু সংবাদ রাখেন এবং এখন দলের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংখ্যার নামকরা কমুনিষ্ট কর্মী ও সদস্যরা যে উক্ত দুর্নীতির মূলে ও মাত্রাতিরিক্ত হারে তারা টাকা পয়সা যে দুহাতে লুঠের রাস্তায় প্রায় প্রকাশ্যে নেমে পড়েছে—একথা আজ আর কারো অজানা নয়। সংবাদপত্রে বহু নজির ও দৃষ্টান্ত প্রায়ই প্রকাশিত হচ্ছে। ধোয়া তুলসীপাতাও যে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ও চারিদিকে বিভৎস পুতিগন্ধের প্রশ্বাস আকাশ-বাতাস কলুষিত করছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। টাকা পয়সার বিশেষ করে, কাঁচা টাকা ও ঘুষের লেন-দেন বেশ প্রকাশ্যেই চলছে এবং এরাজ্যের জনগণের নাকের ডগায় পুলিসের নাকের ডগায় ও মন্ত্রীদের নাকের ডগায় তা জাঁকিয়ে চলছে, কারণ সি, পি, এম দল যে বর্ত্তমান রাজা এ রাজ্যের।

কাজেই সি, পি, এম দলের লোকরা তো সবাই রাজার জাত বা খুদে রাজা। তারা যা খুসী করবে, এটাই তো বড় মজাদার অধিকার তাদের। ঐ দলের সমর্থকরাও আজ জনগণকে শাসিয়ে চলে যেন এরাজ্যের দল নিরপেক্ষ মানুষ-জনেরা এখানকার নাগরিকই নয় বা নাগরিক হলেও তা দ্বিতীয় শ্রেণীর কি মর্মান্তিক দুঃখ ও বিড়ম্বনায় পড়েছে আজ অকমুনিস্টরা, তারা যেন এখানকার বাসিন্দাই নয়, ভিনদেশী। জুলুম, হত্যা ও অত্যাচার নিত্যদিনের ঘটনা, যার কোনরূপ প্রতিকার নেই। সি, পি, এম দলের লোকেরাই এরাজ্যে পুলিসকে নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য দলনেতাদের সাহায্য নিয়েছে। ফলে তারা যতকিছু অন্যায় ও দুর্নীতি করুক না কেন পুলিস

কিছু বলতে সাহসী হয়না মন্ত্রীদের রক্তচক্ষুর ভয়ে। এমন কি কোন হত্যাপরাধে ও বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কোন সি. পি. এম সদস্য বা সমর্থক বা সিটুর কর্মী বা কো অর্ডিনেশন কমিটির লোক বেশ বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়; আর পুলিস তা জানা সত্ত্বেও ঐ সব দুষ্কৃতকারীদের ধরতে চায়না নিজেরা মন্ত্রীদের হাতে নিগৃহীত হবার ভয়ে, তিরস্কৃত হবার ভয়ে অথবা অসময়ে দূর-দূরান্তরে জনমানব বর্জিত অজ পাড়াগাঁয়ে অকারণ বদলি হবার ভয়ে। এইরূপ আতঙ্কের মধ্যে এরাজ্যে বাসীকে বাস করতে হয়, কারণ পুলিস থেকেও নেই, রক্ষা করার নিতান্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বর্তমানে। কি শহরাঞ্চলে কি গ্রামাঞ্চলে কি ঘনি এলাকায় কি হাটে-বাজারে সর্বত্র সর্ব সময়েই এরাজ্যবাসী অকম্যুনিস্টদের প্রাণ হাতে নিয়ে চরম সন্ত্রাসের মধ্যে জীবন যাপনে বাধ্য হতে হয় নিদারুণ ভয়ে ভয়ে।

সি, পি, এম দলের লোকেদের হাজার প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস নেই কোন লোকের, যেহেতু মানুষের জীবন, ধন ও সম্পত্তি এ রাজ্যে নিরাপদ নয় পুলিসি নিষ্ক্রিয়তার দরুণ। অথচ প্রত্যেকেই প্রতিদিন স্বচোক্ষে দেখছে যে, সি, পি, এম দলের কট্টর সদস্যরা ও সমর্থকরা প্রতিনিয়তই সীমাহীন দুর্নীতির মধ্যে ডুবে আছে মাত্রাতিরিক্ত হারে ও মোটা পয়সা কামাচ্ছে বেপরোয়া ভাবে। ঘুষ, অপরাধের প্রমাণ লোপাট, বেআইনী কাজ কারবার, অথবা সরকারী কাজে বাধাদান. জাল পুলিসের ভূমিকা বা পুলিসকে ভয় দেখিয়ে গ্রেপ্তার এড়ান, পয়সার বিনিময়ে প্রকৃত দুষ্কৃতকারীকে পুলিসের কব্জা হতে উদ্ধার, ঘোরতর দুষ্কর্মের প্রশ্রয় দান অর্থপ্রাপ্তির লোভে নোংরা ও সমাজবিরোধী অপকর্মে সি পি, এম কর্মীদের প্রায়ই লিপ্ত বা জড়িত দেখা যায় কেন? সরকারীদলের হাতেই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনস্বার্থে প্রয়োগ না কোরে সি, পি, এম নেতারা, খুদে নেতারা ও কর্মিরা তা জনবিরোধী কাজে লাগিয়ে মোটা মোটা টাকা নিজে দের ঘরে তুলছে সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র, আর তা জনগণ প্রত্যক্ষ কোরে হতাশায় ও দারুণ ঘৃণায় মনে মনে সি. পি, এম দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছে।

সি, পি, এম কর্মীদের উক্ত বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা কোথাও কোথাও অপ্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থাকার ঘটনা ঐ দলের শীর্ষ নেতাদের ও জানা. তবুও ঐ নেতারা, দুর্নীতির ঘটনা কেউ প্রকাশ করে দিলে তার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন যে কেন তা বোঝা ভার। সম্প্রতি মন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জি যিনি পঞ্চায়েত বিভাগে ভার প্রাপ্ত তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, পঞ্চায়েতের কর্ম-কর্তারা দুর্নীতির মধ্যে ডুবে আছে এবং জেলা পরিষদের সমাধি পথ থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চা-য়েতের কর্তারা পর্যন্ত কেউ সরকারী টাকার হিসাব রাখেনি, যেহেতু তারা নিজেরাই বহু অর্থ আত্মসাৎ করেছে পঞ্চায়েত পরিচালনার ক্ষমতা হাতে পেয়ে। এ রাজ্যের অধিকাংশ পঞ্চায়েত বর্তমানে সি, পি, এম দলের কর্তৃত্বাধীন কাজেই পঞ্চায়েতের অপচয়িত সরকারী অর্থ বরবাদ করার জন্য সি, পি এম কর্মীরাই মূলতঃ দায়ী। পন্চায়েতে দুর্নীতি হচ্ছে যা পুকুরচুরির মত বিরাট ও ব্যাপক ঘটনা; তা কি প্রমোদবাবুরা জানেন না, কি জেনে শুনে কেবল দল বাড়াবার জন্য তাঁরা এই নীতি বিগর্হিত কাজের প্রশ্রয়দাতা ও পৃষ্টপোষক? তা যদি না হতো, তবে দেবব্রত বাবুর সত্য প্রকাশের পর প্রমোদবাবুর এত

উষ্মা ও বিরাগ কেন দেবব্রতবাবুর উপর? দেবব্রত বাবু আর এস, পি, দলের, তাই তিনি ঐরূপ মারাত্মক দুর্নীতির সমর্থক হতে পারেন নি, প্রমোদ বাবুর মত আপন দলস্বার্থে।

হঠাৎ শীর্ষনেতারা দেখেন যে, তাঁদের দলীয় গরীব কর্মীরা বেশ দিন দিন ধনী হয়ে উঠছে। তথ্য তাল্লাসে প্রকাশ পায় যে, অনেকেই দলীয় তহবিলে ঐ দুর্নীতিলব্ধ টাকা জমা না দিয়ে বা অতি অল্প পরিমাণ জমা দিয়ে বাকী সিংহভাগই নিজেদের ব্যক্তিগত তহবিলে অর্পণ করছে। শীর্ষ নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় এ ঘটনায় পরেই। ফলে তাঁরা দল থেকে বহু সদস্যকে হয় বিতাড়িত করেন আর না হয় সাসপেণ্ড করেন, তবে প্রকাশ করেন না যে দুর্নীতির জন্য বা অর্থ আত্মসাতের জন্য ঐরূপ শাস্তি বিধান করা হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, দল-বিরোধী কাজের জন্য ঐ সব শাস্তি বিধান করা হয়েছে। শীর্ষনেতারা কি জানেন না যে বাতাসেরও কান্ (কর্ণ) আছে, সে শুনতে পায়? হাওড়া জেলায় সি পি এম দলের বর্তমানে বহিস্কৃত সদস্যদের বহিস্কারের আসল কারণ কি মারাত্মক ধরণের দুর্নীতি নয়?

জেলা পরিষদের সভাধিপতির জন্য নির্দিষ্ট সরকারী গাড়ী হঠাৎ কেড়ে নেওয়া হলো কেন? তিনি কি শুধুই দল বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলেন বলে, না মোটা টাকা হাতিয়ে দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা সৃষ্টি করেছিলেন বলেই বর্তমানে তাঁর এই অবর্ণনীয় কঠিন দুর্দশা। সি বি আই দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সি পি এম কর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া রকমের তদন্তের ব্যবস্থা করবেন কি? তদন্ত ঠিক মত পরিচালিত ও দল নিরপেক্ষ হলে তবেই আসল ব্যাপার ধরা পড়বে এবং দেখা যাবে যে, দল বিরোধী কাজের জন্য নয়, আসলে সরকারী টাকা তছরুপের জন্যই উক্ত ব্যক্তিরা দল থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন বা বহিস্কৃত হবার পথে বর্তমানে সাসপেণ্ড হয়েছেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা চলতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত সত্য প্রকাশ পাবেই—এ কথা যেন চতুর দলপতি ও শীর্ষনেতারা মনে রাখেন। মিথ্যা কথনই যাদের দৈনন্দিন রাজনৈতিক কৌশল তাদের আর এ ব্যাপারে লাজলজ্জা কিসের? এ রাজ্যের জনগণ আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত বাজার প্রভৃতি নামী ও দামী কাগজের পাতায় নিত্য দিনই সি পি এম দলের চূড়ান্ত দুর্নীতির ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে বহু দিন ধরেই, কিন্তু সম্প্রতি দলীয় কাগজ ও দলের সমর্থক পক্ষের কাগজ গণশক্তি ও সত্যযুগ যে সব কথা 'হুঁকা আড়াল' দিয়ে প্রকাশ করেছে তাতেও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানবান পাঠক সহজেই বুঝতে পারবে যে, দুর্নীতির বহিঃপ্রকাশ এত মারাত্মক আকার ধারণ করেছে পশ্চিমবঙ্গে যে, প্রমোদ বাবুরাও মহা সংকটে পড়ে গেছেন তাঁদের কর্মীদের চারিত্রিক দুর্বলতা, বিশেষ করে অর্থলালসার বহর কি ভীষণ ও বিরাট এবং ব্যাপক দেখে।

সরকারী টাকা দলের তহবিলে ঢোকানও নীতিহীনতা, আর সেই নীতিহীনতার প্রশ্রয় দানই কর্মীদের চরিত্রভ্রষ্টের প্রধান কারণ হয়ে উঠলো ক্ষমতার সুযোগে। ক্ষমতাই মানুষকে দুর্নীতি পরায়ণ করে, আর নিরংকুশ ক্ষমতাই নিরংকুশ দুর্নীতির জন্মদাতা। 'Power currupts man & absolute power currupts absolutely' এ প্রবচন নিশ্চয় জ্যোতিবাবু ও প্রমোদ বাবুদের জানা ছিল, তথাপি দল পুষতে গিয়ে তাঁরা এত মারাত্মক ভুল করলেন যে, দলের সৎকর্মীরাও হঠাৎ ক্ষমতার শীর্ষে বসে দুর্নীতির হিম শীতল পঙ্কে নিমজ্জিত হলেন নেতৃত্বের চরম ভুলে। বহিস্কার ছাড়া গতি নাই এখন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

শেষ কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গোখেল বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে, আমি তাই করব।' আমি বিছানায় শুয়ে আছি, নটার সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনলাম, এবং নটা বাজার ঘণ্টা ধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোখেল এসে উপস্থিত। আমার পক্ষে আর তাঁর সঙ্গে না গিয়ে উপায় রইল না। উঠতেই হল এবং যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। গোখেল আমাকে থিয়েটারে নিয়ে গেলেন এবং আমার কাছেই বসলেন—আর আগ্রহের সহিত আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। আমার কাছে এটা একটা অল্পাধিক পরিমাণে নতুন অভিজ্ঞতা গোখলের কাছেও এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, তবে তা অন্যঅর্থে। গোখেলের কাছে অভিজ্ঞতার নতুনত্ব হল এই যানে যে তিনি দেখলেন যে আমার মত একগুঁয়ে পিউরিটান নীতিবাগীশ লোকও, যে থিয়েটার দেখা এড়িয়ে চলে, তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ইংরেজ অভিনেতার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। আমি যে অভিনয় দেখে পুরা মাত্রা আনন্দ লাভ করেছি গোখেলের কাছে এটা হল তার একটা ব্যক্তিগত জয়ের ব্যাপার। সে জয়ের আমিও অংশীদার এই জন্য যে আমি নাটক দেখে আনন্দ পেয়েছি। আমি কখনই বুঝতে পারিনি এবং আজও পর্যান্ত এটা আমার কাছে একটা প্রহেলিকার মত মনে হচ্ছে যে কী করে স্যার হেনরি আরভিং নিজেকে নেপোলিয়নের আকার আকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে ফেললেন।

আমার মনে হয় স্যার হেনরি আরভিং ছ ফুটেরও বেশী লম্বা ছিলেন। অপর পক্ষে নেপোলিয়ান ছিলেন বড়জোর পাঁচ ফুট চার, ইঞ্চি। সে যা হোক, মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন গোখেল, তিনি এগারটার মধ্যে আমাকে আমার হোটেলে ফিরিয়ে আনলেন।

সকাল সকাল শয্যা গ্রহণে আমার জীবনে বড় ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকার এটাই প্রধান কারণ। সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা সম্পর্কে আমি ততটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারিনে, বরং আমি সব সময়ই একটু দেরীতেই উঠেছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাধারণত আমি আট ঘণ্টা ঘুমোই। সময় সময় তা বেড়ে ন ঘণ্টা এমনকি দশ ঘণ্টায়ও দাঁড়ায়। ঘুম আমার কাছে একটা বড় আনন্দের ব্যাপার। এটা কমবেশী পরিমাণে আমাদের পরিবারেরই দান। যখন ঘুমোতে যাই মনের সমস্ত কবাট বন্ধ করে দেই যেন কোন দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা সেখানে প্রবেশ করতে না পারে এবং এটাই হচ্ছে গাঢ় নিদ্রার মূলে রহস্য। প্রথম প্রথম এ কাজে কিছুটা মানসিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। পরে তা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে আমি মনে করিনা। তবে মস্তিষ্ক চালনার বিষয় বস্তুটি মনের উপযোগী হওয়া চাই এবং তা যেন ঘুমের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে। পক্ষান্তরে বিষয়বস্তুটি উপযোগী হলে তা টনিকের মত কাজ করে এবং তার শ্রান্তি চিত্তের আনন্দের সঙ্গে মিশে গিয়ে স্নায়ুমণ্ডলকে উজ্জীবিত করে।

এ পর্যান্ত আমি খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে বলিনি।

ধূমপান এবং মদ্যপান থেকে বিরত থাকা স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় হিসাবে নির্দেশিত আছে। আমি সর্বতোভাবে ধূমপান এবং মদ্যপান থেকে বিরত আছি এবং এজন্য ধূমপায়ী বা মদ্যপায়ীদের থেকে আমার জীবনের আনন্দ উপভোগের মাত্রা কম হয়েছে বলে আমি বলতে পারিনে। ধূমপান এবং মদ্যপান হয়ত সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে আনন্দ দানের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিতে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু এটা অপরিহার্যও নয় আর স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিঘ্ন ঘটাবার ঝুঁকি থেকেও মুক্ত নয় তা যত কম মাত্রায়ই গ্রহণ করা হোক না কেন। খাদ্য সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে স্থানীয় জলবায়ু বা আবহাওয়া ও সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত রুচি প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁর মোটামুটি ধারণা আছে কি খেলে তারা ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সাধারণত এই ধারণা বংশগত ভাবেই ওই সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে। অবশ্য সময় ও স্থানীয় অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাও কিছুটা সীমিত হয়ে যায়। ইয়োরোপীয়রা মাংস ভোজী, ভারতীয়রা নিরামিষ ভোজী। আবার তার মধ্যে বাঙ্গালীরা মৎস্য ভোজী। মৎস্য সহজ পাচ্য, স্বাস্থ্যপ্রদ ও পুষ্টিকর খাদ্য। এ ব্যাপারে বাঙ্গালী ও জাপানীদের মধ্যে লক্ষ্য করার মত সাদৃশ্য আছে। উভয়ই ভাত ও মৎস্য ভোজী যদিও জাপানীরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা মাংস ভক্ষণ ব্যাপারে অনেক উদার। তবে একটি বিষয় খুব পরিষ্কার। তা হল এই অন্তত: আমার অভিজ্ঞতায় তাই বলে—যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জৈবিক খাদ্যের প্রতি ক্রমেই যে অনীহা জন্মে সেটা প্রকৃতির ইঙ্গিত। জীবনে সে ইঙ্গিত অনুসরণ করে চলা উচিত।

সব কিছু বলা ও করা হলেও লাটিন কবির সেই পরম উৎসাহ ব্যঞ্জক ও প্রেরণাদায়ক বাণীটির মূল্য তাঁর সময়ে যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনই আছে। পার্থিব জীবনে সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ হল লাটিন কবির সেই কথাটি সুস্থ দেহে সুস্থ মন। সুস্থ দেহ হল জীবনের ভিৎ, আর সুস্থ মন হল তার উপরে ইমারত। স্বচ্ছ বিবেক, নিরুদ্বিগ্ন ও ঘৃণা বিদ্বেষমুক্ত মন এবং সকলের প্রতি শান্তি ও শুভেচ্ছার ভাব এগুলি হচ্ছে জীবনের শক্ত বনিয়াদ যার উপরে পার্থিব শরীর বিধানকে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। এগুলি আসলে নীতিগত বিষয়, ঠিক বস্তুগত বিষয় নয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে শরীর ও মন উভয়ই পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে নির্ভরশীল এবং একে অপরকে শক্তিশালী করে। মন শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শরীর মনের নীতির সঙ্গে সহযোগিতা করে একটি একাত্মিক পূর্ণতা অর্জন করে। এই অবস্থা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে দূষণীয় যা কিছু থাকে তাকে প্রতিরোধ করে, নিয়ন্ত্রিত করে এবং যা কিছু শুভ তার মধ্যে আছে তাকে জাগিয়ে তোলে ও উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই ভাবে তা মানুষকে তার ব্যক্তিগত জীবনে নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে উদ্বেলিত করে এবং তাকে একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে গড়ে ওঠার যোগ্য করে তোলে।

আমার স্মৃতি চারণের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও তার আনুষঙ্গিক কতগুলি সমস্যা সম্পর্কে আমার অভিমত ও মনের অবস্থার কথা প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিনি। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক বলে মনে হতে পারে এই রকম সমস্যাগুলি সম্পর্কে পর্যালোচনা কালে যে দু-একটি সামাজিক বিষয় এসে পড়েছে সে সম্পর্কে কিছু কিছু বলা হয়েছে। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি—আমি দু-একবার হিন্দু সমাজে বাধ্যতামূলক বৈধব্যজীবন সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। (চলবে)

গণতন্ত্রের বিপদ

কালীপদ সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৭ই ডিসেম্বর দলসিংপাড়া চা বাগিচার একজন আর এস পি সমর্থক গুলীতে নিহত হলেন। মৃত-দেহটি তার গৃহের সামনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। হত্যাকাণ্ডটি সি পি এম সমর্থকদের বলে সবাই মনে করে।

১১ই ডিসেম্বর একদল সি পি এম সমর্থক হরিপালে বাংলা কংগ্রেসের অনশন সত্যাগ্রহ শিবিরে ঢুকে আসবাবপত্র তছনছ করে এবং গান্ধীজীর ছবি ভেঙ্গে ফেলে।

ঐ তারিখে হুগলী জেলার তামিলিপাড়া গ্রামে প্রায় ৪০ জন সি পি এম সমর্থক লাঠিসোটা নিয়ে জোর করে এক বড় কৃষকের দশবিঘা জমির ধান কেটে নেয়।

ঐ দিন জলপাইগুড়ি জেলার মাতালিবস্তি গ্রামে আর এস পি জনতা ফ: ব: সমর্থকের জমির ধান কাটে। হাঙ্গামায় কয়েকজন আহত হন।

হাড়োয়ার গোলাপপুর গ্রামে সি পি আই ও সি পি এম এর মিলিত জনতা এক বাংলা কংগ্রেস সমর্থকের জমির ধান জোর করে কাটতে গেলে সংঘর্ষ বাধে। বার জন আহত হন।

১২ই ডিসেম্বর পঃ দিনাজপুর জেলার জগদীশপুরে এক বড় কৃষক যখন চাষীমজুর নিয়ে তার জমির ধান কাটছিলেন তখন সি পি এম-এর সাত আটশো লোক ধানকাটায় বাধা দেয়। পুলিস এসে পড়ায় বিরোধ মারাত্মক হতে পারে না। পুলিস জমির মালিকের বন্দুকটি নিয়ে যায়। পরদিন যা হবার তাই হয়।

১৩ই ডিসেম্বর বসিরহাট মহকুমার তপেরচর গ্রামে ধান কাটা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে পুলিস কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের সমর্থক চারজন সম্পন্ন কৃষককে গ্রেপ্তার করে।

রাজ্যের শরিকী বিরোধ গেল এবার সংসদে। ১৬ই ডিসেম্বর সি পি আই ও সি পি এম সদস্যদের মধ্যে রাজ্য সভায় তুমুল বাকযুদ্ধ হল। প্রসঙ্গ সেই হেনা গাঙ্গুলীর হত্যা। সি পি এম সদস্য এ পি চাটার্জি হেনা গাঙ্গুলীর হত্যাকে এক ডাকাতের মৃত্যু বলে উল্লেখ করলে, প্রবীণ সি পি আই নেতা অন্ধের ভূপেশ গুপ্ত ক্রোধদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, হেনা গাঙ্গুলী ছিলেন আর সি পি আই-এর বিশিষ্ট কর্মী। তাঁর অতীত রাজনৈতিক ইতিহাসে সামান্য ছিল না। 'ভারত ছাড়' সংগ্রামে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। শ্রীগাঙ্গুলীকে ডাকাত বলা চলে না। তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। শ্রীগুপ্তের কথার জবাবে শ্রীএ পি চ্যাটার্জি রেগে উঠে বলেন, তিনি সি পি আই-এর অতীতের অনেক খবরই জানেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছে লেখা শ্রীডাঙ্গের চিঠিগুলির কথাও তাঁর জানা আছে। অর্থাৎ চলতি কথায় যাকে বলে মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়।

এরপর ভূপেশ গুপ্ত সি পি এম-এর বিরুদ্ধে আরো কিছু গুরুতর অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, কলিকাতার পুলিস কমিশনার সি পি এম এর প্ররোচনামত কাজ করছে। যেহেতু ইংরাজ আমলের এক পুলিস কমিশনার হেনা গাঙ্গুলীকে ডাকাত বলেছে তাই শ্রীগাঙ্গুলী ডাকাত ছিলেন এ কথা বলা ঠিক নয়।

১৫ই ডিসেম্বর প: দিনাজপুরের দীঘাবানা গ্রামে এক বড় কৃষকের জমিতে ধান কাটার সময়, সশস্ত্র সি পি আই জনতা কর্মরত চাষীমজুরদের ওপর চড়াও হয়। তহশীলদার সহ সাত ব্যক্তি আহত হন। হামলাকারীরা একজন চাষীমজুরের কুটীরে আগুন দেয় এবং সেই আগুনে উক্ত কুটীর সহ তৎপর দশখানা বাড়ি পুড়ে ছাই হয়। গ্রামে ১৪৪ ধারার আদেশ জারী হয়।

রায়গঞ্জের নিকট হাতিয়া গ্রামে সি পি এম সমর্থকরা এক কৃষকের জমির ধান জোর করে কাটলে যে সংঘর্ষ হয় তাতে কিছু লোক আহত হন। পর দিন ছাত্র পরিষদ কর্মী অশ্বিনী বর্মণ কলেজ যাবার সময় সি পি এম ঠ্যাঙাড়েদের দ্বারা প্রহৃত হন। অশ্বিনীকে রায়গঞ্জে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১৬ই ডিসেম্বর বসিরহাট এলাকায় বুলান্দা গ্রামে সি পি এম জনতা দুজন সি পি আই সমর্থকের বাড়ি আক্রমণ করে।

মার খেতে খেতে সি পি আই-এর কৃষকফ্রন্ট নড়বড়ে হয়ে যায় এবং অনেক অঞ্চলে পার্টির প্রভাব কমে। দলকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে, সি পি আই রাজ্য কমিটী পাঁচ দফা কর্ম-নীতির এক প্রস্তাব যুক্তফ্রন্টের সামনে রাখে। প্রস্তাবটি ছিল এই রকম :—

(১) জনস্বার্থে পুলিসকে দলীয় প্রভাব মুক্ত রাখার জন্য প্রতি থানায় যুক্তফ্রন্ট শরিকদের পরামর্শ কমিটি গঠন।

(২) শরিক দলগুলি সভায় ভাষণ কিংবা বিবৃতি-দান কালে একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ পরিহার।

(৩) প্রতি মন্ত্রিদপ্তরে শরিক দলগুলির একটি করে যুক্ত পরামর্শ কমিটি।

(৪) যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলির সম্মিলিত জনসভা ও কর্মীসমাবেশ।

(৫) ৩২ দফা কর্মসূচীর রূপায়ণ।

ফ্রন্টের পালের গোদা প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব না দেওয়ায়, সি পি আই-এর চেষ্টা অরণ্যে রোদন হল মাত্র।

১৮ই ডিসেম্বর হুগলী জেলার পোলবা গ্রামে ২০০০ সি পি এম সমর্থক এক সি, পি, আই প্রভাবিত সম্পন্ন কৃষকের জমি ধান জোর করে কাটে। পুলিস লুণ্ঠিত ৭০০ মন ধান ও বিচালি আটক করে বলে জানা যায়।

১৯শে ডিসেম্বর বড়দহে এক কাপড় কলের সামনে দুই শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সংঘর্ষে একজন I,N.T,U,C সমর্থক জখম হন।

মজার কথা, রাজ্য পুলিসের অস্থায়ী আই, জি মিঃমাসুদ সাংবাদিকদের বলেন, ধান কাটার কাজ এ পর্যন্ত বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। সমগ্র রাজ্যে ইতিমধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ ফসল কাটা হয়েছে। অর্থাৎ 'বাবু যত বলে পরিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।'

(চলবে)

Regd No. R. N. 24911/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষান্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

॥ [illegible] ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী সুধীর কুমার পাল

আমরা গভীর [illegible] জানাইতেছি যে আমাদের বন্ধু; সহকর্মী ও প্রবীণ বিপ্লবী সুধীরকুমার [illegible] সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। মর্মান্তিক ব্যাপার হচ্ছে যে [illegible]বাবুর মৃত্যুটা ঘটেছে চিকিৎসকদের ভুলে ও অবহেলায়। সুধীরবাবু বাসে ওঠার সময় অন্যের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে যান ও তার মাথার একটি জায়গায় কেটে যায়। হাসপাতালের ডাক্তাররা এ, টি, এস্ ইনজেকসান না দিয়েই তার মাথার ক্ষতস্থান সেলাই করে দেন। ২/১ দিনের মধ্যেই ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে যাওয়ার ফলে তার জীবনাবসান ঘটে।

সুধীরবাবু যৌবনেই নিখিল ভারত ছাত্র সমিতির একজন প্রতিষ্ঠাতা সভ্য হিসাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে তাঁকে দীর্ঘদিন কারাবাস করতে হয়েছিল।

সুধীরবাবু ছিলেন একজন আদর্শনিষ্ঠ নিবেদিত প্রাণ দেশকর্মী। তাঁর মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি। এবং তাঁর পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

18 1992

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ২রা মাঘ ১৩৮৮ ১৬ই জানুয়ারী ১৯৮২	১৫ সংখ্যা

দুইটি জিনিষ হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কোন্ পথে

সাধারণভাবে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলায় না ভারত। এটা তার পঞ্চশীল। বিশেষ করে সব দেশের সহ অবস্থানের নীতিকে মেনে নেওয়ার নীতির মধ্যেই এটি স্বীকৃত। অবশ্য তার মানে এ নয় যে অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে ভারত কোন উদ্বেগ অনুভব করবে না। বিশেষ করে কোন দেশের নীতি যদি আক্রমণাত্মক হয়, যদি সেই নীতির ফলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা থাকে, তবে সেটা নিশ্চয়ই ভারতের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে। যেমনটা ঘটেছে অতীতে এবং এখনও ঘটে চলেছে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে। ভারত চায় প্রতিবেশী সব দেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধুত্ব। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে যদি কেউ ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয় তবে ভারত চুপচাপ বসে থেকে শুধুই শান্তির বুলি উচ্চারণ করে যাবে। তাকেও বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়, যার পরিণাম দাঁড়ায় দেশ-গঠনের জন্য নির্দ্দিষ্ট তহবিল থেকে সামরিক খাতে প্রচুর অর্থব্যয় এবং এজন্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে, রাজনৈতিক অবস্থাটাও অস্থির হয়ে পড়ে। সবদেশেই, বিশেষকরে একান্ত প্রতিবেশী দেশগুলিতে একটা সুস্থ মজবুত এবং মানবদরদী সরকার চালু থাকুক, এটা ও সম্ভব হয় না শুধুমাত্র ভারতের চাহিদা মতই।

কোন দেশের শুধু নেতৃবৃন্দের ভুল ভ্রান্তিতেই এমন অঘটন ঘটেনা, এর মধ্যে মধ্যে শক্তিশালী দেশের উস্কানিও থাকে। তারা সুনাফা তুলতে সক্ষম হয় তখনই, যখন কোন দেশের সরকার নড়বড়ে হয়ে পড়ে।'

এত বলতে হল বাংলাদেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতি দেখে। সকলেই আশা করছিলেন যে বিগত নির্বাচনের পর ওখানে একটা গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হবে। কিন্তু সেখানে সৈন্যাধ্যক্ষ লে: জে: এরসাদ যে বিবৃতি দিয়েছেন, তার মধ্যে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে দেশের নির্বাচিত সরকারের সংঘর্ষের একটি পরিচ্ছন্ন সম্ভাবনার শুধু ইঙ্গিতই নয়, দুই পক্ষের মধ্যে একরূপ নিশ্চিত মানসিকতাও প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা দেশের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দাস্ সত্তার নয় জনের একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করেছেন। এরসাদ পরিষ্কার বলেছেন সৈন্যবাহিনীর নিকট এই পরিষদ গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি প্রেসিডেন্টকে বলে দিয়েছেন যে যেভাবে এই কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে, তার দ্বারা দেশের মানুষের দাবী ও প্রত্যাশা পূরণ করা যাবে না। তিনি আরো বলেছেন যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ শুধু একটি ভূখণ্ডের জন্যই মুক্তিযুদ্ধ করেনি। তারা যুদ্ধ করেছিল একটি আদর্শ লাভ করার জন্য, যার মাধ্যমে একটি শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে। কেউ কেউ মনে করছেন যে সম্প্রতি মুক্ত যুদ্ধ বিরোধীরা মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য বিস্তার করেছে। লে: জে: এরসাদ বলেছেন মুক্তি যুদ্ধ আজো শেষ হয়নি এবং যতদিন না শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠিত হবে, ততদিন এই সংগ্রাম চলবে। কাজেই এই সত্তা

সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে বিরোধটা মৌলিক এবং কোন জোড়াতালি দিয়ে এর অবসান ঘটান যাবে না। বরং বিরোধটা ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে বেড়েই চলবে। ফলশ্রুতি দাঁড়াবে যে বাংলাদেশে আবার একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি হবে। দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়বে, কারণ অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হবে।

ঐ দেশের আনাচে কানাচে যে সব বিদেশী শক্তিগুলি বাংলাদেশের ঘোলাজলে মৎস শিকার করতে ওঁৎ পেতে বসে আছে তারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট হবে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে এবং স্বার্থ সাধন করতে। বাংলাদেশের সব মানুষ যদি এই বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক না হন, তবে তাদের রক্তস্নাত সদ্য প্রাপ্ত স্বাধীনতাও বিপন্ন হতে পারে। এই দ্বন্দ্বের সমাধান না হলে। ওখানে সামরিক শাসনও প্রবর্ত্তিত হতে পারে। সৈন্যদল ক্ষমতা দখল করতে অগ্রসর হতে পারে এবং ক্ষমতা দখলের সময় যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, সামরিক প্রশাসকেরা ক্ষমতাসীন হবার পর সব প্রতি-শ্রুতির কথা ভুলে যান। তারা তখন তাদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য কোন অন্যায় করতেই দ্বিধা করেনা। এই ইতিহাসের শিক্ষা। পাকিস্তানের দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মিলবে।

বাংলাদেশের মানুষকে একথাও মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তান বাংলাদেশের স্থায়িত্ব চায় কিনা। আসল কথা হল যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষম পরিণতি চিরদিনই দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় সব দেশেই। আমরা প্রত্যাশা করব যে বাংলাদেশকে সেই পরিণতির মুখে ঠেলে দেবে না বাংলাদেশের মানুষ। বহু শ্রম, ঘর্ম, অশ্রু ও রক্ত খরচ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সেই স্বাধীনতা কোন প্রকারে যেন বিপন্ন হতে না দেন ওখানকার মানুষ। খান সেনাদের দ্বারা এবং নিজেদের মধ্যে কাড়াকাটির ফলে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি সুধীজন ও দেশপ্রেমিক নিহত হয়েছেন। বাংলা দেশের মাটি আজো তাদের রক্তে সিক্ত। সেই অধ্যায়ের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে এটাই বাংলাদেশের সব শুভার্থীরা চাইবেন। কিন্তু দেশস্থ মানুষ যদি গৃহযুদ্ধে ইন্ধন জোগান, তবে ত সব আশাই বিনষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষকে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উপর প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। ভারতবৈরী কিছু দেশ ওখানে নাক গলাতে উদ্যত। তারা বাংলাদেশকে সোপান করে ভারতের বিশৃঙ্খলা ও বিপদ ডেকে আনতে পারে। এত কাছাকাছি একটি দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভারতের সজাগ নজর রাখা চাই বিশেষকরে যখন ওখানে এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়, যাদের মর্মস্থলে ভারত-বিদ্বেষ এখনো বর্তমান। অল্পের সামান্য উস্কানিতেও তাদের সাড়া দেওয়া অসম্ভব নয়। ওখানে কোন গণ্ডগোল সৃষ্টি হলে, আবার উদ্বাস্তু স্রোত বইতে পারে, যেটা ভারতের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। অতন্দ্র প্রহরাই সময়োচিত ও বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশ কোন্ পথে যাচ্ছে, তার পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে কোন গাফিলতি যেন না হয়।

একটি ঘোষণা

'বিপ্লবী বাংলার আগামী সংখ্যা ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮২ প্রকাশিত হবে।

—স, বি, বা,

গণতন্ত্রের বিপদ

কালীপদ সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। এতকাল ধানকাটা নিয়ে গোলযোগ হত জমির মালিক এবং ভাগচাষীর মধ্যে এবং তার শুরু মার্কসবাদী দলগুলির কৃষক আন্দোলনে নামার পর থেকে। কারণ তারা স্লোগান তোলে 'লাঙল যার জমি তার।' বর্তমানে বিরোধ বাধানো হচ্ছে এক ভাগচাষীকে হটিয়ে তার জায়গায় দলের সমর্থক ভাগচাষীকে বসাবার চেষ্টার দ্বারা। যুক্তফ্রন্ট অথবা বামফ্রন্ট সরকার, জমিদারী উচ্ছেদ আইন করে কংগ্রেস সরকার যেমন ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছিলেন, তেমনি ভাগচাষবদ্ধ জমির মালিকদের উচ্ছেদ করে ভাগচাষীদের বাড়তি স্বত্ব দিলেন না কেন? এ ব্যবস্থা করলে ফসল বোনা এবং ফসলকাটা নিয়ে কি বছর যে গোলযোগ ঘটে, তা তো অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে যেত।

ভাগচাষ জমি অধিগ্রহণ হচ্ছে না দুটি কারণে (১) অধিকাংশ ভাগচাষ জমির মালিক সি, পি, এম-এ নাম লিখিয়েছে, তারা বিগড়ে গেলে সি, পি, এম-এর গ্রাম সংগঠন দুর্বল হবে, (২) মালিক-ভাগচাষী এবং ভাগচাষী-ভাগচাষীদের বিরোধ যদি মিটে যায়, তাহলে কি নিয়ে সি পি এম গ্রামে গ্রামে Power politics করবে?

২০শে ডিসেম্বর হুগলী মহসীন কলেজে মার্কসবাদী ও নকশাল পন্থী দুই ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন আহত হন। একজনের অবস্থা আশংকা জনক।

মালদহ জেলার গাজোলে সি, পি ,এম এবং বাংলা কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘর্ষে শিল্পমন্ত্রী সুশীল ধাড়া নারী নির্যাতনের ঘটনা উল্লেখ করেন। অসামরিক ও প্রতিরক্ষা ও পাশপোর্ট মন্ত্রী গোলাম ইয়াজদানি ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেন। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি ইয়াজদানির বিবৃতিকে সত্যের অপলাপ বলেন এবং পুলিস বিভাগ কর্তৃক সাত তাড়াতাড়ি গাজোল থানার তদন্তকারী ও, সি কে বদলির আদেশ নাকচ করেন।

দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নববর্ষ ১৯৮২- কে স্বাগত জানাচ্ছি। এ দুঃখ আমার নিজের এবং এ রাজ্যের বহু মানুষের, যাঁরা বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক অবহেলা ও ব্যর্থতার কারণে বিগত চার বছরে হারিয়েছেন তাঁদের প্রিয়জনকে। সান্ত্বনার ভাষা নেই, অসহায় কণ্ঠ তবু আবেগে উচ্ছ্বসিত, ক্ষমতাহীন প্রতিবাদে বজ্রকঠোর। জানি, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে। তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।' তাই মাগি শরণ অনন্তের মাঝে, আর বিশ্বাস রাখি ভবিষ্যতে। প্রার্থনা করি, ১৯৮২ সফল হোক অরাজকত্বের অবসানে। Lead kindly light amongst the encircling gloom'

বছর শেষের দিনকটিতে যাঁরা হিংসার রাজনীতির শিকার হয়ে প্রাণবলি দিয়েছেন তাঁদের স্মরণ করে আমরা ফিরে যাব ১৯৬৯ সালের হানাহানির ইতিবৃত্তে।

গত ২৯শে ডিসেম্বর বর্ধমান থেকে পুলিসসূত্রে জানা যায়, নীলপুরে একটি যুবক কয়েকদিন আগে ছুরিকাহত হয়ে মরেছেন। নিহত ব্যক্তি বর্ধমান জেলা ছাত্র পরিষদ (ই)-র কর্মী সুবীর গুহ। পুলিস

এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করে নি। (অমৃতবাজার /১২/৮১)

৩১শে ডিসেম্বর, শিলিগুড়ি—উত্তরবঙ্গের মালদা ও কোচবিহার জেলায় অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার কোচবিহার পাটছড়া গ্রামে একদল আততায়ীর হাতে তারিণী কান্ত মোদক নিহত হন।

মালদা পুলিস শহরের কাছে বালিবালা এলাকার মহানন্দার বালি থেকে এক যুবকের মৃতদেহ পেয়েছে। জানা যায়, মৃত যুবক মালদা টাউন কংগ্রেসের সদস্য চিত্তরঞ্জন দাস।

মালদার মহেশপুরে পান্না চক্রবর্তী ও যামিনী দাসকে একদল উগ্রপন্থী কুপিয়ে হত্যা করেছে। (আনন্দবাজার ১/১ ৮২)

৩০শে ডিসেম্বর হাওড়া জেলার বাঁটরা থানার ক্ষীরেরতলায় ৮জন সশস্ত্র লোক ৫১ নং রুটের একটি বাস থামিয়ে বাসযাত্রী শান্তিলাল ঘোষ ও তাঁর ভাই রবি ঘোষকে নামিয়ে নেয়, পাইপগান তুলে অপর যাত্রীদেরও নামতে বাধা করে। হামলাকারীদের একজন পাইপগানের গুলী মেরে শান্তিলাল ঘোষকে খুন করে। এবং একটি ধারালো অস্ত্রের দ্বারা দেহ থেকে তাঁর মুণ্ড কেটে ফেলে। রবি ঘোষ হামলাকারীদের পিছনে ধাওয়া করলে বোমায় আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটে অনেক লোকের সামনে। দুর্বৃত্তদলের পাইপগানের ভয়ে এবং শাসানিতে বাসযাত্রী ও পথচারী জনতা আক্রান্তের সাহায্যে এগোতে সাহস পান না।

শান্তিলাল ঘোষের হত্যার প্রতিবাদে পরদিন বাঁটরা শিবপুর এলাকায় হরতাল পালিত হয়। অধিকাংশ দোকান, কলকারখানা ও সিনেমা হল বন্ধ থাকে। পুলিস এ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কারোকে গ্রেপ্তার করে নি বলে জানা যায়। (অমৃতবাজার ৩১/১২/৮১ ও ১/১/৮২)

নদীয়া জেলার কংগ্রেস (ই) প্রতিনিধি দল গত ৩০শে ডিসেম্বর জেলা শাসক ও পুলিস সুপারের নিকট যে স্মারক লিপি দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে বামফ্রন্ট আমলে জেলার ৫৫ জন কং (ই) কর্মী খুন হয়েছেন এবং খুনের ব্যাপারে পুলিস নিষ্ক্রিয়।

৩০শে ডিসেম্বর, সন্ধ্যায় শক্তিনগরে নদীয়া জেলা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে গোপাল রায় (১৩) নামে হাসপাতালের কর্মী ছুরিকাঘাতে মারা যান এবং আর এক হাসপাতাল কর্মী মানব সরকার গুরুতর আহত হন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে খুনের প্রতিবাদে কং (ই) কৃষ্ণনগর শহরে ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক দেয়। শহরের সমস্ত দোকান পাট, সিনেমাহল বন্ধ থাকে। (আনন্দবাজার ১/১ ৮২)

প্রতিকারহীন ও বেদনাদায়ক এই সব ঘটনার স্মৃতি বুকে রেখে কি করে বলতে পারা যায় যে, পশ্চিমবাংলায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেশ ভাল এবং গণতন্ত্র বহাল তবিয়তে আছে? হত্যাকারী ও লুঠেরা দলকে নিছক সমাজ বিরোধী দুর্বৃত্ত বলে হালকা করা চলে না। উগ্রপন্থীরা উত্তর বঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত খুন খারাপি চালিয়ে যাচ্ছে এমন নির্ভয়ে কিসের জোরে?

'সংবাদ: অপরের জমিতে জোর করে ধান কাটার অভিযোগে পুলিস এক পঞ্চায়েত প্রধানকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত প্রধানের কাছ থেকে গুলীভরা একটি রিভলবার আটক করা হয়েছে। ঐ পঞ্চায়েত প্রধান সি পি এম দলভুক্ত। সন্দেশখালি

থানার নিতখেড়ে গ্রামে প: প্র: অবনী গায়েনের নেতৃত্বে প্রায় দেড়শো সি পি এম সমর্থক ঐ গ্রামের বনসিদ্ধ গায়েনের জমিতে জোর করে ধান কাটতে যায়।' ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

'সর্বস্ব খুইয়ে তাঁরা পঞ্চাশজন দেশে ফিরে গেলেন। বাকিরা শুধু সর্বস্ব নয়, টিকিট বা পাশপোর্ট হারিয়ে এখন পড়ে আছেন হাওড়া স্টেশনের পাশে এক হোটেলে। বুধবার রাতে (২৩/১২/৮১) আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে শ্রীলঙ্কাবাসীরা সমাজ-বিরোধীদের কবলে পড়েন, হারান তাঁদের সব কিছু।'

রাত সাড়ে আটটাতেই দলবদ্ধভাবে কলিকাতার বুকে যদি সমাজ দুর্বৃত্তরা এ ভাবে বিদেশীদের সর্বস্বান্ত করতে পারে—তবে আইন শৃঙ্খলা পরি-স্থিতি যে বেশ ভাল সে কথা কি করে মেনে নেওয়া যায়?

'বিভাগীয় মন্ত্রীরূপে পঞ্চায়েতে ব্যাপক দুর্নীতি নিয়ে যে ভাবে দেবব্রতবাবু প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলেছেন তাতে বামদলের বড়কর্তারা ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ হতে পারেন কারণ অধিকাংশ পঞ্চায়েতেই বামদলের দখলে, অতএব দুর্নীতিকেও যে তারা দখল করেছেন—একথাটা ফাঁস না করাই উচিত ছিল। এতে বামদলগুলির ভাবমূর্তি জনমানসে নষ্ট হয়ে গেল যদিও পঞ্চায়েত সমূহ দখল করে তারা পক্ক হস্তেই কামিয়েছেন এবং পক্কহস্তেই দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরেছেন—দলীয় স্বার্থে এ ধরণের সত্যি কথাকে পঞ্চমুখে প্রকাশ না করাই উচিত ছিল।' —যুগান্তর (২৬/১২/৮১)

এই হল বামফ্রন্ট সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও দুর্নীতি দমনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর জন্যই বামফ্রন্ট নেতারা সগর্বে বলেন, এই সরকার এ রাজ্যে যা করেছে, অপর কোন দলের সরকার তা কোনদিন করে নি, করতে পারবেও না। সুতরাং জনগণের ভোট তাদের প্রাপ্য পাওনা এবং পকেটে আছে বলেই ধরে নিতে হয়। হরি খুড়ো বলেন, কথাটা ঠিকই যতক্ষণ ভোটযন্ত্র বামফ্রন্টের একতিয়ারে আছে। যন্ত্র বেহাত হলে জারিজুরি ধরা পড়বে।

হড়িখুড়োরা থাকুন তাদের ভাবনা নিয়ে, আমরা ইত্যাবসরে একবার চোখ বুলিয়ে নি ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্টসরকারের শরিকী খুনোখুনির ওপর।

২৫শে ডিসেম্বর (১৯৬৯) বর্ধমান জেলার ভুনুর ও বরঘনিয়া গ্রামে ফসল কাটা নিয়ে সি. পি, এম সমর্থক জনতার সহিত কৃষকদের সংঘর্ষে দুই ব্যক্তি নিহত ও আট ব্যক্তি আহত হন। জনতা ৫০০ মণ ধান ও তিন খানি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এ সম্পর্কে পুলিস ১১ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং গ্রাম-গুলিতে ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করে।

অন্যদিকে ২৭শে ডিসেম্বর সি পি এম-এর শ্রমিক শাখার অন্তর্গত ব্যাংক, শিল্পসংস্থা, জীবনবীমা এবং শিক্ষকদের এক বিরাট বাবু জনতা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত প্রতিরোধকল্পে রাইটার্স-এর সামনে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভের লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিকে ভয় দেখানো।

ঐ দিন জগদ্দল রথতলার নিকট সি পি, এম সমর্থক দেব প্রসাদ ঘোষ গুলিতে নিহত এবং অপর দুজন আহত হন। আক্রমণ কারীদের নকশাল মনে করে পুলিস দু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

আবার ফ: ব: নেতারা ছিঁচকাঁদুনে প্রেমের অভিনয় করলেন। ৩০শে ডিসেম্বর বারাসতে সারা

ভারত সম্মেলন ডেকে তাঁরা বললেন সি, পি, এম-এর দলবাজীই যুক্তফ্রন্টে সংকট সৃষ্টির হেতু।

'যে করে আমার আশ বলি তার সর্বনাশ।
তবুও যে করে আশ হই তার দাসের দাস।'

—উনপঞ্চাশী।

৩১শে ডিসেম্বর রাত্রিতে ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশনের একদল লোক হাবড়ার নিকট হাটখুরা গ্রামে এক বাড়িতে হানা দেয় এবং একজন স্ত্রীলোক সহ বাড়ির সকলকে বেদম প্রহার করে। পরিবারের সকলে ঘর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। একদিকে বিবেক-বুদ্ধি, অন্যদিকে সন্ত্রাস।

'না যাইলে রাজা বধে যাইলে ভুজঙ্গ।
রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।'

—কৃত্তিবাস।

বিভীষিকাময় একটি বছর কেটে যাবার পর, বামফ্রন্টের কর্মকর্তারা এক মিলিত সভা ডাকলেন ১৯৭০ এর ১৪ই জানুয়ারীতে। লোকসেবক সংঘের বিভূতি দাসগুপ্ত ও আর, এস, পি-র মাখন পাল ফ্রন্টের অন্তর্ঘাতী বিরোধ সমাধানের সূত্র খুঁজতে অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেললেন। ফল কিছু হল না। ভবী ভুলবার নয়।

২রা জানুয়ারী নববর্ষের প্রথম কাজের দিনে সি, পি. এম জানিয়ে দিল, যে প্রস্তাবিত সভায় যোগ দেবে কিন্তু তার আগে মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু যুক্তফ্রন্ট সরকারকে যে অসভ্য বর্বর বলে বিবৃতি দিয়েছেন তা তাঁকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। সভা বসল না। অবস্থা হল যথাপূর্ব তথা পরং।

৪ই জানুয়ারী ধাপার স্থানীয় লোকজনের সহিত সি, পি. এম সমর্থকদের সংঘর্ষে শেষোক্তদলের অমিয় চক্রবর্তী নিহত হন। কিছু দোকান পোড়ে। যদু নন্দন সিং নামে এক ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে গুলি চালায়। পুলিস যদুনন্দনকে গ্রেপ্তার করে।

৫ই জানুয়ারী বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক মণ্ডলী হিংসাত্মক যুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বলেন, সি পি এম-এর সহিত বাংলা কংগ্রেসের আপসের কোন স্থান নেই।

পঃ দিনাজপুরের পি, এস, পি নেতা সলিমুদ্দিন এম. এল, এ অভিযোগ করেন, সি, পি, এম, সি,পি, আই এবং আর, এস, পি একত্রে অথবা পৃথকভাবে অপেক্ষাকৃত ছোট রায়তদের জমি থেকে জোর করে ফসল কেটে নিচ্ছে।

৮ই জানুয়ারী একজন ডাক পিয়নের হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতে ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয়। তিনজন খুন হন। শহরে কারফিউ জারী হয়, সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়।

হাওড়ায় ঐদিন দুই বিরোধী শ্রমিক ইউনিয়নের সংঘর্ষে জয়বিবি রোডের কারখানার শ্রমিক শান্তি-প্রসাদ শর্মা (৩৫) মারা যান।

ধানকাটা শেষ হতে না হতে মার্কসবাদীরা মেছো ভেড়ি দখলে নামে এবং সেই থেকে পঃবাংলার মাছের বাজারে আগুন লাগে। ২৪ পরগণার বামন-ঘাটা গ্রামে মাছের ভেড়ি রক্ষা করার সংঘর্ষে দুজন সি, পি, এম সমর্থক বন্দুকের গুলীতে আহত হন।

(চলবে)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

শেষ কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই সমস্যাটি হিন্দু সমাজের চিন্তার মধ্যে একটা বিরাট স্থান জুড়ে রয়েছে। এর গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। যারা কোন সামাজিক পরিবর্তন বা সংস্কার চান না তারাও এ বিষয়ের উপর আলোচনাকে স্বাগত জানিয়েছেন, অন্যান্য সামাজিক সমস্যাগুলি কম বেশী পরিমাণে ভিন্ন ধরণের। এ গুলি সম্পর্কে লোকের হয়ত আগের মত সে রকম কোন আগ্রহ নেই বা বর্তমান ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নাম সেই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার মত সে রকম কোন ইতিহাসও নেই কিংবা নারীদের প্রতি অবিচার সম্পর্কে আগেকার দিনের সব ক্রমবর্দ্ধমান ধারণাও নেই যা নারীরা এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। তা হলেও একথা গোপন করে কোন লাভ নেই যে ভারতের সামাজিক সমস্যা অতি কঠিন ও জটিলতা পূর্ণ। হিন্দু সমাজের কোন সমস্যার কথাই ধর্মকে বাদ দিয়ে ভাবাই যায় না। যে কোন সামাজিক সমস্যার কথা ধরা যাক না কেন তার মধ্যে ধর্মের সংস্পর্শ এসে পড়বে। কোন সামাজিক প্রথার মধ্যে ধর্ম চর্চার অনুমোদন থাকে—তা যে কোন ধরণেরই হোক না কেন, তা হলে তা জন-মনে দৃঢ় ভাবে গেঁথে থাকে এবং তা যুক্তি বিবেচনায় ধার ধারে না ; তা হয়ে দাঁড়ায় নিছক ভাব প্রবণতা ও আবেগের বিষয়।

ভারতের যেকোন সমাজ সংস্কারককে তাই সংগ্রাম করতে হয় আধিদৈবিক শক্তির সঙ্গে যে শক্তি কম বেশী পরিমাণে এক রকম দুর্ভেদ্য এবং যে শক্তির কাছে প্রয়োজনের তাগিদ বা সাধারণ বুদ্ধির কোন প্রচলিত পার্থিব অস্ত্র কিছুতেই দাঁড়াতে পারেনা। বংশ পরম্পরাগত এই অনুভূতি গভীরে স্থিত মানসিক প্রবৃত্তিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তাই ভারতীয় সংস্কারককে সংগ্রাম করতে হয় এমন একটি সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে যা দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় বিশ্বাসের উপরে। সময় সময় কোন কোন ভারতীয় সংস্কারক লক্ষণীয় ভাবে লোকের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে এটাই প্রমাণিত হয় যে এঁরা যে কেবল মাত্র অসাধারণ শক্তিশালী ও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন তাই নয় ; এটা আরও প্রমাণিত করে যে প্রকৃত মহত্বের প্রতি ভারতীয় জন-মন সর্বদাই আকৃষ্ট হয়।

মহৎ প্রচেষ্টার জপ-মন্ত্র যখন উচ্চ লক্ষ্যে নিয়োজিত হয় তখন তা পবিত্র বলে গণ্য অনুশাসনের বিরোধী হলেও লোকে মেনে নেয়। কোন আধিদৈবিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষ বাস্তবে আবির্ভূত হয়ে যখন এক স্বর্গীয় আলোর বন্যার মধ্যে তাঁর বাণী প্রচার করেন, তখন বিশ্বাসী জনগণকে তা অভিভূত করে ফেলে এবং তা তাদের মধ্যে এমন এক হর্ষ জাগিয়ে তোলে যা তাদের সব কাম্য বস্তুকে সামনে এনে দেয়। এই ভাবে পূর্ব্বের দৈবাগত প্রথার যে চমক জাগরূক থাকে তা চাপা পড়ে যায়। জনগণ তখন এক অবতারের আবির্ভাব

দেখতে পায় যিনি পুরাতন প্রথাকে সরিয়ে নূতন প্রথার প্রবর্তন করেন। তিনি কোন প্রচলিত নিয়ম বা অনুশাসনের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। তিনি সমস্ত নির্দিষ্ট আচরণ তত্ত্বের ঊর্ধ্বে। তাঁর মধ্যে থাকে তখন এক সত্যের আবির্ভাবের উন্মাদনা। তার নিজের মধ্যেই সেই সত্য নিহিত থাকে এবং তিনি সে সত্য প্রকাশ করেন। তিনি এমন ভাবে ঘোষণা করেন যাতে তার বাণী সকলের অন্তরস্পর্শ করে এবং সকলের কল্পনার প্রতি তা আবেদন করে।

এই রকম একজন অবতার ছিলেন চৈতন্য বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। তিনিও বুদ্ধের মতই একজন প্রাচীন প্রথার মূর্তিভঙ্গকারী ছিলেন। তিনিও জাতি ভেদের বিরুদ্ধে ও বাধ্যতামূলক বৈধব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এই ভাবে একটি দৈব অনুশাসন বাণী বিরুদ্ধে আর একটি দৈব অনুশাসন বাণী সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরেরই নির্বাচিত এক মহাপুরুষের মুখে প্রচারিত হয়, কিন্তু পুরাতন যেতে চায়না। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে, এবং মানব হিতৈষিগণ তাদের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য জগতের প্রগতিশীল শক্তি সংহের দিকে মুখ ফেরান। এই ভাবেই একটা সুস্পষ্ট প্রগতিমুখীন অবস্থায় এসে উপনীত হয়; নতুন চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে; নতুন উদ্দীপনার পাখায় ভর করে তা উড়তে থাকে। নতুন চিন্তা, নতুন ভাব-ধারণার প্রভাবের মত শক্তিশালী আর কিছু নেই। এই চিন্তা ধারা ঝরণা ধারার মত সেই পর্বতের পাশ দিয়ে ধাবিত হয় এবং সেই পর্বতের শক্তিশালী অংশকে ক্ষয় করতে করতে ক্রমে প্রশস্ত ও গভীর হয়ে ক্রম বর্ধমান স্রোতস্বিনীতে পরিণতি লাভ করে।

সামাজিক উন্নতির এই গতি অবশ্য মন্থর, কারণ মহাপুরুষের সংখ্যা তো আর কলেজামের মত এত প্রচুর নয়। আর ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি এক ধরণের জটিল মানসিক অভিভূতির ভাব সৃষ্টি করে। তাছাড়া একটা বিরাট সমাজের অগ্রগতি স্বভাবতই মন্থর হয়ে থাকে। তথাপি গতির বিরাম নেই; আর জমির পরিমাণে অল্প হলেও গোটা বস্তুটাকেই তা গাঁজিয়ে তোলে।

এই হল আমাদের পরিবেশ বহুকাল ধরে বংশানুক্রমে চলে এসেছে। ফলে প্রত্যেক হিন্দুর মধ্যেই রক্ষণশীলতার প্রতি একটা ঝোঁক আছে। মহান নেপোলিয়ান বলতেন, 'একজন রাশিয়ানের গায়ে আঁচড় কেটে দেখ, দেখবে তার মধ্যে থেকে মুরাকীট বেরিয়ে আসছে'। সেই রকম একজন হিন্দুকে খোঁচা দিয়ে দেখ, দেখবে তার মধ্যে রয়েছে একজন রক্ষণশীল. তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের মত যারা কর্তব্যের প্রতি আনুগত্য পরায়ণ হয়ে জীবনে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাকে কাজে এবং কথায় ধরে রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি রয়েছে আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম। তারা আমাদের অতিমাত্রিক রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে একটা জাগ্রত প্রতিবাদ স্বরূপ। আমি নিজে অবশ্য কোন সময়ে আমার মনকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল চিন্তা ও নীতিকে অনুসরণ করার মত করে গড়ে তুলতে পারিনি। তাদের কথা হচ্ছে একটা লক্ষ্যে পৌঁছবার কথা। তাদের সে চিন্তা ও নীতি হচ্ছে আদর্শবাদী। আমি মনে করি সে লক্ষ্যে সে আদর্শে পৌঁছতে হলে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে হবে। জন-সাধারণের সঙ্গে জড়িত বিষয়ের মধ্যে কোন একটি বিশেষ স্থায়ী নীতি বলে কিছু নেই। কোন পরিবেশের মধ্যে নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা বিচার করেই নীতিটিকে গ্রহণ করতে হবে। এডমাণ্ড বার্ক বারে বারেই একথা বলেছেন। ভারতে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়ও এই মতের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি নতুন চিন্তায়, বিশ্বাসের প্রবর্তন করেন কিন্তু তিনিও প্রাচীনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছেন। (চলবে)

ভুয়া ভোটারের দ্বারা নির্বাচন অবৈধ

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্ব্বাচন কি একটা ছেলেখেলার অন্যতম? তা নিশ্চয় নয়. তবে সি. পি, এম দল বোধ হয় তাই ভাবে। নচেৎ সুনির্দ্দিষ্ট পাঁচ বছর কাল উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই আগামী মার্চ্চ মাসেই হঠাৎ তারা নির্বাচন চায় কেন এঁড়ে ছেলের বায়না ধরার মত বামফ্রন্ট সরকার কেন ১৫ই মার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভা নির্বাচন কমিশনার এদ, এল সাকদের সাহেবের কৃপা প্রার্থী—? এর মধ্যে যে গূঢ় রহস্য লুকায়িত আছে তা বর্তমানে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতাদের অজানা নয়। ক্ষমতাসীন অবস্থায় ভুয়া ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সি, পি, এম, এর পোয়া-বার সকল দিক দিয়েই। সি, পি, এম দল গাছেরও ফল খায় আবার তলারটাও কুড়াতে চায়—এটাই ওদের স্বভাব ধর্ম বহুকাল ধরেই। ওরা ক্ষমতায় থাকাকালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ভোট পত্র গণনার অধিকার পাবে কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরাই, যারা একদিকে সরকারী কর্মচারী ও অপরদিকে সি. পি, এম দলের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র, আবার কেউ কেউ পদোন্নতির ফলে সি, পি, এম রাজ্যকমিটির সদস্যও হয়েছেন হালে। ১৫ই মার্চ নির্বাচন হলে মজা লুটবে কেবল সি, পি, এম দল ও তার জোটের দোসর অন্যান্য দলেরা। এটাই কি বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের নমুনা সি, পি, এম দলের কাছে? তারাই এতদিন ইন্দিরাগান্ধীকে স্বৈরতন্ত্রী আখ্যায় ভূষিত করে এসে কি শেষে নিজেরাই চরম স্বৈরতন্ত্রের সাধনায় রত হয়ে সুযোগ খুঁজতে ব্যস্ত এবং তাই ১৫ মার্চ্চে তাদের কাছে কি নির্বাচন অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে পড়েছে? এই রাজ্যের লোকজন কিন্তু ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না, তারাও এই ক্যামিউনিষ্টি সতীপনার আসল কারণটা ধরে ফেলেছে ভোটার তালিকার স্বেচ্ছাকৃত কারচুপির বহর দেখেই।

পুকুরচুরি আর কাকে বলে? চোরের মায়ের বড় গলা, তাই সে চিৎকার দিয়ে অপরের মুখ বন্ধ করতে চায়। কিন্তু বাস্তবে কি তা সকল ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়? এক্ষেত্রে তো নয়ই, কারণ ধূর্ত সরকার যত ধূর্তই হোক না কেন এরাজ্য বাসীর চোখে, কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু বামফ্রন্টের এই অহেতুক ব্যস্ততার কারণ জেনে গেছে ইতিপূর্ব্বেই। তাই শ্রীমতী গান্ধীর দল কংগ্রেস (ই) বামফ্রন্টকে সে সুযোগ দিতে চাইবে না আপন রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার নিশ্চিৎ তাগিদে, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে। ফলে ১৫ই মার্চ্চে যারা নির্বাচন চায় আপন দলের শ্রীবৃদ্ধির আশায়, তারা গদীচ্যুত হতে বাধ্য হবে কেন্দ্রের দূরদর্শিতার ফলস্বরূপ উক্ত ১৫ই মার্চ্চ ১৯৮২ সালে বা তৎপূর্বেই। তথাকথিত গণতন্ত্রী সি, পি, এম দল আপন দুর্বুদ্ধির ও নির্বাচনী ভোটার তালিকায় স্বেচ্ছাকৃত কারচুপির ফলেই গদী চ্যুত হবে। ওরা কেন্দ্রের প্রেরিত সরকারী টাকা পয়সার সঠিক হিসাব আজো দিতে পারেনি, উপরোন্তু ধাপ্পা দিয়ে ভুয়া ভোটার তালিকায় নির্বাচন চেয়ে নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ উৎঘাটিত করে নিজেরাই মহা ফাঁপরে পড়েছে। ১৫ই মার্চে নির্বাচন পুরা যে আইনী হবে কারচুপি ভরা ভোটার তালিকার দরুণ। বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দল মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ভুয়া ও কারচুপি ভরা ভোটার তালিকা নিজেদের তল্পিবাহক লোকদের দিয়েই উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরী করিয়েছে সকলের চোখে

ধূলা দিয়ে বাজীমাৎ করার হীন চিন্তার যা আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে সর্বসমক্ষে। ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ও ভূয়া ও কারচুপি ভরা ভোটার তালিকায় এখনই নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী তিনি চান আগে ভোটার তালিকা ন্যায়সঙ্গত ভাবে সঠিক হোক তারপরে নির্বাচন।

ভুলে ভরা ভোটার তালিকায় যারাই নির্বাচন চায়, তারাই এরূপ ভুলে ভরা ভোটার তালিকা তৈরীতে নিশ্চয় ইন্ধন যুগিয়েছে বলে সন্দেহ হয় সকলেরই। ফলে ভোটার তালিকা প্রকৃত প্রস্তাবে সংশোধিত হবার পরেই নির্বাচন বিধেয়, তৎপূর্বে কোন মতেই নয়। সি, পি, এম দলের সুবিধার জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি কি উক্ত মার্চে উক্ত ভূয়া ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন চাইবে? তা কখনই নয়। একপক্ষের চরম সুবিধাবাদী নীতির কাছে অন্য পক্ষের সকলেই কি আত্মসমর্পণ করবে? তা কখনই বাস্তবে সম্ভব নয়।

সি, পি, এম, অবাধে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচনকে যমের মত ভয় করে, আর সে কারণ তারা বর্তমান ভূয়া ও কারচুপিপূর্ণ ভোটার তালিকায় এখনই নির্বাচন চায় অসৎ পথে। সৎপথে চলার শক্তি তাদের নেই কোন কালেই। চিরদিন মিথ্যার বেসাতি করে তারা হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গের গদী দখলে সমর্থ হয় জনতা, লোকদল প্রভৃতি দলের অনুগ্রহে। এবার কিন্তু তারা আর সি, পি, এম দলকে প্রশ্রয় দেবে না। বে-ইমানদের একবারই সুযোগ দিয়ে দেখে, নিশ্চয় বার বার তাদের সে সুযোগ কেউ-ই আর দেবে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সি, পি এম, রাজত্বে যে জ্বালায় অহঃরহ জ্বলছে সে জ্বালায় তারা আর পুনরায় জ্বলতে চাইবে না; সেকথা সি, পি, এম ভাল রকমেই জানে। তাই তারা নিজেদের রাজত্বকালে ভূয়া ও কারচুপিপূর্ণ ভোটার তালিকায় নির্বাচনকে ত্বরান্বিত করতে চায় এখনই, যাতে তাদের পুনরায় গদীতে বসা সম্ভব হয়। ভবিষ্যৎ যে গাঢ় অন্ধকার তা দি, পি, এম দল জানে এবং সেই কারণেই ওরা যেন তেন প্রকারেন ক্ষমতা দখল করার হীন আশায় যত সব অন্যায় আবদার ও কায়দা কানুন চালাতে উদ্যত। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের প্রেরিত টাকার হিসাব না পাওয়ায় খুব সম্ভব সি, পি, এমকে তাগাদা দিচ্ছে। ফলে তাড়াহুড়ি ভোটযুদ্ধে নামার চেষ্টায় ঐ দল উদ্যোগী হয়েছে যাতে এখনই আর হিসাব নিকাশ কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে না হয়, যেহেতু নির্ব্বাচন জরুরী কাজের অন্যতম ঠিক যুদ্ধাবস্থার সময়ের মতই। কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু এত সহজে টাকার হিসাব সঠিক কিনা তা দেখতে বিলম্ব করবে না। সি, পি, এম দলের সব চালাকি ও হিসাবের গোঁজামিল কেন্দ্রীয় সরকারের নখদর্পণে কাজেই রেহাই পাওয়া এখন দুষ্কর মনে হয়।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী মুখে খুবই কাজের লোক, কিন্তু বাস্তব কাজে দেখা যায় তাঁর ত্রুটি বিচ্যুতির হিসাবও কম নয়। তিনি সব সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর, কিন্তু নিজের দায়িত্ব পালনে তেমন যত্নবান বা তৎপর নন। বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যথাসময়ে বেতন ও ভাতা পান না কেন? তাকি অর্থমন্ত্রীর করণীয় কাজের গাফিলতির ফল নয়? অনুরূপভাবে আরো বহু ঘটনা উল্লেখ করা যায়, যার জন্য অর্থ মন্ত্রী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী, কিন্তু তিনি সেসব বিষয়ে নজর দেওয়ার সময় পান না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের পিছনে কাঠি মারতেই তাঁর সকল সময় অজুহা নষ্ট

হয়, যদিও জনগণের অর্থেই তিনি মন্ত্রী হিসাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী যিনি বিদ্যুৎ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কর্তা, তিনিও পদে-পদে নিরাশ করছেন এরাজ্যবাসীকে তাঁর অযোগ্যতার দৃষ্টান্ত বারে বারে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় ঐ দুটি বিভাগেই।

পুলিসমন্ত্রী জ্যোতিবাবু পুলিসের মধ্যে দলীয় অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ঐ বিভাগের পূর্ব্বের শৃঙ্খলাবোধ এমনভাবে নষ্ট করেছেন ইতিপূর্বে যে আজ পুলিস নিষ্ক্রিয় সর্বত্রই, মুখ্যমন্ত্রীর দাপটে। এরপরেও যদি সি, পি, এম, গদী চায় তো লোকে ভোট দেবে কেন? সাচ্চা ভোট পাওয়া শক্ত জেনেই প্রমোদ-জ্যোতিবাবুরা কারচুপিভরা ও ভুয়া ভোটার তালিকায় শাস্ত্রই ভোট চান। কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? শ্রীমতী গান্ধীকে জ্যোতি-প্রমোদবাবুরা যতই তোয়াজ করুন, পশ্চিমবঙ্গে নিরপেক্ষ বুদ্ধজীবি মানুষের দল কিছুতেই কোন মতেই এখন ভোটযুদ্ধ হতে দেবে না। আগে কেন্দ্রীয় টাকার হিসাব দিতে হবে রাজ্য সরকারকে, তারপরে ভোট। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কায়দা প্রমোদ-জ্যোতিবাবুরা অনেক দিন ধরেই শিখেছেন ও তাকে কাজে লাগিয়ে এসেছেন। তবে এবার কঠিন পল্লায় পড়েছেন ওঁরা, কারণ ইন্দিরাজী এত সহজে ওঁদের ছেড়ে দেবেন না। কংগ্রেস (ই) দলও পশ্চিমবঙ্গ দিনদিন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে, কাজেই সি, পি, এম, দলের কারসাজি ও বিভিন্ন চক্রান্তকারী কৌশল এবার ব্যর্থ হবেই—তারই সূচনা দেখা যায় দিকে দিকে।

কাজেই ভোটার তালিকা যতদিন পর্যন্ত না যথা-সম্ভব নির্ভুল, মারাত্মক দোষ ত্রুটি মুক্ত ও আইনানুগ হয়; ততদিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন স্থগিত রাখতেই ভারতীয় সংবিধানের গঠনতন্ত্রমতে ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অবশ্য পালনীয় ধারাগুলির মোতাবেক। নির্বাচন একটা গুরুতর ব্যাপার, এটা ছেলের হাতের মোয়া নয়; যার যখন ইচ্ছা সেকি তখনই তা খাবে। সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার এই যে, সি, পি, এম দল সারা রাজ্যের নিরপেক্ষ মানুষের কাছেও নিজেকে দোষী প্রমাণ করে ছাড়লো, আপন দারুণ লোভকে চরিতার্থ করার দুরভিসন্ধির কথা পূর্বাহ্নে প্রকাশ করে। সবাই জেনে গেল যে ঐদল সরকারে মৌরসী পাট্টা বজায় রাখার জন্যই উক্ত হীন চক্রান্তের ভাগীদার হয়ে নিজ স্বার্থে অকালে নির্বাচন চায় কৌশলে গদী দখলের চেষ্টায়। নির্বাচন পূর্বে ১৯৭৭ সালে যেমন জুন মাসে হয়েছিল তেমনি হোক, তবে তৎপূর্বে ভোটার তালিকা যথারীতি সংশোধিত আকারে ছাপা হোক ও সাধারণে তা দেখে নিশ্চিন্ত হোক যে ভোটার তালিকা সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তবেই নির্বাচন।

কিন্তু মজাটা এই যে চোরা না শোনে ধর্মের কথা এ প্রবাদ বচনটা এক্ষেত্রে বেশ ভাল ভাবেই প্রযোজ্য, কারণ পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সাধারণ লোকই জানে যে, কি সুকৌশলে সি, পি, এম তার দলের ক্যাডার, বেকারভাতা প্রাপ্ত যশংবদ ব্যক্তি ও সমর্থক-দের দ্বারা কিছু কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে ভোটার তালিকা তৈরী করে আলি-মুদ্দিন স্ট্রীটের নির্দেশমত। সাধারণতঃ ভোটার তালিকা পুরাপুরি নির্ভুল হয় না, কিন্তু এবারের ভোটার তালিকার সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সি, পি, এম সমর্থক ব্যক্তিদের নাম উক্ত ভোটার তালিকায় একাধিক ঠিকানায় ছাপা হয়েছে

ও একাধিক নির্বাচন কেন্দ্রের এলাকাভুক্ত। ভোটার তালিকা যদি নিরপেক্ষ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দিয়ে পরীক্ষা করান যায় তবে এ সত্য প্রকাশ পাবে যদি কোন বাড়ীতে ৫ জন লোক থাকে এবং তারা সকলেই কংগ্রেস (ই) দলের সদস্য বা সমর্থক তবে তাদের মাত্র একটাই নাম ভোটার তালিকায় দেখা যাবে, আর দশটা বা বিশটা অন্য এলাকায় সি. পি, এম কর্মী বা সমর্থকের নাম ঐ উক্ত ঠিকানায় দেখা যাবে, যদিও তারা কেউই ঐ ঠিকানার বাসিন্দে নয়। সমগ্র ভোটার তালিকায় এত অধিক মাত্রায় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে দলীয় লোকদের নাম ঢোকান হয়েছে যে সমগ্র ভোটার তালিকাকে বাতিল বলে গণ্য করা ও সম্পূর্ণ নূতনভাবে ভোটার তালিকা তৈরী করা দরকার যদি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কাম্য হয়।

●

পরলোকে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী

হাওড়ার প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী সুশীল কুমার মুখার্জি গত ২২শে ডিসেম্বর মেডিকল কলেজ হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০ বৎসর। তিনি আজীবন কংগ্রেস-সেবী ছিলেন ; স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার অবদান স্মরণীয়। তাঁহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁহার কন্যা ও স্ত্রীর প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

বরিশালের শোলনা গ্রাম নিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশীল রঞ্জন দত্ত গত ৩১শে ডিসেম্বর সকালে হাসপাতালে সেরিব্রাল থ্রম্বসীসে আক্রান্ত হয়ে ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। যৌবনে কলিকাতায় ছাত্র আন্দোলনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। পরে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ধৃত হয়ে নিরাপত্তা বন্দীরূপে বরিশাল জেলে তিনি বৎসর ছিলেন। পরিণত জীবনে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে যুক্ত ছিলেন। শেষ জীবনে বড়িবা কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। আমরা এই একনিষ্ঠ অমায়ীক স্বাধীনতা সংগ্রামীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা
বাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা
মূল্য—৩০ পয়সা

C/34

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলকানাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির—২.০০, ৪। সৈনিক সংগ্রাম কাহিনী—১.৫০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বোমার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৯০ ৭। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১০ মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.১৫, দেশ বাঘের ডোরেমি (১)—১.০০, ১৪। দেশবন্ধু [illegible]—১.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, [illegible] শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচে[illegible] ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৮.০০, ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা [illegible] .৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক –
শ্রীশান্তিলরণ রায়চৌধুরী

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাণী [illegible]
রেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ১৬ই মাঘ ১৩৮৮ ৩০শে জানুয়ারী ১৯৮২	১৬/১৭ সংখ্যা

তোমার আসন শূন্য আজি
হে বীর পূর্ণ করো ....

সম্পাদকীয়

প্রজাতন্ত্র দিবস

ভারতবর্ষের ইতিহাসে, বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ২৬ শে জানুয়ারী দিনটি বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ। ১৯৩০ সালে যখন পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করাই স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য বলে নির্দ্ধারিত হয় তখন লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য শপথ বাক্য রচনা করা হয়েছিল। প্রতি বৎসর ঐ দিনটিতে শত সহস্র দেশবাসী এই সঙ্কল্প গ্রহণ করতে থাকেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করা পর্য্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করতে থাকেন। সঙ্কল্প নেওয়ার জন্য বহু শত লোক কারাদণ্ড ভোগ করেছেন, পুলিশের গুলি ও লাঠি চালনার সম্মুখীন হয়েছেন। তাই এই দিনটি ভারতবাসীদের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তারপর নানা আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্যদিয়ে অর্জ্জিত হল লুপ্ত স্বাধীনতা। সংবিধান রচয়িতাকারী নেতৃবৃন্দ এই দিনটিকে স্মরণীয় করে তুললেন প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। এই দিনই প্রচলিত ভারতবর্ষের সংবিধান, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় রূপ ও সেবা কি প্রকারের হবে, তাই বর্ণনা করে গৃহীত হল সংবিধান। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সঙ্কল্প গৃহীত হল দেশবাসীর দ্বারা। আমাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে, দেশের সব মানুষের সম মর্য্যাদা দান করা, সব ধর্ম্মের আচরণ করার সমান সুবিধাদান এবং দেশের অগণিত দুঃখ দুর্দ্দশা পীড়িত মানুষের মত বাঁচবার বেড়ে উঠবার সুযোগদান। আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু সর্বাঙ্গীন সফলতা লাভ করা সম্ভব হয়নি কতকটা নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতিতে কতকটা বিশ্বপরিস্থিতির প্রতিকূলতার জন্য।

কিন্তু এবারকার প্রজাতন্ত্র দিবসে গর্ব অনুভব করবার মত বিভিন্ন স্তরে সফলতা লাভ করেছি। আজ আমাদের দেশ খাদ্য-স্বয়ম্ভরই শুধু নয়, অন্যের প্রয়োজনে আমরা খাদ্য সরবরাহ করে বহু মানুষকে অনশন থেকে অব্যাহতি দিতে পেরেছি। শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের স্থান হল পৃথিবীতে দশম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের স্থান পঞ্চম। নিরলস প্রচেষ্টার বিরাম নেই। আরো সফলতা লাভ ঘটবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক কাঠামো আজ মজবুত। বিদ্যুৎ, কয়লা, সিমেন্ট অন্যান্য প্রকার দেশের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের উৎপাদন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পেট্রোল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রগতি ক্রমবর্দ্ধমান। ইঞ্জিনিয়ারিং, সূতীবস্ত্র, রেশমজাত দ্রব্যাদি বিদেশের বাজারে রপ্তানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। দেশে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার ফলে, দেশে বিদেশে আমরা সুনাম অর্জন

করেছি। অগ্রগতির রথ যে দ্রুতার গতিতে এগিয়ে চলছে এতে কোন সন্দেহ নেই। যে মূঢ়ের দল বলে যে পঁয়ত্রিশ বছরে দেশের কোন উন্নতিই হয়নি। তারা অন্ধ, মতলববাজ এবং তারা দেশ হিতকারী কিনা সে বিষয়ে গভীর সন্দেহের অবকাশ আছে। তাদের সুমতি হোক, এই শুভদিনে এই কামনাই করি।

কিন্তু এ সব সত্বেও আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব যাতে সৃষ্টি না হয়, সেজন্য কোন্‌দিকে আমাদের সাফল্য সন্তোষজনক নয়, বিচার বিশ্লেষণ করে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং অভীষ্টলাভের পথকে মসৃণ ও সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রথম ও প্রধান কথা স্মরণে রাখতে হবে যে আজো প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে আছেন। তাদের অবস্থার অবিলম্বে প্রভূত উন্নতিবিধান করতে হবে। দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, জাতিভেদ ও অন্যান্য প্রকারের সামাজিক ব্যাধিকে নির্মূল করতে হবে। দেশের মধ্য থেকে দুর্নীতি, শ্রমবিমুখতা, উৎপাদন মানের অবনমন, প্রভৃতির মত সর্বনাশা মানসিকতাকে দূর করতে হবে। মানবীয় মূল্যবোধ ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমের পুনর্বাসন করতে হবে। জনকল্যাণ যজ্ঞে সব মানুষকে অংশীদার করে, এই কল্যাণ ব্রতের সাফল্য ত্বরান্বিত ও সুনিশ্চিত করতে হবে। এবারকার প্রজাতন্ত্র দিবসে এই হোক আমাদের নবসঙ্কল্প।

এইদিনে আমাদের অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে হবে। যাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, আদর্শ নিষ্ঠা চরম স্বার্থত্যাগ ও গৌরবোজ্জ্বল আত্মত্যাগের ফলে দেশের লুপ্ত স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তাদের স্মরণ করে মনন করে, তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য শপথ করতে হবে, এই দিনে। কি চেয়েছি, কি পেয়েছি, কি পাইনি তার হিসাব মেলাবার দিন এইটি। যা পাইনি, তা পেতে হলে কি করতে হবে, তারও বিচার বিশ্লেষণ করে এগিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করতে হবে এই দিনে।

নে তা জী

—কালীপদ সরকার

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম দিবস ভারত ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় সংগ্রামী যুগের বহু ঘটনার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। তার সঙ্গে মন ভারাক্রান্ত করে সেই অমীমাংসিত প্রশ্ন—নেতাজীর কি হল? এক প্রখ্যাত লেখক নেতাজী সম্বন্ধে বলেছেন,—

'Netaji Subhas Chandra Bose is one of the greatest enigmas of history. Many of the incidents connected with his life and death, alleged to be the result of a plane crash of Taifeh, in the Island of Formosa, and even his wedding to Emile Senchol, his former private secretary in Germany are wrapped in mistery.'—Statesman 18. 1. 70.

এই রহস্য প্রহেলিকার উন্মোচন হয় নি এবং কোন দিন হবে কি না কেউ বলতে পারে না। সে রহস্য বিস্ময়ের কুহেলী আবরণ ছায়ায় বসে আজ গান্ধীজী ও নেতাজীর আদর্শ ও জীবন সাধনা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার মাধ্যমে নেতাজীর হেরাশিতম জন্ম তিথিতে তাঁর প্রতি অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই প্রধান নায়ক গান্ধীজী ও নেতাজী উভয়ই ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ, সর্বত্যাগী, নির্ভীক দেশপ্রেমিক। উভয়ের চরিত্র ও সাধনা বিচার করলে দেখা যাবে একজন ছিলেন আর একজনের পরিপূরক। প্রবীণ গান্ধী এবং তরুণ সুভাষ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের মিলিত শক্তি-প্রবাহ। এ দুয়ের একজনকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের কথা ভাবা যায় না।

অহিংসাবাদী গান্ধীজীর নিকট অহিংসার আদর্শ ছিল জীবনধর্ম স্বরূপ, পক্ষান্তরে শক্তিবাদী নেতাজীর নিকট দেশের স্বাধীনতা অর্জন ছিল জীবন লক্ষ্য। গান্ধীজী তাঁর আদর্শের জন্য জীবন আহুতি দিয়েছেন, নেতাজী সংগ্রাম শেষে হারিয়ে গেলেন রহস্য আঁধারে। দুজনই বেঁচে রইলেন দেশবাসীর অন্তরে স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ রূপে, যুগ হতে যুগান্তরে। বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে একটু ভাবলে এই কথাই মনে হয়, এ যেন বিধাতার অদৃশ্য মহা বিধান। ভারতের নব বিশ্ববরেণ্য জীবন সংহিতা রচনার জন্য এঁদের মহা আত্ম-অবদানের যেন প্রয়োজন ছিল।

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত কর্মসূচী সম্পর্কে দুই নায়কের মধ্যে মৌলিক মত পার্থক্য ছিল। ১৯২১ সালে বোম্বাই-এ তরুণ সুভাষ ও প্রবীণ গান্ধীর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকালে যে মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল, ১৯৪০ সালে ওয়ার্ধায় তাঁদের শেষ সাক্ষাৎকাল পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত ছিল। কর্মনীতির দিক দিয়ে বিভিন্নতা থাকলেও, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও লক্ষ্যে উভয়ই ছিলেন এক, তাই গান্ধীজীর অন্তরে সুভাষচন্দ্রের জন্য যেমন স্নেহের পাত্র পূর্ণ ছিল, সুভাষের হৃদয়ে ধরা ছিল তেমনি গান্ধীজীর প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে দূর থেকে নেতাজী তাই সভক্তি অন্তরে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

'জাতির পিতা, তোমার আশীর্বাদ চাই।' এমন অনাবিল মানসিকতা সুভাষচন্দ্রের মধ্যেই সম্ভব।

নেতাজীর সৃষ্ট 'জয় হিন্দ' ধ্বনি এবং 'জাতির পিতা' অভিভাষণটি ভারতের ইতিহাসে অমরত্বের অধিকারী। গান্ধী নেতৃত্বের বিদ্রোহী ভারত পথিকের প্রকৃত গান্ধী-অনুধান বহু গান্ধীভক্তদের স্বাবকতা ম্লান করে দেয়। এর একটি দৃষ্টান্তই শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে মিলে, তিনি হলেন গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধ তাঁর সমকালীন ভারতের আন্তরিকতা-হীন লোকাচার সর্বস্ব ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রেমধর্ম প্রচার করে ছিলেন। বুদ্ধকে অস্বীকার করেও তাঁর মতবাদকে ভারতীয় ধর্মের অঙ্গে স্থান দিতে হয়েছিল এবং বুদ্ধকে পুরাণ বর্ণিত ভগবানের দশ অবতারের মধ্যে স্থান দিয়ে ভারতীয় ধর্মের সহিত একীভূত করা হয়েছিল। নেতাজীর ক্ষেত্রেও সে তথ্য সমভাবে প্রযোজ্য।

আজ একথা কেউই স্বীকার করেন না যে, একমাত্র গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে। নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং ব্রিটিশের ভারতীয় বাহিনীর উপর তার প্রচণ্ড প্রভাব ভারতীয় বাহিনীকে বিদ্রোহ উন্মুখ করে তোলার কারণেই যে ব্রিটিশ ভারত ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল সে কথা এখন দেশের ও বিদেশের অনেক ঐতিহাসিকই বলেন।

গান্ধীজী এবং সুভাষচন্দ্র মূলতঃ এক ধাতুতেই গড়া ছিলেন। উভয়ের কাছেই রাজনীতি পেশা অথবা আত্মপ্রতিষ্ঠার মঞ্চ ছিল না। গান্ধীজী বলেছেন, 'সেবার ভিতর দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায়। আমার কাছে এই সেবাই ভারতের সেবা' নেতাজী বলেছেন, 'স্বদেশ সেবা বা রাজনীতি আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করি নি, স্বরাজ লাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই আমার জীবনের তপঃ ও স্বাধ্যায় (বেদপাঠ), আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান।'

উভয়ের জীবনেই আধ্যাত্মিক প্রভাব সক্রিয় ছিল, তাঁদের সাধনার মর্মবাণী ছিল মানবতাবাদ, জনসেবা এবং দেশপ্রেম। এই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা গান্ধী ও সুভাষকে বার বার মরণজয়ী সংকল্পে অনুপ্রাণিত করেছে, দুঃখ ও বিপদে অবিচলিত থাকার সাহস ও শক্তি জুগিয়েছে।

আবার উভয় নায়কের চিন্তায় ছিল প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও সংগ্রামের পরিকল্পনা। গান্ধীজীর 'ইংরাজ তুমি ভারত ছাড়' যেমন ছিল প্রকাশ্য বিদ্রোহের ইঙ্গিত এবং যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর, নেতাজী প্রতিষ্ঠিত এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক স্বীকৃতি সমৃদ্ধ অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার কর্তৃক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিধি সম্মত যুদ্ধ ঘোষণা ও সংগ্রাম ছিল তেমনি প্রকাশ্য ও ঐতিহাসিক।

সিপাহী যুদ্ধের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধই ছিল ব্রিটীশ অধিকারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর ঘোষিত সশস্ত্র সংগ্রাম। একটি ছিল উদ্যোগ পর্বের দ্বিতীয়টি চূড়ান্ত পর্বের। জাপান কর্তৃক প্রতিশ্রুত বিমান সাহায্য প্রত্যাহার করায় আজাদ হিন্দ ফৌজকে জয়ের নিকটবর্তী হয়েও পশ্চাদাপসরণ করতে হয়। তবুও বিজয়ী বীরের ন্যায় স্বদেশে ফিরে না আসতে পারলেও, নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বময় ঐতিহ্য ও কীর্তিকথা দেশকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। এ সত্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় খোদ ইংরাজ লেখকের মুখেও :

'The ghost of Subhas Bose, like Hamlet's father, walked the battlements of the Red Fort and his suddenly amplified figure over-awed the Conference that were to lead to independence'

—মাইকেল এডওয়ার্ডস, ব্রিটিশ ঐতিহাসিক।

॥ প্রজাতন্ত্র দিবসের ভাবনা ॥

- স্বাধীনতার পরে তিনটি দশক অতিক্রম করেও ধনী দরিদ্রের ব্যবধান বেড়েছে। দারিদ্র্য সীমার নীচে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। এর কারণ মৌলিক ভূমি সংস্কারের ধারাবাহিক অনিচ্ছা ও দেশী বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির ক্রম বর্ধমান কর্তৃত্ব। সাম্রাজ্যবাদীর ঋণের বোঝায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজ বিপন্ন।

- বহু জাতি উপজাতি অধ্যুষিত এই দেশে আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের পটভূমিকাতে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার শক্তিগুলি সুযোগ খুঁজছে। সাম্রাজ্যবাদীরা এদের পেছনে থেকে চক্রান্তও করছে।

- ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রও আজ বিপন্ন। একচেটিয়া রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর, জনগণের, ট্রেড ইউনিয়ান, গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনের অধিকারে হস্তক্ষেপ নেমে আসছে। বিচার-ব্যবস্থা ও সংবিধানকে লংঘন করারও ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট। সমস্ত বিরোধী মতকে দমন করার স্বৈরতন্ত্রী ঝোঁক আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের শপথ : এই সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক মুক্তি, জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জনগণ সতর্ক হন, সোচ্চার হন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ—454/82

আবার এলো

২৬শে জানুয়ারী

—সঞ্জয় চ্যাটার্জী (৮ম শ্রেণী)

প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ দিন। এই দিনই ভারতের নব সংবিধান চালু হয়। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার জ্বালার অবসান ঘটাতে এই দিনই লিখিতভাবে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করা হয় আর তারই ফলস্বরূপ ১৫ই আগষ্ট আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করি।

তাই প্রজাতন্ত্র দিবস বা ২৬ শে জানুয়ারি দিনটি আমাদের জীবনে বিশেষ স্মরণীয়, আমাদের বিদ্যালয়েও এই দিবসটি বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্নের সঙ্গে পালন করা হয়। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এর জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। ঐদিন সকালে ছেলেরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। তারপর যথারীতি শ্রেণীবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ের পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে ব্যাণ্ডের সঙ্গে কুচকাওয়াজ করে প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে যাওয়া হয়। ওখানে অন্যান্য অনেক বিদ্যালয়ের মত আমাদের বিদ্যালয়ের ছেলেরা যথেষ্ট দক্ষতা দেখায়। সকলে সব সময় অংশগ্রহণ করতে না পারলেও উৎসাহী দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেও যথেষ্ট আনন্দ পায়। প্রতিবারের মত এবারও আমরা কুচকাওয়াজে অংশ নিচ্ছি ॥

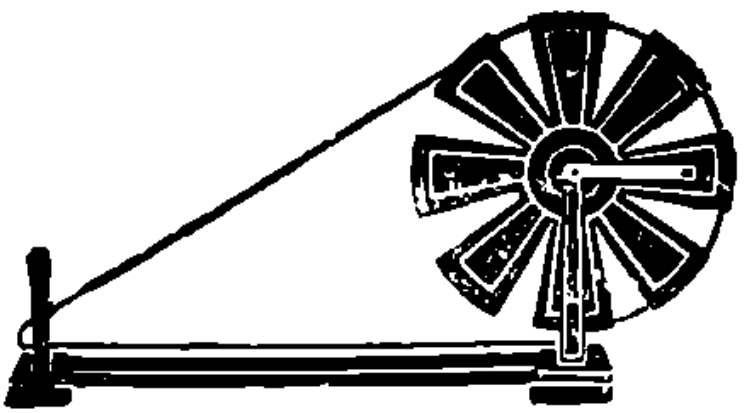

॥ গান্ধীজীর জন্মদিনে বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলী ॥

তারুণ্যশক্তি ও দেশের কাজ প্রসঙ্গে গান্ধীজী—

—মলয় ঘোষ

কবিগুরু গাইলেন গান, শিল্পী নন্দলাল আঁকলেন ছবি—'একলা চলো রে'! এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী অন্ধকার দেশের বুকে চলেছেন আলোর বর্তিকা জ্বালাতে। পথ বন্ধুর, যন্ত্রণায় আকীর্ণ। শতাব্দীর পরাধীনতায় অভিশপ্ত জনজীবনের ম্লান, মূঢ় মূক মুখে প্রতিবাদের ভাষা যোগাতে চান তিনি। উপায় একটিই—অহিংস সংগ্রাম আর সত্যাশ্রয়ী প্রতিরোধ। সত্যকে আশ্রয় করে নিজস্ব ধ্যানধারণায় অটল থাকা। শপথের সুদৃঢ় প্রাচীরে প্রতিহত করা—শাসকের নিষ্ঠুর আক্রমণ। অর্দ্ধনগ্ন ফকীর চলেছেন পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে, শ্মশান-মশান মাড়িয়ে—চৌরিচৌরার পথে, ডাণ্ডির উদ্দেশ্যে, মানবকল্যাণে তাঁর সেই অনির্বাণ পথচলা আজও শেষ হয়নি। ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের বুকের মধ্যে রক্তের অক্ষরে লেখা আছে একটি নাম—গান্ধীজী।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনটি ধারা—গান্ধীজী অনুসৃত অহিংস আন্দোলন, কংগ্রেসের বৃটিশবিরোধী প্রতিরোধ কর্মসূচী এবং চরমপন্থী বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম। এদের মধ্যে কোন্‌টির প্রয়োগ বাস্তবে স্বাধীনতা লাভে সবিশেষ উপযোগী হয়েছে তা বিতর্কের বিষয়। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়, এ তিনের একত্রিত উদ্যোগই ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে, অর্জন করেছে। প্রায় দুশো বছরের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন ক'রতে এই তিন পদ্ধতিরই প্রয়োজন ছিল, যেমন প্রয়োজন ছিল নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের বৃটীশবিরোধী যুদ্ধ ঘোষণার।

স্বাধীনতা গান্ধীজীর কাছে কোন আভিধানিক সংজ্ঞামাত্র ছিলনা। তাঁর কাছে এটি ছিল নিজস্ব ধ্যানধারণার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য। আজীবন এই লক্ষ্যে তিনি অবিচল ছিলেন। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা লাভও তাঁর কাম্য ছিল। সেই সঙ্গে দেশবাসীর আত্মিক স্বাধীনতাও। যা অর্জন করতে হয় নিষ্ঠা, শ্রম ও চরিত্রবল দিয়ে। সর্বপ্রথম এই আত্মিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই গান্ধীজী ডাক দিয়েছিলেন দেশের যুবসমাজকে। কারণ, তারুণ্যশক্তির উপর তাঁর সবিশেষ আস্থা ছিল। সত্যাগ্রহ ছিল তাঁর কাছে মানুষের আত্মিক স্বাধীনতা ও সুদৃঢ় মনোবলের পরীক্ষাস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

'সত্যাগ্রহের যুদ্ধ স্বাবলম্বন, স্বার্থত্যাগ, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যাগ্রহ অমূল্য অস্ত্র, ইহাতে নিরাশার অথবা পরাজয়ের স্থান নাই।' সত্যাগ্রহীও একজন সৈনিক, কিন্তু সাধারণ সৈনিকের চেয়ে তাঁকে অনেক বেশী দুঃখ সহ্য, সহ্য করতে হয় অনেক নির্যাতন।

এ যুদ্ধের বল পশুশক্তি নয়—আত্মিক শক্তি। তারুণ্যের মধ্যে এই আত্মিক শক্তির উদ্বোধনই গান্ধীজীর অভিষ্ট ছিল। সাধারণ একজন মানুষ সত্যাশ্রয়ী হয়ে, হিংসাকে পরিহার করে অসংখ্য নির্যাতন ভোগ করেও লোকহিতে ও ত্যাগব্রতে কিভাবে নিজেকে তিলে তিলে বিলিয়ে দিতে পারেন গান্ধীজীর জীবন থেকে আমরা সেই শিক্ষা পাই। যে মহান জীবনাদর্শ তিনি পরবর্তী কালের মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাকে অনুসরণ করার প্রয়োজন বর্তমানে আরও অধিকভাবে অনুভূত হচ্ছে। নিষ্কাম কর্ম, গীতায় যার কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন অর্জুনকে, গান্ধীজীর ব্রত ছিল। এই ব্রতের রূপায়ণ ছিল তাঁর সেবাধর্মে। জাতীয় জীবনের সার্বিক স্তরে তিনি এই সেবাধর্মকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ কাজে তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল দেশের যুবসমাজ। কারণ, তাঁর কথাতেই—'সেবাধর্মকে যে ব্যক্তি প্রধান ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে তাহার ব্রহ্মচর্য পালন করাই চাই, আর দ্বিতীয়তঃ সেবাধর্ম গ্রহণ করিলে দারিদ্র্যও চিরকালের জন্যই বরণ করিয়া লইতে হইবে।' দেশের তারুণ্য শক্তিকে তিনি সেবাধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন,—দারিদ্র্য আর ব্রহ্মচর্যের বিনিময়ে। যেহেতু, 'ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই শরীর রক্ষা, বুদ্ধিরক্ষা ও আত্মরক্ষা' এক দীর্ঘদিনের শোষিত, অবহেলিত ও বঞ্চিত জনজীবনের অর্দ্ধমৃত তারুণ্যকে তিনি ব্রহ্মচর্যের আগুনে জ্বালিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, ক্ষাত্রবীর্যে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন। বর্তমানেও এর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি।

রাস্কিনের 'আনটু দি লাষ্ট' গ্রন্থের অনুসরণে গান্ধীজী তাঁর 'সর্বোদয়' মতের প্রতিষ্ঠা করেন, যার মধ্যে সমাজবাদী চিন্তাধারার মূল সূত্রটি নিহিত আছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমজীবি জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হতে পারেনা। তাই সামাজিক মানুষের স্বার্থে রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। গান্ধীজির চিন্তায় এই সমাজতন্ত্রের ধাঁচটি ছিল ভারতীয় জীবনযাত্রার অনুসারে যেহেতু এ দেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করেন তাই গান্ধীজীর সমাজবাদের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ ও শিল্পনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্র বলতে তিনি বুঝতেন—সর্বহারার উত্থান, সমাজের সবচেয়ে নিচের লোকটিকে হাত ধরে তুলে আনা আর্থিক নিরাপত্তার মাটিতে। ধনী দরিদ্রের আর্থিক অবস্থার সমতা আনতে তিনি ধনীর শিরশ্ছেদ চাননি, চেয়েছেন তার শোষণের পথকে রুদ্ধ করতে। এখানেই গান্ধী সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। একমাত্র এই চিন্তাধারার অনুসরণেই ভারতবর্ষের মাটিতে ধনী-দরিদ্রের আর্থিক বৈষম্যের অবসান ঘটানো যায় এবং তার জন্য দেশের যুব সমাজকেই অগ্রণী হতে হবে।

গান্ধীজীর ধ্যানে ছিল এমন এক ভারতবর্ষ, যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তি মনে করবে—এ তারই দেশ, এদেশে তার একটা সক্রিয় সত্তা আছে। যেখানে থাকবে না সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, শোষণ অবিচার, সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে থাকবে সম্প্রীতির বন্ধন, দেশের প্রতিটি প্রান্ত থাকবে সংহতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ। স্বাধীনতার

পরে চৌত্রিশটা বছর কেটে গেছে। আজও এদেশের শতকরা ৪০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ কোন রকমে তাঁদের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রেখেছেন। দারিদ্র্য, বেকারী ও নিরক্ষরতার অভিশাপ এই ভূখণ্ডের জনজীবনকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধিকিধিকি জ্বলছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আগুন। প্রাদেশিক সংকীর্ণতার বলি উত্তর পূর্বাঞ্চলের এক গরিষ্ঠ জনসমষ্টি। ব্রহ্মপুত্রের চরার জুড়ে পোড়া অঙ্গারের স্তূপ, কংকাল-করোটি, অসহায় মানুষের আর্তনাদ শত শহীদের রক্তাক্তিত স্বাধীনতাকে উপহাস করছে। হরিজনের ঘর পুড়ছে আগুনে, লালে লাল হয়ে গেল শতাব্দীর আকাশ। ঘৃণায়, অবহেলায় ক্রমান্বিত শোষণে সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ কোন দিগদর্শন খুঁজে পাচ্ছে না।

আন্তরিক প্রচেষ্টা চলছে এই অভিশপ্ত ধারাবাহিকতার অবসানের। কিন্তু শুধুমাত্র সরকারী অথবা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে এই অবস্থাকে পাল্টে দেওয়া যাবে না। এজন্য এগিয়ে আসতে হবে দেশের যুব সমাজকেই। স্বাধীনতা প্রাক্কালে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে গান্ধীজী পদযাত্রা করেছিলেন। ১৯৩০-এ তাঁর ডাণ্ডী অভিযান বিজয়যাত্রার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। মানুষের দুঃখ, বেদনা-যন্ত্রণার দিনে তিনি তাদের হৃদয়ের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন বরাভয় দিয়েছিলেন, আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রতিরোধের প্রতিবাদের, সমগ্র জাতি সেদিন দাঁড়িয়ে উঠেছিল মহাত্মার আহ্বানে। আজ সংহতিহীনতা, সাম্প্রদায়িক সংশয়, বর্ণ বৈষম্য এবং জাতীয়তা-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশের যুবসমাজকে সেইভাবেই মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। যেখানেই সংহতি বিনষ্ট হবে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটবে, বর্ণ বৈষম্যের অভিশাপে নিগৃহীত হবে মানুষ, অপমানিত হবেন মানুষের ঈশ্বর—সেখানেই দেশের তরুণদের সক্রিয় প্রতিরোধের ভূমিকা নিতে হবে। একমাত্র তাহলেই হবে স্বদেশভাবনার প্রকৃত বোধন।

বেকারীত্বের অভিশাপ বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত অশিক্ষিত তরুণ আজ শুধুমাত্র নিজের যুহাতকে গঠনশীল কর্মে নিয়োজিত করতে চায়। তাদের সামনে কোন সুস্পষ্ট দিগ্‌দর্শন নেই। গান্ধীজী এসম্পর্কে অনেক আগেই ভেবেছিলেন। সেই কারণেই তিনি বৃহৎ শিল্পের চেয়ে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের উপর জোর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বিকেন্দ্রিত শিল্পনীতির কথা, বলেছিলেন ঘরে ঘরে কারুশিল্প প্রবর্তনের কথা, গ্রামে গ্রামে যার বাজার থাকবে। দেশের সমৃদ্ধি বলতে তিনি সব মানুষের সমৃদ্ধি বুঝতেন। তাই খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের মতো স্বল্প মূলধনী উদ্যোগের মাধ্যমে সমগ্র জনশক্তিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে যদি কৃষিতে হাতলাঙ্গল ব্যবহৃত হত, গো-মনুষ্য বিষ্ঠা সার হিসাবে কাজে লাগানো যেত, হাতে কাটা সুতো খদ্দর বহুল-প্রচলিত হত, তবে অনেক কম খরচে অনেক বেশী উৎপাদন ঘটত, কর্ম সংস্থানও বাড়তো।

আমাদের দেশে যে মনুষ্যবিষ্ঠা অপচিত হয়, তার পরিমাণ ৭০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন অর্থাৎ ৩৫০ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেটের সমান। শুধুমাত্র সংস্থার ও উদ্যোগের অভাবে এত সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পটি অবহেলিত হচ্ছে। গোবিষ্ঠা দিয়ে সম্প্রতি গোবর গ্যাস প্লান্ট চালানোর চেষ্টা চলছে। এছাড়া, বিভিন্ন প্রকার কারুশিল্প, যা প্রধানতঃ গ্রামে

উৎপাদিত হবে এবং গ্রামেই ব্যবহৃত হবে—এ সবের মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যার বহুলাংশে সমাধান সম্ভব। কর্মহীন তরুণবন্ধুদের এবিষয়ে ভাবতে অনুরোধ করি। প্রথমে শ্রমকে কাজে লাগিয়ে পরে প্রয়োজনে যন্ত্রের ব্যবহার—এই তত্ত্ব গান্ধীজী দিয়েছিলেন ভবিষ্যতের ভয়ংকর বেকার সমস্যার কথা মনে রেখেই। তাঁর স্বশাসিত স্বনির্ভর স্বরাজ গ্রাম ওই একই ভাবনার অনুসারী। চরকাও ছিল এই ভাবনারই প্রতীক। চরকার সুতো কাটাকে তিনি শ্রমশীলতা ও স্বল্পতম মূলধনে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড হিসাবে দেখতেন। স্বাধীনতার চৌত্রিশ বছর পরে, আত্মসমালোচনার প্রয়োজন এসেছে—বৃহৎ শিল্পায়ন কি আমাদের পক্ষে হিতকর হয়েছে না অহিতকর? সমস্ত বেকার এতে কাজ পেয়েছে কি পায়নি? কলকারখানা সবার মুখে অন্ন দিয়েছে না দেয়নি? এসব প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়। তাই গান্ধীজীর যুক্তি এখনও তেমনি জোরদার যেমন ছিল অনেকদিন আগে—যখন তিনি সবাইকে ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের কথা বলতেন, খদ্দর পরতে আর চরকা কাটতে বলতেন। তাঁর পথ যদি না আমরা অনুসরণ করি, দেশের কর্মহীন অসংখ্য মানুষকে কাজ যোগাবো কি করে?

গান্ধীজী গ্রামকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হিসাবে। তাঁর সর্বোদয়ের নীতিতে দেখি, ব্যক্তিমানুষের প্রয়োজনানুসারে ভোগাবস্তুর সমবন্টন। যে ভালবাসা একটি পরিবারকে একাত্ম করে রাখে, পারস্পরিক স্বার্থত্যাগ করতে শেখায়, তা-ই পারে একটি গ্রামের সমস্ত পরিবারকেও মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধতে। এই সমমর্মীতার ভিত্তিতে আদর্শ সামাজিক চেতনা এবং কৃষি ও পল্লীশিল্পের উপর নির্ভরশীল স্বাবলম্বী সমাজব্যবস্থা দেশের গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলাই বর্তমানে যুবসমাজের সামনে সবচেয়ে বড় কাজ। গ্রাম যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, সমৃদ্ধ হয়, দেশও স্বনির্ভর সম্পদশালী হবে।

মহাত্মাজী আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু ভাবতে ভাল লাগে তিনি আছেন আমাদের দেশ ভাবনার অতন্দ্র মুহূর্তগুলিতে, আমাদের উন্নয়নী সেবাকর্মের প্রতিটি উদ্যোগে। তাঁর ধ্যানের কল্পনায় শোষণহীন, বঞ্চনাহীন, দারিদ্র্যহীন, অন্যায় ও অবিচারহীন সুখী ভারতবর্ষ গ্রামরা আজও লাভ করতে পারিনি। অর্জন করতে পারিনি সুখার ভয়মুক্ত সমৃদ্ধ সমাজ। বাপুজী তাকিয়ে আছেন আমাদের তারুণ্যশক্তির দিকে আশায়, আগ্রহে। আমরা কি পারবো তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করতে? আজও কি পারবো না?

[আকাশবাণী কলিকাতা থেকে প্রচারিত]

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Sanction List for NOV. & DEC. 1981.

CALCUTTA

Name

Adhikary -Subodh Kumar 20 Narendranagar,—700 056

Banerjee Smt, Charulata, w/o Late Mahendralal,—19

Basu Duijendra Nath, 1, Woodburn Court—20

„ Smt Nivarani w o Late Hiralal, 22 Middle Road—14

Ramapati 57A Charu Avenue—33

Bhowal Narayan Ch. 16 South Park Modern Lane—32

Biswas Narayan Ch. 18A, Pubpara=56

Chakraborty Smt Jyoti, w/o Late Prasanna Mohan 133 Acharya P C Road—6

„ Smt Usha Rani Devi w/o Late Tirtha Ranjan Chakraborty—32

Chatterjee Smt Purnima w/o Late Nanda Gopal Chatterjee—5

Chaudhury Smt Hena 3 Peary Mohan Roy Road—27

Das smt Bhagwati w/o Late Radha Nath—6

Madhuru rani w/o Late Surja Kanta 91/4 Sashipukur Road—42

Dey smt Sabita w/o Late Manindra Nath—36

Taru Bala w/o Late Gopal Ch. 28B, Ismail Street—14

Dutta Smt Rama w o Late Rabindra Nath 68 Nehru Colony—40

„ Usha w/o Late Chandra Dutta 74/7 Becharam Chatterjee Lane—34

Ganguli Smt Maya w/o Late Priya Nath 12 Indrani Park—33

„ Sudhanshu Kumar 396/7A N. S. C. Bose Road—47

Ghosh Jyotirmoy P—795A Lake Town—55

Goswami Smt Indu Prova w/o Late Hari Gopal—28

Mitra Gauranga Sundar 128 Jamadar Khan Lane—19

Nag Smt Nibedita w/o Late Sailesh Ch.—17

Narayan Choudhuri Sushil M/C N. C. B. P. Ltd. 1 B, B. D. Bag—1

Paul Smt Kamal w-o Late Nepal Ch. 1-17 Rishi Bankim Ch. Road Extention—28

Roy Smt Asha Regent Estate—32

„ Parul Rani w-o Late Paresh Ch. 21-1 Aswini Dutta Road—20

Roy Choudhuri Smt Prativa (Bhadra)—59

Saha Chinta Haran 2 Mandeville Garden—19

„ Smt Prafulla Rani w-o Late Birendra Nath—19

„ „ Naina Devi w-o Late Ram Babu Saha—14

Samajdev Smt Usha Rani d-o Late Surendra Nath—5

Sarkar Kumari Tirtha Sudhan d-o Late Jagat—75

Sen Khagendra Nath A-21 C. I. T. Bldg —27

Sen Gupta Ashim Kr. C-14 L. I. G. Housing Estate 37 Belgatchia Road—37

Kumari Dipa w-o L. Jitendra, 5, Bidhan palli—37

Renu w-o L Sukdeb—50

Dist—24 PARGANAS

Basu Charu Chandra Barasat
Bhattacharjee Sm Kamala w-o Late Thakurdas Raipur
Chakraborty Smt Santo w-o Late Birendra Natagarh
Chaudhuri Smt Kironmoyee w-o Late Manoranjan 102-2 Asokenagar
Das Smt Suchitra w-o Late Radhika Mohan Milempalli, Titagarh
Das ,, Usha Rani w-o Manindranath Sreepally, Barrackpore
Das Gupta Smt Binita w o Susanta Kumar 197 Bidhan Pally, Garia
Deb Smt Malati Prova w-o Benoy Kumar 136 Subarnapattan, Kazipara
Dey Nitya Ranjan, New Barrackpore
Guha Smt Madhuri Prova w-o Late Ranjit Kumar Guha, Doalbagd
Guha Thakurta Smt Gita Rani w-o Late Pabitra Kumar, Gopalnagar
Mukherjee Smt Bela Rani w-o Late Sarajit Mukherjee 1375 Kalyangarh
Pandey Ram Abhilash 224/D Subarnapattan, Kazipara
Paul Jashoda Kumar Kalna, Joka
Saha Satish Chandra 507 3 Ashokenagar
Sinha Smt Sandhya w-o Late Sulal, Station Road, Bongaon

পরলোকে কংগ্রেস নেতা বিজয়চন্দ্র রায়

অবিভক্ত বাংলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা, বন্দবিলা সত্যাগ্রহ খ্যাত, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং যশোহর জেলা কংগ্রেসের দীর্ঘ কালের সম্পাদক বিজয় রায় গত ৮ই জানুয়ারী তাঁর প্রিয় বাসভূমি বন্দবিলায় (বাংলাদেশ) দেহরক্ষা করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর।

১৯৩০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে বিজয় রায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং বহু বার কারাবরণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের দুই দিক পাল মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এবং সতীন সেনের ন্যায় বিজয়চন্দ্রও দেশবিভাগের পর দেশ ত্যাগ করেন না এবং নিজ কর্মস্থল যশোহরেই থেকে যান। যশোহরের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরই তিনি ছিলেন আপনজন এবং একবার তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

কর্তব্য নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা ছিল বিজয়রায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যে গুণে তিনি বিভিন্ন মতের সহকর্মীদের নিয়ে এক সঙ্গে চলতে পারতেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং পরিবার বর্গের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক সহানুভূতি।

ফাঁসিমঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান

[ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সব বীর সন্তান ফাঁসির মঞ্চে বা ইংরাজ জল্লাদের গুলিতে প্রাণ দিয়াছেন তাহাদের আদর্শ, ত্যাগ নিষ্ঠা দেশপ্রেমকে ভুলিতে বসিয়াছি। তাই দেশে আজ এত বিশৃঙ্খলা, এত অধঃপতন। আত্মত্যাগী শহিদদের স্মরণ-মনন উদ্দিপিত করুক আমাদের জীবনকে —তাই আজ প্রণাম জানাই বীর শহিদদের—]

যারবেদা জেল ১৮ই এপ্রিল দামোদর চাপেকারের ফাঁসি হয়। পুণা জেলায় ১৮৬৯ সালে ২৫শে জুন জন্ম। পিতা হরি চাপেকার। অত্যাচারী কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ডকে হত্যার অপরাধে অপর দুই ভ্রাতা বালকৃষ্ণ ও বাসুদেবও ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দেন। একই পরিবারের তিনটী সন্তান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বলি হয় আজ থেকে ৮৪ বছর পূর্ব্বে। ১৮৯৮ সাল

যারবেদা জেলে বালকৃষ্ণ চাপেকারের ফাঁসি হয়। ১৮৭৩ সালে পুণায় জন্ম। মিঃ র‍্যাণ্ডএর হত্যাপরাধে ফাঁসি। ১৮৯৯ সাল

যারবেদা জেলে বাসুদেব চাপেকার এর, মিঃ র‍্যাণ্ডের হত্যা-পরাধে ফাঁসি হয়। অপর দুই ভ্রাতার সঙ্গে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিতে নিজের জীবনকে আত্মাহুতি দেন। জন্ম পুণায় ১৮৮০ সালে। ১৮৯৯ সাল

মহাদেও রাণাডে ১৮৮০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বাসুদেব চাপে-কারকে দুই পুলিশের গুপ্তচরকে হত্যার সাহায্য করার অপরাধে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হন ১০ই মে ১৮৯৯ সালে যারবেদা জেলে ফাঁসী হয়। ১৮৯৯ সাল

ক্ষুদিরাম বসু মাত্র ১৯ বছর বয়সে মজফ্‌ফরপুর জেলে ১১ই আগষ্ট ১৯০৮ সালে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয় গান গেয়ে যান। ১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর মেদিনীপুরে জন্ম। স্কুলে উচ্চ ক্লাশে পাঠরত অবস্থায়ই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং বিপ্লবী দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে পরিগণিত হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ১৯০৬ সালে ধৃত হন—কিন্তু পুলিশের হাত হইতে নিজেকে ছিনাইয়া আত্মগোপন করেন—কিন্তু পুনরায় ধৃত হন এবং ১৯০৬ সালের মে মাসে মুক্তি পান। ১৯০৭ সালে হাটগাছা মেদ ডাকাতি ও বাংলার গভর্নর এর উপর বোমা নিক্ষেপে অংশ গ্রহণ করেন নারায়ণগড় রেল স্টেশনে। ১৯০৮ সালে ওয়াটসন্‌ বমফিল্ড কুলারকে হত্যার চেষ্টা চালান।

১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল মুজফ্‌ফরের সেসন জজ কিংসফোর্ড এর গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করেন কিন্তু সেই গাড়ীতে অন্য ২ জন নিহত হয়। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় ১৯০৮ সালের ১১ই আগষ্ট। ১৯০৮ সাল

প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামের সহকর্মী এবং একই সঙ্গে মুজাফ্‌ফরপুরের সেসন জজকে হত্যার চেষ্টায় ধৃত হন। পুলিশের হাতে ধরা না দিয়া নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মাহুতি দেন। ১৯০৮ সাল

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ২১শে নভেম্বর ১৯০৮ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি হয়। মেদিনীপুরের সরকারী স্কুলের শিক্ষক এবং ঐ শহরেই বিপ্লবী দল সংগঠন করেন। বংগভংগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং এই কারণেই সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন। ১৯০৮ সালে মুজাফ্‌ফরপুর ও আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হন এবং সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আলিপুর জেলের ভিতর রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার অপরাধে ফাঁসি হয়। ১৯০৮ সাল

কানাইলাল দত্ত ১৮৮৭ সালে চন্দননগরে জন্ম গ্রহণ করেন। বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেন ও আলিপুর বোমার মামলায় জেলে বিচারাধীন থাকা কালীন রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার অপরাধে ১০ই নভেম্বর ১৯০৮ সালে ফাঁসি হয়। ১৯০৮ সাল

মদনলালাল ধিংড়া ১৯০৬ সালে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার জন্য ইংলণ্ড যান। সেখানে ভারতীয় বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের ফাঁসি ও দীপান্তরের প্রতিবাদে Political A. D. C. William Curzon Wyllieকে হত্যা করেন এবং সেই অপরাধে ১৭ই আগষ্ট ১৯০৯ সালে Pento Ville জেলে ফাঁসি হয়। — ১৯০৯ সাল

চারুচন্দ্র বসু খুলনা জেলায় শোভনায় জন্ম গ্রহণ করেন। সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে আলিপুর কোর্টে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ১৯শে মার্চ্চ ১৯০৯ ফাঁসি হয়। — ১৯০৯ সাল

বীরেন্দ্র নাথ দত্ত গুপ্ত ১৮৯১ সালে ঢাকা বিক্রমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। Deputy Supdt. of Police সামসুল আলমকে হাই কোর্টে ২৪শে জানুয়ারী ১৯১০ সালে হত্যা করেন। ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯১০ সালে ফাঁসী হয়। — ১৯১০ সাল

শ্রীহট্ট নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী S. D. O. Gordonকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিয়া Gordon এর Bunglowতে যান কিন্তু বোমা ছোড়ার সময়ই হাতে বিস্ফোরন ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয় ২৭শে মার্চ্চ ১৯১৩ সালে। — ১৯১৩ সাল

মাষ্টার আমীর চাঁদ ১৮৬৯ এ দিল্লিতে জন্ম গ্রহণ করেন। স্কুলে শিক্ষকতা ও সমাজসেবায় সকলের প্রিয় পাত্র ছিলেন। লালা হরদয়াল ও রাসবিহারী বসুর প্রেরণায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। ১৯১৪ সালে Viceroy Lord Hardinge এর হত্যার ষড়যন্ত্রে এবং লাহোর বোমার মামলা ও দিল্লি ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত হন এবং বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে ৮ই মে ১৯১৫ সালে ফাঁসি হয়। — ১৯১৫ সাল

বাল মুকুন্দ পাঞ্জাবে ঝিলম জেলায় ১৮৮৯ জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে বি, এ. পাশ করিয়া শিক্ষকতা করেন। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিতে যোগ দেন এবং Viceroy Lord Hardingeকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অপরাধে ৮ই মে ১৯১৫ সালে ফাঁসি হয়। — ১৯১৫ সাল

বসন্ত কুমার বিশ্বাস নদীয়া জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। রাসবিহারী বসুর সহকারী হিসাবে Viceroy Lord Hardinge এর উপর বোমা নিক্ষেপে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১১ই মে ১৯১৫ ফাঁসি হয়। — ১৯১৫ সাল

আউধ বিহারী ১৮৮৯ দিল্লিতে জন্ম গ্রহণ করেন। রাসবিহারী বসুর সহকর্মী হিসাবে Viceroy Lord Hardinge এর উপর বোমা নিক্ষেপের মামলায় ৮ই মে ১৯১৫ সালে ফাঁসি হয়। — ১৯১৫ সাল

বিষ্ণু গণেশ পিংলে তেলেগাঁও, পুণাতে ১৮৮৮তে জন্ম গ্রহণ করেন। আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার বিপ্লবী দলে যোগ দেন এবং বিভিন্ন নামে ভারতের সৈন্য ছাউনিতে সৈন্যদের মধ্যে সংগঠণ করেন। সৈন্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ করার অপরাধে বোমা সহ ২৩শে মার্চ ১০১৫ সালে গ্রেপ্তার হন। লাহোর জেলে ১৭ই নভেম্বর ১৯১৫ সালে ফাঁসি হয়। — ১৯১৫ সাল

ভোলানাথ চাটার্জী ভারতে সসস্ত্র বিপ্লব প্রয়াসে জার্মানী হইতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সেখানে পৌছিয়া দক্ষিণ পূর্ব ভারতের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া গোয়া সীমান্তে ভারতে প্রবেশের সময় পুলিশের হাতে ধৃত হইয়া পুণা জেলে নির্যাতীত হন এবং সেখানেই আত্মহনন করেন। — ১৯১৬ সাল

নলীনি বাগচি ১৮৯৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য হিসাবে নেতাদের নির্দ্দেশে নানাবিধ কর্মে নিজেকে যুক্ত রাখেন। আসামের আটগাঁও ও নবগ্রহ পাহাড়ে সসস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বীরত্বের সহিত মোকাবেলা করেন এবং পরে ঢাকায় কলতাবাজারে সসস্ত্র পুলিশ বাহিনীর প্রতিরোধে গুলিবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্ব তাহার নাম জানিবার অনেক চেষ্টা পুলিশ করে কিন্তু তিনি জবাব দেন—Dont disturb me let me die in peace. — ১৯১৮ সাল

১৬ই জুন ১৯১৮ সালে তার মৃত্যু হয়।

তারিণী প্রসন্ন মজুমদার বাংলার বিপ্লবী দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। নানা কর্মে লিপ্ত ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর তিনি ঢাকায় কলতাবাজারে পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হন। ১৫ই জুন ১৯১৮ সালে। — ১৯১৮ সাল

গোপীনাথ সাহা হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কলকাতা পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট-কে হত্যার প্রচেষ্টা ভুল করিয়া অন্য এক শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করেন এবং ১লা মার্চ্চ ১৯২৪ সালে আলিপুর জেলে ফাঁসি হয়। ১৯২৪ সাল

আলুরী সীতারাম রাজু পশ্চিম গোদাবরী জেলায় ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আদিবাসীদের সংগঠন করিয়া ইংরাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কুশলী গরিলা যোদ্ধা হিসাবে তিনি ইংরাজের ত্রাসের সঞ্চার করেন। তাঁকে ধরার জন্য ১০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজের গুলিতে ১৭ই মে ১৯২৪ নিহত হন। ১৯২৪ সাল

অনন্ত হরি মিত্র ১৯০৬ সালে নদীয়া জেলার বেগমপুরে জন্ম হয়। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। পরে বিপ্লবী দলে যোগদিয়া দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হইয়া যাবজ্জীবন করাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে Dy. Supdt of Police ভূপেন চেটার্জীকে হত্যার অপরাধে ২৮শে সেপটেম্বর ১৯২৬ সালে আলিপুর জেলে ফাঁসী হয়। ১৯২৬ সাল

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ১৯০৪ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত হন এবং জেলে ভূপেন চাটার্জিকে হত্যার অপরাধে ২৮শে সেপটেম্বর ১৯২৬ সালে ফাঁসী হয়। ১৯২৬ সাল

রামপ্রসাদ বিসমিল সাহাজানপুরে (উত্তর প্রদেশ) জন্মগ্রহণ করেন। কাকোরী মেল ডাকাতির অভিযোগে ধৃত হন এবং মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে গোরখপুর জেলে ফাঁসী হয়। ১৯২৭ সাল

আসফাকাউল্লা খান ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কাকোরী মেল ডাকাতির অভিযোগে ধৃত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৮ই ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে ফৈজাবাদ জেলে ফাঁসি হয়। ১৯২৭ সাল

ঠাকুর রোশন সিং ১৮৯৪ সালে উত্তর প্রদেশে জন্ম। কাকোরী মেল ডাকাতি মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। নৈনী জেলে ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে ফাঁসী হয়। ১৯২৭ সাল

রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ১৮৯২ সালে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত হন। কাকোরী মেল ডাকাতিতে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৭ই ডিসেম্বরে ১৯২৭ সালে গোণ্ডা জেলে ফাঁসী হয়। ১৯২৭ সাল

রামচন্দ্র ভরদ্বাজ ১৮৮৬ সালে পেশোয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। গদর পার্টির সভ্য ছিলেন। 'আকটাপ' 'আকাশ' ও 'ভারত মাতা' কাগজের সম্পাদক। ১৯১১ সালে আমেরিকা যান এবং লালা হরদয়াল-এর মৃত্যুর পর 'গদর' কাগজে সম্পাদনা করেন। সান ফ্রানসিসকোতে বৃটিশ গোয়েন্দার গুলিতে কোর্ট রুমে মৃত্যু বরণ করেন।

যতীন্দ্রনাথ দাস ১৯০৪ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বিপ্লবী দলে বিশেষ সভ্য ছিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হন এবং লাহোর সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ থাকেন। অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিবাদে ৬৩ দিন অনশন করেন এবং ১৩ই সেপটেম্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯২৯ সাল

অম্বুজা চরণ সেন ১৯০৫ সালে সেনহাটিতে (খুলনা) জন্মগ্রহণ করেন। পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষেপের সময় ঐ বোমার আঘাতেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। ১৯৩০ সাল

বিনয় কৃষ্ণ বসু ১৯০৮ সালে ঢাকা জেলায় জন্ম। ইন্সপেক্টার জেনারেল ল ম্যান-কে গুলিতে হত্যা করেন ও Supdt. of Police Hodson-কে আহত করেন। কিছুদিন ফেরার অবস্থায় থাকেন ও পরে Writers Building এর অলিন্দ যুদ্ধে Inspector general of Prison Mr. Simpson কে হত্যা করেন। ধৃত হইয়া হাসপাতালে ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯৩০ সাল

বাদল গুপ্ত ১৯১১ সালে ঢাকা জেলায় জন্ম। রাইটার্স বিল্ডিং-এ অলিন্দ যুদ্ধে প্রাণ হারান।

কানাই লাল ভট্টাচার্য্য ১৯১১ সালে মজিলপুর ২৪ পরগণায় জন্ম গ্রহণ করেন। বিপ্লবী দলের সভ্য। আলিপুর এর জজ গালিককে ২৭শে এপ্রিল হত্যা করেন এবং কোর্ট প্রাঙ্গনেই পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ১৯৩০ সাল

দেব প্রসাদ গুপ্ত ১৯১১ সালে চট্টগ্রামে জন্ম। ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে কালারপোলে ইংরাজ সৈন্যের গুলিতে নিহত হন। ১৯৩০ সাল

হরি গোপাল বল—চট্টগ্রাম বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন এবং জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরাজ সৈন্যের গুলিতে নিহত হন।

প্রভাসচন্দ্র বল (ঢ্যাগরা) চট্টগ্রাম বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেন। জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরাজ সৈন্যের গুলিতে নিহত হন। ১৯৩০ সাল

সন্তোষকুমার মিত্র ১৫ই অকটোবর ১৯০০ সালে কলকাতায় জন্ম। হিজলী বন্দী শিবির ২৬ সেপটেম্বর ১৯৩১ সালে বন্দী শিবিরের সৈন্যের গুলিতে নিহত।

ত্রিপুরা সেন চট্টগ্রাম জালালাবাদ পাহাড়ে ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে নিহত। ১৯৩০ সাল

নির্মল লালা	ঐ	১৯৩০ সাল
বিধু ভট্টাচার্য্য	ঐ	১৯৩০ সাল
নরেশ রায়	ঐ	১৯৩০ সাল
শশাঙ্ক দত্ত	ঐ	১৯৩০ সাল
পুলিনবিকাশ ঘোষ	ঐ	১৯৩০ সাল
মধুসূদন দত্ত	ঐ	১৯৩০ সাল
জীতেন দাশগুপ্ত	ঐ	১৯৩০ সাল
মতিলাল কাননগু	ঐ	১৯৩০ সাল

অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার জালালাবাদ পাহাড়ে গুরুতর আহত অবস্থায় ধৃত ও জেল, হাসপাতালে মৃত্যু। ১৯৩০ সাল

হিমাংশু বিমল সেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে দণ্ডিত হইয়া জেল হাসপাতালে মৃত্যু ১৯৩০ সাল

কালারপোল যুদ্ধে (চট্টগ্রামে) নিহত। ১৯৩০ সাল

স্বদেশ রায় ঐ ১৯৩০ সাল

রজত সেন ঐ ১৯৩০ সাল

দেবপ্রসাদ গুপ্ত ঐ ১৯৩০ সাল

মনোরঞ্জন সেন ঐ ১৯৩১ সাল

তারকেশ্বর সেন ১৮ই এপ্রিল ১৯০৫ সালে গৈলা গ্রামে (বরিশাল) জন্ম। হিজলী বন্দী শিবিরে সৈন্যের গুলিতে ১৬ই সেপটেম্বর ১৯৩১ সালে নিহত। ১৯৩০ সাল

ভগৎ সিং লায়ালপুর পাঞ্জাবে ২৭শে সেপটেম্বর ১৯০৭ সালে জন্ম। ১৯২৪ সালে বিপ্লবী দলে যোগ দেন। নানা বৈপ্লবিক কর্মে নিযুক্ত রাখেন এবং তন্মধ্যে কাকোরী মেল ডাকাতিতে অভিযুক্ত যোগেশ চ্যাটার্জি ও শচীন সান্যালকে কানপুর জেল হইতে পলায়ন করিবার প্রচেষ্টা চালান। ১৯২৮ সালে ১৭ ডিসেম্বর জে, পি, Saundus কে গুলি করিয়া হত্যা করেন। লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় ও অন্যান্য অভিযোগে লাহোর জেলে ২৩শে মার্চ্চ ১৯৩১ সালে ফাঁসী হয়। তাঁর দুই সহকর্মী শুকদেব ও রাজগুরু ঐ দিনই ফাঁসী হয়। ১৯৩১ সাল

শুকদেব লায়ালপুর, পাঞ্জাবে জন্ম। ভগৎ সিং ও রাজগুরুর সঙ্গে একই দিন ফাঁসী হয়। ১৯৩১ সাল

শিবরাম রাজগুরু, ভগৎ সিং ও শুকদেবের সঙ্গে একই দিনে ফাঁসী হয়। ১৯৩১ সাল

চন্দ্রশেখর আজাদ—মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়া জেলায় ২৩ শে জুলাই ১৯০৬ সালে জন্ম। পূর্ব্বপুরুষ উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলার অধিবাসী। বেনারস সংস্কৃত কলেজ ও কাশী বিদ্যাপীঠের ছাত্র। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও বেত্রাঘাতের শাস্তি হয়। পরে ভারতীয় বিপ্লবী দলে যোগ দেন। কাকোরী মেল ডাকাতি, ও ভগৎ সিং, রাজগুরু শুকদেবের সঙ্গে লালা লাজপৎ রায়ের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে লাহোরে পুলিশ সুপারিনটেডেণ্ট স্কটকে হত্যার প্রচেষ্টা। ঐ প্রচেষ্টায় Saundus নিহত হয়। পরে Central Legislative Assembl তে বোমা নিক্ষেপ। পরে কোন সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায় এলাহাবাদ alfred park কে পুলিশবাহিনীর দ্বারা ঘেরাও হন এবং দু-হাতে পিস্তল চালাইয়া কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করেন। এই সংগ্রামে পুলিশের গুলিতে ২৭ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ সালে নিহত হন। ১৯৩১ সাল

হরি কিষণ তদানিন্তন উত্ত পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মর্দ্দান জেলায় ১৯০৯ সালে জন্ম। খুদাই মিংমতগার আন্দোলনে যোগ দেন পরে বিপ্লবীদলে যোগ দেন। গভর্ণরকে হত্যার প্রচেষ্টায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন ও ৯ই জুন ১৯৩১ মিনওয়ালী জেলে ফাঁসী হয়।

দীনেশ গুপ্ত—৬ই ডিসেম্বর ১৯১১ সালে ঢাকায় জন্ম। Writers Building এ Simpson হত্যার অপরাধে ধৃত ও ৭ই জুলাই ১৯৩২ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে ফাঁসী।

অনিল চন্দ্র দাশ—৮ই জুন ১৯০৬ সালে ঢাকায় জন্ম। বিপ্লবীদলের সদস্য। পুলিশ হেফাজতে নৃসংশ অত্যাচারে মৃত্যু—২৭ শে জুন ১৯৩২ সালে। ১৯৩২ সাল

নির্মলকুমার সেন—চট্টগ্রামে জন্ম চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের এবং জালালাবাদ পাহাড়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। পরে পটিয়ার Capt. Comeron কে হত্যা করেন এবং নিজেও নিহত হন ১৩ই জুন ১৯৩২ সালে। ১৯৩২ সাল

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার—৫ই মে ১৯১১ সালে চট্টগ্রামে জন্ম। বিপ্লবী নায়ক সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীদলে কাজ করেন। পাহাড়তলী European Club আক্রমনের নেতৃত্ব করেন ২২ শে সেপ্‌টেম্বর ১৯৩২ সালে এবং ঐস্থানে আত্মাহুতি দেন। ১৯৩২ সাল

মৃণালকান্তি রায় চৌধুরী—বিপ্লবী দলের সদস্য। দেওলি বন্দি নিবাসে ৬ই জুন ১৯৩২ সালে আত্মহনন করেন। ১৯৩২ সাল

অনিল ভাদুড়ী—Statesman সম্পাদক Alfred Watson কে আক্রমণের অংশগ্রহণ কাল ৫ই আগষ্ট ১৯৩২ সালে এবং ঐদিনই আহত অবস্থায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯৩২ সাল

মনি লাহিড়ী—বিপ্লবী দলের সদস্য। Alfred Watson এর Case অনিল ভাদুড়ীর সাঙ্গে আহত হন ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯৩২ সাল

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস—চট্টগ্রামে জন্ম। চাঁদপুর রেল ষ্টেশনে পুলিশ অফিসার তারিণী মুখার্জিকে হত্যার অপরাধে ২রা মার্চ্চ ১৯৩২ সালে আলিপুর জেলে ফাঁসী হয়। ১৯৩২ সাল

কালীপদ মুখার্জি ঢাকা জেলায় জন্ম। Special Magistrate কামাখ্যা সেনকে হত্যার অপরাধে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ সালে ঢাকা জেলে ফাঁসী হয়। ১৯৩৩ সাল

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য ১৩ই নভেম্বর ১৯১৩ সালে মেদিনীপুরে জন্ম। জেলার শাসক Douglasকে হত্যার অপরাধে ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৩ সালে মেদিনীপুর জেলে ফাঁসী হয়। ১৯৩৩ সাল

অনাথবন্ধু পাঁজা ১৯১৪ সালে মেদিনীপুরে জন্ম। জেলাশাসক Burgeকে হত্যার প্রয়াসে পুলিসের গুলিতে ১রা সেপটেম্বর ১৯৩৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন। ১৯৩৩ সাল

মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত। মেদিনীপুর জেলা শাসক Mr. Burge কে হত্যার প্রয়াসে পুলিশের গুলিতে আহত হইয়া হাসপাতালে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন। — ১৯৩৩ সাল

হরিপদ বাগচী রাজসাহী দেওলি বন্দী নিবাসে ২২শে আগস্ট ১৯৩৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন। — ১৯৩৩ সাল

নির্মল জীবন ঘোষ হুগলি জেলায় জন্ম। মেদিনীপুরের জেলা শাসক Mr.Burge কে হত্যার অপরাধে ২৬শে অকটোবর ১৯৩৪ সালে মেদিনীপুর জেলে ফাঁসী। — ১৯৩৪ সাল

ব্রজকিশোর চক্রবর্তী মেদিনীপুর জেলা শাসক Mr. Burge এর হত্যার মামলায় ২৫শে অকটোবর ১৯৩৪ সালে জেলে ফাঁসী। — ১৯৩৪ সাল

সূর্য সেন (মাষ্টারদা) ১৮ই অকটোবর ১৮৯৩ সালে চট্টগ্রামে জন্ম। বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান সাধিত হয়। বহুদিন পলাতক থাকার পর পুলিশের হাতে ধৃত হন এবং জেলে পুলিশের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতিত হন—পরে ১১ই জানুয়ারী ১৯৩৪ সালে চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করেন। — ১৯৩৪ সাল

তারকেশ্বর দস্তিদার—চট্টগ্রাম—মাষ্টারদা সূর্য সেনের ধৃত হইবার পর তারকেশ্বরেই দলের নেতৃত্ব করেন। ১৮ই মে ১৯৩৩ সালে ধৃত হন এবং ১২ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসী হয়। — ১৯৩৪ সাল

ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য—১৯১৪ সালে ঢাকায় জন্ম। বাংলার গভর্ণর লর্ড এণ্ডারসনকে লেবং রেস কোর্সে হত্যার চেষ্টায় ধৃত হন ও রাজসাহী জেলে ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ সালে ফাঁসী হয়। — ১৯৩৫ সাল

"স্বাধীনতা বলতে শুধু রাজনৈতিক
অধীনতা থেকে মুক্তি বোঝায় না,
বোঝায় সম্পদের সুসম বণ্টন,
জাতিভেদ প্রথা ও সামাজিক
অন্যায়ের বিলোপ সাধন
এবং সাম্প্রদায়িকতা ও
ধর্মীয় গোড়ামী নির্মূল করা"

" সুভাষ চন্দ্র বসু"

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—মাত্র ১৫.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা
মূল্য—৩০ পয়সা

৫/30

সম্পাদক —
শ্রীশান্তিপদ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
শিল্পীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাদল ঘোষ

যোগাযোগ—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "থার্টি থ্রি বছর পরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজী [illegible] ফাইলস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—২০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। ভারতবর্ষে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৩.০০
৩। অনুশীলন সমিতির ই. মিস্ট্রি—২.০০, ৪। মেদিনীপুর সংগ্রাম কাহিনী—২.০০, [illegible]কোরী শতাব্দী—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—১.৫০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—১.৫০
৭। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—১.৫০, ৮। বিপ্লবের ও মহাত্মাজী—১.৫০
বিপ্লবী বিবেকানন্দ—১.৫০, মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—১.৫০
ভারতের মহাজাগরণ ও [illegible]
[illegible]ডেলেরি (১ ১)—১.০০, [illegible]১)—১.০০
১০। মহান চক্ষুদানের আলোকে—১.৫০, [illegible] মহান শিল্পী বিবেক—১.০০, [illegible] সংগ্রাম—১.৫০, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও [illegible] ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—১.৫০, ২০ [illegible] চেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭
নৈশেল স্টল—১/১/১/A বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০

মূল কার্যালয়—৪ নং বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ২৩শে মাঘ ১৩৮৮ ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২	১৮ সংখ্যা

জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পীঠে
চলে যেতে হবে আমাদের
চলে যাব।
তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণ পণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল।
এ বিশ্বকে এ শিশুকে—
বাসযোগ্য করে যাবো আমি
নব জাতকের কাছে এ আমার
দৃঢ় অঙ্গীকার।

—সুকান্ত

সম্পাদকীয়

কেন এই উষ্মা ?

বিধানসভার আগামী নির্বাচনের দিনক্ষণ স্থির করা নিয়ে প্রচণ্ড হৈ হল্লা করছেন এখানকার ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট দলগুলি। তারা ইতিমধ্যে ময়দানে এক সভাও করেছেন মার্চমাসের মধ্যে নির্বাচন শেষ করার দাবিতে। তাঁরা আরো বলেছেন যে এটা নাকি আন্দোলন পর্বের সবে শুরু। তারা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তুলেছেন সেগুলি যুক্তিসঙ্গত ত নয়ই, বরং হাস্যোদ্দীপক। অবশ্য তাদের প্রকৃত মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী এর মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে।

প্রকৃত অবস্থাটা কি, তা যে কোন চক্ষুষ্মান এবং অতি সাধারণ বুদ্ধির মানুষের নিকটও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বামফ্রন্ট দলগুলি বাদে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে ভোটার তালিকা ভুলে ভরা এবং ভোটার তালিকার সংশোধন করা না হলে এরাজ্যে স্বাধীন এবং অবাধ নির্বাচন হওয়া অসম্ভব। তাদের বক্তব্যের সমর্থনে বহু দৃষ্টান্তও তারা নির্বাচন কমিশনের নিকট উপস্থিত করেছেন। সেগুলি সরেজমিনে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন নির্বাচন কমিশনার যেটা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত এবং অন্যান্যদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্মত। বামফ্রন্ট সরকারের অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক দাবী হল যে তাদের অভিসন্ধিমূলক ভাবে তৈরী ভোটার তালিকা অনুযায়ী এবং তাদের ক্ষমতাসীন থাকা কালেই একমাত্র তাদেরই নির্দ্দেশে মার্চ মাসেই নির্বাচন করতে হবে। তাদের নির্দেশমত কাজ না করলেই নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্বের এবং কেন্দ্রীয় শাসকদলের চাপের নিকট নতি স্বীকার করেছেন বলে অভিযুক্ত করা হবে এমন অদ্ভুত উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত অভিনব, নির্লজ্জ দাবী তারাই করতে পারে, যাদের মস্তিষ্কে ধূসর পদার্থের শোচনীয় অভাব ঘটেছে। একটি রাজ্যের নির্বাচন কখন হবে, সেটা অনেক কিছু ঘটনা ও সার্বিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। বামফ্রন্ট দল যখনই নির্বাচন দাবী করবে তখনই তা সম্পন্ন করতে হবে এমন কোন বাধ্য বাধকতা নির্বাচন কমিশনের আছে কিনা তা রীতিমত যুক্তিতর্কের বিষয়। কোন দল কোন অভিযোগ করলে, তাদের অভিযোগগুলি পরীক্ষা না করেই সরাসরি নাকচ করে দিয়ে, বামফ্রন্ট দলকে বাধিত করতে হবে এমন দাবী বদ্ধ উন্মাদ ব্যতীত কারো পক্ষে তোলা সম্ভব নয়। নির্বাচন কমিশনার একাজ না করলেই বরং তাঁর নিরপেক্ষতা অপ্রমাণিত হত এবং তাঁর কর্ত্তব্যচ্যুতিও ঘটত একথা অনস্বীকার্য্য। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে একাজ যারা করছেন তাদের পক্ষেই এই রকম প্রলাপোক্তি করা সম্ভব। নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা অবাধ নির্বাচনের প্রাথমিক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ত্ত। একাজ করতে সচেষ্ট হলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে, একমাত্র হস্তীমূর্খেরাই এরকম আওয়াজ তুলতে পারে। কেন এই উষ্মা ? কেন এমন কাজ করছে বামফ্রন্ট দলগুলি, সেটাও বাংলাদেশের মানুষের অনুধাবন করে দেখতে হবে। এদের এতদিন অভিযোগ ছিল, তাদের পূর্ণ সময়ের জন্য ক্ষমতায়

থাকতে না দিয়ে, যে কোন অজুহাতে ফেলে দেওয়া হবে। এখন এদের দাবী, নির্দ্ধারিত সময় সীমার পূর্বেই নির্বাচন করো, অর্থাৎ এদের ফেলে দাও। জুন মাসে এদের কার্যকাল পূর্ণ হবে। তার আগেই নির্বাচনের দাবীর মধ্যে অনেকগুলি কারণ আছে। সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যায় যে আগামী বছরের জন্য এরা বাজেট্ তৈরী করলে শোচনীয় ঘাটতি দেখাতে হবে, আয়ব্যয়ের সমতা আনার জন্য নতুন করে এবং বিরাটভাবে ট্যাক্স বসাতে হবে। রাজ্যের অর্থ ভাণ্ডার ত শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে। কোটি কোটি টাকা কি ভাবে অপব্যয়িত হয়েছে, সে চিত্রটাও ফুটে উঠবে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধের ব্যাপারে যথাযথ কর্ত্তব্য পালন না করার জন্য জুন মাসেই দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। যত দিন যাবে, বিদ্যুৎ ঘাটতি, শিল্পে ও কৃষির উৎপাদনেপ আরও ঘাটতি হবে। তখন নির্বাচন হলে, সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে বোকা বানান ও প্রায় অসম্ভব হবে। গ্রামে, গঞ্জে, হাটে বাজারে, শহরে এদের অপদার্থতা ও ব্যর্থতার জন্য জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এবং প্রতিদিনে আরো হবে। তাই যারা বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে, তাদের নাম কেটে দাও, যারা অন্ধভাবে এখনও এদের সমর্থন করবে, তাদের নাম ঢোকাও, পরিণত বয়স্ক নির্ভরযোগ্য লোক না পেলে, শিশু ও কিশোরদের নাম তালিকাভুক্ত করো। এবং এমন কর্মী নিয়োগ এরা পরিকল্পনা অনুসারে করে রেখেছে যারা এদেরই সমর্থক। রাজ্য কমিশন আক্ষরিক অর্থে নিরপেক্ষ বলা হলেও কার্য্যতঃ এই রাজ্যের কর্মীদের মধ্য থেকেই নিয়োগ করা হয়েছে। তারা এক দালান থেকে অন্য দালানে কাজ করতে বসলেই রাতারাতি নিরপেক্ষ হয়ে যাবে, এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর নেই। এরা ক্ষমতাসীন থাকাকালেই নির্বাচন করতে পারলে প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও অন্যান্য কর্মীদের মাধ্যমে এবং পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে বাকীটা সম্পন্ন করা যাবে এটাই আসল মতলব। এই মতলব সাধনে বাদ সাধনের কোন প্রচেষ্টা হলেই গেল, গেল, সব গেল বলে হুল্লোড়বাজী করাই এরা একমাত্র কর্ত্তব্য বলে মনে করছে। জনপ্রিয়তার যে দাবী এরা করছে, সেটা সত্য হলে নির্বাচন যখনই হোক, ভোটার তালিকা সংশোধিত হলেও তাতে ভয় পাবার কি কারণ থাকতে পারে? এইখানেই এই সোরগোলের মৌল কারণগুলি নিহিত।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে, বিশেষ করে কংগ্রেস (ই) দলকে ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবী তোলার জন্য তারা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে ভীত বলে আখ্যাত করা হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনাগুলির সমীক্ষ নিরীক্ষা করলে কিন্তু বিপরীত সত্যটাই উদ্‌ঘাটিত হবে। বামফ্রন্ট দলগুলি নিজেদের ব্যর্থতার গ্লানিতে চিহ্নিত হয়েছে, তাই তারাই অবাধ নির্ব্বাচনের সম্মুখীন হতে ভীত, সন্ত্রস্ত, এমন কি বেসামাল হয়ে পড়েছে। তাই তারা নানাপ্রকার কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে, একদিকে নিজেদের মালিন্য ঢাকতে চাচ্ছে, অন্যদিকে ধোকা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। কিন্তু এটা বহুদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য যে কিছু লোককে সব সময়ের জন্য, বহু লোককে অল্প সময়ের জন্য বোকা বানান সম্ভব হলেও, সব লোককে সব সময়ের জন্য বোকা বানান যায় না। আমরা প্রত্যাশা করব যে মতলববাজদের হৈ হুল্লায় কর্ণপাত না করে, যথাযথ ভাবে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে, নির্বাচন কমিশনার যথা কর্ত্তব্য পালন করবেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কি নাই ?

জীবানন্দ ভট্টাচার্য

কংগ্রেস (ই), কংগ্রেস (এস), কংগ্রেস (জে) এছাড়া অনেক আঞ্চলিক কংগ্রেস আছে,—কংগ্রেস (গান্ধী কামরাজ), কংগ্রেস (মণি) কংগ্রেস (জসেক) গত নির্বাচনে দেখাগিয়েছিল কংগ্রেস (সংগঠন)ও আছে।

১৯৮৫তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শত বর্ষ পূর্তি উৎসব। কে সেই জাতীয় কংগ্রেসের উত্তরাধিকাররূপে উৎসব উদযাপন করবেন ? উপরে বর্ণিত নানা চিহ্নের কংগ্রেস ছাড়াও অসংখ্য কংগ্রেস সেবী আছেন তারা কোন চিহ্নের উৎসবে যোগ দেবেন ? এককালে তারা কংগ্রেসের সেবায় আত্ম নিয়োগ করেছিলেন, জীবনে প্রতিষ্ঠার পথ ত্যাগ করে, অভিভাবকের তিরস্কার মাথায় নিয়ে, আত্মীয় স্বজনের বিরাগভাজন হয়ে পথে বেরিয়েছিলেন। এদের সেদিন কি শুধুই মিলেছিল রাজরোষ, নির্যাতন, কারাগার! না, মিলেছিল দেশবাসীর অকুণ্ঠ স্নেহ ভালবাসা, অর্জন করেছিল দেশবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার আসন। সেই স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধাই ছিল কংগ্রেসের মূলধন। স্বাধীনতা লাভের পর এদের বেশীর ভাগই ক্ষমতা লাভের ঘোড়দৌড়ে যোগ দিতে পারেন নাই, ফলতঃ প্রতিষ্ঠানেরও বাইরে থাকতে হয়েছে। এর ভেতর এখনও যারা এজগতে আছেন তারা জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছেছেন। চরখা লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা আজও তাদের হৃদয়ে আবেগ সঞ্চার করে। শুনেছি ১৯৭৭ সালে দিল্লিতে যেদিন কংগ্রেস (ও) র জনতা দলে বিলয় ঘটে সেদিন ঐ কংগ্রেসের একজন প্রবীন আর একজন কংগ্রেস কর্মীকে, বলেছিলেন—রাজনীতির প্রয়োজনে এটা করতে হচ্ছে কিন্তু ঐ যে পতাকা, ঐ পতাকা ছেড়ে অন্য পতাকার তলে সমবেত হতে হবে এই যা দুঃখ। ঐ পতাকার সম্মান রাখতে একদিন তিনি লাঞ্ছিত হয়েছিলেন—একথা বলতে তার চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছিল। বাস্তববাদী রাজনীতিক বলবেন—'এ নিছক ভাবাবেগ। কিন্তু প্রচুর হৃদয়াবেগ ছাড়া কি এতবড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। আজ যখন দেখি কংগ্রেস সভা বা মিছিলে নির্বাচনী প্রতীক (হস্ত) লাঞ্ছিত পতাকা তখন দুঃখে ক্ষোভে মন ভারাক্রান্ত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নাম ও তার পতাকার বিকৃতি যত শীঘ্র সম্ভব দূর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বলাবাহুল্য কংগ্রেস (ই) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। বিভাজনের সময় দু'পক্ষের দাবির বিচার সাপেক্ষে দু'পক্ষকে দুটি নির্ব্বাচন চিহ্ন দেওয়া হয় এবং দুয়ের পৃথকত্ব বোঝাতে কংগ্রেস নামের শেষে দুই সভাপতির নামের অংশ জুড়ে দেওয়া হয়। একটিতে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির রেড্ডি বা (আর) কিম্বা অপরটিতে ইন্দিরা গান্ধীর গান্ধী দিলে পড়ে মহাত্মা গান্ধীর নামের সুযোগ দেওয়া হয় এজন্য ইন্দিরা বা (ই) দেওয়া হয়। নামটা কংগ্রেস (ই) না হয়ে দাঁড়ায় ইন্দিরা কংগ্রেস।

সংবাদপত্রে, সভা সমিতিতে, বিধান সভায় এমন কি আকাশবাণীতে তাচ্ছিল্য ভরে উচ্চারিত হত 'ইন্দিরা কংগ্রেস'। ভাবটা এই যে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী নিজ নামে পৃথক

দল করেছেন। অনেক বার সভায় এবং সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন,—তিনি বা তার দল এই নাম নেয়নি নির্বাচন কমিশন পৃথকত্ব বোঝাতে এই নাম দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কংগ্রেস (আর, বর্তমানে এস) এর কথা ছিল শ্রীমতী গান্ধী একটি পৃথক দল করেছেন এবং যদি তিনি পুনরায় আসতে চান তবে তারা তা বিবেচনা করে দেখবেন। (ধৃষ্টতা !) বস্তুতঃ নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের আবেদনে শেষ পর্যন্ত এই ছিল যে ওটা একটা পৃথক দল কংগ্রেস সংগঠনের নিয়ম অনুসারে সভা ডেকে ওটা গঠিত হয় নি ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের রায় হল শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস প্রকৃত কংগ্রেস অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এই রায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেস আর তখন ইউ) আদালতে না গেলেও কিছু স্বয়ং সিদ্ধ কংগ্রেসী শা কমিশনের অভিনয় মঞ্চের পাদ প্রদীপে প্রকাশিত হয়েছিলেন এমন আইনজ্ঞ দ্বারা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট সে আবেদন অগ্রাহ্য করে নির্বাচন কমিশনের রায় বহাল রাখেন। এই রায়ের পরই একজন কংগ্রেস নেতা বললেন—আমরাই প্রকৃত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, তবে আমরা এখনও কংগ্রেস (ই) নামেই চলতে থাকব কেন ? তাদের বক্তব্য যাই হোক যুক্তিতে তা টেকে না।

এই (ই) বাদ দেওয়ার প্রস্তাবে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি কটাক্ষ বা অমর্যাদার কথা আসে না। বরং এস, জে. এম প্রভৃতির সাথে তাকে সম পর্যায়ে রাখায় তার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। কোন কোন মহল বলা হয় তিনি দুবার কংগ্রেসকে বিভক্ত করেছেন। ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি দুবার কংগ্রেসকে বিলুপ্তি ও অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

কংগ্রেসের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। আবাদী কংগ্রেসে প্রস্তাব হল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ (Socialistic pattern) পরবর্তী ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। অথচ কংগ্রেস সরকারের সেদিকে পদক্ষেপে দ্বিধা। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাকৃতিক সম্পদের জাতীয়করণ প্রথম পদক্ষেপ। সেই সাথে আসে ব্যাঙ্কগুলিকে মুদ সর্বস্ব মালিকানার হাত থেকে উদ্ধার করে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা। তার অর্থমন্ত্রী বলে বসলেন, আমার মৃত দেহের উপর দিয়েই কেবল ব্যাঙ্ক জাতীয় করণ হতে পারে। এর ফলেই বিরোধ সৃষ্টি, আরও কারণ ছিল। কংগ্রেস ১৯৬৯ সালে বিভক্ত হল। ব্যাঙ্ক জাতীয় করণ, কয়লা খনিগুলির ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে শ্রমিক শ্রেণীর জীবন ধারণের মত মজুরি বৃদ্ধি, দুই শতের অধিক প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যের রাজা মহারাজাদের ভাতা, খেতাব ও বিশেষ নাগরিক অধিকারের বিলোপ সাধন প্রভৃতি নানা পদক্ষেপে কংগ্রেসে নব জীবনের সঞ্চার হল। তারই ফলশ্রুতি ১৯৭১-৭২-এর নির্বাচনে কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে কংগ্রেসের বিরাট সাফল্য। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস কয়েকটি রাজ্যে হেরে যায় আর নির্বাচনের পর উত্তর প্রদেশে চরণ সিং এবং মধ্য প্রদেশে গোবিন্দ নারায়ণ সিং দল ত্যাগ করে জনসঙ্ঘের সাথে হাত মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীত্ব লাভ করেন। ফলে বড় সাতটি রাজ্য কংগ্রেসের হাত ছাড়া হয়। কেন্দ্রে অর্থাৎ লোকসভায় সংখ্যালঘু না হলেও গরিষ্ঠতার যথেষ্ট লাঘব হয়। সিণ্ডিকেট নেতৃত্বের গতানুগতিক পথে চলতে দিলে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের অবলুপ্তির সম্ভাবনাই ছিল।

১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের

প্রথম পরাজয়। এই পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক নয়, মাত্র এইটুকুই বলা যায় যে ইমার্জেন্সি ঘোষণা কারণ নিশ্চয়ই নয়, ওটা করণ অর্থাৎ ঐ অস্ত্র দ্বারা নির্বাচনের লড়াইয়টা হয়েছিল। লোকসভায় কংগ্রেসের আসন তখন ১৪৩। জনতা পার্টির ঘটক দলগুলির অধিকাংশেই পুরাতন কংগ্রেসী। নির্বাচনের পরই যোগ বিয়োগের অঙ্ক সুরু হয়। প্রথমে গুঞ্জন, পরে আলাপ আলোচনা, ক্রমে দু' একটি সংবাদপত্রের প্রকাশ পেতে লাগল যে জনসঙ্ঘকে বাদ দিয়ে কেন্দ্রে সব কংগ্রেসী মিলে একটি সরকার হতে চলেছে। এটা ঘটতে দিলে সমগ্র কংগ্রেসেরই কবর হত। ১৯৭৮ এর বিভাজনের অব্যবহিত পূর্বক্ষণের কারণ যাইহোক বিভক্ত হওয়ায় ঐ অঘটন ঘটতে পারে নাই।

শ্রীমতী গান্ধীর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ফলেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেছে। কংগ্রেসকে মর্যাদার আসনে ও ভারত-বাসীর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নির্বাচন সর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্বাচনকালীন কর্মচাঞ্চল্য দেখালে তা সম্ভব নাও হতে পারে।

অনুশীলন সমিতি

৩২/৮, চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০

সর্বভারত-সশস্ত্র অভ্যুত্থান : ৬৭তম স্মরণ-দিবস

প্রিয় সতীর্থ,

আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ ইং, রবিবার মধ্যাহ্ন ১২ টা হইতে কলিকাতা মহাজাতি সদনে মহানায়ক রাসবিহারী বসু পরিকল্পিত "সশস্ত্র অভ্যুত্থান দিবস" উদ্‌যাপিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করিবেন এবং ইনষ্টিটিউট অব হিস্টরিক্যাল স্টাডিজের অধ্যক্ষ শ্রী নিশীথরঞ্জন রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। অধ্যাপক অমলেন্দু দে "রাসবিহারী স্মারক বক্তৃতা মালা"-উদ্বোধনী ভাষণ দিবেন।

এই অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি ও আন্তরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

অনুশীলন সমিতির পক্ষে আহ্বায়ক : পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র ঘটক

অনুষ্ঠান সূচী :

প্রথম অধিবেশন ১২টা—১-৩০ মি: মূল অনুষ্ঠান। শ্রীজীবন তারা হালদার কর্তৃক অনুশীলন সমিতির আশী বৎসর পূর্তি উৎসবের কার্যসূচী ঘোষণা।

১-৩০টা হইতে ৩টা আহার ও বিশ্রাম।

দ্বিতীয় অধিবেশন ৩টা—৫-৩০ মি: চক্ষুদান মরদেহ দানের শপথ গ্রহণ। "রাসবিহারী স্মারক" বক্তৃতামালা উদ্বোধনী ভাষণ।

সন্ধ্যা ৫-৩০ মি: হইতে ফিল্ম ডিভিসন ও লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

গণতন্ত্রের বিপদ

কালীপদ সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৫ই জানুয়ারী বর্ধমানের উকরিদ গ্রামে ফসল ভাগাভাগি নিয়ে দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে চারজন জখম হন, তিনটি বাড়ি ভস্মীভূত হয়।

ঐ দিন রাত্রিতে কলিকাতার খিদিরপুরে সি, পি, এম এবং কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে বোমা, সোডার-বোতল ইত্যাদি নিয়ে লড়াই চলে। কাশীনাথ দত্ত রোডের কিছু দোকান লুণ্ঠন হয়। ১৫ ব্যক্তি আহত হন।

'চলছে চলবে হাঁকে মস্তান ক্যাডার,
নেতারা বাজায় ঢোল রাম শিঙা কাঁসি।
নিশীথ শ্মশানে দেশ-জননীর কোলে
মড়ার মুখে আগুনে জ্বলে পরিহাস হাসি।'

১৮ই জানুয়ারী হাজার তিনেক লোক লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে মেছোভেরী দখল করতে যাবার পথে হাড়োয়া গ্রামে অনেকগুলি কুটীর পুড়িয়ে দেয়। কয়েকখানা পাকা বাড়িতে আগুন ধরায়।

আসানসোলের নিকট নন্দীগ্রামে সি, পি, এম পরিচালিত জনতার আক্রমণে ১০ জন আহত হলে গ্রামে ১৪৪ ধারার আদেশ বলবৎ হয়।

২০শে জানুয়ারী বাসন্তী থানার উত্তর সোনা-খালি গ্রামে মেছোভেরী লুট অভিযানে দুজন সি, পি, এম সমর্থক নিহত এবং পাঁচজন আহত হন। সি, পি, আই পন্থীরা মেছো ভেরীর মালিকদের পক্ষ নেয়।

ঐ তারিখে মন্দির বাজার থানার বল্লভপুরে এক সংঘর্ষে এস, ইউ, সি সমর্থক বিভূতি হালদার (২১) নিহত হন।

২১শে জানুয়ারী হাসনাবাদ থানার ভবানীপুরে সি, পি, এম জনতার সংঘর্ষে একজন সি, পি, আই-এর লোক নিহত এবং চারজন আহত হন।

আসানসোল এলাকার অজয় কোলিয়ারিতে লক-আউট নিয়ে ২২শে জানুয়ারী সি, পি, এম ও এস এস পি শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে কম পক্ষে ২০ জন জখম হন। আহতদের মধ্যে ৪ জনকে হাস-পাতালে পাঠানো হয়। ২টি লরীতে আগুন লাগানো হয়।

২৬শে জানুয়ারী ঐ এলাকায় চিংকুরিয়া গ্রামে ফ: ব: এবং সি, পি, এম সমর্থকদের মধ্যে হানা-হানিতে তিন ব্যক্তি আহত হন।

২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারী দুদিন ধরে কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গায় সি, পি, এম এবং ফ: ব: অনু বর্তীদের মধ্যে লাঠি, তরোয়াল, বোমা প্রভৃতি নিয়ে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে। আই, এন, টি, ইউ সি কর্মী দুর্গাপদ সরকার (৩০) নিহত ও ১৫ জন আহত হন। পুলিস ২০ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে ও লাঠি চালায়।

২৮শে জানুয়ারী রায়গঞ্জ থানার হরিগোপাল-পুরে কয়েকজন আসামীকে গ্রেপ্তার করতে গেলে দেড়হাজার লোকের সি, পি, এম জনতা পুলিসদলকে আক্রমণ করে ৬টি রাইফেল ও ২৪০ রাউণ্ড গুলি কেড়ে নেয়। পুলিস গুলি চালালে চার ব্যক্তি নিহত ও ২২ জন আহত হন। পুলিসের একজন এস, আই, ও একজন কনস্টেবলও আহত হন। ঐ তারিখে পুকুর থেকে জোর করে মাছ ধরার

আপারে ক্যানিং এর নিকট খোলাখুলি গ্রামে সি পি এম এবং এস ইউ সি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে আট জন আহত হন।

ঐ তারিখে জামুরিয়া থানার চিখুরিয়া গ্রামে ফসল ভাগ নিয়ে সি পি এম এবং ফঃ বঃ-এর লোকদের সংঘর্ষে ১৬ ব্যক্তি আহত হন।

২২শে জানুয়ারী জামুরিয়া থানার হিজলগোড়া গ্রামে সি, পি,এম জনতার সহিত জমির মালিকদের সংঘর্ষে দশ ব্যক্তি আহত হন। আহতদের মধ্যে দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

৩০শে জানুয়ারী কলিকাতার এনটালিতে সি পি এম-এস ইউ সি সংঘর্ষে পুলিস হস্তক্ষেপ করলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়।

৩১শে জানুয়ারী থানা ভিত্তিক পরামর্শ কমিটি গঠনে ফ্রন্টের চোদ্দ শরিক একমতে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। ১১টি শরিকদল সি, পি, এম কে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে। সভায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না। যুক্তফ্রন্টে সংকট গভীরতর হয়ে উঠে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, 'ওরে অন্তরে আয়, ঘুচে যাবে সব অন্তরায়।' কিন্তু অন্তর যাদের বেহেনাবন্ধ, বিবেক ভাড়া খাটে, সেখানে অন্তরায় তাদের দূর হবে কি করে?

১লা ফেব্রুয়ারী এস, ইউ, সি ইউনিয়নের দুজন শ্রমিক কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্গাপুরে সি, পি, এম সমর্থিত ঠিকাদার শ্রমিক ইউনিয়নের লোকদের হাতে মার খায়। দুর্গাপুর স্টীলের কিছু শ্রমিক আক্রমণকারীদের তাড়া করে দুজনকে ধরে ফেলে এবং পুলিসে দেয় আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মালদহ জেলার সাহাপুরে জমি জোর দখলের সংঘর্ষে ১১ জন আহত হন।

জলপাইগুড়ির মেটেলি থানা এলাকায় নাগাই-সুরি চা-বাগিচার একদল সশস্ত্র শ্রমিক একজন পি, এস, পি কর্মীর গৃহে হানা দেয় এবং কর্মীটিকে হত্যা করে। সংবাদদাতা আক্রমণকারীরা কোন্ দলের লোক জানাতে চান।

২রা ফেব্রুয়ারী টাংরা এলাকায় এস, ইউ, সি-সি, পি, এম সংঘর্ষে পুলিসসহ কিছু দাঙ্গাকারী আহত হন। পুলিস ৪২ রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস শেল ছোঁড়ে।

নারিকেলডাঙ্গায় পুনরায় ফঃ বঃ-সি, পি, এম সংঘর্ষে বাধে। পুলিস কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে হাঙ্গামাকারীরা পুলিস দলকে আক্রমণ করে। তিনজন পুলিস আহত হন।

রাজ্য কংগ্রেস সারা পশ্চিমবাংলায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টির জন্য সি, পি, এম-কে দায়ী করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। শিক্ষা বিভাগে সি পি এম কর্তৃক গুরুতর হস্তক্ষেপের অভিযোগও এ প্রস্তাবে থাকে।

২২শে ডিসেম্বর আরামবাগে ছাত্র ফেডারেশনের ৩০০ ছাত্রের জনতা হুগলীর জেলা শাসককে জুতা-পেটা করে, এস, পি-র ঘাড়ে ঘুষি মারে এবং মহাকুমা শাসককে বাসা থেকে টেনে বের করে এনে বাজারের পথে প্যারেড করায়। মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাটিকে অসভ্য আচরণের চরম দৃষ্টান্ত বলে ধিক্কার জানান।

ঐদিক হাওড়া ময়দানে এক বিশাল জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু বলেন, বাংলা কংগ্রেস অথবা আমার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গবে না। মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা লুট, দাঙ্গা, নারীর অবমাননা এবং দলবাজিতে লিপ্ত না হলে ফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর হতে পারত।

২৫শে ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী দেশপ্রিয় পার্কে সি,

পি, এম-এর অবিরত চুক্তিভঙ্গ, মিথ্যাভাষণ, পল্লীও শিল্পাঞ্চলে হিংসাত্মক কাজকর্মের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কেন আমি এই হিংসাত্মক অপরাধ দমনে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না ভেবে জনসাধারণ বিস্মিত হতে পারে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর জ্যোতি বসুর একতিয়ারে থাকায় এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কোন ক্ষমতা নেই। অজয় বাবুর আরো বলেন, সংবিধান প্রদত্ত অধিকার বলে মুখ্যমন্ত্রী ঐ দপ্তর জ্যোতিবসুর হাত থেকে নিয়ে নিতে পারেন কিন্তু তাতে ভদ্রলোকের চুক্তির অমর্যাদা করা হয়। সি. পি, এম-এর মতিগতি পরিবর্তন করে তিনি জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। মারহাবা মারহাবা!

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন কণ্টকবনে মুক্তা ছড়ানোর মত হল। সি, পি, এম তার নীতি পরিবর্তন না করে যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল।

নদীর তট আছে তাই তার নাম তটিনী। তীরের বন্ধন না থাকলে সে হত বন্যা। পুলিস, আইন ও আদালত হল দ্রুতগতি গণতান্ত্রিক সমাজের তীর-বন্ধন। এ তিনের ব্যত্যয় ঘটলে গণতন্ত্র অচল সভ্য সমাজ বিপর্যস্ত এবং মানবতা পরাভূত হয়। অন্ধকার গুহা থেকে বর্বরতা বেরিয়ে এসে সমাজ-সংহতি ভেঙ্গে দেয়। তাই আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যর্থ ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু পরম দুঃখে ও গ্লানিভরে বলেছিলেন, অসভ্য বর্বর সরকার।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী গত ৩০। ১২। ৮১ তারিখে লক্ষ্ণৌ সহরে এক ভাষণে বলেছেন, 'A person Committing 15 murders gets bail from a court. She remarked and asked how Crime could be curbed if this situation continued. She asked her partymen to involve the judges, lawyers and intellectuals in the debate to find a solution to this paradox. The basic purpose of the law would be defeated if it failed to protect the people against wrongdoers and the judiciary too would become ineffective.

Mrs. Gandhi quoted the case of the murder of a magistrate in his own Court in Calcutta in broad day light and said that the Criminal could not be punished as no one came forward as a witness for fear of reprisal.

What use will be our economic prosperity if the life of the individual is not secured? She asked.'

পশ্চিম বাংলায় বামফ্রন্ট পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায়, পুলিস নিষ্ক্রিয়, আদালতের আদেশ লংঘিত সর্বত্র এক ঘোর সন্ত্রাস বিস্তৃত। জনতার সামনে অসহায় অবস্থায় মানুষ খুন হচ্ছে ভয়ে কেউ তার সাহায্যে এগোচ্ছে না। চোখের সামনে নরহত্যা দেখে এবং অপরাধীদের চিনেও, মানুষ পুলিসের কাছে তাদের নাম বলতে সাহস পায় না, প্রকাশ্য আদালতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া তো দূরের কথা। রাজ্যবাসীর কাছে তাই প্রশ্ন কে এই অ-মানবিক অবস্থার জন্য দায়ী? এবং অস্থির সন্ত্রাস তাড়িত পরিস্থিতিতে এ রাজ্যে অবাধ নির্বাচন কি ভাবে সম্ভব? প্রশ্নটি জনমানসে রেখে আমরা ফিরে যাব দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট পরিচালিত সরকারের

শরিকী হানাহানির ভয়াবহ অংশ। সি, পি, এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত এ সময় কলিকাতায় এক সভায় বলেন, ফ্রন্টের কয়েকটি শরিক দল থানা ভিত্তিক মিলিত পরামর্শ কমিটি গঠনের যে প্রস্তাব তুলেছেন তাতে বর্তমান বিরোধীয় বিষয়গুলির নিষ্পত্তি হবে বলে তিনি মনে করেন না। থানা কমিটিগুলি প্রশাসনিক অসুবিধাই শুধু সৃষ্টি করবে। ১৯৭১ এর ৩রা ফেব্রুয়ারী সভায় রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে আলোচনা শুরু হলে সরকার পক্ষের বাংলা কংগ্রেস, ফঃ বঃ, সি, পি, আই এবং এস, ইউ, সি সদস্যগণ যুক্তফ্রন্টের নিন্দা করেন। বাংলা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি এবং জনগণের আশাভঙ্গের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন এবং পরিশেষে বলেন, প্রতিকারের যখন উপায় নেই তখন এ সরকারের শেষ হওয়াই ভাল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী পঃ দিনাজপুর ও মালদহ জেলার পুকুরগুলি থেকে সি, পি, আই ও সি, পি, এম-সমর্থক এবং অনুচর কর্তৃক মাছলুটের খবর আসে। খবর আসে।

দার্জিলিং জেলার পুলবাজারে ২রা ফেব্রুয়ারী ২০ জন সশস্ত্র লোক পুলিস চৌকি আক্রমণ করে। দুজন পুলিস আহত হন।

কলিকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে কোকো কোলা কারখানায় সি, পি, এম ও সি, পি, আই চালিত দুই ইউনিয়নের শ্রমিক সংঘর্ষে ৫ জন আহত হন। কারখানায় পুলিস পিকেট বসে।

নারিকেল ডাঙ্গায় পুলিসের সহায়তায় সি, পি, এম সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে বলে ফঃ বঃ যুক্তফ্রন্ট পরিষদের নিকট অভিযোগ করে।

(চলবে)

সমালোচনা—

—কারা অন্তরালে মৃত্যুরে বরি'
করিল যারা শত্রু জয়—

— সমালোচক

কারা মন্ত্রী শ্রদ্ধাস্পদ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত ব্রিটিশ কারাগারে আত্মাহুতি প্রদত্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর শহীদের স্মারক গ্রন্থকলিকার জন্য আমরা বামফ্রন্ট সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ হলেও, শহীদদের প্রতিকৃতি এবং পরিচয় রেখা সম্বলিত সযত্ন সংকলিত এই সম্পাদন প্রশংসনীয়। বন্দীদশায় নিষ্ঠুর নির্যাতনে, অনশনে এবং ফাঁসীর রজ্জু গলায় তুলে নিয়ে যাঁরা নির্ভয়ে দেশের মুক্তির উদ্দেশ্যে জীবন দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন জাতির স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ, চিরদিন তারা ভারতের মানুষকে মহত্তর দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করবেন।

দেওলি বন্দীশিবিরে নিয়বনিত যে পাঁচজন রাজবন্দীর জীবন অকালে ঝরে গিয়েছিল তাঁদের ইতিবৃত্ত ও স্মারক পুস্তিকায় স্থান পাওয়া সঙ্গত ছিল। এঁরা হলেন—

(১) মৃণাল রায় চৌধুরী (যশোহর) মৃঃ তাঃ ৫।৬।৩২
(২) শৈলেশ চাটার্জি (কুমিল্লা) " " ৩।৬।৩৩
(৩) হরিপদ বাগচি (রাজসাহী) ,, ,, ২১।৮।৩৩
(৪) সন্তোষ গাঙ্গুলী (ঢাকা) ,, ,, ১৭।১০।৩৬
(৫) সাতকড়ি ব্যানার্জী (২৪ পরগনা) ,, ,, ৬।২।৩৮

স্মারক পুস্তিকায় উল্লিখিত এবং অনুক্ত সকল স্বাধীনতা-যোদ্ধা যাঁরা কারা অন্তরালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁদের অমর স্মৃতি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হোক। আইন অমান্য সত্যাগ্রহ 'ভারত ছাড়' বিদ্রোহ এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সংগ্রাম সম্পর্কে কারাগারে যাঁরা নির্যাতনে এবং ফাঁসীতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণ স্মারক পুস্তিকায় কেন হল না, বোঝা গেল না। তাঁদের বিবরণ 'not available' প্রকাশক কর্তৃপক্ষের এই যুক্তি মেনে নেওয়া শক্ত—কারণ প্রকাশক যখন স্বয়ং রাজ্য সরকার। এই ত্রুটি সত্ত্বেও ১৩০ জন শহীদের স্মারক পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কাম্য। সেই সঙ্গে আমাদের অনুরোধ যে স্মারক পুস্তিকার বিক্রয়মূল্য দুই টাকার অনধিক করা হয়।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Sanction List for NOV. & DEC. 1981.

CALCUTTA

Name	Address

Dist—HOWRAH

Bagchi Benoy Kumar 65/5 Panchanantola Road, Bally

Baugdev Smt Parulbala w-o Late Debendra Nath, Pargualia

De Sachindra Nath, Howrah—1

Dutta Smt Sailabala w-o Late Upendra Lal Dutta 2-61 Nischinda Colony, Bally

,, Sovanbala w-o Late Harisadhan Shyampur. Pershyampur

Majumdar Smt Labanya Prova w-o Late Harendra Kumar 53 Tripura Road, Howrah

Sarkar Smt Madhabika w-o Moni Moban 2-8 Hazarhat Kalitola Lane, Howrah

Dist HOOGHLY

Chaudhury Priti Bhusan Chinsura

Paul Rameswar Jorghat Lane Chinsura

Roy smt Bina Rani w-o Late Jnan Ranjan 638 Aurobindapalli

Dist BURDWAN

Chatterje smt Subhasini w-o Late Haridas, Burdwan

Mukherjee ,, Jyotirmoye Debi ,, Bishnupada Katwa

,, ,, Mamata Pannalal Kamalpur Burdwan

Saha ,, Bimala Rani ,, Krishna Kanta Burdwan

Dist BIRBHUM

Chakraborty smt Indra w-o Late Adyanath

Dist BANKURA

Coswami smt Kananbala w-o Late Gopal Ch. Bishnupur

Dist MIDNAPORE

Bera Sitaram Goura

Kundu Dhirendra Nath Kuthirkhali Sakli

Sinha smt Kanaklata wd-L. Gobinda Kumar, Garbeta

Dist NADIA

Chakraborty Gopal b. Arabinda Rd Krishnagarh

Deb Nalinikanta Lalpur — Chandane

Sarkar Smt Renu, w-o L. Priya lal, Andlia

Sinha Ram Dulal Pada Kalyani

Dist COOCH BIHAR

Basu Smt Ila Rani wd-L. Jatindra nath

Sarkar Rakhindra Nath Dinjanerkuthi

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

শেষ কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই শেষ দিন পর্যন্ত উপবীত ধারণ করেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁকে অনুসরণ করে চলেছেন এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথেরই নেতৃত্ব মেনে চলেছে।

আমি মনে করি আমাদের যদি সামাজিক জীবনে উন্নতি করতে হয়, তাহলে তা যতদূর সম্ভব এমন ভাবে ধীরে ও অবিচল গতিতে করে যেতে হবে যাতে জনগণ আমাদের সঙ্গে চলতে অভ্যস্ত হয়। তাহলেই হঠাৎ কিছু করার বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়কে এড়ান যাবে এবং নতুন পুরাতনের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পারবে এবং পুরাতনও নতুনকে আত্মস্থ করতে পারবে। যুগ যুগ ধরে হিন্দু সমাজের এটাই হচ্ছে উন্নতির স্বাভাবিক গতিপথ। এরকম কোন অভিমত প্রকাশ করা সঙ্গত নয় যে দু'শ বছর আগে হিন্দুরা যেখানে ছিল এখনও সেখানেই পড়ে আছে। হিন্দুরা ধীরে চলে, হয়ত বা অনেকে যতটা ধীরে চলার কথা ভাবেন, তার চেয়েও বেশী ধীরে চলে। তবে চলছে যে তাতে কোন ভুল নেই। অবিচল ভাবেই চলছে। গ্যালেলিও যেমন পৃথিবীর সূর্য্য পরিক্রমা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, চলছে. নিশ্চয় পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে চলছে'—সেই রকম নিশ্চিত ভাবেই হিন্দু সমাজ চলছে, আমি যে ভাবে মিলিয়ে চলার কথা বলেছি, কম বেশী পরিমাণে সেই রকম মিলিয়েই চলছে। সমুদ্র যাত্রা, বাল্য-বিবাহ, এমনকি বাধ্যতামূলক বৈধব্য গ্রহণ প্রভৃতি সমস্যাও গত শতাব্দীর শেষভাগে যে পর্যায়ে ছিল আজ আর সে পর্যায়ে নেই। পঞ্চাশ বছর পূর্বে ব্রাহ্মনের ছেলে হয়ে বিলেত গিয়েছিলাম আমাকেই আমার সমাজে এক ঘরে করা হয়েছিল, আর আজ আমি সমাজে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। সম্ভবতঃ এটা অংশত আমার জনসেবার ফল।

কিন্তু সেই জনসেবাও নিষ্ফল হত—যেমন হয়েছিল রামমোহন রায়ের ক্ষেত্রে তার মৃত্যুর পরে দীর্ঘকাল ধরে যদি তার পেছনে সমাজের নীরব, মন্থর অথচ শক্তিশালী সমর্থন না থকত। সমাজের বুকে প্রগতির এই মহান শক্তি নিঃশব্দে কিন্তু অপ্রতিরোধ্য ভাবে থেকে জন-মানসে গুপ্ত ভাবনাকে ফলপ্রসূ করার কাজ করতে থাকে বলেই জন সেবা-মূলক কাজ সমাজের সমর্থন লাভ করে আসছে। অনেক ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রমের বিধি নিষেধের শাসন উল্লেখ যোগ্য ভাবে শিথিল হয়েছে প্রকাশ্যে সাহস করে না করলেও অহিন্দুর সঙ্গে একত্র ভোজন এখন চলছে, কিছুদিন আগে পর্যন্তও যা ছিল দারুণ ঘৃণ্য কাজ। গত কয়েক বছরের মধ্যে বর্ণ বৈষম্যের বাধাও অনেক কমে গিয়েছে। বিবাহ সম্পর্কে বলা যায় যে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারে যে বাধা ছিল, তা আরও শিথিল হয়ে-গেছে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, তা আজকাল হামেশাই হচ্ছে। ব্যক্তিগত ভাবে এই সংস্কার সাধনে আমারও কিছু দান আছে। ব্রাহ্ম সমাজের অবদানতো আছেই। কিন্তু তার পিছনে রয়েছে সাধারণ সমাজজীবনের মধ্যে

আলোড়ন যা মন্থর গতি সম্পন্ন হলেও প্রগতির দিকেই এগিয়ে চলছে।

আমার স্মৃতিচারণের কাজটা এখানেই শেষ করছি। আমার এই স্মৃতিচারণ আমার পরিণত চিন্তার ও দীর্ঘদিনের বিচার বিশ্লেষনের ফল। আমার এও বিশ্বাস আছে যে আমার ঘটনা বহুল বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি-কথা আমার দেশবাসীর প্রয়োজনে লাগতে পারে। আমার কারাবাস থেকে আরম্ভ করে কাউন্সিল চেম্বারের সদস্য পদ গ্রহণ, সরকারী চাকরী থেকে পদচ্যুতি হতে শুরু করে মন্ত্রী পদে উন্নতি পর্যন্ত সব কিছুই বিচিত্র অভিজ্ঞতা বহন করছে। আমাদের জাতীর জীবনের লক্ষ্যস্থান পৌঁছিতে আরও দীর্ঘ পথ চলতে হবে। মরুভূমি এখনও অতিক্রম করা হয়নি।

যাত্রা পথের প্রথম ধাপেও এখনও উপনীত হতে পেরেছি বলে মনে হয় না। দীর্ঘ, বহু দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে এগোতে হবে। এই কঠিন চলার পথে হয়ত ভাবী কালের কত পথ, লারিয়ের বোঝার চাপে ক্লিষ্ট পথিকদের কাছে তাদেরই এমন একজন সহযাত্রী পথিকের দৃষ্টান্ত ও পরামর্শ, নির্দেশরূপে না হলেও, তাদের কাম্য প্রেরণা রূপে সমাদর লাভ করতে পারে যিনি যাত্রা কালের আদি পর্বে শ্রান্তি, ক্লান্তি, দুঃখ কষ্টের কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং জয়েরও স্বাদ পেয়েছেন। আমি একথা দাবী করতে পারি যে স্বদেশ হি-তৈষনার উচ্চ অভিলাষ নিয়েই আমি আমার স্মৃতি কথা লিপিবদ্ধ করছি। আমার সম্মানিত সহকর্মীদের স্মৃতির প্রতিও আমি সুবিচার করতে চেয়েছি। তাদের মধ্যে অনেকে অবশ্য এখন আর জীবিত নেই। আমাদের জাতীয় জীবনের শুরু থেকে ক্রমাগ্রগতি ও প্রাথমিক পর্যায়ে যে উন্নতি লাভ হয়েছিল সে সম্পর্কেও কিছু বলতে চেয়েছি যাতে ভবিষ্যতে তা নির্দেশকরূপে কাজ করতে পারে। সর্বোপরি, লক্ষ্যে পৌঁছবার অগ্রগতির পথে অনেক সময় আমরা যে সমস্ত বিপদ ও প্রলোভনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম সে সম্পর্কেও ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিতে চেয়েছি। ১৯১৫ সালের ৩১শে মে তারিখে রাঁচি সহরের উপকণ্ঠে আমার ক্ষুদ্র, শান্ত কুটিরে বসে আমার স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করি। রাঁচি এখন বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রীপদে নিয়োগের ফলে এ কাজে বাধা না পাওয়া পর্যন্ত আমার কাজ চালিয়ে যাই।

১৯২৪ সালে আমি আবার লিখতে শুরু করি। লিখতে ভাল লাগত বলেই লিখে যাচ্ছিলাম। আমার সম্মানিত সহকর্মী বন্ধুদের যাদের মহাকাল আমাদের কাজ থেকে অপসারিত করে নিয়েছেন এই স্মৃতি চারণের মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে আমার যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের দিনগুলি ফিরে পেয়েছি ও তাদের সঙ্গ অনুভব করার আনন্দ লাভ করেছি। সেই ফেলে আসা দিনগুলির আনন্দের সঙ্গে জীবনের কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না। সেই দিনগুলির স্মৃতি মনে চির জাগরুক থাকে ও আনন্দ দেয়। প্রকৃত পক্ষে এই স্মৃতি জীবন বর্তমানকে ভুলিয়ে দিয়ে মৃত অতীতের মধ্যে আমাকে নিয়ে যায়। সে অতীত তখন আর অচেতন বা স্পন্দনহীন থাকে না। সে তখন সে দিনের সেই উচ্চ অভিলাষ ও দীর্ঘ দিনের এক টানা কর্মের স্মৃতিস্পর্শে সজীব হয়ে হঠে।

(চলবে)

Regd No. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

2/30

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

।। সম্পাদ
শ্রীজগদীশ চট্টে (পতি)

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী সন্ধানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির—২.০০, ৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বাঘার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৯০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৯০ বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫৮, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। দেশ বাঘের ছোবলে (১)—১.০০, ১৪। দেশ বাঘের ছোবলে (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। রাশিয়ার হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৮.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

বৈপ্লবিক—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

10 FEB 1982

মূল কার্যালয়—৪ নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ১৫ই ফাল্গুন ১৩৮৮ ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২	২১ সংখ্যা

'দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক।'

—রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদকীয়

খুনখারাপি বন্ধ করুন

সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সব জেলা শাসক ও পুলিশ প্রধানদের সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিচার বিবেচনা করার জন্য যে বৈঠক ডেকেছিলেন, তাতে এই রাজ্যের পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল বলেছেন যে এই রাজ্যে গড়ে খুন হয়েছেন প্রতিদিন চারজন করে। শ্রীসত্যব্রত বসু একটা তুলনামূলক পরিসংখ্যানও পেশ করেছেন। এইভাবে রক্তপাতের পরিমাণ যা হয়েছে, সেটা যদি ব্লাড ব্যাঙ্কে জমা পড়ত, তবে নিঃসন্দেহে বহু রোগীর জীবন বাঁচান সম্ভব হত। পরিসংখ্যানটা একটু তুলে ধরলে সবারই পক্ষে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হবে।

১৯৭৭ সালে গোটা রাজ্যে খুনের সংখ্যা ছিল ৮৪১টি, চার বছর বাদে ১৯৮১ তে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৩৫টি। এটা মনে করলে খুব ভুল হবে না পুলিশের নিকট সব খুনের খবর থাকে না। অতএব প্রকৃত সংখ্যা এর থেকে বেশী হওয়াই সম্ভব। এ রাজ্যে রবারি, সিঁদেল চুরি এবং চুরি ১৯৭৭ সালের তুলনায় ১৯৮১ সালে কমে গেলেও, খুন ডাকাতির সংখ্যা ভয়ানকভাবে বেড়ে চলেছে। ১৯৭৮ সালে খুন হয় ৯৩২, '৭৯ সালে ১০৯০, '৮০ সালে ১২৯০, এবং একাশীতে ১৪৩৫ জন। সাতাত্তরে গোটা রাজ্যে ডাকাতি হয় ১০৪২, আটাত্তরে ১২০৫, উনসত্তরে ১২৭৪, আশীতে ১২০৩, এবং একাশীতে ১৪১৬। এক্ষেত্রেও বলা চলে বহু ঘটনা গুণ্ডাদের এবং খুনীদের ভয়ে থানায় জানাতে পারে না, ক্ষেত্র বিশেষে রাজনৈতিক দলের প্রভাবে থানাতে ডায়েরীও গ্রহণ হয় না। তাই প্রকৃত সংখ্যা এর থেকে বেশী বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না। একটা হিসাব যদি পুলিশ প্রধান আলাদাভাবে পেশ করতেন, তবে চিত্রটা আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠত। ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে দেশের কত টাকা লুণ্ঠিত হয়েছে, সেটা দেশবাসী বুঝতে পারত। সকলেই জানেন যে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত, দেশের দরিদ্রতর শ্রেণীর মানুষদের অর্থ সাহায্য করতে, যার ফলে গরিবী দূর হবে, দেশের সাধারণ মানুষ ব্যাঙ্কের টাকার সাহায্যে, অন্ন সংস্থান করতে সক্ষম হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে হিতে বিপরীত হচ্ছে। আর এটা ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে ঘটেছে, এমন সরকারের কার্য্যকালে, যারা দুঃখ নিপীড়িত, শোষিত জনগণের কল্যাণ সাধনের প্রধান প্রবক্তা এবং এ কাজের সর্বস্বত্ব তাদের হাতেই সংরক্ষিত বলেই দাবী করেন অহরহ।

অলমতি বিস্তারেন। যারা সগৌরবে প্রচার করেন যে এ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি আদৌ খারাপ নয়, অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক ভাল, তাদের এই সংবাদে কি প্রতিক্রিয়া হবে তারাই জানেন। কিন্তু পরিসংখ্যান বলে চিত্রটা ভয়াবহ। দেশের একশ্রেণীর মানুষেরা যে যখন তখন খুন করবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সেটা সম্ভব হয় একমাত্র কারণে, যেটা হল খুন করলেও কিছু হয় না এই মানসিকতা।

রাজনৈতিক দাদা পেছনে থাকলে ত সাত খুন মাপ। তা ভিন্ন, আদালতের বিচারে কারাদণ্ড হলেও, কিছুদিন বাদে দাদাদের কল্যাণে মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত। বিচার চলার সময় জামিনে মুক্তি

পাওয়ার ব্যবস্থাও, যেটা সম্বন্ধে পুলিশ বিভাগও আপত্তি জানিয়েছে, জনদরদী সরকার আইনানুগ করেছেন। এই সব আসামীরা বাইরে এসে সাক্ষ্য প্রমাণ লোপ করে দেয়, খুন খারাপির ভয় দেখিয়ে। সাক্ষীদের মামলা চলার সময় আদালতে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য করে, যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি ফেঁসে যায়। এটা শুধু আমাদেরই মন্তব্য নয়। বহু স্থানে বহুবার বিচারকারী জজ, ম্যাজিস্ট্রেটরা এ ব্যাপারে কঠোর মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন। গণতন্ত্রের অনেক রূপই ত দেখা গেল, খুন করবার অধিকারকে গণতান্ত্রিক অধিকার বলে একটা আইন পাশ করে দিলেই ত সব লাঠা চুকে যায়।

কিন্তু এই অবস্থার পরিণতি কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে, সেটাই শঙ্কার বিষয়। এই প্রশাসনের শৈথিল্যে বা প্রশ্রয়ে, যাই হোক না কেন, এই রক্ত স্রোত ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকলে যে কারো পরিত্রাণ থাকবে না শেষ পর্যন্ত এটা বুঝতে কোন অসাধারণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় না কোন মতবাদের আশ্রয় নেওয়ার। সমাজ থেকে মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ যদি বিলীন হয়ে যায়, তবে ত সমাজে জন্তু জানোয়ার ব্যতীত কারো অস্তিত্ব থাকবে না। যারা ক্ষমতার গদী আঁকড়ে থাকতে চান, তারাও একদিন এদেরই শিকার হতে পারেন, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। সেদিন কে থাকবেন এবং কে থাকবেন না রাজত্ব ভোগ করার জন্য, এ কথা বলতে পারে একমাত্র মহাকাল। তবে অতীত ইতিহাস থেকে যদি শিক্ষা নেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে এই নৈরাজ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় না এবং এই অপকর্মে যারা প্রশ্রয় দেয়, তাদের পতনই শুধু অবশ্যম্ভাবী নয়, মূল্যটাও দিতে হয় ভয়ঙ্কর ভাবে।

সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে, জনসমাজের স্বার্থে তাই আজ কঠোর হবার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। অন্যথায় মানুষের বহু মূল্যবান ঐতিহ্য, যা সৃষ্টি করতে বহু অর্থ, শ্রম, ঘর্ম, অশ্রু ব্যয় করতে হয়েছে, নষ্ট হয়ে যাবে। কালের বিচারে ইতিহাসের কোন আস্তাকুঁড়ে তাদের স্থান নির্ণীত হবে, যারা এ কাজ বন্ধ করছেন না বা করতে চান না, সে কথা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারে।

আমরা চাই যে যাদের হাতে প্রশাসন যন্ত্র, তারা সব দলের, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি, সমাজ সংস্কারকদের সক্রিয় সহায়তা ও সাহায্য নিয়ে এই অমানবিক দস্যুদের সঙ্গে মোকাবিলা করার কাজে এগিয়ে আসুন। অরণ্যে রোদন করার সামিল হবে কিনা এই দাবী, তার জন্যে আমরা, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব।

প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে, সমাধানে অগ্রসর হবেন প্রশাসকেরা, এটাই নিরীহ, রাজনীতি নিরপেক্ষ, সব মানুষই চায়। নিজেরা কাগজে বিবৃতি দিয়ে, এমন কি নতুন নজীর সৃষ্টি করে, বশংবদ মুখ্যসচিবকে দিয়ে বিপরীত বিবৃতি দিলেই সব সঙ্কট দূর হবে না। অন্য কেউ এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, সে কথা শুনে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যদি হাসিই পায়, তবে কান্নার দিন খুব দূরে থাকবে না বলে আশঙ্কা হলে কি খুব ভুল হবে? এই সর্বনাশ যদি রুখতে না পারেন, তবে সরকারী প্রশাসন, কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট বা অন্য যাদের হাতেই থাকুক, তাদের কোন ক্ষমা থাকবে না। খুন খারাপি বন্ধ করুন, এই জনগণের দাবী।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ অনুশীলন ভবন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সম্পাদকীয় বিবরণ

বান্ধবান্তরম্,

পর শাসন হতে মুক্ত হওয়ার দশবৎসর পরেও স্বাধীন ভারতে শাসনাধীন দল দেশবাসীর জাতীয় চরিত্র গড়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় বিপ্লবী গোষ্ঠীর পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভব হল না। জাতীয়তা বোধ ব্যতীত গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা সফল হয় না। তাতে দলতন্ত্রী ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধীদের গদির লড়াইর সুযোগ সৃষ্টি করে, জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার বা শোষক গোষ্ঠীর সম্পদবৃদ্ধি হয় এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। এমন অবস্থায় কতিপয় বিপ্লবীনেতা অনুশীলনের শাশ্বত আদর্শ 'চরিত্র, নিষ্ঠা, ত্যাগ' ব্রতে অনুপ্রাণিত কর্মীদের সহযোগীতায় গৃহহীন, বুভুক্ষু, অশিক্ষিত জনগণের সেবায় প্রবৃত্ত হয়ে একটি কর্মী নিবাসের অভাব বোধ করেন এবং ১৯৬০ সনে এই অনুশীলন ভবন গড়ে তোলেন। ইহার প্রতিষ্ঠা দিবস স্থির করার পূর্বে মহান নেতা রাসবিহারী বসু পরিকল্পিত ভারতব্যাপি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নির্দ্ধারিত দিনটিকে দেশবাসীর স্মৃতিপটে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ২১ শে ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা দিবস স্থির করেন। এই তাৎপর্য্য পূর্ণ দিনটিকে আমরা উত্তরসুরীরা অতি পবিত্র দিন বলে মনে করি এবং অভ্যুত্থান দিবস ও প্রতিষ্ঠাদিবস প্রতিবৎসর একই সঙ্গে উদযাপন করি। আজ ভবনের ত্রিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে আপনাদের সঙ্গে সর্বাগ্রে মহান নেতা রাসবিহারী বসু ও ভবন প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত আশুতোষ কাহালী কেদারেশ্বর সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং জানা অজানা স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদকুলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দের আরব্ধ কার্য ব্যতীত আর কোনও গঠনমূলক কাজকরা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁদের মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সর্বত্যাগী কর্মী ও অর্থাভাবই ইহার প্রধান কারণ।

পুস্তকাগার সহ পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় ও 'শক্তিসংঘ' ব্যায়ামাগার সন্তোষজনক ভাবে পরিচালিত হলেও এই ভবন সৌধটির রুগ্ন অবস্থা অহি পরিষদকে বিচলিত করে তুলেছে। জলনিকাশ বিহীন ইমারতটির আয়ুকাল অস্বাভাবিক ভাবে কমে আসছে। অনতিবিলম্বে ইহার সংস্কার একান্ত আবশ্যক। সতীর্থ ও শুভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না।

এ ভবন সতীর্থদের শুধু মিলন ক্ষেত্রই নয়, বর্তমানে ইহা অনুশীলন সমিতির একমাত্র কর্মকেন্দ্র। অনুশীলন ভবনকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

আমাদের পুস্তকাগারে পুস্তকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন তিন হাজার একশতে (৩১০০) পৌঁচেছে। একাধিক দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা থাকায় পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ে আশাতীত ভাবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প পরিসর ব্যায়মাগারে প্রতিদিন কমপক্ষে ২৫টি যুবক শরীর চর্চা করে উপকৃত হচ্ছে। প্রতি বৎসর প্রয়াত বিপ্লবী বন্ধুদের প্রতিকৃতি সংরক্ষণের জন্য তাদের আত্মীয়স্বজনেরা আগ্রহ সহকারে ভবনে দিয়ে থাকেন। আজও ৬ খানা প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন হল। প্রয়াত বিপ্লবী নেতাদের স্মৃতি রক্ষার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অনুশীলন সমিতির ইতিহাস, বিপ্লব আপস

ত্রৈলোক্য মহারাজের জীবনী, মহারাজের লিখিত জেলে ত্রিশবৎসর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং আমাদের বন্ধু ঐতিহাসিক ক্ষীরোদ কুমার দত্ত প্রণীত স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক তথ্যপূর্ণ বহু পুস্তক বিক্রয়ের জন্য ভবনে রাখা হয়েছে।

পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গের অরাজক ও সমস্যা জর্জরিত অসহায় দুর্গত জনগণকে সমবেদনা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বিবরণী শেষ করছি।

জয়হিন্দ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

সম্পাদক

অনুশীলন ভবন

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ করগুপ্ত

যুগান্তর দলের বিশিষ্ট বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী নরেন্দ্রনাথ করগুপ্ত (কানু) ২১ শে ফেব্রুয়ারী তার যাদবপুরের বাড়ীতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর। তিনি ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে ও বন্দীশিবিরে আটক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ করগুপ্ত ছিলেন তার ভ্রাতুষ্পুত্র, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান যোদ্ধা এই বিপ্লবীর স্মৃতিতে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী কৃষ্ণদাস ব্যানার্জি

বিপ্লবী বাংলার বিশিষ্ট সহযোগী যুগান্তরদলের বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী কৃষ্ণ দাস (কৃষ্ণপদ) ব্যানার্জি গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রিষড়া সেবাসদনে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহার বাড়ী ছিল যশোহর জেলার ইতনা গ্রামে। কর্মস্থল ছিল বরিশালে, ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন জেলে এবং বন্দী নিবাসে আটক ছিলেন। ১৯৪২ সালেও তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। বহুদিন অসুস্থ হয়ে রিষড়া সেবাসদনেই ছিলেন। বন্ধুবৎসল অমায়ীক অকৃতদার এই মহান বিপ্লবীর স্মৃতিতে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী (৪)

—জনৈক স্বাধীনতা সংগ্রামী

বহুদিন পর বামফ্রন্ট সরকারের কৃপণ হস্ত থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সর্বপ্রকার অসুখের চিকিৎসার জন্য বিনা খরচে হাসপাতালগুলিতে একটা সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা মঞ্জুর হয়েছিল। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। উচ্চ পর্যায়ে বিশেষ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায়, যে সুযোগদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, কার্যাক্ষেত্রে তা বানচাল হবার উপক্রম হয়ে পড়েছে। হাসপাতালগুলিতে সরকারী নির্দেশ গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে যে সর্ত আরোপিত হয়েছে, সেটা পালন করতে হলে, অসুস্থ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এই গলদ নীতি, মন্ত্রীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে কিনা জানিনা। আমাদের দেশের আমলাতন্ত্রের বাধাসৃষ্টি করার যে অপূর্ব দক্ষতার নজির আছে, এ ক্ষেত্রে স্বাধীনদেশেও তার গতি প্রকৃতি আদৌ পরিবর্তিত হয়নি দেখে, রীতিমত বিস্মিত হয়েছি।

নির্দেশনামার মধ্যে একটি সর্ত ছিল যে বিনা-খরচে হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পেতে হলে, বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান বা নির্দিষ্ট অফিসারের অনুমোদন পত্র সংগ্রহ করতে হবে। তা না হলে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিচয়ের যথার্থতা নিরূপণ করা নাকি সম্ভব হবেনা। আমাদের নিকট বহু রিপোর্ট এসেছে যে তারা স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে (কলকাতার কথা বলছি) অনুমোদন পত্র না আনার জন্য এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এই অনুমোদন সাপেক্ষ চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো দরকার এখনই। নতুবা এটা একটা প্রহসনে পরিণত হবে। তবে কখন কার কোন অসুখ হবে পূর্বানুমানের ভিত্তিতে, আগে থেকেই অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করে রাখার কোন প্রশ্নই থাকতে পারেনা। হঠাৎ রোগাক্রান্ত হলে, যেমন সকাল বা সন্ধ্যাবেলায় কোন রোগের আক্রমণ হলে ত অফিসারকে পাওয়া যাবেনা। কতগুলিক্ষেত্রে, যেমন হৃদরোগের ক্ষেত্রে অনুমোদনপত্র আনতে আনতে রোগীকে বিনা চিকিৎসায় রাখলে, তার জীবনাবসান ঘটতে পারে। তখন আর অনুমোদন-পত্র কোন কাজে লাগবে? তা ভিন্ন, রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে (কলকাতার কথাই বলছি) লাইন দিয়ে অনুমতিপত্র আনতে কতদিন লাগবে? সে কাজ করার জন্য রোগীর বাড়িতে লোকও না থাকতে পারে। অনুমতিপত্র কিসের উপর নির্ভর করে দেওয়া হবে? অনুমোদন প্রার্থী প্রকৃত লোক কিনা, এটা নির্ধারণ করতে পুলিশী তদন্তের ব্যবস্থা হবে নাকি? এতে কত সময় লাগবে? রোগী ততদিন বেঁচে থাকবে ত? যখনই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়েছিল, তখনই তার মধ্যে এখন একটি গাঁট সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার ফলে কোনদিনই কেউ সুযোগ পাবেনা। এটা মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা জানি না। অথবা এটা কি আমলাতন্ত্রের চিরদিনের স্বভাবের পরিচয়? পেনসনবই সঙ্গে নিলে ত সবই প্রমাণিত হয়। সেটা কেন হবেনা সেটা দুর্বোধ্য। কৃপণের বাড়ির নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নেই, এমনি একটি কথা প্রচলিত আছে। এত দেখছি তাই হবার উপক্রম। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের একটি অতি নিন্দনীয় কীর্তি হচ্ছে যে তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য এ পর্যন্ত

একটি কপর্দ্দকও আর্থিক সাহায্য বা অন্য কোন সুযোগ সুবিধা দেননি। যে কাজ করেছে ভারতের অন্য সব রাষ্ট্র। এটাই প্রগতিশীলতার পরিচায়ক বলে এরা মনে করছেন কিনা জানিনা। এতদিন পরে চিকিৎসার একটু সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা হয়েছিল, সেটা আজ কার্যতঃ অচল হয়ে পড়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আমাদের অনুরোধ যে অসম্ভব সর্ত বিলোপ করুন, অন্যান্য ব্যবহারিক অসঙ্গতি দূর করুন, অন্যথায় এ নির্দেশনামা প্রত্যাহার করুন, অযথা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হয়রাণ করবেন না। এই সরকার থেকে কোন সাহায্য না পেয়েও তারা বেঁচে আছেন ও থাকবেন। কিন্তু তাদের হয়রানি করার অধিকার কোন সরকারেরই থাকতে পারেনা। এ কথা বলাই বাহুল্য। আমরা প্রতীক্ষা করব সরকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগ কি ব্যবস্থা নেন, এ সম্বন্ধে।

প্রসঙ্গত, কয়েকটি ব্যবস্থার কথা ভেবে দেখতে স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করি। অনুমতিপত্র নেবার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। পেনসন বই বা তাম্রপত্র দেখালেই হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হবে।

দাঁত বাধান ও চশমা বিনামূল্যে দেবার ব্যবস্থা মাত্র কলিকাতার দুটি হাসপাতালেই সম্ভব। কিন্তু সাধারণ রোগীদের ভীড় খুবই বেশী। কাজেই পরীক্ষা করাতে ও বিনামূল্যে জিনিস পেতে সময়ও অত্যন্ত বেশী লাগছে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে। যদি এই সুযোগ দানকে অর্থবহ করতে চান, তবে কয়েকটি চশমা ও দাঁত বাধাবার দোকান থেকে এই জিনিসগুলি পাবার ব্যবস্থা করতে হবে। শুনেছিলাম যে মেয়ো ও রামরিকদাস হাসপাতালগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সব রকম চিকিৎসার জন্য আলাদা করে চিহ্নিত করবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আছে। ঐ হাসপাতালগুলিতে চশমা ও দাঁত বাধাবার সুযোগ প্রসারিত করলে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেক সুবিধা হবে ও অযথা হয়রানিও কমবে। কিছু কাজ না করতে পারলে, অকাজটাকে অন্ততঃ বন্ধ করুন, এটাই অবশ্য করণীয়। সংশ্লিষ্ট মহলে কি প্রতিক্রিয়া হয় আমাদের বক্তব্যের দ্বারা সেটা লক্ষণীয়।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী কালীপদ ব্যানার্জি

প্রবীণ বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় গত শনিবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী নাকতলার বাড়ীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মদারীপুরের শান্তি সেনার তিনি একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যান্ত হিজলী, বক্সা, দেউলী বন্দী নিবাসে আটক ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর, আমরা এই বিপ্লবীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

নকসাল আন্দোলন এবং তারপর

—কালীপদ সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'In 1967, it is suspected that Mr. Ajoy Mukherjee gave a secret order to the police to go ahead with a relentless combing and mopping up operation, ignoring the agreed decision of the cabinet.'

—Naxalbari and after by Samar Sen.

আদর্শবাদী তরুণ মনে বিপ্লবের রোমাঞ্চ ও অসমসাহসিকতা সহজেই প্রভাব ফেলে। আপসের পথে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বিশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে প্রভূত বৈষয়িক উন্নতি ও তিনটি যুদ্ধের মোকাবিলা করার স্বাক্ষর থাকলেও তাতে বৈপ্লবীক, মাদকতা ছিল না তাই চারু মজুমদারের ব্যক্তি হত্যার দ্বারা শ্রেণী শত্রু নিপাতের অভিনব কর্মসূচী এবং পিকিং বেতারের ছেদহীন বিপ্লব প্রচার কিছু উন্নতমনা আত্মত্যাগ ব্রতী যুবককে নকসাল আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং তাঁরা তাতে যোগ দেন।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত প: বঙ্গে স্থিতিশীল সরকার ছিল না। ডঃ রায়ের মৃত্যুর পর রাজ্য কংগ্রেসে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব ঘটেছিল। কংগ্রেসে বিভাগ এবং ধরাজনিত খাদ্যাভাব প: বঙ্গের রাজনীতিতে কঠিন সংকট সৃষ্টি করেছিল। এই অস্থির পরিস্থিতির সুযোগে জাতীয় সংহতি বিনাশকারী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে. সি, পি, আই (এম) এবং মার্কসবাদী উগ্রপন্থী নকসাল পন্থীরা ছিল তাদের মধ্যে প্রধান। ১৯৬৯ সালে রাজ্যে সি, পি, আই (এম)-এর নেতৃত্বে দ্বিশীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে অরাজকতা চরমে উঠে। সরকার কর্তৃক গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত বিচারাধীন নকসাল নেতাদের মুক্তিদান আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়।

১৯৬৯ সালের ১লা মে কলিকাতা ময়দানে কানু সান্যালের সভাপতিত্বে নকসালপন্থীরা এক বিশাল জনসভায় তাদের নতুন রাজনৈতিক দল সি, পি, আই (এম, এল) গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ঐ সভায় কানু সান্যাল বলেন, 'স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে সি, পি, আই, সি, পি, আই (এম), ফ: ব: প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি মুখেই শুধু বিপ্লব প্রচার করেছে, কেউই বিপ্লবী সংগ্রামে নামে নি। মার্কস ও লেনিন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু উপরোক্ত বামপন্থী দলগুলি নির্বাচনের দ্বারাই অভীষ্ট লাভের চেষ্টায় তৎপর আছে। এরা ছাত্র ও যুবকদের নিকট নির্বাচনী লড়াইকেই বিপ্লবী সংগ্রামের রূপ দিতে চাইছে।

বামপন্থীদের এই কর্মপন্থা ভ্রমাত্মক, শোধনবাদ ও বার্ধভার নামান্তর : সি, পি, আই (এম, এল) মনে করে, নকসাল বাড়ির সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ হল প্রকৃত বিপ্লবী সংগ্রামের পথ সংকেত।' সভার শেষে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ,' 'নকসাল বাড়ি জিন্দাবাদ, 'চারু মজুমদার জিন্দাবাদ,' চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' ধ্বনি তোলা হয়।

সি, পি, আই (এম এল) গঠনের পর সি, পি, আই (এম) নকসাল পন্থীদের সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব নেয় এবং তাদের বিপথগামী অ্যাডভেঞ্চারিষ্ট

বলে নিন্দা করে। চারু মজুমদারকে 'এজেন্ট প্রভোকেটর,' 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক' এবং 'মাও-এর আজ্ঞাবাহী' বলে ব্যাখ্যা দেওয়াও হয়। এর ফলে সি পি আই (এম) ও নকসাল-পন্থীদের মধ্যে বিরোধ বাধে এবং উভয় পক্ষের কিছু কর্মী হতাহত হন।

১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গড়লে পঃ বঃ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজ জোরদার হয়। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় অংশের মিলিত অধিবেশনে সরকারের নীতি ঘোষণায় বলেন,—

'Government is determined to root out Lawlessness and to eliminate the politics of murder' স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে সি. পন্থ বলেন,—'It is the responsibility of all of us to Carry on a dialogue with the Naxalites and help them see reason and restore their faith in democratic processes. He expressed Concern over the present state of West Bengal, where, when a Crime was Committed none came forward to give evidence because of the prevailng terror.'—Statesman.

(আশ্চর্য, ১৯৭১ সালের অবস্থা ১৯৮১ সালে পশ্চিম বাংলাকে আবার পেয়ে বসেছে আরো বেশী করে)

নকসাল নেতাদের মধ্যে মতবিভেদ ঘটায় সরকারের সহিত তাদের diologue অনুষ্ঠান হয় না। শক্তহাতে দুষ্কৃতকারীদের দমনই সরকারের সামনে একমাত্র পথ খোলা থাকে। নকসালপন্থীদের মধ্যে যেমন কিছু আদর্শনিষ্ঠ প্রতিভাবান তরুণ ছিলেন, তেমন ছিল স্বভাবদুর্বৃত্ত শ্রেণীর মানুষ। শেষোক্তদের দ্বারা সমাজের ক্ষতি হল সর্বাধিক। অন্যদিকে নকসাল নেতা সৌরেন বসুর নেতৃত্বে সি পি আই (এম-এল) ১৯৭০ সালে যে প্রতিনিধি দলটিকে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে চীনে পাঠায়, ব্যক্তিহত্যার কর্মসূচীর জন্য চীনের প্রধান মন্ত্রী চু এন লাই তাঁদের ভর্ৎসনা করে বিদায় দেন। 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'—এই স্লোগানও চীন নামঞ্জুর করে।

এই ঘটনার পরেই দলের ভিতরে চারুমজুমদারের ব্যক্তিহত্যার থিসিসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে এবং দলে ভাঙ্গন দেখা দেয়।

প্রকৃত পক্ষে নকসাল আন্দোলনের উৎপত্তির মূল ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার মধ্যে নিহিত। ভারতে যে গণতান্ত্রিক সংবিধান, নির্বাচিত সংসদ ও বিধানসভাগুলি আছে, কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, বামপন্থীসহ দেশের অগণিত নরনারী মনে করেন, তার সাহায্যে গণতান্ত্রিক বিবর্তনের পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সি পি আই (এম) সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে সম্ভব নয় একথা স্বীকার করেও, বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণের ঝুঁকি নিতে অসম্মত হওয়াতেই, সি পি আই (এম)-এর বিপ্লববাদী সদস্য ও সমর্থকরা নকসাল বাড়িতে সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূচনা করেন।

পশ্চিম বাংলার মানুষ খুনোখুনীর রাজনীতি চায় না, একথা সহর ও গ্রামের ধনী-দরিদ্র সকল

(এর পর ১২ পৃঃ দেখুন)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

শেষ কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই স্মৃতি কথা কী নীতি নির্দেশ করে এবং শিক্ষাই বা কী দেয়? এ বিষয়ে মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত যা বলেছিলেন সে কথাই উদ্ধৃত করা যাক। রমেশচন্দ্র স্বপ্নালু লোক ছিলেন না; এমন কি তিনি একজন খুব উৎসাহ উল্লাসী পুরুষও ছিলেন না। তিনি ছিলেন কাজের লোক ও ধীর-স্থির প্রকৃতির মানুষ। প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে ছিল ঐতিহাসিকের চিন্তাধারা। তার উৎকৃষ্ট উপন্যাস-গুলির মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার ইতিহাস ভাবনার মধ্যে একটা জিনিষ ছিল—তা হল সব কিছুরই অন্তর্নিহিত প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবধারণ ক্ষমতা। বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তিনি। সেই সময় তিনি আমাকে একখানা পত্র লিখেছিলেন। পত্রখানি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মিঃ জে, এন, গুপ্ত রচিত রমেশচন্দ্রের জীবনী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সেই পত্রে রমেশ চন্দ্র লিখেছেন, 'কী অদ্ভুত বিপ্লব আমরা এক প্রজন্মের মধ্যেই দেখতে পেলাম। কী পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তন সাধনে কী মহৎ ভূমিকাই না আপনি নিয়েছেন।' রমেশচন্দ্র বলেছেন, 'আমাদের জীবৎকালেই আমরা সেই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পেলাম।' আকারে এবং প্রকারে এই পরিবর্তন হল একটা রক্তপাতহীন বিপ্লব।

একথাটা অতিরঞ্জিত করে বলা কথা নয়। এটা খাটি সত্য কথা। সম সাময়িককালের ইতিহাসই তার প্রমাণ। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? ১৮৭৫ সালে আমি যখন আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু করি, তখন আমাদের স্থানীয় সরকারী সংস্থা-গুলির মধ্যে জনগণের কোন প্রতিনিধি ছিল না। বর্তমানে ১১৬টি মিউনিসিপ্যালিটি বাংলাদেশে আছে। তার মধ্যে ইতিপূর্বে মাত্র চারটি মিউনিসি-প্যালিটি বাদে আর সব কটিতেই সব সদস্যই সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। চেয়ারম্যান এবং প্রধান কর্মসচিবও হতেন মনোনীত। আইন পরিষদের অবস্থাও ছিল ওই একই রকম; সমস্ত সদস্যই ছিলেন সরকার মনোনীত। সরকারী কার্যের কর্মকর্তারাই রাজ্যশাসন ব্যাপারে সমস্ত নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করতেন। কিন্তু এদের মধ্যে একজনও মনোনীত বা নির্বাচিত ভারতীয় ছিলেন না। সিভিল সার্ভিসের লোকেরাই ছিলেন বাছাই করা প্রধান সরকারী কর্মকর্তা। এরাই দেশ শাসন করতেন। তার মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ভারতীয় ছিলেন। ভারতের জনমত ছিল দুর্বল; তাও আবার কদাচিৎ ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ পেত। জাতীয় জীবনের কোন স্পন্দনই অনুভব করা যেত না। এই বিরাট ভারতীয় মহাদেশ ছিল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, যার মধ্যে কোন সংহতি ছিল না, ছিল না কোন ঘনিষ্ঠতা বা সামঞ্জস্য। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও কোন ঐক্য ছিল না। বিভিন্ন ভাষায় তারা কথা বলে; পরস্পরের সহিত ঝগড়া বিরোধ করে, স্পর্ধা দেখায়। এই

ভাবে তারা নিজেদের শক্তির অপচয় করে। 'ভিন্ন ভিন্ন মতের মধ্যে একে অন্যের ভাষাও বুঝতে পারেনা; এ যেন এক ভাষার ব্যাবেল—চরম বিভ্রান্ত, চরম বিশৃঙ্খলা।

এই অবস্থার সঙ্গে বর্তমানে আমরা দেশের যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি তার তুলনা করা যাক। বাংলাদেশে, এবং অন্য প্রদেশেও বর্তমানে স্থানীয় সংস্থাগুলি জন-প্রতিনিধিদের ভিত্তিতে গঠিত হচ্ছে। ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব বৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতা কর্পোরেশনের গঠন প্রণালী এখন গণ-তান্ত্রিক। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলগুলি সবই এখন গণ-প্রতিনিধিদের পদ্ধতিতে গঠিত হচ্ছে। সেখানে এখন জন সাধারণের প্রতিনিধিদেরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সমূহে ও ভারতীয়দের বেশ ভালভাবে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেখানে দেশের শাসনকার্যে এদের মতামতের শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। সর্বশেষে প্রতি প্রদেশে পার্লিয়ামেন্টারী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সূচনা এই ইঙ্গিতই বহন করছে যে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সম্ভাবনা দৃষ্টি পথের মধ্যেই এসে গেছে। সরকারী উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। কত দ্রুত সে নিযুক্তিকে ভারতীয়করণ করা হবে সে বিষয়ে অভিযোগ থাকতে পারে, এবং আছেও বটে। তবে ভারত ভারতবাসীর জন্য এ ধারণা সুস্পষ্টরূপে সরকার কর্তৃক মূলনীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

বঙ্গ বিভাগ আইনের সংশোধন হওয়ায় ভারতীয় জনমতের শক্তি পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা কতই না বলেছিলেন, এ আইন একটা স্থির, স্থায়ী ব্যবস্থা। কিন্তু ভারতীয় অভিমত তা মেনে নিতে রাজি হয়নি এবং ভারতীয় অভিমতই জয়লাভ করল। সংবাদ পত্র সমূহ এখন স্বাধীন ভাবে সময়ে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করছে। সর্বশক্তির অধিকারী হতে না পারলেও এদের ক্ষমতা এখন প্রচুর। আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থাসমূহ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এখন দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছেয়ে ফেলছে। এই ভাবে পঞ্চাশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এক বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটে গেছে। এ বিপ্লব রক্তপাত হীন বিপ্লব। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র ঘটনাচক্রে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সাময়িক হিংসাত্মক কার্যকলাপ যা এনার্কিস্টিরা করেছেন। যারা অতি মাত্রায় উৎসাহী ও আগ্রহশীল তারা হয়ত যা পাওয়া গিয়েছে তাতে খুসী হতে পারছেন না। তারা চান আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে, আরও সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছতে। কিন্তু একটা বিরাট পরিবর্তন যে ঘটেছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। বিশ্বের ঘটনাবলী যে শক্তির সৃষ্টি করেছে তা হয়ত এই পরিবর্তনকে সাহায্য করে থাকতে পারে। কিন্তু আমরাও আমাদের সাধ্যমত কাজ করেছি। আমাদের রাজনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল স্বায়ত্ত শাসন লাভ করা। সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ ছিল আইনানুগ উপায়ে আন্দোলন করা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হল আমাদের বৃহৎ শক্তিশালী সংগঠন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভ করার লক্ষ্যে পৌঁছতে নিয়মতান্ত্রিক পথ ছাড়া অন্য কোন পথকে কংগ্রেস স্বীকার করেনি। ত্রিশ বছরের অধিক কাল ধরে কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক পথেই সেই একমাত্র উদ্দেশ্যের অভিমুখে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে চলে এসেছে আর তার সাফল্যও হয়েছে বিস্ময়কর।

একটি সতর্কবাণী আমি এখানে উচ্চারণ করতে চাই। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবছেন যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য এবং সভ্য জগতে আমাদের মর্যাদার স্থান করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে আমাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণতন্ত্র ও সীমাবদ্ধতার গণ্ডী ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এই ভাবনা সম্পর্কে আমার কথা হচ্ছে এই যে সে রকম প্রয়োজন এখনও দেখা দেয়নি। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্পর্কে যে জ্ঞান আমাদের আছে তাতে মনে হয় না যে পরিমেয় নিকটবর্তী সময় সীমার মধ্যে সেরূপ কোন প্রয়োজন এমনভাবে দেখা দিবে যাতে এখনই আমাদের সে বিষয়ে সজাগ থাকা দরকার। রাজনীতিতে কোন কিছু সম্পর্কে খুব একটা বড় রকমের ধারণা নিয়ে চলা ভুল, অতি বড় কিছু আশা করা ভুল। সেরূপ করলে তা পাওয়ার জন্য সহজেই এমন ভাবে সেদিকে ঝুঁকে পড়তে হতে পারে যার ফলে আমাদের বর্তমান কর্মকাণ্ডই বাধা পেতে পারে ও আমাদের আশু বিকাশ ও উন্নতি ব্যাহত হতে পারে।

একটা শাস্ত্র বাক্য আছে 'দৈনন্দিন প্রাপ্তির প্রাচুর্যের মধ্যে অমঙ্গল নিহিত থাকে'। যারা প্রকৃত কর্মী তাদের এই শাস্ত্রবাক্য কখনই ভোলা উচিত হবে না। আমরা যদি ঘোষণা করি যে আমরা ব্রিটিশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন হতে চাই, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে কোন দায়-দায়িত্বের বাধ্যবাধকতার মধ্যে না থেকে খাঁটি স্বায়ত্ত শাসন চাই, কেউই আমাদের সে আশা আকাঙ্খার আপত্তি করতে পারেনা। কারণ, ইহা মূলতঃ ন্যায্য এবং দেশে প্রেমোদ্দীপক মনোভাব। কিন্তু আমাদের পরিবেশের কথা, ঘটনা পরম্পরার কথা ভাবতে হবে। কারণ তাই কোন রাজনৈতিক তত্ত্বকে রূপ দান করে এবং চিন্তানৌচিত্য বোধের প্রেরণা দেয়। তা হলে এখন যদি আমরা এই ভাবাদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকি এবং আমাদের বর্তমান প্রাত্যহিক রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর মধ্যে তাকে জোরদার করার চেষ্টা করি তা হলে কি ঘটবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি আমাদের সে আশা পূরণের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হবে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের দাবী উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শক্তির সমস্ত প্রভাব আমাদের পক্ষেই থাকবে। সে ক্ষেত্রে আমরা যে কেবলমাত্র কোন বাধাই পাবনা, তা নয়, আমরা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সহানুভূতি, হয়ত সাহায্যও পাব; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত শাসন ভোগ্য ডোমিনিয়ন গুলিরও সাহায্য পাব। বিচ্ছিন্নতার তারা আপত্তি জানাবেন, হয়ত বা প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করবেন, কিন্তু ঐকাকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তিকে তারা স্বাগত জানাবেন, সাহায্যও করবেন।

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পরে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় বলে মনে হলে আরও উন্নতি সাধনের জন্য কি করা না করা, তা আমাদের উত্তরাধিকারীদের ভাবনার জন্য রেখে যেতে পারি। তারাই হবেন শ্রেষ্ঠ বিচারক। তারাই তখন অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। ইতিমধ্যে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস লাভ করার জন্য কাজ করে যাব। আমাদের সে প্রচেষ্টায় সমস্ত সভ্য মানব সমাজেরও সমর্থন হয়ত আমরা পাব। পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে এই সমস্ত বিবেচনার বিষয়-গুলিকে কি উড়িয়ে দেওয়া যায়?

কিন্তু এই ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস কি ভাবে লাভ করা হবে? সুশৃংখল, নিরুপদ্রব ক্রম বিকাশের পথে, না খোলাখুলিভাবে প্রকাশ্য বিপ্লবের পথে, কিংবা অন্ততঃ বিপ্লবী কার্য্যক্রমের সহায়ক এমন কোন পদ্ধতিতে যাকে বিপ্লবী কর্মধারারই একটা অংশ বলেই অবশ্য মনে করা যাক? দীর্ঘকাল জনসেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এবং কর্ম-জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করায় এ বিষয়ে প্রামাণিকতার সহিতই আমি কিছু বলতে পারি। ১৯০৯ সালে ধিংড়া যখন লণ্ডনে একটি এনার্কিষ্ট হিংসাত্মক কাণ্ড করল, আমি তখন লণ্ডনে ছিলাম। ঘটনাটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

স্যার উইলিয়াম কার্জন উইলি এবং ডাঃ লাল কাকাকে সে গুলি করে হত্যা করল। এই হত্যা কাণ্ডের ফল কি হল? আমি লণ্ডনে আমার কাজে ভয়ঙ্কর ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলাম আমার সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা অচল হয়ে পড়ল। আর ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র অধ্যয়নরত ছিল, তাদের অবস্থাও অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে উঠল। আমি অবশ্য সমস্ত অনিষ্ট দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর পরি-স্থিতির ধাক্কা এখনও সামলাতে হচ্ছে। তাই আমার দেশবাসীর কাছে আমার মিনতি: 'বিপ্লবের কথা বলো না। প্রতিবন্ধকতা বা বাধা সৃষ্টির কৌশলের কথাও বলো না। বাধাসৃষ্টির কাজও বিপ্লবাত্মক কাজের সহায়ক। তা যদি করো, তা হলে তোমাকে বিপদের মুখে গিয়ে দাঁড়াতে হবে যেখান থেকে, নিজেকে সামলাবার জন্য তুমি যত চেষ্টাই করনা কেন, তোমাকে ক্ষিপ্র গতিতে আসল বিপ্লবের গভীর গহ্বরে পড়ে যেতে হতে পারে। সে বিপ্লবের ভয়ঙ্কর পরিণতি হচ্ছে রক্ত পাত, আর তারই পেছনে পেছনে আসবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। তাই মিনতি আগুন নিয়ে খেলা করো না। একবার সে বিক্ষোভ আরম্ভ হয়ে গেলে তাকে ঘিরে অনেক অশুভ শক্তি এসে দাঁড়ায়। সে সময় সেই অশুভ শক্তি সম্পর্কে তোমার হয়ত কোন ক্ষীণতম ধারণাও থাকে না। এই শক্তিগুলি সেই বিক্ষোভ-কে এমনভাবে বাড়িয়ে তোলে ও গতিবেগ দান করে যা বিক্ষোভের সৃষ্টি কর্ত্তারাও ধারণা করতে পারেন না। তখন তারা সেই বিক্ষোভকে সংযত করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন।

(চলবে)

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

শ্রেণীর মানুষের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ১৯৬৯ সালের সি পি আই (এম) প্রভাবিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থ প্রশাসন ১৯৭১ সালের নির্বাচনে প্রভাব ফেলে এবং ১৯৭২ সালের নির্ব্বাচনে মার্কসবাদীদের ভরাডুবি ঘটায়। (১৯৮২ সালে এ রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্ব্বাচন হলে ১৯৭২-এর পুনরাভিনয়ের সম্ভাবনা যে নেই তা বলা শক্ত।)

১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই অসুস্থ চারু মজুম-দার তাঁর কলিকাতার গোপন আশ্রয় নিবাদে গ্রেপ্তার হন এবং লালবাজার পুলিস লক-আপে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী চারু মজুমদারের মৃত্যু ভারতের কমিউনিষ্ট বিপ্লবের বিতর্কের অবসান না ঘটিয়ে তাকে জটিলতর করেছে এবং কমিউনিষ্টদের চিন্তায় যে ঢেউ তুলে গেছে তা সহজে থামবে না।

নকসাল আন্দোলন ব্যর্থ হলেও, বিপ্লববাদী, উন্নতচরিত্র তরুণদের আত্মদান কখনো বিফলে যেতে পারে না। সমাজ-চিন্তায় তার প্রভাব অপ্রত্যক্ষে কাজ করে যাবে। প্রচলিত ইতিহাস যাই বলুক না কেন—তাঁদের ইতিহাস অমর হয়ে থাকবে। তাঁরা ছিলেন—

"আমরা ধরি মৃত্যু রাঙার
বজ্র-ঘোড়ার রাশ,
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের
জীবন-ইতিহাস।"

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
Regd. WB/NC 7/

বার্ষিক :—মাত্র ১৫.০০ টাকা
বান্মাষিক :—৮.০০ টাকা
মূল্য—৩০ পয়সা

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী

শ্রীকালীপদ সরকার

শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীধারীন ঘোষ

প্রচ্ছদ—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রগাহন রায়—৫.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ রায়চৌধুরী

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—প্রবোধ বসু

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

বাংলার বিপ্লব—১.৫০, ২। ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ অনুশীলন সমিতির ক্রি. মিছিল—২.০০, ৪। পৌষালী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, সাকোরী ষড়যন্ত্র—১.২৫, ৬। কলটা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—৭০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—১০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে নারী ও মেয়ে—৭০, ১০। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—৭০ বিপ্লবী বিবেকানন্দ—৫০, ১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—৭০ ১২। ভারতের মহাবিপ্লব ও জাপানী বিভীষিকা—১৫, ১৩। বেশ বাঘের ছোবোনি (১)—১.০০, ১৪। বেশ বাঘের ছোবোনি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চট্টগ্রামের আহ্বান—৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হারিয়ে যাওয়া প্রচেষ্টা—১৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৫০, ২০। মাই হারা প্রচেষ্টা—১.৫০

কার্যালয় :— ৪নং বক্সি দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

বৈঠকখানা—১/১৫১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বক্সি দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

একাদশ বর্ষ	শনিবার ২২শে ফাল্গুন ১৩৮৮ ৬ই মার্চ ১৯৮২	২২ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

দুইটি জিনিস হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদকীয়

সুপ্রিম কোর্টের অভূতপূর্ব রায়

সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখার্জির নিকট নির্বাচন সংক্রান্ত একটি বিচারাধীন মামলা নিয়ে যে সব ঘটনা ঘটে গেল, সেটা রীতিমত একটি রোমহর্ষক ঘটনার সঙ্গে তুলনা করছেন কেউ কেউ। বস্তুতঃপক্ষে ঘটনাটি রীতিমত দুর্বোধ্য। সাধারণ গৌড়জন এসব দেখে শুনে হৃদয়ঙ্গম করছেন সেই প্রবাদটিকে—Facts are sometimes stronger than fiction. অর্থাৎ বাস্তব ঘটনা কখনও কখনও রূপকথার চেয়েও আশ্চর্যজনক হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আছে। এখানে ন্যায়বিচারের পারম্পর্য্য বহুদিনের। এমন সময় ছিল, যে এখানকার বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা, সূক্ষ্ম আইনজ্ঞান, ও নির্ভিকতা এদেশের আদর্শস্থানীয় ছিল। এখানকার বিচারপতিদের পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও আইনের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা, সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। এদের কারো কারো স্বাধীনচিত্ততা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। শোনা যায়, ইংরেজ রাজত্বে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতিকে কোন ব্রিটিশ আসামীকে খালাস দেওয়ার অনুরোধ করলে, তিনি প্রশাসকদের দ্বারা বিচার বিভাগকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত চেষ্টা বলে মনে করেন এবং হাইকোর্টের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেন। সে গৌরব আজো বহুল পরিমাণে বিধৃত আছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং এমন একটি হাইকোর্টের বিচারাধীন মামলাকে তড়িঘড়ি নির্দেশ দেওয়া হলে, নির্দ্ধারিত দিনের পূর্বে মামলার বিচার শেষ করার জন্য এবং সেই নির্দ্দেশ পালন করতে বলা হল প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশের মারফৎ। এমন অভূতপূর্ব, নজীর বিহীন নির্দ্দেশ ইতিপূর্বে কখনও জারি করা হয়েছে বলে ইতিহাস কোন সাক্ষ্য দেয় না। এটা আদেশ, কি অধ্যাদেশ সাধারণ মানুষের এমন কি আইনজ্ঞরাও বুঝতে পারছেন না।

গণতান্ত্রিক দেশে, সাধারণ মানুষের অধিকার বিপন্ন হলে, তা রক্ষা করতে পারেন দেশের উচ্চতম আদালতগুলিই। কিন্তু সেখানকার বিচারপতিদের এমন আদেশ দেওয়ার আগে শতাধিকবার ভাবতে হবে যে তাদের বিচারপদ্ধতি ও রায়গুলি যেন জনগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে, তাদের ন্যায়বিচারের উপর যেন কোন সন্দেহ না জাগে, যেন মনে না হয় তারা অশোভন আগ্রহের সঙ্গে কোন কাজ করেছেন। এতে গোটা বিচার-বিভাগের সুনাম নষ্ট হয় এবং মানুষ ন্যায়বিচারের উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে।

বর্তমান সুপ্রিম কোর্টের আদেশ সম্বন্ধে মানুষের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, তার নিরসন হওয়া দরকার সকলের স্বার্থেই। এখানে একটি মামলা চলছিল বিভিন্ন প্রান্তের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে।

রাজনীতির কোন স্থান নেই কোন বিচারালয়ে। যে অভিযোগ বিচারপতির নিকট পেশ করা হয়, তার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করতে হলে, উপযুক্ত প্রমাণ, নথিপত্র, সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত করতে হয়। আদালত সে সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তার রায় দান করেন। কোন বিচারপতিকে বিচারাধীন মামলা সম্বন্ধে তার নিজস্ব পদ্ধতি, বিচার বিশ্লেষণ হঠাৎ হুকুম জারী করে সংক্ষিপ্ত এমন কি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সমাধা করতে বললে ও তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়। এমন কি এর ফলে উচ্চতর আদালতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবার সম্ভাবনাও থাকে। এ কথা সত্য বটে যে বিচার এদেশে অনেক সময় দীর্ঘায়িত হয় নানা কারণে। কিন্তু Laws delay বলে মেনে নেওয়া ব্যতীত উপায় থাকে না।

এবারকার সুপ্রীম কোর্টের আদেশের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করার জন্য যে সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তা কেন করা হল, এ প্রশ্ন উঠবেই এবং উঠেছেও। কেউ বিচারাধীন মামলার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপিল করলেই কি এমনিতরো নির্দেশ দিতে হবে? যারা আপীল করেছিলেন, তারা কিসের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন? বিচারপতি মুখার্জি কোন রায় দেননি, সুতরাং তার রায়ের বিরুদ্ধে এই আপিল নয়। তবে কি তাঁর নিরপেক্ষতা ও বিচার ক্ষমতাকে এরা সন্দেহ করেছে? সুপ্রীম কোর্ট কেন বললেন না যে এই মামলা বিচারাধীন, কাজেই কোন আপিল এক্ষেত্রে অচল।

বিবাদীপক্ষ নানা কথা বলেছেন। সেটা তাদের অধিকার ভুক্ত এবং সে কথা তারা বলতে পারেন। কিন্তু আদালত কেন কোন গুরুতর কারণ ব্যতীত সে আপিল গ্রহণ করলেন, এমন অদ্ভুত আদেশ দিলেন? যারা বলতে চান যে পয়লা মার্চ নির্বাচন তালিকা প্রকাশিত না হলে, এ রাজ্যে নির্বাচন হবে না তারা ত ভ্রান্ত। বর্তমান পয়লা এপ্রিল নির্বাচন তালিকা প্রকাশিত হলে, পৃথিবীতে কি আকাশ ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা ছিল? পয়লা মে তারিখে একাজ করলেও চলে, কারণ তেত্রিশ দিনের ব্যবধান থাকলেই যথেষ্ট হত। বর্তমান বিধান সভার আয়ুকাল ত ২৪শে জুন পর্যন্ত। একদল রাজনীতিবিদ তাদের রাজত্বকালে নির্বাচন সমাধা না করতে পারলে. তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হবে না বলেই শঙ্কিত। অবশ্য তারা মুখে বলছেন বিরোধী দলেরা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে ভীত। কিন্তু স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের প্রধান সর্ত হল নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন। সেটা করা হয়নি উদ্দেশ্য প্রণোদিত এটাই তাদের বক্তব্য এবং বর্তমান মামলায় তার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করাই বিচারপতি মুখার্জির করণীয়। সে সুযোগে একদলকে বঞ্চিত করা ও অন্যদলকে অন্যায় কাজের সুযোগ করে দেওয়া নিশ্চয়ই ছোট, মেজ, বড় কোন আদালতেরই দায়িত্ব হতে পারেনা।

বিচারপতি মুখার্জিও যে এজন্য ক্ষুব্ধ, সেটা তার মন্তব্যে পরিস্ফুট। তিনি বলেছেন সংবিধান, আইন ও পূর্ব নজিরে এই ঘটনার কোন সমর্থন মেলে না। এটা অনুরোধ, নির্দেশ বা আশা যাই হোক না কেন, এই ঘটনা বিচার ব্যবস্থার মর্য্যাদা, আদালতগুলি বা বিচারকদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, আমি বুঝতে পারছি না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি বেনজীর। এর সঙ্গে এই আদালতের মর্য্যাদার প্রশ্ন জড়িত, তাই আমি ওই নির্দেশ পালন করতে ইতঃস্তত করেছিলাম। কিন্তু আমি বিচার বিভাগের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই। আমি নিজেকে

বিচার বিভাগের শৃঙ্খলার অধীন বলে মনে করি। তাই এমন কিছু করতে চাই না যাতে বিচার ব্যবস্থার ক্ষতি হতে পারে। তাই আমি ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ গ্রহণ করে, এই আদেশ দিচ্ছি।

কলিকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বার এসোসিয়েশনও এজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিমত হল এ ধরণের নির্দেশ সংবিধান বিরোধী এবং এতে হাইকোর্টের মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এ রকম ঘটনার সংবিধান, আইন ও পূর্ব নজীরের কোন সমর্থন নেই। বিচারপতি মুখার্জী এই নির্দেশ অমান্য করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে যে সঙ্কট সৃষ্টি হত, তাতে সুপ্রীম কোর্ট ও সাধারণ ভাবে সব আদালতেরই সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত হত। বিচারপতি মুখার্জী আইন ও সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদা রক্ষা করেছেন রীতিমত ক্ষুব্ধ হওয়া সত্বেও, এজন্য তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। কলিকাতা হাইকোর্টের সুনাম রক্ষা করেছেন বলে তিনি নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। সুপ্রিম কোর্ট তাদের সংবিধান বহির্ভূত কাজ করা সমীচিন হয়েছে কিনা ভেবে দেখবেন বলে আমরা প্রত্যাশা করি। এ সত্য ত সর্বজন স্বীকৃত যে বিচারপতিদের শুধু ন্যায় বিচারপতিদের শুধু ন্যায় বিচার করলেই হবে না, ন্যায় বিচার যে করা হয়েছে সেটা সকলকে, অনুভব করাতে হবে।

বিচারপতিদের কার্যকলাপ ও রায়গুলির মধ্যে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে বের করা নিছক বাতুলতা রাজনীতিবিদদের, বিশেষ করে, এ রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলগুলির, হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে আদালতে মামলার জের যদি দীর্ঘায়িত হয় এবং সেজন্য সংবিধান সম্মত কারণে যদি এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক হয়, তবে সে দায়িত্বের সিংহভাগ তাদের উপরই বর্তাবে, এটাই বহু চিন্তাশীল মানুষের ধারণা। এই ধরণের কার্যকলাপ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপরও আঘাত হানবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী সম্মেলন

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ কলিকাতার উত্তর দমদম স্বাধীনতা সংগ্রামী কর্মী সমাজের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামীর উপস্থিতিতে আগামী দিনের জন্য কতকগুলি বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, যান্ত্রিক কুটিরশিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা যাদের মধ্যে অন্যতম। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী অধ্যাপক অতুল গুপ্ত এবং সভার কাজ পরিচালনা করেন কর্মী সমাজের সম্পাদক শ্রীসুখেন্দু সোম।

সমুদ্র জলসীমা অধিকার প্রশ্ন

—কালীপদ সরকার

সমুদ্রের ব্যবহার ও অধিকার-সীমা নির্ণয় সম্পর্কে আবার নতুন করে বিচার বিবেচনা শুরু হয়েছে এবং তথ্যাভিজ্ঞরা মনে করছেন, এই বছরের শেষাশেষি অথবা ১৯৮৩ সালে সমুদ্র আইন চুক্তিটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সভায় গৃহীত হতে পারে। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র আলোচনা বয়কট করায় গত তিন বছর বিষয়টি চাপা ছিল। রিগান প্রশাসন সম্প্রতি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় আলোচনায় যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং খসড়া চুক্তির শর্তাবলী খতিয়ে দেখছে।

সমুদ্রের উপর সকলের সমান অধিকার—এই প্রাচীন নীতি বর্তমানে অচল। এমন কি সমুদ্রের উপর উপকূলবর্তী দেশের তিন মাইল পর্যন্ত অধিকার, সপ্তদশ শতাব্দীর এই সিদ্ধান্তও অচল ও পরিত্যক্ত। তিন মাইল ব্যাপী অধিকারনামার প্রবর্তক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেফারসন। তাঁর সময় কামানের গোলার গতিসীমা ছিল তিন মাইল, জেফারসন সমুদ্র তীরবর্তী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিন মাইল পর্যন্ত অধিকার সঙ্গত বলে স্থির করেন। বলা বাহুল্য সেই সিদ্ধান্ত এখন অর্থহীন।

সমুদ্র সংলগ্ন দেশগুলি পরে ৩ মাইল অধিকার সীমাকে ১২ মাইল করে নেয় কিন্তু তাতেও প্রয়োজন মিটছে না। বর্তমানে আলোচনা চলছে সমুদ্র-অধিকার সীমাকে ২০০ মাইল অবধি বিস্তৃত করার। এই সীমাবৃদ্ধির দাবির পিছনে প্রতিরক্ষার চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মৎস্য শিকার, জ্বালানী তৈল ও খনিজ আহরণ এবং সমুদ্রজলকে দোষমুক্ত রাখার অধিকারগত প্রয়োজন।

উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যবহারে সমুদ্র এখন অনধিগম্য নয়। যান্ত্রিক কৌশলে মৎস্য শিকার প্রায় নিশ্ছিদ্র। অবাধ মৎস্য শিকার, সহর বন্দর কলকারখানা এবং জাহাজের পরিত্যক্ত আবর্জনা, গ্যাস এবং বিষাক্ত রাসায়নিক অবশেষ, সমুদ্রজলকে অবিরত দূষিত করতে থাকায়, শুধু মৎস্যের বংশবৃদ্ধি হ্রাস করছে তাই নয়, মৎস্যকুলকে ধ্বংস করতে বসেছে।

সমুদ্র জরীপে জানা গিয়েছে, তীরবর্তী দেশগুলির নব্বই কোটি লোকের মলমূত্র, আবর্জনা, শিল্পশালার বিষাক্ত অবশেষ পড়তে পড়তে ভূমধ্য সাগরের জল এমন বিষাক্ত হয়েছে যে সেখানে সামুদ্রিক মৎস্য বিলুপ্তপ্রায়, উপকূল ভাগের অনেক স্থানে সমুদ্রস্নান পর্যন্ত নিষিদ্ধ। সমুদ্রতলের উদ্ভিদ মরে শুষ্ক খড়ের আকার নিয়েছে।

অনেক জাতের সামুদ্রিক মাছ ডিম ছাড়ার আগে নদী-প্রবাহে প্রবেশ করে। কল-কারখানার বিষাক্ত অবশেষে নদীজল দূষিত হওয়ায়, এই জাতীয় মাছের বংশবৃদ্ধি কমে গেছে এবং তাদের পূর্বের স্বাদও আর নেই। ইলিশের দুর্লভতা এবং স্বাদহীনতা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। গভীর সমুদ্রের দূর অঞ্চলে দূষিত করণ হয়ত ভয়াবহ নয়, কিন্তু অবহেলিত নদী ও উপকূল সাগরজলকে দোষমুক্ত রাখার প্রয়োজন অপরিহার্য এবং তার মৌল দায়িত্ব সমুদ্রতীরবর্তী দেশের। দায়িত্ব থাকলে অধিকারকেও স্বীকার করতে হয়।

ভারতের তিন দিকে সমুদ্র এবং উপকূল ভাগের পরিমাপ ৩৫০০ মাইল। কৃষিগবেষণা বিভাগ বলেছেন, ভারতে কৃষিভূমি উদ্ধার নিঃশেষিত,

নতুন কৃষিভূমি সংগ্রহের আর কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি হেতু খাদ্যপ্রয়োজন মেটাতে গেলে সামুদ্রিক মৎস্য ও উদ্ভিদের উপর ক্রমেই বেশি করে নির্ভর করতে হবে। অনেক দেশই এই পথ গ্রহণ করেছে।

মনুষ্য খাদ্য ছাড়া সমুদ্রগর্ভে আছে প্রচুর জ্বালানী গ্যাস ও তৈল যার সঞ্চিত পরিমাণ পৃথিবীর স্থলভাগে অবস্থিত তৈল ও গ্যাসের চেয়ে কম নয়। বর্তমানে বিশ্বে প্রতি বছর যে এক কোটি ব্যারেল তৈল উত্তোলিত হয় তার এক পঞ্চমাংশ উঠে তীরবর্তী সমুদ্র থেকে। গভীর সমুদ্রেও তৈল আছে এবং সেই তৈল আহরণের জন্য যন্ত্রপাতি সমন্বিত জাহাজ এবং ভাসমান কারখানা নির্মাণের ব্যবস্থাও হচ্ছে। ভারতের মত বিরাট দেশে প্রয়োজনের মাত্র ১৫ শতাংশ তৈল উৎপাদিত হয়, বাদবাকী তৈল আমদানী করতে রপ্তানী বাণিজ্যের দ্বারা কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অর্দ্ধেকের বেশি চলে যায়। ভারতের আর্থিক সংকট ও বৈদেশিক ঋণের কারণ এটিই। প্রতিরক্ষা, পরিবহন ও শিল্পোন্নয়ন অব্যাহত রাখতে গেলে বর্তমানে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এই চলমান সংকট কাটিয়ে দেশের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে, ভারতকে তৈল উৎপাদনে স্বয়ংভর হতেই হবে এবং তৈল সমৃদ্ধ ভারত মহাসাগরকে কাজে লাগানোর মধ্যে তার সাফল্যের সম্ভাবনা নিহিত।

তৈল ও জ্বালানী গ্যাস ছাড়াও সমুদ্র গর্ভে আছে কয়লা এবং নানাজাতীয় ধাতব আকর। সমুদ্র জলের নীচে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য তামা, নিকেল, ম্যাংগানিজ গ্রন্থি কোবালট খণ্ড বা অনেককাল মানুষের ধাতব বস্তুর প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। পৃথিবীর সীমিত কর্ষণযোগ্য ভূমিতে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির শেষ সীমা আছে। কৃত্রিম রাসায়নিক সার, গভীর নলকূপ বাহিত সেচ এবং বিরামহীন ভূমি ব্যবহারের দ্বারা ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতাহানির বিষয়ও বিবেচ্য। এ অবস্থায় বর্দ্ধিত সংখ্যা মানুষের বিকল্প খাদ্যের উৎস হল সমুদ্র।

এই সত্য উপলব্ধি করে বৈজ্ঞানিকগণ সমুদ্র ও গ্রহান্তরে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। গ্রহান্তরে এ ব্যাপারে কোন আশার আলো দেখতে না পেলেও তাঁরা সমুদ্রগর্ভে মৎস্য ও জলজ উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্যের বিরাট সম্ভার দেখতে পেয়েছেন। সমুদ্র তীরবর্তী দেশ ও দ্বীপ অধিবাসীরা ইতিমধ্যেই সামুদ্রিক মৎস্য, ঝিনুক ও শামুকের শাঁস এবং কিছু উদ্ভিদকে তাদের অন্যতম প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। ভারতের বিকল্প এবং পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহে সমুদ্রকে ভবিষ্যৎ নির্ভরস্থল মনে করা যেতে পারে। তাই সমুদ্র সীমার অধিকার প্রশ্ন ভারতের নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে ভারতীয় বিজ্ঞানী-সমীক্ষক দল কর্তৃক দক্ষিণ মেরু অভিযান এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রস্তাবিত ২০০ মাইল ব্যাপী অধিকার সীমা স্থির হলে, উপকূলবর্তী দেশগুলি দূষিতকরণ থেকে সমুদ্রজলকে যেমন মুক্ত রাখতে পারবে, মৎস্য শিকারকে তেমনি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পাবে। উপকূল দখিয়ার তৈল আহরণ, বিমান চালনার আকাশসীমা ও জলের নীচে সাবমেরিণের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাদের হাতে থাকবে।

সমুদ্রসীমার প্রস্তাবিত অধিকার কিন্তু কতকগুলি শর্তসাপেক্ষ। ভূ পৃষ্ঠে ১১৬টি প্রণালী ও সংকীর্ণ আন্তর্জাতিক জলপথ আছে। এই জলপথের দুই

তীরে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির নিকট থেকে হয়ত জল ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র নেবার প্রয়োজন হবে এবং তার জন্য শুল্কও দিতে হবে। তবে ছাড়পত্র ও শুল্কের ব্যবস্থা চালু হবে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বিধান অনুযায়ী। ২০০ মাইল পর্যন্ত অধিকার সীমা নির্দ্ধারিত হবার সঙ্গে শান্তির সময়ে ঐ সমুদ্র অঞ্চল দিয়ে অবাধ জাহাজ চলাচল ও আকাশ পথে বিমান উড়ার আন্তর্জাতিক অধিকারকেও মেনে নিতে হবে।

এ ছাড়া আছে ভূমিবেষ্টিত দেশগুলির সমুদ্রপথ ব্যবহারের সমস্যা। এই দেশগুলির কথা হল, সমুদ্র প্রকৃতির দান এবং সমুদ্রপথ ব্যবহার এবং সমুদ্রজাত সম্পদ সংগ্রহের অধিকার আছে তাদেরও। ভূমিবন্দী দেশগুলির বক্তব্য একেবারে অসার নয়। উপকূলবর্তী দেশগুলির সমুদ্র সীমা-অধিকার এবং সার্বভৌমত্ব বহাল রেখে, বন্দর সমুদ্রপথ ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকলে ভূবেষ্টিত দেশগুলির প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। তবে এ বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিই বাঞ্ছনীয়।

এরপর আছে গভীর সমুদ্রের মাছধরা ও সম্পদ আহরণের অধিকারগত সমস্যা। মোট সমুদ্র জলের ত্রিশ শতাংশ উপকূল অঞ্চল, বাকি সত্তর শতাংশ গভীর সমুদ্র। ৫ মাইল থেকে ৯ মাইল গভীর যে সমুদ্র, তাও এখন মানুষের নিকট পরিজ্ঞাত এবং সেখানে চলেছে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই গভীর সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত খনিজ আহরণের জন্য নৌ-শক্তি সমৃদ্ধ দেশগুলি খুবই তৎপর। এ নিয়ে বিরোধ ধূমায়িত। সুতরাং কেবল ২০০ মাইল পর্যন্ত উপকূল সীমা ও আন্তর্জাতিক সংকীর্ণ জলপথ বাধামুক্ত করলেই সমুদ্র ব্যবহারের সমস্যা মিটছে না, গভীর সমুদ্র ব্যবহারের জন্যও সর্বসম্মত আন্তর্জাতিক বিধি প্রণয়ন আবশ্যক।

১৯৭৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জ সভার যতগুলি অধিবেশন হয়েছে তাতে কোন বিষয়েই সিদ্ধান্ত লওয়া সম্ভব হয় নি। অধিকারগত প্রশ্নটি অমীমাংসিতই রয়ে গেছে।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের যশোহরের প্রবীণ বিপ্লবী প্রমথ জোয়াদ্দার তাঁর টিটাগড়ের বাড়ীতে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯৩০ সালে তিনি বেঙ্গল অর্ডিনেন্স-এ গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে বন্দী জীবনযাপন করেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার সকলকেই আকৃষ্ট করিত। বন্ধুবৎসল পরোপকারী এই ব্যক্তিটি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর অমর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে জানাই আমাদের আন্তরীক সমবেদনা।

—প্রহর শেষের ঘন্টা বাজে শুনেছ কি হতমান
মহামহিমের ইনসাফ লেখে সত্যের ফারমান—

—সমীক্ষক

বামফ্রন্ট সরকার শাসন কালের সময় সীমায় এসে নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারকে যে শাসক রাজনৈতিক দল নিজের ক্রীড়নকে পরিণত করতে পারেন না সেই সত্যই সাম্প্রতিক প্রদত্ত রায় সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হল। সে বিচারে মাননীয় বিচারপতি বি. সি. বসাকের ২৬ ফেব্রুয়ারীর রায়কে ঐতিহাসিক বলতে হয়।

যে রাজনৈতিক দলই সরকার চালান না কেন, তাকে স্বদল, বে-দল এবং দল-নিরপেক্ষ সকল নাগরিকের সংবিধান সম্মত বৈধ অধিকার রক্ষা করতে হয়—এই হল উক্ত রায়ের সারমর্ম। বিচারপতি রাজ্য সরকারকে আদালত অবমাননার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং তার জন্য কেন আইন মাফিক শাস্তি বিধান হবে না তার কারণ দর্শাবার নোটিস জারি করেছেন রাজ্য সরকার, মুখ্য সচিব অমিয় কুমার সেন, পুলিস কমিশনার নিরুপম সেন এবং কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ার ম্যানের উপর।

শেষোক্ত তিন মহারথী প্রত্যক্ষভাবে আদালতের নির্দেশ অমান্যের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই দায়িত্বপূর্ণপদে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল বলেই স্বীকার করতে হয়। রাজ্য সরকার এবং মহারথী ত্রয় 'শো-কজ' নোটিসের জবাবে কি বলেন এবং তার পরিণতি কতদূর গড়ায় তা দেখার জন্য জনসাধারণ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন।

অন্য একটি মামলা যার বিষয়বস্তু ভোটার তালিকা—এখন হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন। এক দল লোক বলছেন, নির্বাচন রাস্তা ছেড়ে এখন আদালতে। মার্কসবাদী সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা বলছেন, কংগ্রেস (ই) পঃ বঃ বিধান সভার নির্বাচন পিছিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে মামলা মামলা জুড়ে চক্রান্ত করছে। আপাত দৃষ্টিতে এঁদের কথায় ছাপ থাকলেও, বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধির গভীরতা নেই।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের বৈধ অধিকার রক্ষার শেষ আশ্রয় বিচারালয়। ভারতের সংবিধায়কগণ সেই কারণে লোকসভা ও বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদল সংবিধান অনুযায়ী কাজ করছে কিনা তা দেখার ক্ষমতা বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত করেছেন। গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এ ব্যবস্থা যে অপরিহার্য, যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল আগে 'ওয়াটার গেট' কেলেংকারি মামলা এবং প্রেসিডেন্ট নিকসনের পদত্যাগে তা প্রমাণিত হয়েছিল।

ভারতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণকালে পদপার্থীকে যে শপথ নিতে হয় তাতে সংবিধান মেনে চলা ও নিরপেক্ষ আচরণের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকার আছে। ক্ষমতার মোহে অন্ধ বামফ্রন্ট সরকার সেই পবিত্র প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখার দরকার বোধ করেন নি, তাই আজ নিগৃহীত বঞ্চিত-অধিকার নাগরিকরা প্রতিকারের পথ না পেয়ে শেষ আশ্রয় আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। এতে চক্রান্তের কি আছে?

বামফ্রন্ট সরকার যদি আদালতের নির্দেশে নিজেকে হতমান মনে করেন এবং লোকচক্ষে হেয় হন, তবে তার জন্য বামফ্রন্টের নেতারাই দায়ী।

বাল্যখিল্যরা বলতে পারেন, বিচারপতি বসাকের রায়ই শেষ কথা নয়, 'বাবারও বাবা আছে। যেমন বিচারপতি সব্যসাচী মুখার্জির ভোটার তালিকার মামলার অন্তবর্তী আদেশ সম্বন্ধে তাঁরা বলেছিলেন। অথবা তাঁরা হালকা মেজাজে বলতে পারেন, 'রেখে দাও ও সব আদালতের রায়' মাঁকড় ঝোঁকড় হয়।'

কিন্তু বিষয়গুলিকে এত লঘু করে দেখা চলে না। এদের সঙ্গে ভারতীয় নাগরিকদের সাংবিধানিক মৌল অধিকার রক্ষার প্রশ্ন জড়িত আছে। আদালত অবমাননার জের সহজে মেটবার নয়, কারণ তার পিছনে আছে আরো অনেক প্রশ্ন। পরবর্তী শুনানী শুরু হলে সে সব প্রকাশ পাবে।

এই মামলার শুনানী শেষ হতে হতে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাবে কিনা তাও বলা শক্ত। কারণ হাইকোর্টের পর সুপ্রীম কোর্ট আছে। তবে মামলাগুলি আর কিছু না হোক একটি গনতান্ত্রিক আচরণ বিধির নজির হয়ে থাকবে যা ভবিষ্যতে অন্য সরকারগুলিকেও সতর্ক হবার সুযোগ দেবে। ক্ষমতা পেয়ে ইচ্ছামত হাতে মাথা কাটা যায় না।

বিচারপতি বসাকের রায়ে বলা হয়েছে, ১৯৮১ সালের ৩রা এপ্রিল কংগ্রেস (ই)-র ডাকা বনধের পূর্বে কলিকাতা রাষ্ট্র পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান কর্মীদের প্রতি যে সার্কুলার দিয়েছিলেন ১৯৮২ সালের ১৯ই শে জানুয়ারী বামফ্রন্টের ডাকা বনধের তাঁর দেওয়া সার্কুলার বয়ানে ও অর্থে পৃথক। সার্কুলার জারির সময়সীমার মধ্যের ব্যবধান বিদ্যমান অথচ বামফ্রন্ট সরকার বলেন, সরকার বনধ ঘোষণা করেন নি। সরকার বনধের পক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়।

নির্বাচনের ভিত্তি হল ভোটার তালিকা। ভোটার তালিকায় কারচুপি থাকলে নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য। বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ সময় ধরে ভোট লড়াই-এর জন্য যে ফাঁদ তৈরী করেছেন তাতে জেনে শুনে যদি কেউ ধরা দিতে না চায় তাহলে তাকে কাপুরুষ বলা হয় কোন্ যুক্তিতে?

ভোটার তালিকার কারচুপি 'ওয়াটার গেট' কেলেংকারির চেয়ে কিছু কম নয়। পশ্চিমবংগের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার এ সম্বন্ধে কি বলেন? অবশ্য এই সব গুরুতর প্রশ্নের জবাব শোনার সুযোগ হয়ত জনসাধারণ পাবেন না। মেয়াদ শেষের ঘন্টা হয়ত তার আগেই বেজে যাবে এবং বামফ্রন্ট জবাব না দিয়েই তল্পি নিয়ে সরে পড়বেন, সমস্ত দোষ চক্রান্তের উপর ঝেড়ে ফেলে। ইনসাফ বেইমানদের এন্তেজাম করতে না পারলেও মহামহিমের ফরমানকে কেউ নাকচ করতে পারে না।

ঠাকুরের 'কথামৃত' বিশ্বশান্তির সহায়ক

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিম উলঙ্গ অরণ্যচারী মানুষ আপন প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে উন্নত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনায় অসভ্য অবস্থা থেকে সভ্যতামুখীন এক নূতন ধরনের জীবন যাপনের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তাদের সে সাধনা ক্রমবিকশিত হয়ে সুসভ্য মানুষের জন্মকে সম্ভব কোরে তোলে ধাপে ধাপে। অসভ্য মানুষের মধ্যে যে প্রকৃত স্বাভাবিক সরলতা ও মনখোলা ভাবের আদান প্রদানের প্রবণতা ছিল তা কিন্তু সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হতে শুরু করে। মানুষের মধ্যে কপট ও কৃত্রিম আচার-আচরণের সাক্ষাৎ মেলে তখনই, যখন সে নিজেকে সভ্য বলে চিহ্নিত কোরতে প্রয়াসী হয় বা প্রকৃতই সভ্যতা বিলাসী হয়ে ওঠে। ফলে সভ্য মানুষ কূট বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে অপরের ওপর প্রভুত্ব বিস্তারে লালায়িত হয়ে ওঠে প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই। স্বার্থের সংঘাত আগেও যেমন ছিল অরণ্যচারী অবস্থায়, ঠিক তেমনটিই রইল বা তা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিল সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে; কিন্তু পূর্বের মত তা আর প্রকাশ্যে রইলনা বটে, তবে প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল তা ঠিক ছাই চাপা সুপ্ত অঙ্গারের মত ভিতরে ভিতরে তা প্রজ্বলিত হয়েই রইল। সভ্যতা মানুষকে অনেক কিছু জাগতিক সম্পদের অধিকারী করলেও, মানসিক সম্পদের দিক থেকে মানুষ অনেকখানি হারিয়ে ক্রমশই ছোট হয়ে যেতে থাকল কৃত্রিম সভ্যতার চাপে পড়ে।

সভ্যতাকে সম্বল করে নিয়ে বর্তমান মানুষ যত বড়াই করুকনা কেন, সভ্যতার সুফল যেমন অনেক-গুলি পাওয়া গেল তেমন কুফলও তার জন্য কম কিছু নয়। মানুষের মন আর মুখ এক ছিল আদিমকালে এবং সভ্যতাবিকাশের স্তরে স্তরে মানুষ নিজেকে সংকুচিত করতে গোপন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আপন স্বার্থ চিন্তায়ও তথাকথিত মর্যাদা রক্ষার তাগিদে, যদিও সেই স্বার্থচিন্তাও মর্যাদা বোধ অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গতও নয় বাস্তবে। তবু একটা হীনমন্যতা মানুষকে সব সময়েই কেমন যেন ঘিরে থাকে, যার হাত থেকে তার আর নিস্তার থাকে না অত্যন্ত আত্মসচেতনতার কারণে যা মোটেই অভিপ্রেত নয়। সভ্য মানুষ কালক্রমে এত মারাত্মক ও ভীষণ ভাবে কপটাচারী হয়ে পড়ে যে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উন-বিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে মানুষকে 'তার মুখ আর মনকে এক করার' জন্য উপদেশ দেন এবং উক্ত উপদেশ শ্রী'ম' অর্থাৎ শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত ঠাকুরের 'কথামৃত' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে যান ১৮৮২ সালে। কথামৃতের শতবর্ষ পূর্তির বছর ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ সাল। ঠাকুরের শ্রীমুখ নিসৃত বাণীগুলি 'কথামৃতে' ঠিক ঠিক ভাবে লেখা ও পরে তা ছাপা হয়েছে। সভ্যতা গর্বী সুশিক্ষিত মানুষকে সংযত ও সন্ত্রাবাপন্ন করার জন্যই ঠাকুরের উক্ত উপদেশ।

ঠাকুরের জীবদ্দশায় উনবিংশ শতাব্দিতে যে সব তদানীন্তন সুশিক্ষিত ও সুসভ্য ব্যক্তি ঠাকুরের সান্নিধ্যলাভে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের 'মা ভব-তারিণীর' মন্দিরের ছোট ভট্টচায (নিরক্ষর পূজারী বামুন গদাধর চাটুজ্যের) পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের ঈশ্বর ভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন ও ঠাকুরকে অবতার বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তথায় আগত ভৈরবী ব্রাহ্মনীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপনের পরেই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তদীয় প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে সে যুগে বহু উচ্চ শিক্ষিত প্রকৃত জ্ঞানীজন আধ্যাত্ম চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে উচ্চ-পর্যায়ের জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হন। ভারতের বিপ্লববাদের প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং ও তদীয় শিষ্যা মিস্ মারগারেট নোবেল অর্থাৎ ভগ্নী নিবেদিতা স্বামীজির আদেশেই তিনি ভারতীয় পবিত্র বিপ্লবীদের সাহচর্যে এসে তাঁদের নানাভাবে সক্রিয় সাহায্য, সহযোগীতা দেন ও অর্থ যোগাড়ের সহায়ক হন। আই রিশ মহিলা নিবেদিতা ভারতকে নিজ পূর্ণ জন্মভূমি বিবেচনায় বিপ্লবের পাশে এসে বিশাল শক্তি নিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে দাঁড়ান।

বিপ্লব আন্দোলন বেশ শক্ত মাটিতে দানা বেঁধে প্রকাশ্যে বর্তমান হয় ভারতভূমিতে ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে। 'যত মত তত পথ' ঠাকুরের উক্তি এবং দৃঢ় বিশ্বাস সেই যুগে মানুষকে পরস্পরের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। আত্মোক্ষণ চণ্ডালকে ঠাকুর কোল দিয়ে জগতকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে, কেউ-ই অপাংতেয় নয়, অবহেলার বস্তু নয়, কাউকেই পরিত্যাগ করা চলে না সকলকে নিয়েই জীবনের চলার পথে এগিয়ে যেতে হবে, তবেই চলা সার্থক আর জীবনও সার্থক।

সর্বমানবের কল্যাণই ঈশ্বর চিন্তার সোপান। 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। এই মহাবাণীকে সম্বল কোরেই ভারতের মানুষ সেদিন মনুষ্যত্বে উন্নীত হবার সাধনায় মগ্ন হবার জন্য চেষ্টিত হয়েছিল।

আজিকার মত জাতিতে জাতিতে, ধর্মীয় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, রাজনৈতিক দলে দলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, যে কোনও মতাদর্শে বিশ্বাসীতে বিশ্বাসীতে, দেশে দেশে অঞ্চলে অঞ্চলে যে হানা-হানি ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অহরহ লেগেই আছে, তার থেকে মুক্তির পথ দেখায় ঠাকুরের উপদেশাবলী, ঠাকুরের বিশ্বমানবতাবাদ ও ঠাকুরের সমগ্র জীবন সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪৭ বৎসর পূর্বে ধরাধামে আবির্ভূত হন ২৪শে ফেব্রুয়ারী। তাঁর ১৪৭ তম জন্মতিথি পালিত হয় ও পূজা, পাঠ, হোম, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ঐ তারিখে সম্প্রতি বেলুড় মঠে বিপুল জনসমাগমে ঐ ব্যাপারে উৎসব পালিত হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ রবিবারে। জনসমুদ্র উদ্বেল হয়ে ওঠে তথায় ঐ দিনে, কিন্তু ঠাকুরের মহাবাণী সফল করার কোন প্রয়াস তো দেখা গেল না। সেই হিংসা, দ্বেষ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ, কপটাচার, পরশ্রীকাতরতা এক কথায় যত কিছু হীনতার প্রাবল্য। তা তো কৈ। অন্তর্হিত হলোনা আজো। তবে কি ঠাকুরের মহাবাণী ব্যর্থ হবে ? না তা কখনই নয়। মানুষ নিশ্চয় নিজেদের ভুল বুঝে ঐ ঐ ঘৃণ্য পথ পরিহার করে ঠাকুরের আদেশ ও উপ-দেশ মত চলার চেষ্টা করবে।

নিজেদের সুষ্ঠু জীবন যাপনের উদ্দেশ্যেই মানুষ-কে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রদর্শিত বিবেকের পথে চলে জীবনকে উন্নীত করতেই হবে সভ্যতা মানুষকে যান্ত্রিক মানুষে পরিণত কোরতে উদ্যত বলে প্রতীতি হয়, কারণ বর্তমান সভ্যতার যুগে মানুষ অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক, নির্লজ্জ স্বার্থপর, পরমত অসহিষ্ণু ও ভোগবাদী আত্মসর্বস্ব জীবে পরিণত হতে চলেছে যা সারা বিশ্বে সংঘাত সৃষ্টির পথে মানুষকে নিক্ষেপ করছে। এর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতেই হবে, নচেৎ সমগ্র মানব জাতির বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী অদূর ভবিষ্যতে। ঠাকুরের মহাবাণীকে সার্থক করার জন্য বিশ্বের

সকল দেশের তরুণ-তরুণীকে এগিয়ে আসতে হবে নিষ্ঠার সঙ্গে, সততার সাথে, আত্মবিশ্বাসের বলে, তবেই মানব জাতির মুক্তি, ভোগ-বিলাসের হাত থেকে পরিত্রাণ বাস্তবে সম্ভব হবে। ভারতীয়দের মধ্য থেকেই সে প্রচেষ্টা শুরু হবে অগ্রে, পরে সকল জাতি, সকলদেশ উদ্বেলিত হয়ে ছুটে আসবে এই পুণ্যভূমি ভারতে। তবেই মানব প্রজাতির অগ্রগতি নিশ্চিত হবে পারস্পরিক সমঝোতা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে। বস্তুবাদী দেশ ও জাতিগুলিও নিজেদের অহমিকা পরিত্যাগ করে ভারতীয় ঋষি ও মহাপুরুষদের আধ্যাত্ম জীবনধারার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। দারিদ্র, কুসংস্কার, আত্মম্ভরিতা, বৈরী মনোভাব প্রভৃতির হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় মানুষকে ভালবাসা। মানুষে মানুষে সদ্ভাব, মানুষে মানুষে অন্তরিক প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনই মানুষকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করতে সক্ষম। ঈশ্বরের তৈরী এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মানুষই হচ্ছে সর্ব শ্রেষ্ঠ জীব, আর বিচার বুদ্ধি মানুষেরই আছে, অপর জীবেদের তা নেই।

কাজেই শ্রেষ্ঠদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে হবে শ্রেষ্ঠ পথে বিচরণ করে, তবে বিশ্বে শান্তি ফিরে আসবে। বর্তমান অশান্ত, ক্ষুব্ধ, লোভী মানুষকে খতিয়ে দেখতে হবে কি তার কাছে প্রেয়, কিশ্রেয়? তার শ্রেয় ও প্রেয় হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শান্তি, যে শান্তি তার চলার পথের সহায়ক হবে সর্বক্ষেত্রেই। সেই শান্তির পথ পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ভালবাসা ও পরস্পরকে জানা ও তার অনুশীলন প্রয়োজন সর্বাগ্রে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে আপন সহোদর ভাই জ্ঞানে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই। তবেই সেই পরম আকাঙ্খীত মহামানুষ, মহাশান্তি, মহানন্দ সম্ভব। সমগ্র মানব সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই এ পথে চলা ছাড়া অন্য কোন উপায় বা পথ নেই।

ঠাকুরের পুণ্য জন্মদিনে ভারতবাসীর প্রতিজ্ঞা হোক ঠাকুরের পুণ্য জন্মদিনে ভারতবাসীর প্রতিজ্ঞা হোক ঠাকুরের মত ও-পথ এবং স্বামীজীর মত ওপথ আমাদের পরমাদর্শ। এ মহাদর্শকে ধ্রুবতারা করেই আমরা জীবনে চলার পথে সকলকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ কোরেই এগিয়ে যাবার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব—তা সে যতই কঠিন ও কঠোর হোক না কেন। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ চিন্তাধারার দেশ ভারত। তাই ভারতকেই সত্যকে আশ্রয় করে শিবকে স্মরণ রেখে সুন্দরের পূজায় অগ্রবর্তী হয়ে চলতেই হবে, যাতে অপরাপর দেশ ও জাতি ঐ একই পথে ভারতের দোসর হয় আপন আপন দেশ ও জাতির কল্যাণ ও মুক্তির চিন্তায়। মানুষের মুখ আর মন এক হলে পরস্পরকে বিশ্বাস করতে ও সঠিকভাবে চিনে নিতে অসুবিধা হবে না। ফলে অকারণ ভুল বোঝাবুঝির ইতি ঘটবে। মানুষ তার প্রধান ধর্ম মনুষ্যত্বের অবথা অপমৃত্যু ঘটাতে তৎপর হবে না ভবিষ্যতে—এই আশা ও বিশ্বাস মানবতাবাদকে সুরক্ষিত করুক সারা বিশ্বে।

●

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

শেষ কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা হিন্দুরা বিপ্লব এমন কি বিপ্লবের অনুরূপ কোন কিছুর প্রতি বিরূপ। আমাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে বিবর্তন ক্রম বিকাশ। এ বিষয়ে আমরা প্রকৃতির নির্দেশই অনুসরণ করি। শিশু ক্রমান্বয়ে কৈশোর যৌবন পেরিয়ে পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হয়। সেইরূপ নৈতিক বিশ্ব ব্যাপারের মধ্যেও কোন আকস্মিক বিপর্যয় নেই। সমাজের বুকে যে শক্তি নিহিত থাকে সে শক্তির দ্বারা পর্যায়ক্রমে জগতে বাস্তব উন্নতির যে বিন্যাস ঘটে তারই অনুসরণ করে চলে মানুষের মনোজগৎ। এই অনুশাসন স্বদেশ প্রেমিক কর্মীদের শুভকর্মের দ্বারা ও প্রগতিশীল সরকারের উদার সাহায্য ও পৃষ্ঠ পোষকতায় পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

অসহযোগ আমাদের নিজেদের যে সম্পদ এবং কর্মশক্তি আছে তার উপর নির্ভর করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা আবার আমাদের বহির্জগতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে লভ্য জীবন রসের ধারা ও প্রগতির পথে চলার প্রেরণা দায়ী উদার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আমরা বিশ্ব মানব-সমাজ থেকে আলাদা হয়ে একা দাঁড়াতে পারিনা। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত থেকেই আমাদের দাঁড়াতে হবে। আমাদের যা দেওয়ার আছে তা তাদের দিয়ে এবং তাদের কাছ থেকে আমরা যা নিতে পারি তা নিয়ে বিশ্ব মানবের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে স্ফীত করে তুলব। এই ভাবে বিশ্ব শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আমরা আমাদের নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রশস্ত ও উন্নত করে তুলতে পারি, অপর পক্ষে আমরাও আমাদের বিপথ হিসাবে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ তাদের দান করতে পারি। মানবতার ক্ষেত্রে আমাদের অবদান ফুটিয়ে তুলতে হবে। আর বিশ্ব মানবতাও তার মূল্যবান জ্ঞান ও প্রেরণার ভাণ্ডার আমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে আমাদের প্রত্যাবদান যোগাবে।

তবে অবশ্যই আমাদের পুরাতন ভিত্তির উপরই দাঁড়াতে হবে। আমাদের সেই ভিত্তিকে প্রশস্ত ও বাধামুক্ত করে তার উপরে ইমারত গড়তে হবে। জাতীয় জীবন প্রবাহিত হয় এক অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন ধারায়। সেই ধারাপ্রবাহে অতীত এসে বর্তমানের সঙ্গে মিশে যায়। বর্তমান আবার অতীতকে সঙ্গে নিয়ে বিপুল বেগে গড়িয়ে পড়ে অদৃশ্য এবং চির প্রসারণশীল ভবিষ্যতে।

এই ভাবে জাতীয় জীবনের ধারা প্রতি পর্যায়ে প্রশস্ততর হতে থাকে এবং চতুর্দিকে এর উর্বরতা ও শুভ প্রভাব বিস্তার করে চলে। আমাদের জাতীয় জীবনের নোঙর কিন্তু অবশ্যই আমাদের অতীতের সঙ্গে, চিরাগত ভাববৃত্তি ও ঐতিহ্যের সঙ্গেই বেঁধে রাখতে হবে যে ভাববৃত্তি ও ঐতিহ্য আমাদের ইতিহাস রচনা করেছে এবং যা প্রধানতঃ আমাদের ভবিষ্যতের কাঠামোকে আকৃতি ও রূপ দেবে।

(চলবে)

কম্রেড অনিল মুখার্জীর স্মরণ সভা

জন্ম : ১০ই অক্টোবর, ১৯১২ মৃত্যু : ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২

বন্ধুগণ,

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী '৮২ ঢাকায় আমাদের উপমহাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও মেহনতী মানুষের মুক্তির সংগ্রামের অন্যতম উৎসর্গিত ও কারা-নির্যাতিত অক্লান্ত বিপ্লবী প্রবক্তা ও ঐতিহাসিক, 'সাম্যবাদের ভূমিকা,' 'শ্রমিক আন্দোলনে হাতে খড়ি' (যাহা রুশ ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে), 'স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি', 'হারানো খোকা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পুরোধা ও শ্রমিক আন্দোলনের নির্মাতা কমরেড অনিল মুখার্জীর জীবনাবসান হয়েছে।

এই আমরণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মেহনতী মানুষের মুক্তির প্রবক্তাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আগামী ৬ই মার্চ '৮২ শনিবার সন্ধ্যা ৫টায় কলকাতার মৌলালিতে অবস্থিত প্রজ্ঞানানন্দ ভবনে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সর্বসাধারণ এই সভায় যোগদান করবেন এই অনুরোধ।

: আহ্বায়ক :

ব্রজেন দাস সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ্ ধরণী গোস্বামী কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী আবদুল্লা রসুল সোমনাথ লাহিড়ী সরোজ রায় জগদীশ চ্যাটার্জী বিশ্বনাথ মুখার্জী নিরঞ্জন গুপ্ত অধ্যাপক শান্তিময় রায় গোপাল ব্যানার্জী ভবেশ নন্দী বঙ্গেশ্বর রায় পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত গনেশ ঘোষ বেহু ধর খুসু দত্ত রায় এবং আরও অনেকে।

RegdNo.R. N . 24511/71

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795

Regd. No. B/[illegible]/77

বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা

বাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা

মূল্য—৩০ পয়সা

C/30

MAR 1977

সম্পাদক—

শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী

শ্রীকালীপদ সরকার

শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীধারীন ঘোষ

বেহালা—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

১

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির—২.০০, ৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা যাদুঘর সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৯০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, দেশ বাঁচাও ভোলেনি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বাঁচাও ভোলেনি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১০ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ১৩ই চৈত্র ১৩৮৮ ২৭শে মার্চ ১৯৮২	২৫ সংখ্যা

আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরই জাতীয় ঐক্য গঠিত।

—ভগিনী নিবেদিতা

সম্পাদকীয়

জনগণের নিকট আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে জনজীবনে দিনে দিনে যে দুর্গতি ঘনিয়ে আসছে, সে সম্বন্ধে জনসাধারণের শুধু সজাগ হলেই চলবে না। প্রবল গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে এবং প্রশাসকদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেললে কারো পরিত্রাণ নেই। প্রশাসনিক ব্যর্থতা জনগণ দীর্ঘদিন কোন দেশে সহ্য করে না। জনসাধারণের মানসিক অসন্তোষ একদিন ফেটে পড়বেই। যারা একাবার কৌশলে অপকৌশলে ক্ষমতা দখল করে, তারা যদি সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে, প্রাথমিক কতকগুলি কর্তব্য পালন না করে, তবে একদিন না একদিন জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবেই। ক্ষমতার মদ মত্ততায় যদি কোন দলীয় সরকার মনে করে অনন্তকালের জন্য তাদের পক্ষে মৌরসী পাট্টা দেওয়া হয়েছে, তবে তাদের সেই আত্মঘাতী ভুলকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দায়িত্ব নিগৃহীত, নিপীড়িত জনগণেরই। একাজ তারা না করলে, গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে তাদের কর্তব্যচ্যুতি ঘটবেই এবং গণতন্ত্র সেজন্য ব্যর্থ হবেই।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যেন কেমন উদাসীন হয়ে পড়েছেন, একথা আমরা দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি। মনুষ্যসৃষ্ট সব অসুবিধাই যেন তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি বর্তমান সরকারের অপদার্থতার ধ্রুপদী অপকীর্তি। এজন্যে শুধু গৃহস্থ গৃহেই অন্ধকার নেমে আসেনি। এসেছে কৃষি, শিল্প উৎপাদনগুলির ক্ষেত্রে। উৎপাদনের পরিমান সেচের জলের অভাবে দারুণ কমে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে। বহু শিল্প অকোজো হয়ে পড়েছে। বহু কারখানা বন্ধ হয়েছে, হাজার হাজার মানুষ কর্মচ্যুত হয়ে পড়ার জন্য, রুটি রোজগার বন্ধ। এই অনর্থগুলির মূলে বিদ্যুৎ ঘাটতি বিশেষ পরিমাণে দায়ী। যানবাহনের অপ্রতুলতাই শুধু নয়, কলকাতার মানুষের যানবাহনের অভাবে খেটে খাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থাও শোচনীয়। সম্প্রতি যে সমস্যাটা দারুণ ভাবে মানুষকে শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন, ও আন্দোলিত করে তুলেছে সেটা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, বিশেষ করে এ রাজ্যের পুলিশ বিভাগের অপরাধ দমনে ব্যর্থতা। পুলিশ শুধু অপরাধ নিবারণ কার্যেই ব্যর্থ হয়নি। ঘটনার পর অপরাধীদের খুঁজে বের করতেও পারছে না।

শুধু কিন্তু পুলিশ বিভাগকেই এজন্য দায়ী করলে চলবে না। বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এজন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও সমান দায়ী। এমন কি একথা বললেও ভুল হবে না যে এই শোচনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার দায় ভাগ তাদেরই বেশী।

বর্তমান প্রশাসক দল ক্ষমতালভের পর যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং যে সব কাজ করেছেন, তাতে পুলিশ বিভাগে শুধু শৃঙ্খলতাহীনতার সৃষ্টিই হয়নি, বস্তুতপক্ষে এই বিভাগটি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু কেন? পুলিশ বিভাগে নিজ দলের প্রভাব বিস্তার করবে জন্য সেখানে দলবাজীর সৃষ্টি করেছেন। একটি বিখ্যাত খবরের কাগজের প্রতিবেদক যে চিত্র তুলে ধরেছেন, সেটা রীতিমত ভয়ঙ্কর। নতুন ইউনিয়ন সৃষ্টির মতলব নিয়ে পুলিশ কর্মীদের মধ্যে বিভেদও উশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করেছেন। নতুবা স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই নিম্ন বিভাগীয় পুলিশ কর্মীরা, কি করে উচ্চতর পুলিশ কর্মচারীদের মনের আনন্দে

গালিগালাজ করলেন? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোন টু শব্দটি করেন নি এই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে। তিনি নিজেদের সৃষ্ট ইউনিয়ন কে জোরদার করার জন্য এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেন কি। সংবাদে আরো প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে স্থানান্তরিত করণ ও নিয়োজন হয়েছে নিজ দলের প্রতি আনুগত্যের নিরিখে। তখনই একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার ঐ সভাতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন যে এই ভাবে কাজ কর্ম চলতে দেওয়া হলে পুলিশ বিভাগে দক্ষ প্রশাসন বলে কিছু থাকবেনা এবং তার কুফল হবে সাংঘাতিক। আজ তো অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে পুলিশ বিভাগের বারোটা বেজে গিয়েছে আর তারই ফলশ্রুতি হচ্ছে চুরি, ডাকাতি, খুনখারাপি, লুটতরাজ গোটা রাজ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে এবং পড়ছে। সেদিন আলীপুরের স্টেট্ ব্যাঙ্কের শাখায় কয়েকজন কর্মী নিজেদের জীবন বিপন্ন করে একজন ডাকাতকে ধরেছেন। কিন্তু পুলিশকে ফোন করে, স্টাবে করে ছুটে যেয়েও খবর দিলেও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়নি।

সবচেয়ে মারাত্মক সত্য হচ্ছে যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের অকর্মণ্যতার গ্লানি অনুভব করছেন না। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝাতে চাইছেন যে এরাজ্যে নাকি আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি তুলনায় প্রায় সর্বোত্তম। আজকাল রাজনীতিবিদরা মানবীয় মূল্যবোধ আদর্শ-টাদর্শের ধার ধারেন। প্রচুর অমৃতভাষণ করেন নিজেদের। তুলনা করার কোন অর্থ হয়না। অন্য রাজ্যে যদি অবস্থা আরো খারাপ বলে তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয়, তবে এ রাজ্যের শোচনীয় পরিস্থিতির কোন সমর্থন মিলবে? তা ভিন্ন একটি সত্য হৃদয়ঙ্গম করার মত। বলা হচ্ছে যে দিল্লী বাসী ডাকাতেরা আজ কাল পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় কেন? তারা কি বুঝেছে যে অপকর্ম করার পক্ষে এই রাজ্যটাই নিরাপদ? এটা সত্য হলে এর থেকে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে? তবে রাজনীতি করতে হলে লজ্জা ঘৃণা, ভয় থাকলে চলবে না, এই যদি তাদের নীতি হয় তবে সে কথা আলাদা। সব চেয়ে দুঃখের কথা যে জ্যোতি বসুকে একজন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক বলে প্রচার করা হয়। তার অধীনস্থ বিদ্যুৎ আইন শৃঙ্খলার যে বেহাল হয়েছে তার পর তাঁর বিবেকে দংশন অনুভব করে পদত্যাগ করাই উচিৎ ছিল বলে বহু চিন্তাশীল এবং বিদগ্ধজন মনে করেন।

গণতান্ত্রিক কাঠামোতে মুস্কিল হল যে একবার নির্ব্বাচিত হবার পর শত অপকর্ম করলেও, জনগণ কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য্য, যে গণ আদালতে তাদের কাজকর্মের বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ আসে। পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনে সে সুযোগ সমাগতপ্রায়। কংগ্রেস কমিউনিষ্ট বুঝিনা, প্রত্যেক দলের কার্য্যকলাপ নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তাদের প্রতি আবারও সমর্থন জানান হবে কিনা সেটা নির্দ্ধারণ করতে হবে কাজকর্মের স্থিতি পত্রের Balance-Sheet) নিরিখে। একাজ না করলে জনগণকে নিশ্চিতই স্বঘাত সলিলে ডুবে মরতে হবে। জনগণের নিকট আমাদের আবেদন কারো ধোকাবাজিতে, মিথ্যা আশ্বাস বাণীতে বিশ্বাস করবেন না। নিজেরাই খতিয়ে দেখুন, কে বা কোন দল তুলনামূলক ভাবে আপনাদের স্বার্থ সংরক্ষিত করতে পারবে। আগাছা বেটিয়ে বিদায় করুন, অন্যথায় সামনে আপনাদের সমূহ বিপদ আরো ঘণীভূত হবে। প্রয়োজন আপনাদের নির্মোহ বিচার বিশ্লেষণ। অন্যথায় আপনাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। উঠুন, জাগুন, জ্ঞানীজনের সঙ্গে পরামর্শ করে রায়দান করুন।

বিরোধীরা স্বার্থান্ধ হলে বিপদ অনিবার্য্য

—বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়, তাহচ্ছে এইযে, শত্রু বা শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে অযথা অভিসন্ধি মূলক সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষারোপ কোরে শত্রু বা শত্রু পক্ষকে লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করাও তদ্বারা স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের অথবা গোপন স্বার্থান্ধ হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ পরিস্কার ও দৃঢ় করা। ইংরাজীতে একটা কথা আছে "Give a bad name to the Dog and then kill him" অর্থাৎ সারমেয় প্রীতির দেশ বিলাতে কুকুরটাকে মারতে হলে তার বিরুদ্ধে পূর্ব্বাহ্নে অপপ্রচার বা নিন্দাসূচক কোন কিছু রটনা না করতে পারলে তাকে মারা বড় শক্ত ব্যাপার, কারণ জনচিত্ত তাতে বিরক্তও উত্তেজিত হতে পারে ও কুকুরের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তারা। স্বার্থান্ধ মানুষ বা দলস্বার্থে উন্মত্ত কোন কোন রাজনৈতিক দল ঠিক ঐ একই কারণে বিরুদ্ধ পক্ষের বা বিরুদ্ধদলের বিরুদ্ধে মন গড়া উদ্দেশ্য প্রনোদিত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ও সেই মিথ্যাকে বার বার সত্য বলে অপরের কাছে নিপুনভাবে প্রচার কোরে নিজেদের হীন ও স্বার্থপর উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় তৎপর হয়।

সাধারণ মানুষ উক্ত কূট কৌশলের ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতেই পারে না, তবে যখন পরিশেষে বুঝতে পারে তা ও সম্যকরূপে জানতে পারে, তখন ঐ চক্রান্তকারী ব্যক্তি বা দলের উপর খড়্গাহস্ত হয়ে ওঠে ও তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, অন্যায়কারীকে উচিত শিক্ষা দেবার সৎ-অভিপ্রায়ে। বর্ত্তমান ভারতে উক্ত কূট কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সি পি এম দলের সর্বোচ্চনেতৃত্ব ও ছোট বড় নেতারা বিগত ১৯৭৭ সাল থেকে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে দিনের পর দিন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মিথ্যা প্রচার ও রটনা কোরে চলেছে যে, তিনি স্বৈরাচারী। তাঁর বিরুদ্ধে ঐ একটা কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার প্রচার করা হচ্ছে নিজেদের রাজনৈতিক আখের গোছাবার হীন মতলবে। এতদসত্বেও শ্রীমতী গান্ধী তাঁর স্বীয় অধ্যবসায়, কর্ম্মকুশলতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও গগনচুম্বি জনপ্রিয়তার জোরে পুনরায় ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেছেন লোক সভায় একক নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ কংগ্রেস (ই) দলের সদস্যদের সমর্থনে।

তিনি যদি স্বৈরতন্ত্রী হতেন প্রকৃত প্রস্তাবে, তবে নিশ্চয় ভারতব্যাপী সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের রায় তাঁর পক্ষেই পুনরায় সমর্থন যোগা হতো না। তাঁর স্বীয় শক্তি, বুদ্ধি ও অক্লান্ত জনসেবা শীর্ষ স্থানীয় ছিল বলিয়াই এরূপ কঠিন কাজ তাঁর কাছে সহজও সরল প্রতিপন্ন হয়েছে। ফলে বিরোধীদের পরাস্ত করা তাঁর পক্ষে পুনরায় সম্ভব হয়েছে।

বিগত দুবছর তিনি যে নৈপুন্যের সাথে ভারত রাষ্ট্রকে পরিচালনা করছেন ও বিশ্বের দরবারে ভারতের যে সুউচ্চ স্থান দখল সম্ভব হয়েছে তার জন্য কৃতিত্বের সবটাই তাঁর প্রাপ্য। বিদেশে ভারত যথেষ্ট সুনামের অধিকারী তাঁরই ঐ কান্তিক কর্ম্ম প্রচেষ্টায় তবুও বিরোধীরা ভারত রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা করায়ত্ব করার অভিপ্রায়ে শ্রীমতী গান্ধীর সকল জন

কল্যাণকর প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে চলেছে আপন আপন দলস্বার্থে। কেউ বা আবার প্রধান মন্ত্রী হবার বাসনায় বিরোধী শক্তি গুলিকে জোট বাঁধবার জন্য পরামর্শ দিতে অত্যন্ত ব্যস্ত। বিরোধীরা কিন্তু আসলে ছত্রভঙ্গ, কেউ-ই অপরের প্রাধান্য বরদাস্ত করতে রাজি নয়। সবাই মিলে কালনেমির লঙ্কা ভাগের মত গাছে না উঠতেই এক কাঁদি কলা বা নারকেল পেতে সদাই উৎগ্রীব।

আবার বিরোধীদের সম্মিলিত হবার প্রচেষ্টা এতই স্বার্থান্ধ যে, পরস্পরকে তারা বিশ্বাস করতে পর্য্যন্ত অক্ষম। অন্ধ মোহে বিরোধীরা এতই আচ্ছন্ন যে তারা সকলে মিলে একটা শক্তিশালী দলে পরিণত হতে রাজি নয়। নিজেদের বৈশিষ্ট নিজেদের আলাদা আলাদা নেতৃত্ব, নিজেদের ডগমা প্রভৃতি পুরামাত্রায় বজায় রেখে তবে তারা কেবল নির্বাচনী জোট বাঁধতে চায় পরস্পরের সঙ্গে উদ্দেশ্য সকলে মিলে যৌথ প্রচেষ্টায় শ্রীমতী গান্ধীর তথা কংগ্রেস (ই) দলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রস্তুতি চালান ও তাকে কার্য্যকর করা।

বিরোধীরা কেউ-ই বেশ খোলা মন নিয়ে একে অপরের সঙ্গে আলোচনায় বসতে ও একটা সর্বজন গ্রাহ্য নীতি বা কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে তৎপর নয়। এর আসল কারণ হচ্ছে এইযে, প্রত্যেকেই নিজের কোলে বেশী কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য নির্লজ্জ ভাবে উৎগ্রীব, যা দৃষ্টিকটু ও অন্যায় অপরের চোখে। বিরোধীরা এতস্বার্থ পরের মত আচার আচরণে ব্যস্ত যে, তারা পরস্পরকে কাছে টানতে তো পারছেই না, উল্টে তাদের নগ্ন তার বহিঃপ্রকাশে সকলেই মাঝে মাঝে উত্বিগ্ন হয়ে পড়ছে বি-জে-পির সঙ্গে সি পি এম এর হৃদ্যতা বা জোট মজুত করতে সি পি আই একেবারে নারাজ। লোকদলের সঙ্গে বি-জে-পির আঁতাত কঠিন ব্যাপার তাদের অতীতের ক্রিয়াকাণ্ডের পুনারাবৃত্তির আশংকায়। জনতাদল সি পি এম দলের অতীত বিশ্বাস ঘাতকতা এখনো ভুলতে পারে নি। বিরোধীরা কেউ-ই বিশুদ্ধ দেশ কল্যাণের জন্য জোট বাঁধতে তৎপর নয়।

তাদের আসল উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারেণ এক বার শ্রীমতী গান্ধীকে হটান এবং তা যে কোনও উপায়েই হোক না কেন। আদর্শের বালাই কোন দলেরই নেই বর্ত্তমানে। তারা লোভের বশবর্ত্তী হয়ে উন্মত্ত আবেগে ক্ষমতা দখলের নেশায় মেতে উঠেছে আপন আপন স্বার্থ পূরণের আশায়, যা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। কংগ্রেস (ই) দলে পূর্বেকার মত ক্যাডারে ক্যাডারে একাত্মবোধ আজ আর নেই। ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বর্ত্তমান দারুন দুর্বিপাকে পড়ে কংগ্রেস (ই) দলের নেতৃত্ব ও সাহায্য কামনা করলেও ঐদল নিজেদের মধ্যে রেষারেষিতে এত মত্ত যে তারা সকলে মিলে একমত হয়ে এই মুহূর্ত্তে জনগণের পাশে দাঁড়াতে বা জনগণকে সুপরিচালিত করতে অক্ষম।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস (ই) দল বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ যদিও, তবুও ঐদল নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝা বুঝির ফলে সঠিক ভাবে বিরোধীদলের কর্ত্তব্য পালনের প্রায় ব্যর্থ বলেই মনে হয়। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস (ই) দলের বিরোধীরাও শতধা বিভক্ত, ফলে তারাও ব্যর্থ সঠীক ন্যায়ানুগ বিরোধীতার ক্ষেত্রে, যা দেশের ও দশের পক্ষে ক্ষতি কারক।

বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা শুভ নয়, আর তা কাম্যও নয়। বিরোধীরা সরকারকে সঠীক পথে চলতেও উন্নয়ন মূলক কাজে সাহায্য করবে জাতীয়

স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনে। বিরোধীদলের ভূমিকা যেমন মর্যাদা সম্পন্ন ঠিক তেমনই দায়িত্ব পূর্ণও বটে। দুঃখের জাতীয় সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে বা বহিরাগত কোন শত্রুর আক্রমণের আশংকার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলের প্রধানদের কাছে পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়েও বর্ত্তমানে কোন বাস্তব ভিত্তিক সাড়া পান নি।

গণতন্ত্রে এই নজির খুবই বিপদজনক, কারণ দেশের সামগ্রিক বিপদের দিনে সরকার ও বিরোধী দল একযোগে একমতে একপথে চলবে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ কর্ম্মে বা দেশ রক্ষার জরুরী তাগিদে। বিরোধীদলের দায় দায়িত্ব জাতীয় প্রশ্নে সরকারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, তথাপি ভারতে বিরোধী দের সেই দায়িত্ব পালনে আগ্রহশীল দেখা যায় না ভারতে বিরোধীরা বিরোধীতার জন্যই কেবল বিরোধী তা করে, যা গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। তাছাড়া বর্ত্তমানে কেন্দ্রে যারা কংগ্রেস [ই] দলের সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তারা কেউ-ই বিরোধীদলের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সংঘবদ্ধ নয়, আর নিজেদের বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রেও একমত নয় অধিকাংশ সময়েই ফলে ন্যায়ানুগ প্রকৃত বিরোধীতার কাজ ব্যাহত হয়, এর ফলে এদেশের জনগণের দুঃখ কষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

মানুষ দিশেহারা হয়ে হতাশায় ভোগে, আর ঐ সব ভ্রান্ত রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে। এদেশে জনগণের প্রকৃত আশা আকাঙ্খা পূরণের চিন্তায় কোন নেতাই তেমন ব্যস্ত যান নয়। দীর্ঘ দিন এই অবস্থা চলতে থাকলে মানুষ ধৈর্য্য হারা হয়ে হটকারী শক্তিগুলির পিছনে মদত দিতে উৎসাহিত হবে, যা আরো ক্ষতির কারণ হবে সরকার ও বিরোধী সব রাজনৈতিক দলকেই ভেবে দেখতে হবে যে কিভাবে ও কত দ্রুততার সাথে এদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা যায়, অন্যথায় প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধের আবর্তে পড়ে দেশ ছারখার হয়ে যাবার পথ ধরবে, যা চরম বিপদ জনক সকলের পক্ষেই এ দেশ বাসীর মধ্যে কেউ-ই তখন রেহাই পাবে না উক্ত রক্তাক্ত ও জ্বলন্ত বিপদের হাত থেকে কারণ মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে।

পরিবহন দপ্তরের ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে ? জবাব চাই।

ষ্টাফ রিপোর্টার

পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৭৫ সালে সরকারি বাস ছিল ৭০৪ টী, বেসরকারি বাস ১০৩০টী ট্রাম ৩০০ ট্যাকসি ৮৪০০ টী। এই সব যানবাহন ঐ সময় যাত্রী বহন করত ৪০ লক্ষের মত তখন কলিকাতার মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল ৫৫ লক্ষ কাজেই উদ্বৃত্ত ১৫ লক্ষ যাত্রী ট্রাম বাসে ভিড় করত।

দু-বছর পর ১৯৮১ সালে যানবাহনের সংখ্যা কমে গিয়ে দাড়ায় :—সরকারি বাস ৫৫০ বেসরকারি বাস ৮০০ ট্রাম ৩০০ ট্যাক্সি ৭৩৪৮, এই সব যানবাহন ২৮ লক্ষ যাত্রী বহন করে, বর্ত্তমানে কলিকাতার যাত্রীর কতক অংশ বাসে, ট্রামে ঝুলে জীবন বিপন্ন করে যাতায়াত করেন, বাকী লক্ষ লক্ষ যাত্রীর একমাত্র ভরসা পায়ে হাটা। এটা সরকারি খাতার হিসাব। কার্য্যত ট্রাম বাস চলে আরও কম। প্রতি দিনই ৭০ থেকে ১২০টী সরকারি বাস ব্রেক ডাউন হয়ে পড়ে যাবে। ইতিমধ্যে রুটের সংখ্যা বেড়েছে বাস বাড়েনি। বেসরকারি বাসের জন্য ও নতুন নতুন রুট খোলা হয়েছে। বাস পথে নামছে না প্রয়োজন মত। একটা কারণ বাসের স্যাসি সহজে মিলে না। অন্য কারণ বাসের চালক ও কণ্ডাকটর কে হবেন ঠিক করে দিবে বাসকর্মচারী ইউনিয়ান। এই সব ঝামেলায় নতুন বাস বার করায় মালিকের উৎসাহ নাই। প্রতি দিন ৬০ থেকে ৮৫টা ট্রাক এক ট্রিপ দিয়েই ক্লান্ত হয়, আর চলতে পারে না। মিনিবাস কিছু বেড়েছে, এখন প্রায় ৫০০। মিনিবাস প্রতিদিন ১লক্ষ ৪০ হাজার যাত্রী বহন করে বিভিন্ন রুটে মিনিবাসের ধর্মঘট ও লেগেই আছে।

এই ভয়াবহ অবস্থা হতে কলিকাতার যাত্রীদের কিছুটা সুবিধা দেওয়ার জন্য নগর পরিকল্পনা রিপোর্টে দেখা যায় নতুন বাস, ট্রাম তৈরী বা কেনার জন্য এবং বাস ট্রাম মেরামতের জন্য ১৯৮১ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক দিয়েছে ৩০ কোটি টাকা, আরও বরাদ্ধ করেছিল ১৯ কোটি টাকা, কিন্তু পরিবহন দপ্তর এক বছর চেষ্টা চালিয়ে ও প্রথম বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকার সবটা খরচ করতে পারেনি। প্রথম বছর পরিকল্পনা অনুযায়ী যেখানে ৫টী নতুন ট্রাম হওয়ার কথা ছিল, সেখানে হয়েছে মাত্র ১টী। সিদ্ধান্ত ছিল ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাস থেকে প্রতিমাসে ৪০টী নতুন বাস বের হবে এখন পর্যন্ত বের হয়েছে মাত্র ৩০টী। দোতালা বাস বের হওয়ার কথা ছিল ৮০টী এখন পর্য্যন্ত একটীও বের হয়নি। বেলঘড়িয়া ওয়ার্কসপে ৭৫টী একতলা বাস তৈরী করার কথা, তৈরী হয়েছে মাত্র ৩০টী।

পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কি ব্যবস্থা গ্রহন করে সি পি এম সরকার নিশ্চয়ই জানেন। পরিবহণ দপ্তরের টাকার অভাব হয়নি তবুও পরিকল্পণা অনুযায়ী কাজ না হওয়ার কারণ পরিবহন মন্ত্রী বা বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা পুলিশ দপ্তর হতে শুরু করে সমস্ত দপ্তরেই ফুটে উঠছে, চাঁপা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। চাঁপা দিলে বিস্ফোরণ হতে পারে এই আশঙ্কায় মুখ্যমন্ত্রী মাঝে মাঝে ব্যর্থতা স্বীকার করছেন কিন্তু প্রতিকার করার ব্যবস্থায় দৃঢ়তা বা সবল নীতি নাই কেন।

(এর পর ৯ পৃ:)

সমুদ্রসীমা অধিকার প্রশ্ন

—কালীপদ সরকার

[২]

সমুদ্রে মাছধরার বিষয়টি কিন্তু সহজ নয়। সমুদ্রের যত্র তত্র মাছ পাওয়া যায় না, আবার সব জায়গায় সব রকম মাছ থাকে না। ২০০ মাইল সমুদ্র সীমা পেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিনা প্রতিযোগিতায় আপন এলাকায় কড্ ও হ্যালিবাট মাছ ধরতে পারবে কিন্তু চিংড়ির জন্য তাকে যেতে হবে ব্রেজিল ও বেঙ্কিস-কোর সমুদ্র এলাকায় এবং টুনার জন্য পেরু ও ইকুয়েডার উপকূলে। অপর দেশের সমুদ্র এলাকায় মাছ ধরতে গেলে ছাড়পত্রের দরকার হবে এবং তার জন্য শুল্ক দিতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশ তাদের যান্ত্রিক মাছধরা জাল সমন্বিত জাহাজ নিয়ে তখন অবাধে সর্বত্র মৎস্য শিকার করে বেড়াতে পারবে না। এই সব দেশ ২০০ মাইল সীমা তো দূরের কথা মাছ ধরার ব্যাপারে ১২ মাইল ভৌগলিক সীমাই মানতে চায় না। অনেক ছোট দেশও এবিষয়ে কম যায় না, থাইল্যাণ্ড কর্তৃক পশ্চিম বঙ্গের অতি নিকট উপকূল দরিয়ায় মাছ ধরার ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। সম্প্রতি থাইল্যাণ্ডের ছুটি মাছধরা জাহাজ এই কারণে ভারতের উপকূল নিরাপত্তা নৌ-বাহিনীর হাতে ধরাও পড়েছিল।

ইংলণ্ড ও আইসল্যাণ্ডের মধ্যে কডমাছ শিকার নিয়ে বিরোধ লেগেই আছে, এ ব্যাপার নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বার কয়েক গোলাগুলী ছোড়াছুড়িও হয়েছে। মাছধরা নিয়ে বিরোধ আছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইকুয়েডরের মধ্যে, রাশিয়া এবং জাপানের মধ্যে। গলদা চিংড়ির জন্য ব্রাজিল ও ব্রেজিল পরস্পর বন্দুক উঁচিয়ে আছে। হায়রে গলদা চিংড়ি! আমাদের দেশে যা ধরা হয় তা তো চোখেই দেখা যায় না। তেলের দাম মেটাতে তা চলে যায় দেশের বাইরে। দাম হল এক কেজি ১১০ টাকা।

মাছধরা সম্পর্কে যে সব আলোচনা হয়েছে তাতে বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন, বক্তব্যের যৌক্তিকতা এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নিরূপণের গুরুত্বের উপর যথেষ্ট আলোকপাত হলেও কোন মীমাংসায় আসা সম্ভব হয় নি। তবে একথা ঠিক যে, পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে সমুদ্র সম্পদ আহরণ সম্পর্কে একটি সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তে না পৌঁছলে শান্তি নির্বিঘ্ন হবে না।

সমুদ্র সম্বন্ধে মানুষ যতটা জেনেছে তার চেয়ে অনেক বেশি এখনো মানুষের কাছে অজানা। সমুদ্র গর্ভে লুকিয়ে আছে কত লুপ্ত জনপদ, নগর, পর্বত হ্রদ, নদী, কান্তার এবং অরণ্যের জলপ্লাবিত ধ্বংসাবশেষ। তাদের মাঝে আছে মানুষের স্মরণাতীত যুগের জীবনযাত্রার কত বিস্ময়কর নিদর্শন। অনাবিষ্কৃত সমুদ্র জগৎ কেবল লোকাতীত রহস্যেরই সন্ধান দেবে না, যোগাবে সমস্যা পীড়িত মনুষ্য সমাজকে আরো কয়েক হাজার বছরের জন্য আবশ্যক খাদ্য জ্বালানী তৈল, কয়লা ও গ্যাস।

এ প্রসঙ্গে ভারতবাসীর মনে স্বভাবতই ভারত মহাসাগরের কথা জাগবে, সমুদ্রের আর এক না রত্নাকর তাও স্মরণে আসবে। কবি দ্বিজেন্দ্রলা

লিখেছেন "যে দিন সুনীল জলধি হতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ"—ভূতাত্ত্বিকদের মতে আগে জল তারপর ভূমির সৃষ্টি, তাই কবি বাণী কল্পনা নয় বৈজ্ঞানিক সত্য। ভারতবর্ষ আমাদের জননী স্বরূপা হলে, ভারত মহাসাগর মহাজননী। মহাজননী আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর রূপ দুই বাহু দিয়ে সন্তানকে আগলে আছেন যুগ যুগ ধরে। ভারত মহাসাগরকে বাদ দিয়ে ভারতকে ভাবা যায় না। ২০০ মাইল সমুদ্র সীমা ৩৫০০ মাইল দীর্ঘ উপকূল ভূমি লগ্ন ভারতীয় উপদ্বীপের ভৌগলিক অবস্থান অন্তর্গত হওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত।

সমুদ্র সমীক্ষকরা বলেন, ম্যালাগ্যাসি দ্বীপ কোন এক সময় ভূসংলগ্ন ছিল, জলমগ্ন লেমুরিয়া দেশের অবশিষ্টাংশ হল সেকিলিস দ্বীপ পুঞ্জ, এরা বৃহত্তর ভারতের দক্ষিণভাগ। ঘরাণাতীত যুগে গুরুতর নৈসর্গিক কারণে এই অঞ্চল মূল ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমুদ্র নিমজ্জিত হয়েছিল।

ম্যালাগাছি, ও আফ্রিকার মাঝে অবস্থিত কমোরো দ্বীপমালা, সোমালিয়ার নিকটবর্তী জাঙ্গিবার, সকোত্রা বার্মা সন্নিহিত মারগাই এবং সুমাত্রার মণ্ডাই দ্বীপপুঞ্জ মূল দেশ সংলগ্ন ছিল। তুষার যুগের পরবর্তী কোন সময়ে প্রচণ্ড ভূমিকম্প অথবা মহাপ্লাবন বয়ে এই ভূভাগ জলমগ্ন হয়ে যায়। সমুদ্র তলে অধিকতর পরীক্ষায় বিস্ময় রহস্যময় ভূ-পরিবর্তনের সত্যতা প্রমাণের অপেক্ষায় আছে।

ভারত মহাসাগরে প্রবাল মুক্তা ও তৈল ছাড়া আছে অপর খনিজ ও করলা। পরীক্ষায় দেখা গেছে সমুদ্র গর্ভের ভূস্তর, পর্বত শিলা এবং খনিজ পদার্থের প্রকৃতি ভারতের সমজাতীয়।

ভারত মহাসাগরের এক বিশেষ সৃষ্টি প্রবাল, যা আর কোথাও দেখা যায় না। মুক্তাও তাই। প্রবাল করে দ্বীপসৃষ্টি আর মুক্তা মনোহরণ। ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগর সঙ্গমে, সিন্ধুনদ মোহানা পক প্রণালী, মালাবার উপকূল, মারগাই দ্বীপপুঞ্জ, অস্টেলিয়ার পশ্চিম পার্বত্য উপকূলে মুক্তা সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

ভারত মহাসাগরের তিমি বিদেশী মাছধরা জাহাজীদের কাছে এক প্রধান আকর্ষন। ম্যালাগাছি এবং কোকস কিলিং দ্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্র তিমিদের প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র। পূর্বে মোজাম্বিক প্রণালী, কোমোরো এবং চা গোস দ্বীপপুঞ্জের আশে-পাশে এবং বঙ্গোপসাগরে তিমিদের ভালই আনাগোনা ছিল কিন্তু বর্তমানে তিমিরা শিকারীদের উপদ্রব এড়াতে ভারত মহাসাগরের দূর দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের দিকে চলে যাবার পথে।

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া ভারত মহাসাগরের প্রতি নেক নজর বাড়িয়েছে অবশ্য মুক্তা আহরণ বা তিমি শিকারের লোভে নয়, তাদের লক্ষ্য হল তৈল। বৈজ্ঞানীদের ধারণা, আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরের উপকূল থেকে ভূগর্ভ সঞ্চিত তৈল-ভাণ্ডার ভারত মহাসাগরের সুগভীর এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ এশিয়ার উপকূল সন্নিহিত দেশগুলির আগ্রহ এ বিষয়ে কম নয় এবং সে আগ্রহ স্বাভাবিক এবং ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই"—হল পরিস্থিতি।

গভীর সমুদ্রে মাছধরা এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে খনিজ আহরণ সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘে আলোচনা কালে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের যে প্রস্তাব উঠেছে, উন্নত দেশগুলি নীতিগত ভাবে তার প্রতি

সমর্থন জানালেও সম্পদ সংগ্রহ কর্মে তারা তাদের নিজ নিজ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে চায়। তার ফলে এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় নি।

ভারত মহাসাগরের এক বৃহৎ অংশ যে ভারতীয় ভূমির জলময় অঞ্চল একথা পূর্বে বলেছি। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে লোহিত সাগরের মুখ পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। ভূ-তাত্ত্বিক ও গবেষক বৃন্দও তাই বলেন। ভারত মহাসাগরে দূর দেশ থেকে লুব্ধ অভিযাত্রীরা এসে ঘাঁটি গাড়বে, দুর্গ তৈরী করবে এবং সমুদ্র সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে, ভারত চুপ করে তাই দেখবে—এ কখনো হতে পারে না।

পৃথিবীর স্থলভাগ ঘন মনুষ্য বসতি পরিপূর্ণ, খনিজ সম্পদ নিঃশেষিত প্রায়, ভূমিজ খাদ্য অপ্রচুর এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক সমস্যা কণ্টকিত। সমুদ্রই ভবিষ্যৎ দিনের সম্ভাবনাময় আশ্রয়। সমুদ্রে অধিকার প্রতিষ্ঠার নয়া সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ সংহত করে, উন্নত শক্তিধর দেশগুলির উচিত রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবিত সমুদ্র- অধিকার আইনকে মেনে নিয়ে, সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হওয়া। এ বিষয়ে ভারত তাই সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে এবং ভারত মহাসাগরকে রণ উত্তেজনা মুক্ত শান্তির অঞ্চলরূপে রাখার দাবি তুলেছে।

(৬ পাতার পর)

এই ব্যর্থতার মাশুল জনগণের দিতে হতেছে এবং দুর্ভোগের চরম সীমায় পৌঁচেছে। অথচ জন দরদী বামফ্রন্ট সরকার দপ্তরগুলির গাফিলতি, কর্মহীনতা ও বিশৃঙ্খলতার প্রতিকারের ব্যবস্থা করে না কেন? জনগণ জবাব দাবী করতে পারে নাকি? সি পি এম মার্কসবাদী বলে কিন্তু দলবাজিতে নীতিভ্রষ্ট হতে কোন দ্বিধা করে না। ইন্দিরাজীর শাসনে গণতন্ত্র বিপন্ন বলে এবং কেন্দ্রকে দোষাক্রান্ত করে দলের নীতিভ্রষ্টতার প্রতিক্রিয়া রোধা যাবে না। জনগণকে ভাঁওতা দিয়ে কতদিন চলবে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

শেষ কথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইংরেজ পাঠকদের কাছে এটা জানানো দরকার যে ভারতীয়দের মধ্যে বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে যারা প্রথম দিকে যোগদান করেন মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাদের একজন। গোটা আমলা তন্ত্রের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই তাদের এই পরম পবিত্র স্বার্থ বেষ্টনীর অভ্যন্তরে ভারতীয়দের প্রবেশকে অত্যন্ত ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখা ও অবাঞ্ছিত বলে মনে করা হয় এবং তাই তাঁদের এই স্বার্থের রাজ্য সীমার মধ্য থেকে একজন অতি বিশিষ্ট অভিবান কারীর সরাসরি বিতাড়নকে তারা ব্রিটিশ কর্মচারীদের ও তারা নিজেরা যে ভারতীয়দের তাদের সহকর্মী রূপে উপস্থাপিত করার বিরোধিতা করে দূরদর্শিতা প্রদর্শন করেছে তার, মহিমা ও জয় গৌরব কীর্তন করার কাজে লাগায়। প্রকৃত পক্ষে গোটা এংলো ইণ্ডিয়ান সমাজ এ ব্যাপারে যা বলেছে তা হল এই রকম "হ্যাঁ তা বটে, তা বটে ভারী চালাক লোক; ঠিক যেমনটি আমরা তোমাদের আগেই বলেছিলাম—এসব নচ্ছার প্রকৃতির প্রতারকের দল। সিভিল সার্ভিসের সম্পূর্ণ অঙ্গনযুক্ত এসব লোক। আরে দুনিয়ার মধ্যে সিভিল সার্ভিসের কাজ হল সবচেয়ে সেরা কাজ, সব চেয়ে সৎ কাজ, আর আসল প্রকৃতিতে একাজে হল একান্তভাবে ভদ্দর লোকের কাজ। এ বেটা হল ভারতীয়দের মধ্যে একটা বুদ্ধি ভ্রষ্ট লোক; আর গভর্ণমেন্টকেও তাই তার চাকরীর তিন বছর পূরা হওয়ার আগেই তাকে তাড়িয়ে দিতে হয়েছে।"

এই রকম ব্যাপক বিরূপ মনোভাব যেখানে সুরেন্দ্র নাথের উপর এই ভয়ঙ্কর শাস্তি বিধানে কতখানি কাজ করেছে তা আমরা বলতে পারছি না। তবে একটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে সুবিচার ও মার্জনা পাওয়ার জন্য তিনি যে আবেদন করেছিলেন সেই আবেদনের সুষ্ঠু শুনাবার কাজে তা বাধার সৃষ্টি করেছিল। তিনি এই শাস্তিদানের প্রতিবাদ করে আপিল করেছিলেন। তার পক্ষে তার হাজার হাজার স্বদেশ বাসীও আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তার সেই বৃথায় গিয়েছে।"

এর পরে মিঃ হিউস আমার প্রতি এই ব্যবহারের সঙ্গে একজন ইয়োরোপীয় সিভিলিয়ানের ব্যবহারের যিনি আমার চেয়ে ঢের বেশী গুরুতর অপরাধ করেছেন—তারতম্য করে যা লিখেছেন তা হল এই :

আমাদের মত যারা নিরপেক্ষ অভিমত পোষণ করেন তাদের কাছে এই বিচার ব্যাপারটার উপর যে একা অতি অনুজ্জ্বল ম্লান আলোকপাত ঘটেছে বলে মনে হয়েছে তা এই ঘটনাই প্রকাশ পাচ্ছে। পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাবলীর খুব বেশী দিন পরের কথা নয়। একজন বিধিমত নিযুক্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান অপরাধীজন ধরা পড়লেন। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তদন্তকারী অফিসারগণ তাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেন। সুরেন্দ্র নাথের বিরুদ্ধে তার বিচারগণ যে অপরাধ প্রমানিত হয়েছে বলে বিবেচনা করেছিলেন তার চেয়ে বহু গুরুতর অপরাধে অপরাধী বলে এই সিভিলিয়ান সাব্যস্ত হলেন। তার অপরাধ ছিল আর্থিক ব্যাপারে বাম খেয়ালীপনা করা, আধুনিক

যুগে সিভিল সার্ভিসের ইতিহাসে যার কোন নজির মেলেনা। এই কর্মচারীকে কি সেজন্য তার চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল? না, তা করা হয়নি। তার প্রতি শাস্তিদানের ব্যবস্থাই হল এই যে সে সরকারী টাকাটা যে যেমন ভাবেই হোক তার নিজের ব্যক্তিগত তহবিলে চলে গিয়েছে তা তাকে ফেরৎ দিতে হবে আর তার কি পনের মাসের জন্য চাকরী থেকে সাময়িক ভাবে কর্মচ্যুত অবস্থায় থাকতে হবে এই ভাবে সেই সময়টার বেতন না পাওয়ার কিছুটা আর্থিক ক্ষতি তাকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যেই মাত্র তার কর্মচ্যুতি কালের মেয়াদ শেষ হল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর আত্মীয় সেই ব্যক্তিকে এই প্রদেশে এমন একটি পদে নিযুক্ত করা হল যে পদটি ছিল বিশেষ ভাবে লোভনীয় এবং পদটির বেতন পরিমাণ হচ্ছে প্রদেশের সর্বোচ্চ স্তরের বেতন পরিমাণের সমান। অথচ তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ যদি না থাকত তা হলেও কি চাকরীর ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা কি যোগ্যতা কোন দিক দিয়েই তিনি সে চাকরী পাওয়ার অধিকারী হতে পারতেন না।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি গঠিত হওয়ার পরে এই রকম শাস্তিহীন অপকর্ম চালিয়ে যাওয়া বর্তমানে এক রকম অসম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় আমলারা কিরূপ সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক আচরণ করে এই ব্যাপারটা তারই প্রমাণ, এবং একটা শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ কাল ব্যাপী অধিকাংশ আমলা কর্মচারীর মনোভাব যে কী ছিল এই দুই কর্মচারীর বিভিন্ন ধরণের ভাগ্য চিত্র তাই এক পরিপূর্ণ স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত বহন করছে।'

মিঃ হিউম এই ভাবে তার নিবন্ধের উপসংহার করেন:

'তা হলে এই সময় সুরেন্দ্রনাথের অবস্থা কি দাঁড়াল?

ভগ্ন হৃদয় অত্যন্ত অপমানিত ও প্রায় কাঙাল হয়ে (কারণ তার যা কিছু অর্থ সংস্থান ছিল তা সব তার ইংল্যাণ্ডে আসার এবং সেখানে শিক্ষালাভ করার কাজে শেষ হয়ে গিয়েছে) তিনি যদি হতাশায় আত্মহত্যা করতেন তা হলেইবা কে তাতে বিস্ময় বোধ করত? কিন্তু না, তিনি তা করেন নি; তিনি ছিলেন সাহসী এবং ভালবাসা পাওয়ার মত সজ্জন ব্যক্তি। তিনি শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ায় মহত্তর কাজে লেগে গেলেন। তার প্রতি ঘোর অবিচার হয়েছে, যার ফলে তার প্রথম জীবনটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে দিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। নিজের জীবন চর্যা দ্বারা সব উপহাস ও নিন্দাবাদকে অতিক্রম করে তার চরিত্র সম্পর্কে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছিল তা তিনি খণ্ডন করলেন।'

সরকারী বিরোধিতার মধ্যে থেকে আমলা শাসিত ভারত-ভূমিতে একজন লোকের পক্ষে জন জীবনে নিজের যথাযোগ্য মর্য্যাদার স্থান পুণরুদ্ধার করার প্রয়াস যে উহার প্রকৃত ধরণের জন্যই প্রায় আশা-ভরসাহীন তা ইংল্যাণ্ড বাসীদের অতি অল্প লোকই অনুধাবন করতে পারেন। বছরের পর বছর ধরে সুরেন্দ্রনাথ গ্রাণ্টের মত দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এমন ভাবে সংগ্রাম করেছেন যে সে সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত হয় মৃত্যু, নয় বিজয় দিয়ে তার প্রচেষ্টাকে সাফল্য দান করবে। তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে শিক্ষাদান কাজে লেগে গেলেন; একটি সংবাদ পত্র প্রকাশ করলেন এবং তার সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার নিজেই গ্রহণ করলেন।

(চলবে)

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Sanction List for JAN & FEB. 1982.

CALCUTTA

Name

Banerjee smt Renuka w-o Late Kalidas Banerjee Cal-10
Bhattacharjee smt Amiya Rani w-o Priyabrata Bhattacharjee, 5/1 Raralpara Lane, cal-35
Dhirendranath 92 Janakalyan, cal-49
Smt Gouri w/o Late Anil Krishna Bhattacharji 37B Raja Virendra St. cal-5
,, ,, w/o Late Pabitra Kamal Bhattacharji 5 Subal Chandra Lane, cal-9
Jibananda 28/3 Jhamapukur Lane, cal-9
smt Biva Rani w/o L Satyandra Ch. Bose 133 Ramlal Agarwala Lane, cal-50
smt Nive Rani ,, Late Atul Chandra 16/C Raja Lane cal-9
,, Sambhunath 6/B Jatindas Road, cal-29
smt Saraju Bala c o Late Jitendra Nath Bose 1 Chetlahat Road, cal-27
Chatterjee smt Sovana w/o Late Harendra Nath 347 I. I. T. Road cal-34
Chowdhury smt Bindu w/o Late Sukumar Chowdhury 226 R. N. Tagore Road, cal-50
smt Labany Prova w/o Late Digbasan Chowdhury 11/1A Northern Avenue cal-37
,, smt Sova Rani w/o Late Jitendranath Chowdhury 3 Domestic Area cal-25
Datta smt Binapani 93/1 Garpar Road, cal-9
,, smt Lila w-o Late Sudhir Ch. Dutta cal-54
Dey Sarkar Taranath 55 Ripon Street cal-16
Ganguly smt Amiya Bala w-o Late Bhabaranjan Ganguly cal-63
Ghatak Dinesh Ch. 2 Greek Church Row Extn., cal-26
Ghosh smt Chitra w-o Late Dhirendra Nath Ghosh 199 B. B. Ganguly St. cal-12
smt Latika c/o Malay Kr. Ghosh cal-49
smt Maya Rani w-o Late Debkumar Ghosh 35 Beliaghata Main Road, cal-10
,, smt Tulsi w.o Late Himangshu Mohan Ghosh cal-35
Guha Sudhir Ch. 118 Vivekananda Road cal-6
Majumdar smt Bina w-o Late Benod Ch. Majumder 23/A Harataki Bagan Lane cal-5
Mitra Anil Kumar A-60 Lakshminagar, Dum Dum cal-28
,, smt Biva w-o Late Sitanshu Kanta Mitra Gariahat Road, cal-19
Mukherjee Hemendra Kumar 56 Unique Park cal 34
Ray Jyotirmoy 10/6A Charu Chandra Avenue, cal-33
Sarkar smt Asha Rani c/o Rajendralal Sarkar cal-33
,, Benoy Bhusan 101/B Rash Behari Avenue cal-29
Sen smt Gita w-o Late Satyaranjan Sen 5E Palm Avenue cal-19
Shome smt Ptitikona w-o Late Satyendra Chandra Shome cal-24

RegdNo.R. N .24511/71 | Diplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—মূল্য ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | সাধারণ—৩০ পয়সা

130

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

শ্রীজগদ্ধ[illegible]য় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। দ্বিতীয়তে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৩০
৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৩৫, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০
বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১ মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৫০
ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, দেশ যাদের ভোলেনি (১)—১.০০, দেশ যাদের ভোলেনি (২)—২.০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, স্বাধিকার প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৭.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট ভগ্নী প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭
টেলিফোন—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ২১ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯ ৫ই জুন ১৯৮২	৩৫ সংখ্যা

দুইটি জিনিষ হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

APRIL—1982

Dist—CALCUTTA

Basu Smt Sovana w-o Late Kshitish Basu, 16/1E Arpuli Lane, Calcutta-12
Bhaduri Smt Maya w-o Late Murari Mohan Bhaduri, Calcutta-22
Bhattacharjee Smt Mahamaya w-o Late Rabindra Nath Bhattacharjee, Calcutta-56
Chakraborty Kshitish Chandra 42 Garden Reach Road Calcutta-24
Chanda Smt Prova Rani, Gopal Krishna 21 Chandranath Chatterjeb Street, Cal.-25
Chatterjee Smt Latika w-o Late Sudhendu, Harinath De Road, Calcutta-9
Das Smt Kanaklata w-o Late Haridas, 107/101/4 Uttadanga Main Road, Calcutta-67
Das Smt Sukh Rani w-o Late Balaichand, P120 Dakshin Para Road, Calcutta-28
Dolui Kumari Jamun, d-o Late Gosthabehari, 165/H/18/P Belgachia Main Rd. Cal-10
Ganguly Smt Indira w-o Late Sibdas Calcutta-47
Ghose Smt Sita w-o Late Anukul, 15A, Bhim Ghose Lane, Calcutta-6
Goswami Smt Bakulrani w-o Late Niranjan Prosad, Calcutta-56
Khan Smt Parul w-o Late Sachin, 108K Mandharpukur Road, Calcutta-26
Khastagir Krishna Narayan 36/13 Jheel Road, Calcutta-32
Mukherjee Labanyabala w-o Late Sudhanya Kumar, Calcutta-51
Nag Smt Mira w-o Late Monoj Kanta 52A, Jubilee Park, Calcutta-33
Paul Juthikarani w-o Late Bancharam, Calcutta-54
Shastri Smt Satyasati w-o Late Onkarlal Calcutta-7
Sen Smt Charubala w-o Late Satee Bhusau, Ekdalia Road Calcutta-19
Talukdar Smt Ranjita w-o Late Tusharkanti 110 College Street, Calcutta-12

Dist –24 PARGANAS

Bhattacharjee Smt Provarani w-o Late Matinurachandra H' B, Town Road, No. 7
Bhowmick Smt Rajlakshmi w-o Late Sa'. t Chandra Nabapalli, Natagarh
Biswas Smt Labanpabala w-o Late Makhanlal 1512/4 Kalyangarh

সম্পাদকীয়

নবগঠিত বামফ্রন্ট সরকার যেন মনে রাখেন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নির্বাচন মিটে গেছে। বামফ্রন্ট বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। যা হবার তাই হয়েছে। বামফ্রন্ট আগামী পাঁচ বছরের জন্য মন্ত্রিসভাও গড়েছেন। দপ্তর বন্টন নিয়ে যে মিনি সংকট দেখা দিয়েছিল তারও ফয়সালা হয়ে গেছে। আপাততঃ দপ্তর-ছাঁটাই স্থগিত, পাকা সিদ্ধান্ত পরে। তবে এ সংকট বামফ্রন্টের ঘরোয়া ব্যাপার, মান অভিমানের পালা। প্রমোদবাবুই তাই বলেছেন, "এতে জটিলতার কি বা আছে। বিরহে পীরিত বাড়ে।" জনসাধারণও জানেন, এ মন কষাকষি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবে না।

অবশ্য কিছু সি. পি. এম নেতা এ ব্যাপারে বেশ কঠোর ভাব পোষণ করেন। তাঁদের কথা হল, ফঃ বঃ এবং আর, এস, পি খুব বাড়াবাড়ি করছে, ওদের বাস্তব অবস্থা সময়ে দেওয়া দরকার। বামফ্রন্টের এই ভিতরকার তামাসা উপভোগ্য হলেও উপজীব্য নয়, জনগণের তা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। তাদের জিজ্ঞাসা হল, বামফ্রন্ট সরকার প্রথম দফার পাঁচ বছর যে নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করে রাজ্য চালিয়েছেন দ্বিতীয় দফাও কি সেই ধারায় চালাবেন, না তার পরিবর্তন করবেন? এই বিদ্যুৎ সংকট আর লোডশেডিং কি এমনি ভাবেই চলতে থাকবে এবং সি, পি এম বিরোধী দলের মানুষদের খুন করার রাজনীতি কি আগের মতই চালিয়ে যাবে?

মুখে যে যাই বলুন না কেন, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে আদৌ ভাল নয়, সে কথা ফ্রন্টের কর্তা ব্যক্তিরা না বোঝেন এমন নয়। তার প্রতিকারের জন্য ফ্রন্ট সরকার কি পুলিশ প্রশাসনকে নতুন গাইড-লাইন দেবেন? নতুন মন্ত্রিসভার নিকট থেকে রাজ্যবাসী এ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ঘোষণা চায়। চায় কাজে সে ঘোষণার প্রতিফলন।

অন্যদিকে নির্বাচন শেষ হতে না হতেই রাজ্য জুড়ে কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের ওপর নতুন করে আক্রমণ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন; মারধোর, ঘর পোড়ান, দোকান ভাঙচুর, লুট তরাজের ঘটনাও ঘটেছে। পুলিসের কাছে অভিযোগ করে ফল হয় নি। আগের মতই পুলিস নিষ্ক্রিয়, নীরব দর্শক। এই সন্ত্রাস চলতে থাকলে অ বাম জনগণ কি করবেন? তারা কি ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অন্যত্র চলে যাবেন? এ প্রশ্নের যথার্থ একটা উত্তর নতুন বামফ্রন্ট সরকারকে দিতে হবে।

অত্যাচারিতদের অভিযোগ, এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে সি, পি, এম সমর্থকরা। অভিযোগ যে মিথ্যা সে কথা বামফ্রন্ট সরকার আদালতের সাহায্যে প্রমাণ করুন, নতুবা অপরাধের দায় দায়িত্ব সরকারের উপরেই বর্তাবে। এ ধরণের অরাজকতা চলতে দেওয়া একটি স্থিতিশীল নির্বাচিত সরকারের পক্ষে যে মর্যাদাহানিকর সে কথা সরকার নিশ্চয়ই জানেন।

নির্বাচন নিয়ে ময়না তদন্তে জন সাধারণের উৎসাহ খুবই কম। নির্বাচনে রিগিং হয়েছে সেও জানা কথা। রিগিং-এর অভিযোগ আজি নিয়ে প্রিয়বাবু আনন্দবাবুরা দিল্লি দিল্লি করতে পারেন, রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দরজার সামনে ধর্ণা দিতে পারেন, এমন কি একটা মামলাও দায়ের করতে পারেন কিন্তু তাতে হবেটা কি? এ সবই মিছে আশা, মরুমরীচিকা। দিল্লির মতিগতি জানা হয়ে গেছে।

দিল্লিতে ছুটাছুটি না করে কংগ্রেসের নেতাদের উচিত গ্রামের মানুষের দিকে মনোযোগ দেওয়া, গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলা এবং সম্ভবমত জনসেবার কাজ হাতে নেওয়া। জনগণই ক্ষমতার উৎস। ১৯৭৭ সালের পরে এ কাজ কংগ্রেস কোথাও ভালভাবে করেছে বলে জানা যায় না। সংগঠন না গড়ে দরবারে সময় নষ্ট করা অনুচিত।

সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সংগঠনের কাজে এখনি লেগে যাওয়া উচিত একেবারে প্রদেশ কংগ্রেস থেকে গ্রাম কংগ্রেস কমিটি পর্যন্ত চলবে দল গড়ার কাজ এবং গণসংযোগ। সংগঠন মজবুদ হলে রাজ্য নেতাদের দিল্লিতে ছুটতে হবে না. দিল্লির কর্তারাই তাঁদের কাছে আসবেন। হাওয়ার জোরে নৌকা চলে বটে, তবে দাঁড়িমাঝিও ভাল দরকার। দরকার হালে ও দাঁড়ের মিলও।

সফল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী পক্ষের একটা ভূমিকা আছে। সম্প্রতি নির্বাচিত বিরোধী দলের সংখ্যা বড় না হলেও দলে বেশ কিছু সর্বজনশ্রদ্ধেয় গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছে। প্রদত্ত ভোটের বিচারে বলা চলে বিরোধী পক্ষ রাজ্যের এক বিরাট জনসমষ্টির সমর্থন পুষ্ট। এ কারণে বামফ্রন্ট সরকারের উচিত বিরোধী পক্ষের অভিমতকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া, নিছক ব্রুট মেজরিটির জোরে বিরুদ্ধপক্ষের কণ্ঠরোধ না করা।

বামফ্রন্টের নেতারা নিজেরাই বলেছেন, বিগত পাঁচ বছরের শাসন ছিল তাঁদের কাছে পরীক্ষা নিরীক্ষা কাল, এবার তাঁদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে জনসাধারণের মনে সাফল্যের ছবি তুলে ধরতে হবে। কথাটি অযৌক্তিক নয়। তবে এ কাজ করতে হলে প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য বিরোধী পক্ষের সহযোগিতা নিয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার। বিরোধী পক্ষের অভিযোগকে গায়ের জোরে নস্যাৎ না করে, সহানুভূতি ও বিচারের দ্বারা নিষ্পত্তি করলে বামফ্রন্ট সরকার নিজেরই ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পারবেন। পাঁচ বছর আগে ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিম বঙ্গে একটি পরিচ্ছন্ন, সৎ এবং দক্ষ প্রশাসন গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বামফ্রন্ট সরকার সেই প্রতিশ্রুতি পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। অফিস আদালতের কাজে ফাঁকি, বিশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতি বেড়েই গেছে। পুলিস বিভাগ তো চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার যেন এই অসাফল্যের কথাটি ভুলে না যান। বিধান সভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ফ্রন্ট সরকারের পক্ষে শক্তহাতে শাসন রজ্জু ধরার ক্ষেত্রে কোন বাধার হেতু নেই।

গত পাঁচ বছর ধরে বামফ্রন্ট নেতারা যে চক্রান্তের ভূত দেখেছেন, কেন্দ্র কর্তৃক সরকার ভেঙ্গে দেবার আতংকে ভুগেছেন এবং অতীতের কংগ্রেসী সরকার ও কেন্দ্রের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে চেয়েছেন, সে সব যে ভিত্তিহীন তা প্রমাণ হয়ে গেছে। এবার ওসব প্রচারে কাজ হবে না, কাজের কাজ তাঁদের কিছু করতেই হবে। ভাঁওতা দিয়ে বেশিদিন কাউকে বোকা বানান সম্ভব নয়।

দফায় দফায় বেতন বাড়িয়ে, উপরি আয়ের পথ খুলে দিয়ে অথবা গৌরী সেনের টাকা ছড়িয়ে কিছু লোককে হাতে রাখা সম্ভব কিন্তু সারা রাজ্যের মানুষকে তার দ্বারা দলের পিছনে পাওয়া যায় না। গত নির্বাচনেই এই নির্মম সত্যের কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের দলতন্ত্রী নীতির পরিবর্তন না ঘটলে, আপনার জন তোষণের সংকীর্ণ মনোভাব না ঘুচলে, এই অসন্তোষ প্রকাশ ব্যাপকতর হবে। তখন পাঁচ বছর ধরে শাসন ক্ষমতা দখল করে থাকাও সহজ হবে না, এই সতর্কবাণীটি যেন নবগঠিত বামফ্রন্ট সরকার সযত্নে মনে রাখেন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত
বঙ্গ বিভাগ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের মনে এই ভাব জাগল যে আমাদের অপমান করা হয়েছে, আমাদের অবজ্ঞা করা হয়েছে, আমাদের সঙ্গে চালাকি করা হয়েছে আমরা অনুভব করলাম, আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ বিপর্য্যস্ত হতে চলেছে।

আমরা আরও বুঝতে পারলাম যে আমাদের উপর ইচ্ছা করেই এই আঘাত হানা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে যে ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্য ও আত্মসচেতনতা দেখা দিয়েছে তাকে ধ্বংস করা গোড়ার দিকে প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেশ বিভাগ করার ইচ্ছা থাকলেও, আমরা বুঝতে পারলাম যে এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও কারসাজি আছে, এবং একে যদি পাশ হতে দেওয়া যায় তা হলে তা আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে মারাত্মক হবে, আর যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর ভারতের উন্নতি প্রধানত নির্ভর করছে, তাকেও মারণ আঘাত হানবে। কারণ একথা সরকারীভাবে প্রকাশেই বলা হয়েছে যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম হবে একটি মুসলমান প্রদেশ, এবং এই ধর্ম বিস্তারের পার্থক্যকে নবগঠিত প্রদেশের জন্য যে নীতি অনুসৃত হবে তার ভিত্তিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

আমরা আর সময় নষ্ট করলাম না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদে এক সম্মেলনে মিলিত হলাম মহারাজা নিজে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহন করেছিলেন। সম্মেলনে আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন মিঃ এইচ ই এ কটন। মিঃ কটন তখন কলকাতায় ব্যারিষ্টারী করতেন। বর্ত্তমানে তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মিঃ কটন দেশ বিভাগ রদ আন্দোলনের প্রতি গভীরভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন।, ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ব্যাটস্ক্লিফ এবং ইংলিসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ফ্রেজার ব্লেয়ারও এই আন্দোলনের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন। এংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় যারা সাধারণতঃ সমস্ত সরকারী মতামত সমর্থন করেন তারাও তাদের বিশ্বস্ত মুখপত্রসমূহের মাধ্যমে দেশ বিভাগের নিন্দা করেন। তাদের মনোভাব কিন্তু বেশী দিন থাকেনি। তবে দেশবিভাগ বিরোধী আন্দোলনের প্রথমদিকে এংলোইণ্ডিয়ান প্রেসের মনোভাব ঐ রকম ছিল।

সম্মেলনে স্থির হল যে মহারাজা দেশ ভাগের আদেশের পুনর্বিবেচনার জন্য ভাইসরয়ের নিকট একটি টেলিগ্রাম করবেন এবং সেই সঙ্গে জোর দিয়ে এ কথাও বলা হবে যে যদি প্রশাসনিক কারণে দেশ বিভাগের অপরিহার্য্য বলেই মনে হয়

তাহলে যেন বাংলা ভাষাভাষী গোষ্টিকে অপরিহার্য্য রূপেই সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ রূপে রাখা হয়। একটা তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে পরবর্তীকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক যে ধরণের দেশ বিভাগের খসড়া গ্রহণ করা হয় এই সম্মেলনের প্রস্তাবের পূর্বেই তা সুস্পষ্টরূপে সূচিত হয়েছিল এবং মহারাজ ভাইসরয়কে যে টেলিগ্রাম করছিলেন তার মধ্যেই তা লিপিবদ্ধছিল।

প্রশাসনিক কাজে যদি বাস্তবিকই কোন অসুবিধা অনুভূত হয়ে থাকে তাহলে বাংলা ভাষা-ভাষী লোকদের এক প্রদেশে রেখে বাদবাকী অন্য সমস্তকে আর একটি প্রদেশে রেখে দেশ ভাগ করলে সে অসুবিধা দূরীভূত হত এবং জনমতও তাতে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু লর্ড কার্জন ও তাঁর সরকারের তাতে সুবিধা হবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, লর্ড কার্জনের কাজের মধ্যে একটি অভিসন্ধি ছিল। সে অভিসন্ধি মহারাজার প্রস্তাব মত দেশ ভাগ করলে চরিতার্থ হবে না। তবে লর্ড হার্ডিঞ্জের মত যে আমাদের মতের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল তার কারণ হল এই যে তাঁর সময়ের সরকারী নীতি ও লক্ষ্য ছিল লর্ড কার্জনের সময়ের নীতি ও লক্ষ্য থেকে পৃথক।

মহারাজার প্রাসাদের সম্মেলনের পরে প্রায় প্রতিদিনই হয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের বাড়ীতে নয় তো ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্যের বাড়ীতে সম্মেলন বসত। সিদ্ধান্ত হল যে ৭ই আগষ্ট টাউনহলে এক জনসভার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশ বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে ভাগ্যক্রমে এই দিনটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মফঃস্বলে মফঃস্বলে নিমন্ত্রন পত্র পাঠান হল এই সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য। সব জায়গা থেকেই সর্বসম্মত ভাবে উৎসাহ ব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গেল। আমার বন্ধু বাবু অঘোরচন্দ্র গুহ ময়মনসিংহ থেকে এক পত্র লিখে নির্দিষ্ট দিনে সভার কাজ স্থগিত রাখতে অনুরোধ জানালেন এই জন্য যে আরও কিছু সময় পেলে মফঃস্বলের লোকেরা সংগঠিত হতে পারবেন কিন্তু যে আবেগ ও উদ্দীপনা জাগ্রত হয়েছে এবং কাল বিলম্ব না করে প্রথম ধাক্কা দেওয়ার যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বন্ধুদের সংগে পরামর্শ করে আমি তাকে লিখলাম যে সময় বুঝে কাজ করার একটা গুরুত্ব আছে এবং সর্বপ্রথমে যে বড় রকমের বিক্ষোভ দেখান হবে তা অবিলম্বেই করা দরকার এই জন্য যে আন্দোলনকে এমন এক নের্তৃত্ব ও নির্দেশ দিতে হবে যা সমস্ত দেশ জুড়ে আগামী দিনে আন্দোলনের বিস্তার ও ক্রমাগ্রগতিকে একই তালে চলতে সংহত করবে।

৭ই আগষ্টের জনসভায় কি কি প্রস্তাব নেওয়া হবে সে বিষয় আলোচনার জন্য অনেকগুলি বৈঠক বসে। এই সমস্ত বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ ও নিবিষ্ট আলোচনা চলে। এই আলোচনায় পূর্ব্ব বঙ্গ ও উত্তর বঙ্গ উভয় অঞ্চলেরই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগন উপস্থিত থেকে অংশ গ্রহন করেন। আলোচনা বৈঠকে এইরকম একটা মনোভাব গড়ে ওঠে যে কেবল মাত্র জনসভা করে গেলেই কিছু হবে না; লর্ড কার্জন জনসাধারণের সুখ দুঃখের অনুভূতিকে রীতিমত অবজ্ঞা করে আসছেন; তিনি জনমনকে প্রকাশ্যেই ঘৃনার চোখে দেখছেন। সুতরাং আরও কিছু করা দরকার। এমন কিছু করা দরকার যা এই আন্দোলনের পিছনে যে প্রকার ক্ষোভের ভাব রয়েছে তাকে রূপ দান করতে পারে। নানা রকমের প্রস্তাব উঠেছিল। আমার এখনও মনে আছে ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েসনের বাড়ীতে প্রায় রোজই বৈঠক বসত আর সে সমস্ত বৈঠকে এই প্রস্তাবগুলি আসত। একটি প্রস্তাব ছিল এই যে আমরা সকলে অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের মত সমস্ত সম্মানের পদগুলি ছেড়ে দেব, জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য পদও ত্যাগ করব। এই প্রস্তাবে আপত্তি করার সুস্পষ্ট কারণ ছিল। সে কারণ হল এই যে স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলির সদস্যপদে ও ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বহাল থাকলে দেশের লোকের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায় ঐসমস্ত পদে কার্য্যরত থাকলে স্থানীয় ব্যাপারে প্রভাব খাটাবার যে সুযোগ পাওয়া যায় যে প্রভাব আসন্ন সংগ্রামে কাজে লাগান যাবে। তা ছাড়া আরও একটি চিন্তার বিষয় ছিল। তাহল এই যে সমস্ত দেশই যে আমাদের এই মতে সায় দেবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। এইরকম একটা বৃহৎ আন্দোলনের শুরুতেই যদি আমরা আংশিক ভাবেও হেরে যাই, তা হলে তা বিপর্য্যয় ডেকে আনবে। সুতরাং এ চিন্তা ত্যাগ করা হল।

যুগান্তর বিপ্লবী সম্মিলনী।

স্মরণ-সভা

প্রিয়বন্ধু,

প্রয়াত বিপ্লবী পরমানন্দ, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, বটকৃষ্ণ মিশ্র, কৃষ্ণদাস বানার্জী, নরেন করগুপ্ত শঙ্কর নিয়োগী, রতিকান্ত দত্ত নগেন্দ্র চন্দ্র দেব, ব্যোমেন্দ্র কিশোর আচার্য্যচৌধুরী, শৈলেশ প্রসাদ মজুমদার, শিশির সোম, প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়, শশধর আচার্য্য এবং সুরেশ গাঙ্গুলি স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উপলক্ষে আগামী ১১ই জুন/৮২ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫টায় প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ ভবনে (কিরণচন্দ্র হলে) স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই স্মৃতিসভায় আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

ভবদীয়

ইন্দুভূষণ বসু

সভাপতি যুগান্তর বিপ্লবী সম্মিলনী।

২৬শে মে/৮২

৩২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৯।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দেশে ফিরে আসুন

— হাই রিপোর্টার—

কেন্দ্রিয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বি, পি, এন্ সিং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হতে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি বিদ্দের দেশে আনার জন্য ১৫ দিনের সফরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন।

আমেরিকায় মোট ভারতীয়দের সংখ্যা তিনলক্ষ ছিয়াশি হাজার এঁদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ অন্তত ত্রিশ হাজার, এই ত্রিশ হাজারের মধ্যে ১৫ হাজার বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করেছেন। প্রায় নয় হাজার ভারতীয় ছাত্র আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছেন।

দেশ গঠন কাজে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তবিদদের প্রয়োজন বেশী, এঁদের জন্যই সরকার পরিকল্পনা করে ওঁদের দেশে ফিরার জন্য আবেদন করেছেন।

চীনে বিপ্লবের পর নতুন সরকার প্রবাসী চীনা বিজ্ঞানীদের প্রতি আবেদন জানায়েছিলেন দেশ গড়ার কাজে সহায়তা করার জন্য চীনে ফিরে আসতে সেই প্রবল স্নায়ুযুদ্ধের যুগেও আমেরিকার সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছেড়ে নামকরা প্রবাসী চীনা বিজ্ঞানীরা দেশে ফিরে এসেছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি বিদ্দের মধ্যেও অনুরূপ দেশাত্ম বোধ নিশ্চয়ই আছে। প্রয়োজন দেশে ওঁদের জন্য কাজের ও গবেষণার পরিবেশ তৈরী করে দেওয়া। কেন্দ্রিয় বিজ্ঞান ও শিল্প পরিষদের পক্ষ থেকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী তৈরী করা হয়েছে প্রবাসী বিজ্ঞানীদের জন্য। শুধু চাকরী নয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা যাতে দেশে এসে নিজেরা তাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেন তার জন্য সরকার সহায়তা করবেন। এই সব প্রস্তাব ও পরিকল্পনা বি, পি, এন, সিং আমেরিকায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নিকট তুলে ধরবেন। আশা করব বিজ্ঞানীরা দেশ প্রেমিকের মন নিয়ে আমেরিকার থাকা খাওয়ার ও বিলাসিতার মোহ ত্যাগ করতে পারবেন এবং মিঃ সিং এর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ফিরে এসে দেশগঠন কাজে ব্রতী হয়ে দেশবাসীর নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

———.

পরলোকে বিপ্লবী শিশির কুমার সোম

যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্ম্মী ময়মনসিংহের শিশিরকুমার সোম ৮২ বৎসর বয়সে গত ১১ই মে ১৯৮২ তারিখ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ছাত্র অবস্থায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ঐতিহাসিক ইণ্ডো-জার্মাণ বিপ্লবী প্রচেষ্টায় প্রথম কারারুদ্ধ হন ১৯১৬ সালে। কারাবরণ ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাকে শেষ দিন পর্য্যন্ত আদর্শচ্যুত করিতে পারে নাই। আমরা তাঁহার পরিবার আত্মীয় বান্ধবের সঙ্গে একাত্মভাবে তাঁহাকে স্মরণ করি এবং তাঁহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

বিপ্লবী-দরদী রবীন্দ্রনাথ

[যুগান্তর সাময়িকীতে প্রকাশিত লাভলী মোহন রায়চৌধুরী লিখিত সন্দেহ ভাজন রবীন্দ্রনাথ এবং অপূর্বকুমার চন্দ লিখিত কবির সঙ্গে চীন জাপান কানাডায় হতে অধিকাং তথ্য গৃহীত]

—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস

রবীন্দ্র নাথের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কবি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করেন এবং বহু সভায় ও মিছিলে নেতৃত্ব দেন, ছন্দে, গানে, বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে ও দেশ প্রেমে উদ্বেলিত ও উদ্দীপীত করে ছিলেন। ১৯০৭ সালে প্রকাশ্য রাজনীতি হতে দূরে সরে শান্তিনিকেতনেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন। কিন্তু সরকারী কর্তাব্যক্তিদের ভ্রুকুটি ও চোখ রাঙ্গানী তোয়াক্কা করতেন না। শান্তি নিকেতনে বেছে বেছে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের স্থান করে দিয়েছিলেন। হীরালাল সেনের মত রাজদ্রোহে দায়ে দণ্ডিত ব্যক্তিকে চাকুরী দিয়েছিলেন। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রকাশিত সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক রাজদ্রোহ দায়ে অভিযুক্ত উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধবকে শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯১৮ সালে ৭ জানুয়ারী বিপ্লবী নলিনী কান্ত ঘোষের নেতৃত্বে গৌহাটী বণ্ডযুদ্ধে দণ্ডিত বিপ্লবী মনীন্দ্র রায়কে শ্রীনিকেতনে চাকুরী দিয়েছিলেন।

অনুশীলন সমিতির নেতা নরেন্দ্র নাথ সেন ১৯১২ সেপ্টম্বর মাসে বিপ্লব প্রচেষ্টায় বৈদেশিক সাহায্য বিশেষ করে জার্মান সাহায্য ব্যবস্থা করার জন্য কেদারেশ্বর গুহকে গোপন পথে বিদেশে পাঠান এবং কেদারেশ্বর গুহ গোপন পথেই দেশে ফিরে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর গোপন ঘাঁটিতে গিয়ে রিপোর্ট দেন। এই কেদারেশ্বর গুহও শান্তিনিকেতনে কৃষি বিভাগে চাকুরী করতেন, আরও অনেক বিপ্লবী শান্তিনিকেতনে স্থান পেয়েছেন। অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভগিনী নিবেদিতাকে রবীন্দ্র নাথ তাঁর প্রথম সন্তান মাধুরীলতা বা বেলা বা বেলফুল বা বেলী বা বেলা-রাণীর বিদ্যাচর্চার প্রধান পরামর্শদাতা করেন। ইংরেজ সরকার রবীন্দ্র নাথের বিপ্লবীদের উপর আকর্ষন পছন্দ করে নাই, তাই ১৯১২ সালে এক গোপন সার্কুলারে শান্তিনিকেতনকে সরকারী কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে ঘোষনা করা হয়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর ও পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। এই মাত্রাহীন নজরদারীর ফলে কবি ১৯১৬ সাল ৩০ এপ্রিল গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠান। ভারতের ইংরেজ শাসনযন্ত্র এইখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। কবিকে অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ডি,লিট্ দেওয়ার আয়োজন করা হয়, তখন স্বয়ং লর্ড কার্জন সাহেব এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

১৯১৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী একটী গোয়েন্দা রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সরকারী মনোভাব বুঝা যাক। ঐ রিপোর্টে সে বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারী শিবনাথ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে ব্রাহ্মসমাজ হলে বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লিগের একটী সভার বিবরণ দেওয়া হয়। এই সভায় যে কয়জন সন্দেহ ভাজন (Political Suspect) উপস্থিত ছিলেন পুলিশের মতে রবীন্দ্র নাথ অন্যতম। বাংলা সরকারের রাজনৈতিক বিশেষ শাখার অন্তর্ভুক্ত ১৯১৫ সালের ২০৭ নম্বর, নম্বর ফাইলে এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই রিপোর্টে জানা যায় আই,

বি র এই রিপোর্ট পাওয়া মাত্রই কাউন্সিলের মাননীয় সদস্য পি, সি, লায়ন চিফ সেক্রেটারীর কাছে ১৭ মার্চ একটী নোটে কি কারণে একজন নাগরিককে সাসপেক্ট বলে মার্কা করা তা বিস্তারিত-ভাবে জানতে চান। নোটের উত্তরে জানান হয় যে একমাত্র রাজনৈতিক কারনেই সন্দেহ ভাজনদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তখন লায়ন গোটা সাসপেক্ট লিষ্টটী তলপ করে পাঠান। এই লিষ্টের সঙ্গে পুলিশের তৈরী রবীন্দ্র নাথের একটী হিষ্ট্রি সিট ও ১৯১২ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারী ভাইসরয়ের কাছে পাঠান স্যার চার্লস বেইলির একটী গোপন নোটের অংশ বিশেষও লায়নের কাছে প্রেরিত হয়। এগুলি খতিয়ে দেখার পর লায়ন যে মন্তব্য করেন সেটী সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য তিনি বলেন একথা অবশ্য সত্য যে বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্র নাথ কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কবি অনেক কাজের মধ্যেই তাঁর পরিচিতি রেখে গেছেন, সুতরাং এখনও তাঁকে সন্দেহ ভাজন (Suspect) বলে চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। ১৯১৫ সালে ২রা এপ্রিল তাঁর প্রথম নোটটি পাঠান। কতকদিন পরই দার্জিলিং থেকে ৯মে হিউজেস বুলার এর কাছে এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে লায়ন আরও একটী চিঠি লেখেন। শেষোক্ত চিঠিতে লায়ন অভিযোগ করেন যে পুলিশের দীর্ঘ সাসপেক্ট লিষ্টটীর মধ্যে বিগত আড়াই বছর সময়ে কোন পরিবর্তণ করা হয়নি, অর্থাৎ পুরাণ রিপোর্টের ভিত্তিতে এক কালে যাদের সন্দেহের চোখে দেখা হত তাঁদের সম্পর্কে এখনও সেই সন্দেহের মানসিকতা জীইয়ে রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় স্পষ্টত উল্লেখ না করলেও সাসপেক্ট লিষ্ট থেকে রবীন্দ্র নাথের নাম বাদ দেওয়ার জন্য লায়ন ইঙ্গিতে অনুরোধ জানান। বলা বাহুল্য জনারেবল মেম্বারের এই অনুরোধ রক্ষা করা হয়।

পুলিশের এই সমস্ত রিপোর্ট সত্বেও রবীন্দ্র নাথের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও দেশানুরাগ সামান্যতম ক্ষুণ্ন হয় নাই। লর্ড-আরউইন বেড়াবেও সি, এফ এনড্রুজকে একদিন বলেন তিনি শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করতে খুব ইচ্ছুক। মিঃ এনড্রুজ এই কথা কবিকে বলেন এবং রবীন্দ্র নাথ লর্ড আরউইনকে আশ্রমে আমন্ত্রণ জানান। ভাইসরয় শান্তিনিকেতন আসছেন জেনে বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ এলেন রবীন্দ্র নাথের সঙ্গে দেখা করতে, তখন অপূর্ব কুমার চন্দ উপস্থিত ছিলেন। আশ্রমে পুলিশ মোতায়েন সম্পর্কে রবীন্দ্র নাথের মতামত তিনি জানতে চাইলেন। রবীন্দ্র নাথ বললেন আশ্রমের ভিতরে পুলিশ মোতায়নের অনুমতি তিনি দিতে পারবেন না।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জোর দিতে লাগলেন ভাইসরয়ের আশ্রম পরিদর্শনের আগে গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গায় পুলিশ মোতায়েন রাখা দরকার। রবীন্দ্র নাথ বিরক্ত হয়ে অপূর্ব কুমার চন্দকে বললেন ভাইসরয়কে দেওয়ার জন্য এই মর্মে একটী চিঠির খসড়া করতে—তিনি জানতে পেরেছেন ভাইসরয় শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের আগে আশ্রমের অভ্যন্তরে পুলিশ মোতায়েন করা একান্ত আবশ্যক; যেহেতু আশ্রমের অভ্যন্তরে পুলিশ মোতায়নের অনুমতি দেওয়া যাবে না সেইজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছেন যে মহামান্য ভাইসরয় যেন তাঁকে আশ্রম পরিদর্শনের আমন্ত্রণ বাতিল বলে গণ্য করার অনুরোধ জনানর জন্য ক্ষমা করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একেবারে মুষড়ে পড়লেন এবং রবীন্দ্র নাথকে বললেন চিফ সেক্রেটারীর সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত তিনি যেন ভাইসরয়কে চিঠি না লেখেন। পরামর্শের পর মেনে নেওয়া হয় যে লর্ড আরউইনের

পরিদর্শনের সময় আশ্রমের ভিতরে পুলিশ মোতায়েন করা হবে না।

এনড্রুজ সাহেবকে লর্ড আরউইন লেসেন তার শান্তি নিকেতন পরিদর্শন একটা অত্যন্ত স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ভারতের ভাইসরয় হিসাবে তাঁর কার্যকালের একটা রেড লেটার ডে, এতে বুঝা যায় আশ্রম পরিদর্শন কালে রবীন্দ্র নাথের ব্যবহার ও আশ্রম পরিবেশে ভাইসরয় কতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন।

১৯২৯ সালে জানুয়ারীতে রবীন্দ্র নাথ চীন জাপান হয়ে কানাডায় গিয়েছিলেন। কানাডা যাওয়ার পথে কয়েক দিন এবং ফিরার পথে প্রায় একমাস জাপানে কাটায়েছিলেন। সেই সময় রবীন্দ্র নাথের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন জাপানের বিরাট পণ্ডিত Dr. Anesake, ব্লাক ড্রাগন সোসাইটির নেতা Toyma, রাজদরবারের শিল্পি Yokoyama Taikivan, এমনি আরও অনেকে ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং পেশোয়ার সীমান্ত আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবী সাহারণপুরালা। অপূর্ব কুমার চন্দ লিখেছেন কানাডা থেকে ফিরার পথে জাপানে থাকাকালীন রাসবিহারী বসুর সঙ্গে আমাদের ভালভাবে পরিচয় হয়।

রোজই তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম অবাক হতাম এই বিখ্যাত বিপ্লবীর মজার গল্প আর ঘটনায় ঠাসা জীবণের পরিচয় পেয়ে। সূক্ষ্ম রসিকতা বোধও তার ছিল। গুরুদেব রাসবিহারী বসুকে খুবই ভালবাসতেন।

রবীন্দ্র নাথের বিপ্লবীদের প্রতি আন্তরিক দরদ ও শ্রদ্ধা মূর্ত হয়েছে সুভাষ চন্দ্র সম্পর্কে তার উক্তি। এ উক্তি অন্যান্য নেতাদের শ্রদ্ধা জানানর বক্তব্য হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

রবীন্দ্র নাথ বলেছেন "সুভাষ চন্দ্র তোমার রাষ্ট্রীক সাধনার আরম্ভকালে তোমাকে দূর হতে দেখেছি। সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট হয়ে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের সাবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্য ক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা দুঃখে, নির্বাসনে, দুসাধ্য রোগের আক্রমণ, কিছুতেই তোমাকে অভিভূত করেনি। তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি"। রবীন্দ্র নাথের এই উক্তিতে পরিষ্কার রবীন্দ্র নাথ সুভাষ চন্দ্রকে বিপ্লবীর ভূমিকায় আশা করেছিলেন এবং কবির এই আশা পূরণ হওয়ায় রবীন্দ্র নাথ দ্বিধাহীন চিত্তে তার মনের ভাব আন্তরিক দরদ ও স্নেহশীল মনে প্রকাশ করেছেন।

অত্যাচার নিপীড়ন, অন্যায়, অসত্যের আবির্ভাব দেশ বিদেশে যেখানে হয়েছে রবীন্দ্র নাথ নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন নি, গর্জে উঠেছে তাঁর লেখনি, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে তাঁর কণ্ঠ। এই অত্যাচার অবিচার প্রতিরোধ করে যাঁরা জীবন দান ও জীবন বিপন্ন করেছেন সেই সব বিপ্লবীদের তিনি দিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন ও অফুরন্ত দরদ। রবীন্দ্র নাথ কেবল-মাত্র দার্শনিক ও কবিই ছিলেন না, বিপ্লব প্রচেষ্টায় যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের প্রতি তাঁর দরদ ছিল অফুরন্ত সেজন্য ভয়ভীতির বা রাজরোষের তোয়াক্কা করতেন না।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রসংগ ঃ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নির্ব্বাচন-'৮২

—মলয় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে এই রাজ্যের ভোটারদের মধ্যে একটি পরিষ্কার রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে অনুসরণ করার প্রবণতা দেখা গেছে, যাকে ইংরাজীতে সম্ভবতঃ পোলারাইজেশন বলা যায়। মানুষ স্পষ্টতঃই রাজ্যের প্রধান দুটি পরস্পরবিরোধী দলকে বেছে নিয়েছেন—আরও অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের মধ্যে, ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে সমর্থন জানিয়েছেন প্রধানতঃ এই দুটি দলকেই। রাজ্যের ক্ষমতাসীন সি পি এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট এবং বিরোধীপক্ষে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের মধ্যে নির্বাচনে আসন ভাগাভাগী হয়েছে, ৭৭-এর দিগ্বিজয়ী জনতাদল, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রমুখ ফ্রন্ট বহির্ভূত দলগুলি একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারে নি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দলগুলির প্রার্থীদের জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়েছে—এসবের মধ্যে দিয়ে এই ব্যাপারটিই স্পষ্ট হয়েছে যে অনেকগুলি দল নয়, সরকার গঠন ও শক্তিশালী বিরোধী পক্ষে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য রাজ্যের প্রধান দুটি ফ্রন্টই যথেষ্ট বলে জনগণ মনে করেছেন—যা রাজনৈতিক ভাবে তাঁদের পরিণত ও দূরদর্শী চিন্তারই প্রকাশ ঘটায়।

পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলগুলিতে, বিশেষতঃ কলকাতা শহরে কংগ্রেস উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেছে। গ্রামাঞ্চলে সি পি এম তথা বামফ্রন্টের একাধিপত্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

লাভ লোকসানের হিসাবে, এবারের ভোটে বামফ্রন্টের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, কংগ্রেসের ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। বামফ্রন্ট খাস কলকাতার বুকে মূল্যবান ১১টি আসন হারিয়েছে, তাঁদের ৬ জন পূর্ণমন্ত্রী ও বিধানসভার চীফ হুইপ্ পরাজিত হয়েছেন, কলকাতার বাইরেও ৭৭ এর তুলনায় তাঁদের বেশ কয়েকটি আসন হারাতে হয়েছে, সর্বোপরি যেসব আসনে বামফ্রন্টের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন, তার কয়েকটি ছাড়া, অধিকাংশ কেন্দ্রেই বিরোধীপক্ষের প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় বামপন্থী ভোটের মার্জিন ৭৭ এর তুলনায় অনেক কমেছে। যদিও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান হিসাব দিয়েছেন যে এবারে তাঁদের ফ্রন্টের পক্ষে মোট ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ভোট বেশী পড়েছে, বাস্তব অবস্থা কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।

বামফ্রন্টের এই বিপর্যয় অপ্রত্যাশিত হলেও কংগ্রেসের ক্ষতি, অন্ততঃ রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহলের কাছে, অভাবনীয় ছিল না। গত পাঁচ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের অসংখ্য ব্যর্থতা, আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি, শহর ও গ্রামাঞ্চলে নির্লজ্জ দুর্নীতি, ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পবিরোধ, শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য ও দলবাজী প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর হাতে হাত মিলিয়ে সোনার বাংলা গড়ে তোলার আহ্বান কংগ্রেসের নির্বাচনী পালে অনুকূল হাওয়ার সঞ্চার করে,

কিন্তু একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কালক্ষেপ, দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও প্রার্থী নির্বাচনে একদেশদর্শীতা প্রভৃতির ফলে এই রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠন সেই অনুকূল হাওয়াকে কাজে লাগাতে পারলো না। ভোটার লিষ্টে কারচুপীর অভিযোগ নিয়ে প্রথমে হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করতে গিয়ে শুধু সময় নষ্ট হয়নি, সংগঠনের সর্বস্তরে নির্বাচন হবে কি হবে না এই নিয়েও কর্মীদের মধ্যে একটা সংশয় ও তার ফলে নির্বাচনের প্রাথমিক কাজকর্মে ছেদ পড়ে।

নির্বাচন কমিশন চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করার পরেও যে সময় হাতে ছিল, প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে টালবাহানা ও দিল্লী কলকাতা টানা-পোড়েনের মধ্যে দিয়ে তার অনেকটাই অতিবাহিত হয়। দলে দলে কংগ্রেস কর্মীরা বিভিন্ন জেলা থেকে নিজেদের পছন্দমতো প্রার্থীর স্বপক্ষে অথবা ওপরতলার মনোনয়ন প্রাপ্ত প্রার্থীর বিপক্ষে দরবার করতে প্রথমে প্রদেশ অফিস ও পরে দিল্লী পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ীতে যে মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন, নির্বাচনী কাজকর্মে সেই সময়টুকু দিলে কংগ্রেস এই রাজ্যে আরও অনেক ভাল ফল করতে পারতো। এছাড় গত পৌরসভা নির্বাচনে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতির একটি অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্তের ফলে একতরফাভাবে কংগ্রেস নির্বাচন বয়কট করায় গ্রামাঞ্চলে তার সংগঠন শেষ হয়ে গেছে।

পৌরসভা নির্বাচনে সেই সময় কংগ্রেস যদি অংশ গ্রহণ করতো রাজ্যের গ্রামাঞ্চলগুলিতে অন্ততঃ কিছু আসন অবশ্যই পেতো এবং সেইসব আসনকে কেন্দ্র করে গ্রামের সংগঠনকে পরবর্তী নির্বাচনে কাজে লাগানো যেত। শহরতলী ও গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের ভরাডুবি প্রধানতঃ পৌরসভা নির্বাচন বয়কটের অবশ্যম্ভাবী ফল বললে অত্যুক্তি হবে না।

কয়েকটি কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকারী প্রার্থীর বিরুদ্ধে বেসরকারী কংগ্রেস প্রার্থী নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। যদিও পলিটিক্যাল পোলারাইজেশনের ফলে এঁদের প্রাপ্ত ভোট তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু জনতা প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে এই সংখ্যা যুক্ত হলে যা দাঁড়ায় রাজ্যের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে শুধুমাত্র সেই স্বল্প ভোটের ব্যবধানেই কংগ্রেস প্রার্থীরা বামফ্রন্টের কাছে পরাজিত হয়েছেন। অতএব বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রার্থীদের জন্য অথবা জনতার সঙ্গে আসন সমঝোতা না হওয়ার ফলে কংগ্রেসের কিছু আসন নষ্ট হয়েছে, এমতকে অস্বীকার করা যায় না।

দলীয় প্রার্থী নির্বাচনে কর্মীদের মতামত ও পছন্দকে প্রাধান্য না দিয়ে একাধিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত স্বার্থে অযোগ্য ও অপরিচিত প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার ফলেও এই রাজ্যে কংগ্রেস বেশ কিছু আসন হারিয়েছে। সর্বোপরি, রাজ্যের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট গত চার বছরে অতি সন্তর্পণে কিন্তু নিশ্চিতভাবে নির্বাচন মেসিনারীকে যেভাবে কবজা করেছে; ভোটার তালিকা প্রণয়ন থেকে শুরু করে প্রদত্ত ভোট গণনা ও চূড়ান্ত ফলপ্রকাশ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে দলীয় কর্মী ও দলগত স্বার্থের যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, তার মোকাবিলা করা অন্ততঃ বর্তমান রাজ্য কংগ্রেসের ভাঙাচোরা নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব নয়, মানুষের বিক্ষোভ ও হতাশা পুঞ্জীভূত হওয়া সত্ত্বেও বামফ্রন্টের হাত থেকে আরও অধিক সংখ্যক আসন ছিনিয়ে নেওয়া যার জন্য সম্ভব হয়নি।

শহরাঞ্চলে কংগ্রেসের সাফল্য প্রধানতঃ মধ্যবিত্তের সমর্থনজাত বলে অনেকে মতপ্রকাশ করেছেন,

বিদ্যুৎ বিভ্রাট, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, পরিবহন সমস্যা ও আইন শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি নাকি মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে বামফ্রন্ট থেকে জাতীয়তাবাদী করেছে। কথাটা আংশিকভাবে হলেও পুরোপুরি ঠিক নয়। শুধুমাত্র মধ্যবিত্তের সমর্থন কোন একটি রাজনৈতিক দলের জয় বা পরাজয়ের পক্ষে একটি অন্যতম ফ্যাক্টর হলেও তাকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে না। কোন কোন অত্যুৎসাহী রাজনৈতিক প্রতিবেদক আবার শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত ভোটারদের একটি বিশেষ অংশকে দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ক্রমাগত বাম ও বিরোধীফ্রন্টের পক্ষে আন্দোলিত হতে দেখেছেন এই ভোটাররা নাকি হিসাবকষে প্রতিঅল্টারনেট নির্বাচনে যথাক্রমে বাম ও বিরোধীপক্ষকে সমর্থন করেন কোন কারণ ব্যতিরেকেই।

মানুষের অর্থাৎ ভোটারদের মনোজগতের এই প্রকার জটিল বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়েও সাধারণ ভাবে বলা যায়—পরিবহন সমস্যার অবনতির জন্য যদি মহম্মদ আমিনের পতন হয়, সক্রিয়তা যদি অশোক মিত্রের পরাজয়ের কারণ হয়, শিক্ষায় নৈরাজ্য যদি পার্থদের পতন ঘটায় কিংবা খাদ্যসরবরাহে ব্যর্থতা যদি সুধীনকুমারকে বিপদে ফেলে তবে চরম বিদ্যুৎ সংকটের জন্য দায়ী বিদ্যুৎমন্ত্রী জ্যোতি বাবুর পরাজয় হলো না কেন?

অপদার্থ মৎস্যমন্ত্রী বা ব্যর্থ স্বাস্থ্যমন্ত্রী জিতে এলেন কিভাবে? সরকারী কোন মন্ত্রকের সাফল্য ব্যর্থতার দায় সেই বিভাগের মন্ত্রীর উপর পড়লেও প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই তার জন্য মূলতঃ দায়ী যেহেতু দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কোন মন্ত্রী ইচ্ছা থাকলেও পা বাড়াতে পারেন না অথবা বাড়াতে গেলে বাধা পান। যেমন হয়েছিল পঞ্চায়েতমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে, পঞ্চায়েতে দুর্নীতি নিয়ে সেল গঠন করতে গিয়ে তাঁকে স্বয়ং বামফ্রন্টের চেয়ারম্যানের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

আসলে, প্রকৃত ভোট যেখানে বেশীপরিমাণে পড়েছে যেখানে মানুষ সাহসে বুক বেঁধে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন, কংগ্রেস প্রার্থী যেখানে নিজের জোরে, সুনামে, জনপ্রিয়তায় অথবা শক্তিশালী সংগঠনের সহায়তায় নির্বাচন লড়েছেন এবং প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে যেখানে খুব একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়নি, সেখানে কংগ্রেস জিতেছে। কলকাতার ১১টি কেন্দ্র, ২৪ পরগণার সত্যরঞ্জন বাপুলী, হুগলী সিঙ্গুরের ভারাপদ সাধুখাঁ, বীরভূমের সুনীতি চট্টরাজ, মুর্শিদাবাদের ৭টি কেন্দ্র, মালদার ৬টি আসন প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আরামবাগে সি পি এম এর ওপেন মাস্‌লিং, ভীতি প্রদর্শন ও সন্ত্রাস সৃষ্টির মধ্যেও সেখানকার মানুষ কংগ্রেসকে দুটি সীটে জয়ী করেছেন, অন্যদিকে একচেটিয়া সংগঠনের জোরে, তাঁবেদার সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায়, ভোটের মুখে মুখে মুক্তহস্তে দান খয়রাতি ও উদার প্রতিশ্রুতির মোহজাল বিস্তার করে এবং সর্বোপরি পরিকল্পিত পথে আতংক ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে, একাধিক জেলায় ও কয়েকটি শহরাঞ্চলেও বামফ্রন্ট তার আধিপত্য বজায় রেখেছে।

জাতীয়তাবাদী মানুষ স্বাধীন মতপ্রকাশে সক্ষম হননি অথবা বিরত থেকেছেন—নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে—শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী সংগঠনের অভাবকে অনুভব করে। মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নবিত্তের প্রশ্ন নয়, শুধুমাত্র অস্তিত্বরক্ষারপ্রশ্নে বামসন্ত্রাস কবলিত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের পক্ষে নেতীবাচক ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা সম্পর্কে দু-চার কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভুয়া ভোটার তালিকার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আদালতের দ্বারস্থ হওয়া, ৮ লক্ষ ভুয়া ভোটারের তালিকা দান ও তদন্তের দাবী প্রভৃতি বিষয়ে নির্বাচন কমিশন যে অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছিলেন, নির্বাচনের দিন স্থির করা নিয়ে তাঁরা যে নিয়মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। ঠিক সমভাবে বিকারযোগ্য এই নির্বাচনে ব্যাপক দুর্নীতি ও নির্বাচন কর্মীদের সরাসরি যোগসাজসের তথ্যগত অভিযোগ সম্পর্কে তাঁদের আশ্চর্য উদাসীনতা, তাতারে কংগ্রেস প্রার্থীকে নির্বাচনী প্রচারে বাধাদানের ঘটনা অথবা মালদহে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবমাননার ঘটনাকে তাঁরা গুরুত্বই দেননা। হুগলীর চাঁপাদানীতে একাধিক ব্যালট বাক্স কেন সীলভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায়, চন্দননগরে পোলিং এর সময়কার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ও কাউন্টিং এর সময়ে প্রাপ্ত ভোটের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ বর্দ্ধিত ভোটের ব্যবধান কিভাবে হয়, জগদ্দলের একটি বুথে ভোটকর্মীদের কেন সি পি এম কর্মীদের লাঞ্ছনা ও বোমাবাজির মুখে পড়তে হয়, নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও ভোটের দিন পর্যন্ত কেন সরকারী গাড়িগুলিকে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের হয়ে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়, নির্বাচনী সংবিধান বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রীরা কেন ভোটের ৪৮ ঘন্টা আগে পর্যন্ত নির্বিচারে প্রতিশ্রুতি দিতে থাকেন, বলাগড়ের ব্যালট পেপার যা নাকি সরকারী প্রেসের ওয়েস্টেজ ছিল কিভাবে কঠোর প্রহরা সত্ত্বেও বাইরে আসে, প্রচুর ডুপ্লিকেট ব্যালট পেপারের অস্তিত্ব সম্পর্কে কাগজে সংবাদ বেরোলেও তা নিয়ে কেন তদন্ত হয় না—ভোটের আগের থেকেই বিরোধী পক্ষের নেতা ও কর্মিদের উপর অসংখ্য হামলার ঘটনা প্রমাণ সহযোগে উপস্থাপিত করলেও নির্বাচন কমিশনের কাছে গুরুত্বলাভ করেনা কেন, অধিকাংশকেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা শতকরা ৫০—৫৫ ভাগ থেকে কিভাবে ৮০-৮৫ ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত হয়, এসব প্রশ্নের কোন উত্তর রাজ্যের নির্বাচক মণ্ডলীর পাবেন না। বরং সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ (?) নির্বাচনে সামিল হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন তাঁদের অভিনন্দন জানাবেন।

'৮২ এর নির্বাচন তাই রাজ্যের মানুষের কানে নতুন কোন আশার বাণী শোনাতে পারে নি। বামফ্রন্ট এই নির্বাচনে আরও পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতা দখল করেছে। শতকরা প্রায় ৮০টি আসন লাভ করে বামপন্থার লাল দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে জনসমর্থনের চড়া রঙ তাঁরা বজায় রেখেছেন। বাম সমর্থকদের তুমুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনে শুধু কাঁটার মতো বিঁধছে একটা প্রশ্ন—এই নির্বাচন যদি বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় না রেখে রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধানে হতো, তাহলেও কি ফলাফল একই হতো? জনসমর্থন যদি সত্যিকারের থাকে, তাহলে জোরের সঙ্গে বলা যায়, নিশ্চয়ই একই হতো—বামফ্রন্টের নেতারাও তাই বলবেন। এবং তখনই প্রশ্ন জাগে, তাহলে আপনারা ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করার জন্য এতো ব্যগ্র হলেন কেন? সেকি শুধুমাত্র ১৯৫৭ সালে বিধান রায়ের সরকারাধীন নির্বাচনকে সাক্ষী রাখার তাগিদে, না অন্য কোন উদ্দেশ্য এর পেছনে কাজ করেছিল আপনাদের মনে কি এই সন্দেহ ছিল যে, সরকারী ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন না করতে পারলে, প্রশাসন ও পুলিশকে দলীয় স্বার্থে পরিচালিত করতে না পারলে এবারে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া যাবে না? '৮২ এর নির্বাচনে জনমনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আপনারাও কি সংশয়মুক্ত ছিলেন না?

———

ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ মিমাংসা

—কালীপদ সরকার

গত ১৭ই মে থেকে চারদিন দিল্লিতে ভারত ও চীনের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা হয়ে গেল তাতে সীমান্ত বিরোধের মীমাংসার কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে উভয় পক্ষই তাদের অভিমত শান্তভাবে প্রকাশ করেছেন এবং একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী অধিবেশন বসবে পিকিংএ, তখন আরো আলাপ আলোচনা হবে। দুটি দেশের মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপনে সীমান্ত বিরোধই যে প্রধান বাধা দুদেশের প্রতিনিধিবর্গই সে কথা স্বীকার করেন।

বিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬২ সালের চীন ভারত সীমান্ত যুদ্ধের পর এই প্রথম চীন সরকার সীমান্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি জটিল। একটি দুটী অধিবেশনে সমস্যা সমাধান হবে এ আশা কেউই করেন না, আবার বিরোধটা অনন্ত কাল অমীমাংসিত পড়ে থাকে, এ অবস্থাও এশিয়ার দুই বৃহৎ রাষ্ট্র তথা সমগ্র এশিয়ার পক্ষে কল্যানকর নয়।

চীন কর্তৃক অধিকৃত ভারতীয় ভূ খণ্ড ভারতকে প্রত্যার্পণ এবং উত্তর পূর্ব্ব ভারতের কিছু অঞ্চলের ওপর চীনের দাবি প্রত্যাহার হল সীমান্ত বিরোধ নিরসনের মূল শর্ত। এ দুটি শর্ত পূরণ হলে নতুন করে সীমান্ত চিহ্নিত করণ পরবর্তী পদক্ষেপ। এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব না নিয়ে, উভয় পক্ষেরই উচিত উদার ও সংবেদনশীল নীতি গ্রহণ। চীনের সহিত বার্মার সীমান্ত চীন ম্যাকমোহান লাইন অনুসারে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, অথচ ভারত—চীন সীমান্ত নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে চীন ম্যাকমোহান লাইন স্বীকার করতে চায় না। যতদিন তিব্বত স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল ততদিন ভারতের উত্তর সীমান্ত নিরাপদ ছিল। তিব্বত ম্যাকমোহান লাইন সম্পর্কিত চুক্তির সাক্ষরকারী ছিল। সীমান্ত নিয়ে তাই উত্তাপ হয় নি এবং বাফার ষ্টেট রূপে তিব্বত ভারত ও চীনের মধ্যে শান্তির প্রাচীর গড়ে রেখেছিল। চীন কর্তৃক তিব্বত অধিকারের পরই সীমান্ত বিরোধ ঘটেছে। চীন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে।

অবস্থা জটিলতর হয়েছে ভারত বিভাগের কারণে পাকিস্থান ও বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রই ভারতকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে চীনের সাহায্য চেয়েছে এবং প্রকারান্তরে চীনের সম্প্রসারণ বাদের শিকার হয়েছে। চীন সেই সুযোগ কাশ্মীরের তথা ভারতের আকছাই চীন অক্সল পাকিস্তানের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে এবং নির্বিঘ্নে কারাকোরাম সড়ক তৈরী করে পাকিস্থানে প্রবেশের পথ প্রস্তুত করেছে। মিত্রতার প্রশ্রয়ে চীন এখন করাচী বন্দরপর্যন্ত অনায়াসে যেতে পারে।

অন্যদিকে চীনের লক্ষ্য উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অঞ্চল অধিকার করে বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছানো। চীন চায় ভারত মহাসাগরে তার নৌ—শক্তির উপস্থিতি উত্তর—পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে অশান্তি ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করে চীন ওই অঞ্চলগুলিকে মূল ভূ—ভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের প্রভাবে আনতে চায় আসামের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের প্রকাশ্য রূপ বিদেশী বিতাড়ন হলেও, আন্দোলনের গোপন লক্ষ্য বিচ্ছিন্নতাবাদ। আসাম আন্দোলনের পিছনে বিদেশী হাত নেই এমন কথা কেউ হলপ করে বলতে পারেন না। নাগা মিজো, মনিপুরী বিদ্রোহীদের সামরিক শিক্ষা ও

অস্ত্রসরবরাহের ব্যাপারে চীনের যোগ সাজসও অবিদিত নয়।

আমাদের দেশে বেশ কিছু সংখ্যক চীনাপন্থী আছেন। তাঁরা প্রায়ই ভারত সরকারকে চীনের সহিত বিরোধ মিটিয়ে নেবার জন্য চাপ দেন কিন্তু পরিস্থিতির সার্বিক মূল্যায়ণ করতে চান না। চীনের সাম্প্রতিক আগ্রহ যে বর্তমান আন্তর্জাতিক কূট তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া নিয়ে দুই বিশ্ব—শক্তির মধ্যে যে উত্তেজনা ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে তাতে চীন কি ভূমিকা নেবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত চীন ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে। চীন পাকিস্থানকে নিয়মিতভাবে সামরিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে।

মৈত্রী গঠনের অভিলাষ চীন আসলে ভারত সোভিয়েত সম্পর্কে ফাঁটল ধরাতে চায় কিনা তাও বিশদ সমীক্ষার দাবি রাখে। ভারতকে নির্বান্ধব করতে পারলে তাকে মার্কিনী জোটের প্রভাবে আনা সম্ভব এ ধারণা যুক্তিহীন নয়। ভারতের চীনাপন্থীরাও তাই চান।

ভারত—সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি যদিও কোন দেশের বিরুদ্ধাচরণ নয়, তবু কিছু রাষ্ট্রের নিকট চুক্তিটি চক্ষুশূল। তাই নানা-ভাবে চুক্তিটির গুরুত্ব হ্রাসের চেষ্টা অব্যাহত আছে। দুই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আলাদা হওয়া সত্বেও, উভয় দেশ একে অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলায় এবং বৈদেশীক নীতিতে শ্রদ্ধাশীল স্বাধীন মনোভাব পোষণ করায়, ভারত—সোভিয়েত চুক্তি কেবল কাল পরীক্ষা উত্তীর্ণই নয়, মানবজাতির শান্তিময় ভবিষ্যতের দিশন্ত উন্মোচন করেছে।

সুতরাং ভারতের পররাষ্ট্রনীতির এই মূল্যবান সংগ্রহকে অক্ষুন্ন রেখে চীন ভারত মৈত্রী প্রস্তাব বিচার্য—এ কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা আবশ্যক।

তিব্বতের কি কিছুই বলার নেই? তিব্বত কি চিরদিন চীনের একটি প্রদেশ হয়েই থাকবে? লিপি-মালা, ভাষা এবং সংস্কৃতিতে তিব্বত চীন থেকে স্বতন্ত্র। ত্রিশ বছর পরেও তিব্বতীরা তাদের স্বাতন্ত্র্যের জন্য লড়াই বন্ধ করেন নাই। রাষ্ট্রপ্রধান দালাইলামা এখনো দেশান্তরী, তিনি আশা রাখেন স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের। চীন এবং ভারত হয়ত তিব্বতের কথা ভুলেই গেছে। ভুল একদিন ভাঙবে।

এ ব্যাপারে তিব্বত কিছু না বললেও, দূর থেকে সতর্কধ্বনী ঝেড়েছেন তাইওয়ানের জাতীয়তা-বাদী চীন সরকার। তাইওয়ান বলেছে, "সীমান্ত নিয়ে ভারত—চীন চুক্তি হলে তাইওয়ান তাকে স্বীকৃতি দেবে না। কারণ চীন কমিউনিস্ট শাসকরা একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী চীনা জনগণের প্রতি-নিধিত্বের কোন অধিকার তাদের নেই"। বারুদের কাঁকুড়ের তের হাত বীচি।

সীমান্ত প্রশ্ন নিয়ে মিমাংসার দিকে এগোতে না পারলেও, ব্যবসা বানিজ্য ও প্রযুক্তি বিদ্যার আদান প্রদান নিয়ে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে তাকে ফলপ্রদ বলা যায়। চীন বিদেশমন্ত্রী হুয়াংহুয়া ভারতের বিদেশমন্ত্রী নরসিংহ-রাওকে পিকিং সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, রাও নীতিগত ভাবে তা গ্রহনও করেছেন। আলোচনা আলাপের দরজা মুক্ত হোক, একে অপরকে আরো বেশি করে জানুন, আরো বেশি করে বুঝুন এবং তার মাঝ দিয়েই মীমাংসার সূত্র একদিন উদ্ভাষিত হওয়া সম্ভব।

———

Chakraborty Smt Chhaya w-o Late Sailendra Nath, Parbakglous

Chakraborty Smt Debi Fulrirani w-o Late Debendra Nath Chakraborty, Barasat

Das Smt Labonya Prova w o Late Benoy Krishna Das, Halisahar

Das Smt Santisudha w-o Late Ganesh Chandra, Asokenager

Dey Kulachandra P. 51 Cosenagar Modhyamgram

Dey Manoram w-o Late Manindra Chandra Hospital Road, Habra

Guha Smt Kiron Prova w-o Late Narayan Chandra A 193 H. B. Town Road No. 5

Dist—Midnapore

Banerjee Smt Namita w-o Late Ajit Kumar, Maheshri Secondari

Bera Panchanan Rajarampur, Shibramnagar

Ghorai Smt Shantibala w-o Late Sital Chandra, Bandabanchak

Jana Bansari Mohan Rampur, Palaspai

Jana Git Gobinda Daltmbachak, P. O. Kumarpur

Maity Bhabataran

Mama Jitendranath Anantapur, Naba Anantapur

Dist—Hooghly

Bandopadhyay Smt Bina w-o Late Benoyendra Nath 14 Sarat Chatterjee Rd., Hooghly

Ghosh Smt Bijoli w-o Late Jana

Goswami Smt. Priyabala w-o Lat Satchidananda 41 Surya Sen Street, Konnagar

Dist—Nadia

Das Gupta Naresh Chandra Polki Road, Krishnanagar

Sen Smt Kanak Prova w/o Late Rameshchandra Dearapara. Nabadwip

Dist—Jalpaiguri

Pandit Smt Nivarani w-o Late Dhiren Pandit, Debinagar (Jalpaiguri)

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—ডাক ১৫.০০ টাকা
বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা
মূল্য—৩০ পয়সা

30

9 JUN

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চাটার্জী
শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ধীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির—২.০০, ৪। সৌদাগী সংগ্রাম [illegible]—১.০০, ৫। চাকোরী শচীন্দ্রনাথ—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার [illegible] গ্রাম কাহিনী—.৪০; রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—১০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রাম ও খেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১০। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, দেশ বাঙ্গের ছোরেনি (১)—১.০০, দেশ বাঙ্গের ছোরেনি (২)—১.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। রাজিব হত্যা প্রচেষ্টা—.১৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৫০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

নৈহাটী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ৪ঠা আষাঢ় ১৩৮৯ ১৯ই জুন ১৯৮২	৩৭ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

একজন আধ্যাত্মিক মহামানব সৃষ্টি করিবার জন্য কোটি কোটি মানুষকে বলি দিয়া লাভ নাই। যদি কোটি কোটি মানুষকে নিষ্পেষিত করিয়া একজন আধ্যাত্মিক মহামানব সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা অন্যায়। বরং মুক্তির জন্য একজন মহাপুরুষের দুঃখ ভোগ শ্রেয়ঃ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রসংঘ, আমেরিকা ও মানবকল্যাণ

আরব দুনিয়ায় এবং অন্যত্র যে সব ঘটনা ঘটছে, তার সকল মোকাবিলা না করতে পারলে, তৃতীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিহত করা যাবে না। এবারের যুদ্ধে যে সব মারণাস্ত্রের ব্যবহার করতে কয়েকটি দেশ যে ভাবে প্রস্তুত, তাতে গোটা মানবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া এক প্রকার অবধারিত। অথচ ভেবে আশ্চার্য্যান্বিত হতে হয় পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তির মানসিকতা দেখে। আমেরিকা যুদ্ধের প্রকাণ্ড ঝুঁকি নিয়ে অতীত দিনের অবিমৃশ্যকারী সাম্রাজ্যবাদীর নীতি অনুসরণ করছে এখনও। কিন্তু পৃথিবীর নদীগুলি দিয়ে যে বহু পরিমাণ জল গড়িয়ে গিয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, এ কাণ্ডজ্ঞান আমেরিকার নেই। চিরাচরিত সেই প্রাধান্য লিপ্সা, সে দোষ ত্যাগ করতে পারেনি বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও। ভিয়েৎনামের যুদ্ধে যে আমেরিকা কতটা হতমান হয়েছে, সে শিক্ষা সে ভুলে গিয়েছে। তাই এশিয়ায় আফ্রিকায় আমেরিকা আজো সেই সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে, আজো তার প্রাধান্য বজায় রাখতে কোন কসুর করছে না। আমেরিকার বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়কেরা কি দেউলিয়া বনে গিয়েছে? তাদের অনুসৃতনীতির কি ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাদের দেশের উপর, সেটা বুঝবার মত বুদ্ধিরও কি অভাব ঘটেছে?

বিগত দুটি যুদ্ধে ভৌগলিক অবস্থানের জন্য তাদের দেশের উপর কোন সরাসরি আক্রমণ ঘটেনি সত্য, এবারও ঘটবে না এই ভরসায়ই কি আমেরিকা তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল ও ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার বাস্তবকে গ্রাহ্যই করছে না? যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশলের উন্নতির জন্য, কয়েকটি দেশ বিশেষ করে রাশিয়া যে নিদারুণ আঘাত হানবার শক্তি অর্জন করেছে, সে সম্বন্ধে অন্ধ থাকলে নিজেদের ধ্বংসকেই ডেকে আনবে আমেরিকা, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি শুধু দুর্বোধ্যই নয়, সেটা চপলমতির পরিচায়কও বটে। এক এক দেশের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের নীতি তারা অনুসরণ করছে। ভারতবর্ষ পরমানবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও, চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে ইউরেনিয়ম দেওয়া হয়না, অথচ পাকিস্তান এ্যাটম বোমা তৈরী করলেও সাতখুন মাপ। যে কয়েকটি দেশ পরমাণু শক্তিধর হয়েছে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবে না, অথচ অন্য কোন দেশ পরমাণু শক্তিধর হতে চাইলে, তাকে সর্বতোভাবে দুর্বল রাখার জন্য, সে কাজে বাধা দেওয়া হবে. এমন হাস্যকর নীতির প্রবর্তনের কথা কেউ কখনও শোনেনি, মেনে চলা তো দূরের কথা। অথচ এই আমেরিকাই অন্যদেশে নাক গলিয়ে তাদের এইসব অস্ত্র দিচ্ছে। পাকিস্তানকে সব রকমে সাহায্য দিয়ে, এমনকি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করার মত অপকর্ম করতেও তার বাধে না এবং সেজন্য বিবেকের কোন দংশন করে না। সম্প্রতি ইজরায়েল যে ভাবে লেবাননের উপর বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়া ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও তার পক্ষে নির্লজ্জ সমর্থন জানাতেও কোনও রকমে লাজিত হয় না, এটা পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকেও ভেটো দিয়ে অকেজো করতে পরাঙ্মুখ হয়না। ইজরায়েলকে

সমর্থন করার পেছনে আমেরিকার যে মনোভাব লুকায়িত, তার বিশ্লেষণ করলেই, আমেরিকার বর্তমান স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

কি উদ্দেশ্যে আমেরিকা একাজ করছে? পশ্চিম এশিয়ায় ইজরায়েলকে হাতে রেখে আমেরিকা একটা শক্ত ঘাটি বানাতে চায়। ইজরায়েলের মারফৎ অস্ত্র ও টাকা পয়সা দিয়ে আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার একনায়কতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, আমেরিকার কংগ্রেসের সমালোচনার সম্মুখীন না হয়ে। এই আমেরিকার গণতন্ত্র বাঁচাবার অদ্ভুত কৌশল। আজ লেবানন সীমান্তে যে যুদ্ধ বিরতির কথা শোনা যাচ্ছে, এটা তাৎক্ষণিক। আমেরিকা এই নাক গলানোনীতি ও সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ত্যাগ না করলে, আবারও যখন তখন যুদ্ধের পুনরাবির্ভাব ঘটবে।

বিগত যুদ্ধের পর যখন বিশ্বরাষ্ট্র সংঘটিত হয়েছিল, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা, পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা লাভকে ত্বরান্বিত করা এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বৃহৎ শক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে তাদের মতামতে না চললেই তাকে পঙ্গু করে রাখছে। এই অপকর্মই অহরহ করা হবে এবং ভবিষ্যতে করা হবে না এমন নিশ্চয়তা নেই। প্রশ্ন জাগে তবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই সংঘকে টুটো জগন্নাথ করে রাখার কি মূল্য আছে?

এই সংস্থার জন্মলগ্নেই রাহুর প্রবেশ ঘটেছিল। মাত্র পাঁচটি দেশকে ভিটো প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তাই তারা প্রত্যেকেই নিজেদের সুবিধামত ভিটো প্রয়োগ করে অধিকাংশ দেশের মতামতকে কাণা কড়িরও মূল্য দিচ্ছে না। এ ব্যবস্থার অবসান ঘটান দরকার অবিলম্বে, যদি এই সংস্থার মারফৎ কোন কাজ করাতে হয়। একশত চল্লিশটি দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে মাত্র পাঁচটি দেশ? এটা কোন স্থাবনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই অবস্থায় কোন দেশের মঙ্গল সাধন করতে পারবে না এই সঙ্ঘ। সঙ্ঘের কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করতে হবে, পৃথিবীর মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এরা কি রাজী হবে? লক্ষণ দেখে মনে হয়, অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, সে পথে এরা চলবে না। বিশ্ব শান্তি কোনদিনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, রাষ্ট্রসংঘের পক্ষে, যদি এই হাল বজায় থাকে। এদের সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রস্তাবগুলি অমান্য করলেও যদি কোন শাস্তিবিধান করার ক্ষমতা না থাকে তার তবে কে মান্য করবে তাকে, বিশেষ করে উস্কানিদাতারা যদি তাদের পেছন থেকে প্রশ্রয় দেয়? কাজেই বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের ভবিষ্যৎ, সম্মান ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে বহু দেশে। লীগ অব নেশনস-এর মত অপমৃত্যু থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচতে হলে, নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে হবে, নতুন করে কার্য্যকরী শক্তি হিসাবে একে গড়ে তুলতে হবে।

এমন একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য যেখানে বসে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বিবাদ বিসম্বাদ আলাপ আলোচনা, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যায়। এর জন্য দুটি ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার। এক, ভিটো প্রয়োগ করার অধিকার কেড়ে নিতে হবে। দুই, এই সংঘের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকারী করার জন্য এদের একটি প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তুলতে হবে, অমান্য করলে অমান্যকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। অন্যথায় এই সংস্থাকে নপুংসকের ভূমিকাই অভিনয় করে যেতে হবে। বিশ্বশান্তি ও বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্নই থেকে যাবে নিরবধিকাল।

বিজয়োৎসব

—প্রঃ বিঃ বাঃ

আঁধারে একলা বসে আছি। মনের আকাশে 'সন্ধ্যার ঘন মেঘমালা'। রাত্রির নিবিড় ছায়া ধীরে ধীরে নামে দুই তীরে। চারিদিকে অসুস্থ পরিবেশ, অমানবিক বাস্তবতা। কেমন এক ভয়ংকর আত্মতুষ্টি প্রতিবাদহীন অসহায়তা। প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হল?

যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখি আগাছার কাঁটাবন। বনস্পতিরা বেঁচে নেই। তাদের দেহ অস্থি মজ্জার ওপর কৃত্রিম সার-মাটি ফেলে চলেছে আগাছার আবাদ। আগাছার জয় জয়কার!

সহসা নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করে বোমা ফাটার বিকট শব্দ কানে আসে। একটানা চলে সে আওয়াজ। বাণ্ড পার্টির ইংরাজি বাজনার সুরও ভেসে আসে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে ওঠে ভয়-জাগানো—চিৎকার যার নাম স্লোগান। বিজয়োৎসব হচ্ছে। কাদের বিজয়? পরাজয় বা হল কাদের? কোন দেশ কে জয় করল?

রাবণ বধের পর রামচন্দ্রকে ঘিরে বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল লংকার সমুদ্র সৈকতে। তার স্মরণ-উৎসব আজও পালিত হচ্ছে সারা দেশ। তারপর অনেক যুগ কেটে গেছে। অনেক যুদ্ধ, অনেক জয় পরাজয় ঘটেছে এই ভারতবর্ষে কিন্তু জনমনে তাদের স্থায়ী ছাপ পড়ে নি। তারা পুঁথির পাতায় ইতিহাস হয়ে আছে শুধু।

কুরুক্ষেত্রের ভয়ানক যুদ্ধে পাণ্ডবরা জয়ী হয়েছিলেন। সসাগরা ভারতের অধিকারও তাঁরা পেয়েছিলেন। সে যুদ্ধজয়ে কিন্তু বিজয়ীর মনে আনন্দের স্বাদ ছিল না। কৃষ্ণকে সামনে রেখে সম্রাট যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গিত অপরাধীর ন্যায় রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেছিলেন।

মৌর্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। কলিঙ্গ যুদ্ধও ছিল রক্তক্ষয়ী বড় যুদ্ধ। যুদ্ধ জয় অশোককে কিন্তু আনন্দদানের পরিবর্তে বিমর্ষ করেছিল। তাঁর যৌবন চিত্ত উদ্বেলিত করে প্রশ্ন জেগেছিল সেদিন, যুদ্ধ নয়, রক্তপাত নয়; ভালবাসা, অহিংসা কেন হবে না দিগ্‌বিজয়ের পন্থা?

তারপর, শক-হুণ দল-তুর্ক-মুঘল-রাজপুত-মারাঠা শিখ অভ্যুদয় পতন কালস্রোত পার হয়ে এসে দাঁড়াই পলাশী প্রাঙ্গনে। পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল ইংরাজ বণিক দল অপ্রত্যাশিত ভাবে কলিকাতায় বিজয়োৎসব করেছিল তারা মহানন্দে, ভারতবর্ষে সম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন নিয়ে। ইংরাজদের সেই বিজয়োৎসবের শরিক হয়েছিল তাদের ভারতীয় তাঁবেদার-মোসাহেবের দল। তখন মুর্শিদাবাদে মীরজাফর নেশায় বুদ হয়ে বাইজীর নাচ উপভোগ করছিলেন, আর বাংলা বিহার ওড়িষ্যার নবাবীর খোয়াব দেখছিলেন।

তারপর, প্রায় দুশো বছর পরে নয়া দিল্লিতে আর একটা বিজয়োৎসব হয়েছিল যার নাম স্বাধীনতা উৎসব। এ উৎসবের আনন্দেও উষ্ণতা ছিল না। দেশবিভাগ জনিত বেদনা ও দুর্ভাবনা নেতৃবৃন্দের মনকে বিষাদ ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। আর যিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখ্য নায়ক এবং ভারতাত্মার প্রতীক, সেই গান্ধীজী তখন উৎসব সমাবেশে অনুপস্থিত। দেশের এক প্রান্তে ভূমিতলে মানুষের বসে তিনি আত্মসমীক্ষার দুঃখ সাগরে মগ্ন।

আর একটা বিজয়োৎসবের কথা মনে পড়ল। সে উৎসব হয়েছিল সৃষ্টির আদিযুগে। বৃত্রাসুর

স্বর্গ অধিকার করে উৎসব করেছিলেন নন্দন কাননে। দৈত্যগণ সেদিন দেবতাদের গড়া স্বর্গভূমিকে উন্মাদ কল কোলহলে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। বৃত্রাসুর ইন্দ্রাণী শচীকে ধরে এনে অসুর সম্রাজ্ঞীর দাসীত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর কি হল সে কথা সবারই জানা।

'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'।

অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে, রাত্রি গভীর। নিদ্রাহীন দুই চোখ। আলোকে যা দেখা যায় না, অনেক সময় অন্ধকারে তা স্পষ্ট দেখা যায়। বোমা ফাঁটার শব্দ এখনো চলেছে। এই যে বিজয়োৎসব হচ্ছে, ঘণভার জর্জরিত রাজকোষের অর্থে মহোচ্ছব লাগানো হয়েছে, তার পরিণাম ফল কি, কি তাতে লাভ হবে? জন সাধারণ কি চোখে তাকে দেখবে? মানুষের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা সত্যি দুর্বোধ্য।

পূর্ত মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী বলেছেন, রাজনীতিকের জীবন অভিনয় বিশেষ। কথাটি যতীনবাবুর বহু সহজ সত্য ভাষণের মতই বর্ণে বর্ণে সত্য। স্বয়ং শেকসপীয়রই বলেছেন, 'World is a stage; রামরাজ্যের বিজয়োৎসবও তাই একটি অভিনয়। 'Full of sound and fury, signifying nothing.' নির্বাচনী জয় যদি কারচুপি মুক্ত হত, তবুও তো তাকে একটা ইতিবাচক ঘটনা বলা যেত। তা যখন নয় তাহলে তা নিয়ে এত ঘটা কেন?

মঞ্চের সামনে যখন হাজার হাজার দর্শক অভিনয় দেখেন তখন তারা মনে করেন যা দেখছি সবই সত্য, সবই অভিনব। দর্শকের এই মন হারানো ভাব অভিনেতাকে তৃপ্তি দেয়, সাফল্যের কল্পনায় উল্লসিত করে। কিন্তু তারপর? যাত্রার পালা শেষ হলে ঘরে ফিরতে ফিরতে অনেক দর্শকই হর্ষ পুলক রোমাঞ্চের অভিজ্ঞতা ভুলে যায়।

রাত্রি অনেক বেড়েছে। চোখে ঘুমের পরশ। বোমার শব্দ সঙ্গীত নৃত্যের হৈ উল্লাস স্তিমিত প্রায় অন্ধকার কেটে গেছে, আকাশ ভরে নেমেছে চাঁদের আলো। আগাছা বনে জোনাকির আলো মিট মিট করছে। মাটি চাপার নীচে বিদেহী বনস্পতিদের দীর্ঘনিঃশ্বাস পতনের অস্ফুট শব্দ। অনেক দূরে তেরোনার রাজপথে ফ্রানসিসক্যান খ্রীষ্টীয় ফকির লরেন্স যেন এখনো বলে চলেছেন—

"These violent delights have
violent ends,
And in their triumph die, like
fire and powder,
Which as they Kiss Consume."

—Romeo And Juliet.

———

সাগরে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়

—সাধন সরকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া শেষ পর্যন্ত সেই বহু বিতর্কিত গণ-বিধ্বংসী সর্বাধুনিক অস্ত্র নিউট্রন বোমা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রকাশ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই হয়ত উভয় রাষ্ট্রই নিউট্রন বোমা তৈরি করে ফেলেছেও। এই বোমার ধ্বংস ক্ষমতা একটু ভিন্ন ধরনের। ২ থেকে ৩ কিলোটন টি-এন টি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নিউট্রন বোমা নিক্ষেপের ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার সকল প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কোন গতিকে যারা বেঁচে যাবে তারা অত্যন্ত যন্ত্রণাময় এক ভোগান্ত মৃত্যুর শিকার হবে। তবে এই বোমা শুধু জীবন ধ্বংস করবে, বৈষয়িক সম্পদ নষ্ট করবে না।

তিন বছর ধরে নিউট্রন বোমা নিয়ে বিশ্বের নানা-স্থানে আলোচনা হয়েছে। কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষ এই বোমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে কিন্তু শেষে দেখা গেল কোন যুক্তিই মেনে নিল না দুই বিশ্বশক্তি। কে আগে তৈরি করেছে এবং কে প্রতিরোধের প্রয়োজনে তা পরে তৈরি করেছে—সে বিতর্কের মীমাংসা এ ক্ষেত্রে অসম্ভব।

এ সত্য ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, আগামী দিনে কোন বৃহত্তর যুদ্ধে আক্রমনকারী ও আক্রান্ত উভয়ই জয়ী হবার জন্য আণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করে ক্ষান্ত হবে না এবং তখন নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে বিশ্বব্যাপী ধ্বংস কাণ্ড ঘটার সম্ভবনা দেখা দেবে। এ সম্পর্কে স্টকহোলম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিট্যুটের প্রধান বলেছেন: সঠিক ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করে, নিউক্লিয়র যুদ্ধকে গ্রহণযোগ্য ও জয়-লাভের উপযোগী করে তোলা যেতে পারে—এ ধারণা রীতিমত বিপজ্জনক, এমন কি অসম্ভব।

সীমাবদ্ধ নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহার করার কথা যারা বলেন তাদের যুক্তি খণ্ডন করে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিশেষজ্ঞ মি: র‍্যান্ডি সক্লাইডার বলেছেন যে, এ ধারণাটা নিতান্তই অলীক। নিউক্লিয়ার যুদ্ধ শুরু হলেই তার ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধির পথে কোন বাধা থাকবে না। যারা বলেন, নিউট্রন বোমাকে সীমিত ক্ষমতা করে প্রচলিত অস্ত্র শস্ত্রের সঙ্গে সম স্তরে ব্যবহার করা যেতে পারে তাদের যুক্তির পিছনে ও কোন সারবত্তা নেই কারণ বাঁধা ধরা নিয়মে গোলা গুলী ছুঁড়ে যুদ্ধ চালানো যায় না। প্রবাদ বচন হল, "Nothing is urfair in love and war."

দুই বিশ্বশক্তির ভাণ্ডারে যতগুলি আণবিক অস্ত্র মজুদ আছে, তা পৃথিবীর ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট। আগামী কোন মহাযুদ্ধে যদি তার প্রয়োগ ঘটে তাহলে আশংকা কার্যে পরিণত হবে। যদি সেগুলি ব্যবহার না করা হয় তাহলেই বা তাদের কি করা হবে। সমুদ্রে কিংবা জনহীন অঞ্চলে আনবিক অস্ত্রগুলিকে যদি নষ্ট করে ফেলা হয় তাহলেও তাদের তেজস্ক্রিয়তা এমনভাবে পরিমণ্ডল দূষিত করবে যে

প্রাকৃতিক বিপর্যয় অসম্ভাবী হবে। মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি তাকে আজ এমনই এক হুরুহ সমস্যার মাঝে টেনে নিয়েছে।

আণবিক অস্ত্র প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল জাপানে। দ্বিতীয় বার তার ব্যবহার হবে কোথায় তা নিঃসন্দেহে ভাবনার বিষয়, তবে আণবিক সে পরীক্ষা যে অশ্বেত-কায় মানুষদের উপর হওয়ার সম্ভাবনা অত্যাধিক সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার কারণ কম। বর্তমানে পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে যুদ্ধের উত্তেজনা বহমান তাদের মধ্যে ঝটিকা কেন্দ্র হল পারস্য উপসাগর থেকে ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত বরাবর এলাকা। এই এলাকায় একটি বড় রকমের যুদ্ধ বাধিয়ে তোলার সকল আয়োজনই তলে তলে চলেছে এখানকার কোন দেশেরই বর্তমানে আনবিক অস্ত্র নেই, তবে তাদের পিছনে যে সব বৃহৎ শক্তি আছে তারা অণবিক অস্ত্রধর। এই দেশগুলির মধ্যে পাকিস্তান আনবিক বোমা তৈরির কাজে অনেকদূর এগিয়েছে এবং ভারত তার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে। ইজরাইল ও আনবিক বোমা তৈরি করতে হয়ত সক্ষম। অপর দেশগুলি চুপ করে বসে নেই, সেখানেও অনবিক শক্তি গবেষণার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তাহলে ধরে নিতে পারা যায়, সন্নিষ্ট এলাকায় যদি যুদ্ধ বেধেই যায় তবে তা প্রচলিত অস্ত্র প্রয়োগের মধ্যে সীমিত থাকবে না, আনবিক যুদ্ধে পরিণত হবে।

শান্তি চাইলেই শান্তি পাওয়া যায় না। শান্তি বৈঠকে পানপাত্র উত্তোলন করে পঞ্চশীলের মহিমা প্রচার করে গলা ভেজানো গেলেও, দুষ্কৃতকারির মন ভেজানো যায় না। আজকের দিনে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধের নিষ্পত্তি যুদ্ধের মাধ্যমে হয় না, যুদ্ধ কোথাও আঞ্চলিক স্তরে সীমাবদ্ধও থাকে না। প্রকাশ্যে যুদ্ধে অংশ না নিলেও, যুদ্ধরতদের পিছনে চক্রান্তকারী ও অস্ত্র ব্যবসায়ী রাষ্ট্রগুলি ইন্ধন যোগায় এবং যুদ্ধকে করে দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রতিক কালে ইরাক-ইরাণ যুদ্ধ তার এক শোচনীয় দৃষ্টান্ত।

ইরাক ও ইরান কি বোঝে না যে, পরস্পর হানাহানি ও আর্থিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাদের কোন লাভ হবে না। এনে তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষই লাভবান হবে, যাদের সংগে উভয়ের স্বার্থের কোন কোন মিল নেই। কিন্তু যুদ্ধ এমনই এক সর্বনাশ ব্যাপার যাতে জড়িয়ে পড়লে, বেরিয়ে আসা খুবই শক্ত। তবুও বাহুবলের অবস্থান, জবরদস্তি, হুমকি প্রদর্শন এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতার শেষ নেই। এই হল প্রগতির পরিণতি!

নিউট্রন বোমার কথা থেকে অন্যদিকে এসে পড়েছি, আবার বক্তব্যে ফিরছি। রণনীতিবিদরা নিউট্রন অস্ত্র ব্যবহার করার যে পরিকল্পনা করেছেন বিশ্বের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা গুলির পক্ষে তার অর্থ কি হতে পারে তা সহজেই বোধগম্য। এই বোমা বৈষয়িক সম্পদ ধ্বংস করবে না, কিন্তু বৈষয়িক সম্পদ কাদের জন্য? সে কথা কি তারা ভেবে দেখেছেন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিউট্রন বোমা তৈরির সিদ্ধান্ত করার নানা দেশে নানা অভিমত প্রকাশ হয়েছে। ফরাসী সরকার মন্ত্রী চার্লস হেনরু বলেছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই একটি নিউট্রন বোমার পরীক্ষা কার্য সমাধা করেছে। ফ্রান্সও নিউট্রন সমরাস্ত্র নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু মার্কিন সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, এটা একটা বিপজ্জনক পদক্ষেপ। পশ্চিম জার্মানী প্রেসিডেন্ট রেগনের সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সমর্থন

করেছে। ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার বলেছেন—আমেরিকা যে নিউট্রন বোমা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার, এ নিয়ে তাঁর কোন মন্তব্য নেই। সুইডেনের প্রধান মন্ত্রীর অভিমত হল—নিউট্রন বোমা পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিপজ্জনক ভাবে বাড়াবে। জাপানের নাগাসাকিতে ২০টী দেশের ১০৫ জন প্রতিনিধি ও ১১টি আন্তর্জাতিক সংস্থার ১১০০০ মানুষের পরমাণু অস্ত্রবিরোধী সম্মেলনের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিউট্রন বোমা তৈরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া দোস্ত চীন তাবে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিউট্রন বোমা তৈরির সিদ্ধান্তে চীন সন্তোষ প্রকাশ করেছে। চীনের মতে এই সিদ্ধান্ত পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এবং মধ্য ইউরোপে আগ্রাসন প্রতিহত করতে নিউট্রন বোমা ন্যাটো জোটকে শক্তিশালী করবে।

অন্যদিকে মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব কাসপার ওয়েনবর্গার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র নিউট্রন সমরাস্ত্র মজুত করতে উৎসাহী নয় এবং বন্ধুদের সম্মতি ছাড়া সে সাগরপারের কোন দেশ এ জাতের বোমা ব্যবহার করবে না। সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত অস্ত্রশক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই নিউট্রন বোমা তৈরির সিদ্ধান্ত।

পৃথিবীবাসীর কথা হল, সাগরে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কি ভয়।

ফকল্যাণ্ড যুদ্ধ কি শেষ হতে চলেছে

—রাজনৈতিক সমীক্ষক

ফকল্যাণ্ডের দ্বিপাক্ষিক লড়াই সম্ভবত শেষ হতে চলেছে। বৃটেন তার সেনাদলকে ফকল্যাণ্ডের রাজধানী পোর্ট ষ্ট্যানলির উপর আক্রমণ হানতে নির্দেশ দিয়েছে। আর্জেন্টিনার যে সাত হাজার সৈন্য পোর্ট ষ্ট্যানলি রক্ষায় নিযুক্ত, তাদের জল, স্থল ও আকাশ পথ অবরুদ্ধ, দু সপ্তাহ খাদ্য সরবরাহ বন্ধ। হয় মরণপণ লড়াই, নয়ত আত্মসমর্পন, এ দুয়ের একটি তাদের বেছে নিতে হবে। তাই মনে হচ্ছে, এ লেখা ছাপা হবার আগেই ফকল্যাণ্ডে পুনরায় ইউনিয়ন জ্যাক উড়বে।

অন্যদিকে এই যুদ্ধ নিয়ে কিছু জটিলতার আভাস সঞ্চারিত হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির যে প্রস্তাব পাশ হয়েছে বৃটেন ও মকিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো প্রয়োগ করে তাকে নাচক করেছে। লাতিন আমেরিকার দুটি রাষ্ট্র আর্জেন্টিনা চাইলে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে তাকে সাহায্যের প্রস্তাবও দিয়েছে।

ফকল্যাণ্ড দক্ষিণমেরু সমীপর্তী হাড় কাঁপানো শীতের এক বিরল বসতি দ্বীপপুঞ্জ। অধিবাসী হাজার দুই ঘরছাড়া প্রায় ভুলে যাওয়া ইংরাজ বংশধর। এই 'রবিনসন ক্রুসোদের' জীবিকা পশু পালন এবং মৎস্য শিকার। আরজেন্টিনা একদিন ছিল স্পেনীয় উপনিবেশ। ১৮২৫ সালে আরর্জেন্টিনা স্বাধীনতা অর্জন করে।

আরর্জেন্টিনা দক্ষিন আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহৎ রাষ্ট্র। আয়তনে প্রায় এগার লক্ষ বর্গমাইল, জন সংখ্যা আড়াই কোটি। গম উৎপাদনে দেশটি বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির অন্যতম। গবাদি পশুপালন এবং মাংস রপ্তানী আরজেন্টিনার প্রধান ব্যবসা। খনিজ দ্রব্যেও আরজেন্টিনা সমৃদ্ধ।

এতকাল আর্জেন্টিনা নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জটির সম্পর্কে উদাসীন থেকে হটাৎ কেন তা দখল করতে গেল তার পিছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে। এই কারণ কেবল নৈকট্য নয় সেই কথাতেই আমরা আসছি।

একমাত্র ভৌগোলিক নৈকটাই যদি সীমানার শেষ কথা হয় তাহলে আন্তর্জাতিক আইন বলে কিছু থাকে না অনেক দেশেরই নতুন করে সীমানা বিন্যাস দরকার হয়ে পড়ে। আর্জেন্টিনা তা জানে না এমন নয়।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলির উপর দীর্ঘকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খবরদারি চালিয়ে এসেছে। একথাও ঠিক যে, স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদ থেকে লাতিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামে যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট অবদানও ছিল লাতিন আমেরিকার উপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমতে থাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কাল থেকে বর্তমানে দুই বিশ্বশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কমিউনিজমের প্রসার অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়েছে। লাতিন আমেরিকার দেশ গুলিতে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিপত্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ঘরের পাশে সোভিয়েত শক্তির বিস্তার মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র আদৌ ভাল চোখে দেখে না।

ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন খুব সম্ভব যৌথ উদ্যোগে দিয়েগো গার্সিয়ার ন্যায় একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনা করেছিল যা লাতিন আমেরিকার দক্ষিণ ভাগকে দাবিয়ে রাখতে পারে। সেই সম্ভাবনা আঁচ করে আর্জেন্টিনা আগে ভাগেই ফকল্যাণ্ড দখল করে বসেছে। নতুবা নয়টি রাষ্ট্র নিরপত্তা পরিষদে আর্জেন্টিনার অনুকূলে স্থিতা-

বন্ধা বজায় রেখে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সমর্থন করত না।

ফকল্যাণ্ড পুনরুদ্ধার বৃটেনের নিকট একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রশ্নও বটে। প্রথমে বৃটেন যুদ্ধের ব্যাপারে তেমন উদ্যোগ নেয় নি। বৃটেন হয়ত ভেবেছিল চমকিতেই কাজ হবে। কিন্তু তা যখন হল না, ফকল্যাণ্ড থেকে আর্জেন্টিনা সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হল না, তখন বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধযাত্রা ছাড়া গত্যান্তর ছিল না। সে কারণে বৃটেনকে দুনিয়ার নিন্দাবাদ শুনতে হয় নি।

আর্জেন্টিনার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সুসম্পর্ক আছে। উভয় দেশের মধ্যে বানিজ্যিক লেনদেনও কম নয়। যুক্তরাষ্ট্র সেই কারণে বিরোধী আপসে মিটিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল কিন্তু যে গোপন হাত বিরোধকে গভীরতর করতে সক্রিয় আছে, তা আপস করতে দেয় নি। ফকল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ যাই হোক, যুক্তরাষ্ট্রের সহিত আর্জেন্টিনার মন কষাকষি হলে তার রাজনৈতিক মুনাফা গোপন হাতেই যে পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্বশক্তি দুটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা পৃথিবীর কোথায় কখন উত্তেজনা সৃষ্টি করবে কেউ তা জানে না। প্রত্যক্ষ যুদ্ধের বদলে, পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে লড়াই-এর এ হল এক অভিনব নেপথ্য কৌশল।

ফকল্যাণ্ড নিয়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই। বৃটেনের অনুকূলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দান বৃটেনকে শক্তি জুগিয়েছে এবং তার নিঃসঙ্গ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে সমরাস্ত্রও দিচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ। নিরাপত্তা পরিষদের মতামত ডিবেটিং সোসাইটির বিতর্কের চেয়ে কার্যকর নয়। আর্জেন্টিনার অনুকূলে কিছু বৃহৎ রাষ্ট্রের নৈতিক সমর্থন থাকতে পারে, কিন্তু নৈতিক সমর্থন দিয়ে তো যুদ্ধ জয় করা যায় না।

ফকল্যাণ্ড ফিরে পেলেও হাজার মাইল দূরের এই নিষ্ফলা দ্বীপ দুটিকে দখলে রাখতে বৃটেনের যে রেকারিং আর্থিক লোকসান বইতে হবে তা তার সাধ্যায়ত্ত কিনা সে কথাও বিবেচ্য। তখন হয় ফকল্যাণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইজারা দিতে হবে নয়ত এ ব্যাপারে আর্জেন্টিনা তথা লাতিন আমেরিকার সঙ্গে একা আকস রফা করতে হবে। বৃটেনের হাতে সাম্রাজ্যরূপী গৌরী সেনের সিন্দুকের চাবি নেই যে সে লাভ লোকসানের হিসাব না করে খেয়াল খুসিমত টাকা ছাড়াতে পারে। পঞ্চাশ বছর আগে যা সে করত।

এই মিনি যুদ্ধের একটা দিক কিন্তু দেখবার মত, তা হল আর্জেন্টিনার ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার ভবিষ্যৎ যুদ্ধ কৌশলে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। বৃটেনের দুই বিরাট রণতরী ক্ষেপনাস্ত্র আঘাতে ডুবিয়ে দেওয়া আর্জেন্টিনার পক্ষে কম কৃতিত্ব নয়। আরো জাহাজ ডুবেছে, বিমান ধ্বংস হয়েছে, সৈন্য হতাহত হয়েছে। তবু বৃটেন শেষ রক্ষা করতে পারবে বলে ধরে নেওয়া যায়। সাফল্যের গৌরব তখন ক্ষয় ক্ষতির মহিমাকে মুছে দেবে।

ফকল্যাণ্ড নিয়ে বৃটেনের সহিত যুদ্ধে আর্জেন্টিনা সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করবে কিনা সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট লিওপলডো গলতিয়েরি বলছেন, যে কেউ সাহায্য করতে চাইবে তার সাহায্যই তাঁরা নেবে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া তেমন আভাস দেয় নি।

ফকল্যাণ্ড দ্বীপ পুঞ্জের মাটির তলায় নাকি খনিজ তেল মজুদ আছে এমন একটা কথা শোনা যায়, তবে তার প্রমান এখনো কিছু মেলে নি। তেল সম্ভাবনা নিয়ে কিন্তু এ লড়াই নয়। লড়াই-এর কারণ কি তা আগেই বলা হয়েছে।

অবাধ নির্বাচন কি করে হবে

—কালীপদ সরকার

পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভা নির্বাচন হয়ে গেছে গত ১৯শে মে, কিন্তু তা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ আজও চলেছে। তার হেতু, এ নির্বাচন এমন কিছু প্রশ্ন তুলেছে যা ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে পারে না। নিরপেক্ষ, অবাধ এবং দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান হল গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচন কিন্তু সে সব মৌলিক আচরণবিধি পালনের খাতির রাখতে পারে নি। মেরুদণ্ডে যদি ক্ষয়রোগ ধরে তাহলে রোগীকে বাঁচানো সত্যিই কঠিন।

নির্বাচনের ভিত্তি হল ভোটার তালিকা। ভোটার তালিকায় ব্যাপক ভুল থাকলে নির্বাচন বৈধ হতে পারে না। এই ভুল ইচ্ছাকৃত, কিংবা অনিচ্ছাকৃত প্রশাসনিক গাফিলতি, সে প্রশ্ন আসে না। নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ণ নির্বাচনী বিভাগীয় দপ্তরের দায়িত্ব, নাগরিক অথবা রাজনৈতিক দলগুলির নয়। তবে ভোটার তালিকার ভুল সংশোধনের জন্য নাগরিক অথবা রাজনৈতিক দল যদি সচেষ্ট হন তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচিত তাদের সর্ব প্রকারের সাহায্য করা। দুঃখের বিষয়, ভোটার তালিকা সংশোধনের ব্যাপারে পশ্চিম বঙ্গে তা মোটেই হয় নি।

ভুল-ত্রুটি সংশোধন কামীরা পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন এ বাধা এসেছে নির্বাচন দপ্তরের কর্মচারীদের নিকট থেকে এবং ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের ক্যাডার ও সমর্থকদের নিকট থেকে। নির্বাচন দপ্তরের উপর তলার অভিযোগ জানিয়ে কোন ফল হয় নি। এ সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে, নির্বাচন কমিশনের নিজের এমন লোকবল নেই, যা দিয়ে তিনি ভোটার তালিকা তৈরি এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেন। নির্বাচনের অধিকর্তা হলেও, রাজ্য সরকারগুলির দ্বারাই তাঁকে লোকসভা এবং বিধান সভাগুলির নির্বাচনের কাজ চালাতে হয়। কাজেই প্রকৃত প্রস্তাবে নির্বাচন কমিশনের ব-কলমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন রাজ্য সরকার।

সংবিধান নির্মাতারা আশা করেছিলেন সরকারী কর্মচারীরা দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকবেন। সরকারী কর্মচারীরা তখন রাজনীতি করতেন না। সরকারী কর্মচারীরা দলীয় রাজনীতি করলে তাঁদের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা যায়। পশ্চিম বঙ্গে ভোট কারচুপির পাণ্ডা হলেন সরকারী কর্মচারী-দের এক বৃহৎ অংশ যারা প্রকাশ্যে দলীয় রাজনীতি করেন। তা না হলে প্রিসাইডিং অফিসার নিজে ব্যালট পত্রে ছাপ মেরে ভোট বাক্সে ফেলবার সময় হাতে নাতে ধরা পড়তেন না। এমন ঘটনার কথা কেউ কখনো আগে কি শুনেছেন?

ভোটার তালিকা সংশোধন প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অসম্ভব হওয়ায় এবং ভুয়ো ভোটারপূর্ণ তালিকাকে চূড়ান্ত বলে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হওয়ায়, কিছু বিক্ষুব্ধ নাগরিক আদালতে শরণাপন্ন হন এ ছাড়া তাদের করবার কিই বা ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মামলাটি যখন কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারাধীন, সুপ্রীম কোর্ট প্রতিবাদী পক্ষের প্রার্থনামত মামলাটি কলিকাতা হাইকোর্ট থেকে তুলে এনে নিজে বিচার করেন। কলিকাতা হাই-কোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্ট বার একবাক্যে এই বে-নজির হস্তক্ষেপের নিন্দা করে।

তড়িঘড়ি বিচার পর্ব শেষ করে ১৯৮২ সালের ৩০শে মার্চ মামলাটি খারিজ করে এক সংক্ষিপ্ত

আদেশ দেন সুপ্রীম কোর্ট। উক্ত আদেশে বলা হয়, পূর্ণাঙ্গ রায় পরে দেওয়া হবে। তারপর দীর্ঘ আড়াই মাস কেটে গেছে, রায় প্রকাশিত হয় নি। সুপ্রীম কোর্টের আদেশ পাওয়া মাত্র মুখ্য নির্বাচন কমিশন গুরুতর ত্রুটি পূর্ণ ভোটার তালিকাকে চূড়ান্ত বলে প্রকাশ করেন। নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রস্তুতের মূল দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি অভিযোগগুলির ওপর গুরুত্ব দিলেন না। তাঁর কাজের ফলে যে হাজার হাজার নাগরিক তাদের প্রধানতম গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হলেন সে প্রশ্নও তাঁকে স্পর্শ করল না।

১৯শে মে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রীশ্যামলাল শকধর বললেন, নির্বাচ যাতে স্বাধীন ও অবাধ হয় তার জন্য তিনি সব রকম ব্যবস্থা নেবেন। পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করবেন ইত্যাদি। পরিদর্শকরা কি কাজ করেছেন সকলেই দেখেছেন। তাঁদের কাছে এবং স্বয়ং শ্রীশকধরের কাছে যে ভূরি ভূরি অভিযোগ পড়েছিল, সে সব অভিযোগের কি গতি হল তাও সকলে জানেন।

পশ্চিম বঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে অবাধ দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের অনুকূল ছিল না, এ কথা ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলই তুলেছিলেন, এমন কি স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী ও তাঁর নির্বাচনী সফর কালে একাধিকবার বলেছিলেন। ফ্রন্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের হত্যা, মারপিট এবং তাদের নির্ব্বাচনী প্রচারে বাধা দানের বহু ঘটনা এবং পুলিসী নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ মুখ্য নির্বাচন কমিশনের গোচরে আনা হয়েছিল। সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নৃশংস গণহত্যা, নকশালী ভোট বয়কটের খবরদারি এবং প্রার্থী অপহরণের ঘটনার রিপোর্টও শ্রী শকধর পেলেন কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সংকল্প থেকে তিনি বিন্দুমাত্র নড়লেন না।

বামফ্রন্ট সরকার গত জানুয়ারী থেকে অর্থাৎ মেয়াদ ফুরাবার ছয় মাস আগে, নিজেদের হাত দিয়ে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সক্রিয় হন। পাঁচ বছর ধরে সযত্নে বামফ্রন্ট যে নির্বাচনী ব্যূহ রচনা করেছিলেন নিজেদের একতিয়ারে নির্বাচন না হলে, তা যে তেমন কার্যকরী হবে না, সে কথা তারা ভালভাবেই জানতেন কিছু দেরিতে হলেও, সুপ্রীম কোর্টের রায়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এষেনীয় মনোভাব বামফ্রন্টের বহু বাঞ্ছিত অভীষ্ট পূরণের সহায়ক হল। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাই স্বস্তিতে ভরপুর হয়ে ঘোষণা দিলেন, "ভূমিকম্প না হলে এ রাজ্যে নির্বাচন হবেই।" পশ্চিম বাংলার মানুষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবলেন, "না বাবা, ভূমিকম্পের দরকার নেই, নির্বাচন, করো ক্ষমতায় থাকো।"

পশ্চিম বঙ্গে বামফ্রন্ট যখন আপন একতিয়ারে নির্ব্বাচন করতে অতি ব্যস্ত, চারিদিকে সাজ সাজ রব তুলেছেন এবং নিভৃতে ঘন বৈঠক শুরু করেছেন, ঠিক তখনই হরিয়ানা ও হিমাচল রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে দিয়ে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের রাজ্যে সাময়ীক ভাবে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করার সুযোগ দিলেন। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল প্রভাব খাটিয়েছে সে কথা যাতে কেউ না বলতে পারে তার জন্যই এই সুস্থ গণতান্ত্রিক আচরণের নজির রাখলেন তাঁরা। সে দৃষ্টান্ত বামফ্রন্টের মনে রেখাপাত করে নি।

এক সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশন শ্রী শ্যামলাল শকধরও বলেছিলেন, নির্ব্বাচন কালে রাজ্যে রাষ্ট্র-

পতির শাসন প্রবর্তন করা উচিত। পশ্চিম বাংলায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে নানা গুরুতর ব্যাঘাত ঘটলেও, শ্রী শঙ্কর তাঁর সেই সুচিন্তিত অভিমতের কথা বোধহয় ভুলে গেলেন তাঁর এই বিস্মৃতির কারণ দুর্বোধ্য।

১৯শে মে যে নির্বাচন হল তাতে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারিরা বলছেন, এই কারচুপি ঘটেছে সুপরিকল্পিত ভাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের বশংবদ ছোট বড় সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে। নথিপত্র ও সাক্ষ্য প্রমাণ সহ অভিযোগ পেশ করা হয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের নিকট এবং তিনি নাকি তদন্তের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কি হয় তাতো সকলেরই জানা।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর এক সপ্তাহের মধ্যে ভোটের সরকারী তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট প্রকাশের কথা। তিন সপ্তাহ হয়ে গেল কিন্তু সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি। কোন প্রার্থী কত ভোট পেয়েছেন সব সাকুল্যে এবং বুথওয়ারী—তারও জাবেদা কপি প্রার্থীরা পান নি। ভোটের তথ্য প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব অনেকের মনে এই সন্দেহ এনেছে যে, সংশ্লিষ্ট গণতন্ত্রে কারচুপি ঢাকার জন্য ম্যানিপুলেসান চলেছে এবং তার জন্যই এই বিলম্ব।

মার্কসবাবীরা যে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন, সে কথা ইতিহাস স্বীকৃত। এদেশের মার্কসবাদীরা ভিন্নতর হবেন এমন আশা করা অন্যায়। তাঁরা যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না সে কথা তাঁরা গোপন রাখেন নি। মার্কসবাদীদের বিচারে নির্বাচন হল ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার মাত্র। সুতরাং তাঁরা জপ-মালা হাতে নিয়ে নির্বাচন লড়বেন এ ধারণা ভ্রমাত্মক। রিগিং যে হবে সে তো জানা কথা।

কিন্তু সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় সরকার যার ওপর গণতন্ত্র রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত, সেই কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবাংলার অরাজক অবস্থা এবং সন্ত্রাস রাজত্বে কেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ মার্ক্সবাদী পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের হাত দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্মতি দিলেন—সেই প্রশ্ন এ রাজ্যের অ-বাম জন সাধারণ কেন্দ্রের নিকট নিশ্চয়ই করতে পারেন।

বাইরের বিপদ থেকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার ন্যায় ভিতরের বিপদ থেকে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাও মূলত কেন্দ্রের কাজ। রাজ্য সরকারগুলি অঙ্গরাজ্যরূপে কেন্দ্রের হয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করেন। নতুবা কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্টারন্যাল এমারজেনসি ঘোষণা করতেন না, উপরোক্ত প্রশ্নটি তাই সম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক।

দেশ আগে দল পরে। দেশের স্বার্থে প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কারও করা যেতে পারে। নির্বাচনে রিগিং যদি সংক্রামক ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে বিকল্প ব্যবস্থার বিষয় ভাবতে হবে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধান গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার কথাও বিবেচনা যোগ্য।

——

RABINDRANATH

—by Mrs. Srrojini Naidu—

From the four corners of the earth, millions of men and women will mourn today for one whose radiant genius had brought them inspiration, solace in their sorrow, comfort in their weakness, hope in their despair and light in their darkness. Today in Calcutta thousands of men and women must have gone on pilgrimage to look their last upon that beautiful face that had shone upon them for three generation : millions of men and women must have brought their last offerings of flowers and tears to lay upon the bier of one whose mortal span of life was predstined for only four score years, but whose period of immortality was to cover aeons and aeons of time.

Last night, I was given a warning that any hour I might expect to hear that the beloved Rabindranath Tagore had passed away into the region of his dream, All night I jay awake, waiting for the word to tell me that the beautiful body and the beautiful spirit had parted company. With the dawn, I asked again and they said tl at he still lived. I asked again and I was told that he had passed away.

THE SECRET

What was significant of Dr. Rabindranath Tagore ? The world is full poets ; the world is full of music ; the world is full of beauty. Why then was Rabindranath Tagore so adored, so loved and so worshipped by tens of thousands of human beings in every part of the world ? He was born in Bengal ; all his traditions were in Bengal : all his heritage of mind and spirit lay in Bengal ; all his poetry is filled with the landscape of Bengal, the rivers of Bengal, the flowers of Begal, the village life of Bengal, the heavy clouds of August that brood upon the rivers ; everything is of his own country and yet he was a poet of the whole world. He wrote in a language known to few, but it became the language of the hearts of myriads of people. What was the secret ? What was his message ? His secret was his heart-felt love for all humanity. His message was the message of human service and human love.

Sitting in his village home, sitting at the shadowed Himalayas sometimes, sitting in a boat and floating down a river listening to the song of the boatmen, sitting in his own Santiniketan, like a prophet amongst his followers, he listened to "the still sad voice" of the humanity" and with his mystic eye he looked into the hearts of men and women, he understood th secret of their tears and the secret of their laughter. From his limited landscape he understood, he visualised, he pictured the entire varied landscape in the world and he knew as if by magic the secrets of all heart. He lifted his voice and sang ; and in his song was a laughter of all the brightness of the world. He lowered his voice and sang and in those lower tones was all the anguish of human sorrow. He lifted his eyes and saw the little children at play and his song tinkled : his songs shone ; his song echoed with the joy of childhood. He heard the prayer of spirits agonising to find communion with the invisible God. The deep solemn tone of their agonising filled his song. He looked upon the conflict of the world and his heart was pierced with sorrow, for the sorrow of the world. He felt dew upon his feet ; he felt the stars upon his head ; he listened to the music of great

rivers; he saw the sunset upon great mountains and all these were caught and crystallised with his magic words.

He wandered up and down the world, noting, thinking, brooding and out of all his experience out of all his vision, he wove a great panoramaof experience for himself He read the ancient scriptures, the ancient philosophy of his country, he made a comperative study of the scripture texts, the books of literatures of all other countries : and his heart made a great affirmation of the unity of all mankind.

A ROMANTIC FIGURE

In his younger years he was a great romantic figure. His poetry was ecstatic with the very lyric quality of his youth ; the exuberant note of youth, the extravagance of youth was there. In his middle years the rapture was somewhat stilled and a graver note came into his music. But in his later years, he returned to something of the old ecstacy mellowed, grown richer, grown softer, yet none the less it was something of the ecstacy of youth, for he lived with young people, he drew inspiration from their laughter, he spoke with them and renewed his dreams and what he gave to youth was a benediction and what he received from youth was an inspiration.

I remember him at various stages of his life, various stages of my life. When I was a very little girl in Hyderabad my mother used to sing in a rich mazzo-soprano voice lyrics that moved me, though I did not understand the tongue in which she sang. It was a song of one Rabindranath Tagore, she told me. "Ravi Babu" she said, 'was the idol of all Bengal'. She told me that all men and all women sang the songs : the boatmen on the river, the peasant in the field, the students in their schools, women at their household tasks, men doing the labours of men in cities and hamlets, towns and the hillsides in fields everywhere they sang the songs of Rabindranath Tagore. If they were glad, spontaneously his songs rose to their lips ; if they were sad, his songs were a sanctuary of broken hearts. Did men need inspiration, he inspired ; if men needed to be rebuked in a gentle fashion, he rebuked them ; and when his country was in distress, when his country, saw dreams of freedom from every form of bondage, he held aloft the torch himself from which all eager hearts caught own torches.

When he went to Europe, I remember, not the first time, when I was there, but in 1913, that great epochmaking year for the world as well as for himself. When he went with his Gitanjali in his hand, when my friend, the great Irish poet Yeatts, filled with rapture for his revelation of the spiritual, stood sponsor for the genius of Tagore to the world, I remember with a thrill the reaction of Europe to the genius of Tagore. Gitanjali was the message of peace and tranquility for which a fevered world was waiting and from one end of Europe to another, the name of Tagore became a beacon and a banner. Men and women looked to him for a new life, new courage, new hope. They were torn with fear and doubt They appreciated his knowledge of the things that were to come to Europe.

PROPHET OF A NEW VISION

Very shortly, because, after all, it was a year after the publishing of the Gitanjali that the Great War in Europe took place, he felt that they needed something to comfort them beforehand, something to give them strength in anticipation of that time of tragedy

which somehow instinctively they foreshadowed in their lives. And Tagore with his beautiful flowing robes, Tagore with his beautiful flowing locks, Tagore with his beautifully flowing beard became a figure of romance, became a figure of every kind of fascination to which the hearts of old and young responbed. England, usually so shy of expressing emotion, England, usually so reserved, so little ready to accord enthusiastic reception especially to foreigners, went almost mad over Tagore, and there were so many amusing instances that happened men and women reading his poetry everywhere, in their rooms, in public places, and once I hearb of five old ladies sitting in a row in a bus all reading Gitanjali and the young man who saw this ran to me and said, "Hold my hand quickly, I have seen five ladies reading Gitanjali in a row !"

When he a went to Scandinavia, Yugoslovia, Czechoslovakia, Hungary, France, Germany, America, Canada, South America, to all the countries of the world, he was the prophet of a new vision. Here was the wise man from the East, the wise man bringing a new vision and a new version of life, and he talked to them of the spiritual riches of his country and he went out as the great Ambassador of his country. It is said he was a mystic. Perhaps he was a mystic—all poets are mystics, all Indians are mystics, but people forget that besides his grave and lovely mysticism he was really a man of h mour and humanity. He played with children as one of them. He flirted with beauty because all poets are perennial lovers of beauty, and he sat with old men wisely stroking his beard and talking with them deep truths of life, and death, and re-birth and re-death, and wherever he went men followed him saying : what vision of beauty is this ! In a drap world, what is this radiant figure ? Is he a priat, is he a prophet, is he a seer ?

HE LIVES FOR EVER

The answer was he was all three, because he was a singer. What can be greater than to be a poet like Tagore ? Philosophers have lived rad died, their schools of philosophy have grown up and been forgotten. Kings have lived and died and who remembers them their names and the dynasties they founded ? Great generals have achieved glory and been forgotten. But the poets live for ever, he lives in the hearts of today, he lives in the hearts of tomorrow and a poet like Tagore who loved his country was none the less a lover of all countries. Even in every fibre of his being, in every silvery hair of his head, in every rich red drop of his blood, Indian outside and Indian inside of him, he, none the less, was the symbol of the genius of India. But he always had a universal quality. And India, always universal in her appreciation of all knowledge, the reception of all science, her re-action to all beauty no matter from where the gift of beauty came, found her last, her latest, her most lovely interpreter, her most lovely embodiment, her most prophet, her most lovely affirmation in Rabindranath Tagore, who, before he died, with the knowledge of his coming death said, 'I have tasted the hidden honey of a lotus', The hidden honey of the lotus was the ultimate vision of this seer and out of the lotus of his own lyric genius it was that he drew the hidden honey with which he went, sweet upon his tongue, to greet the immortals in the world of poets, his fellow poets belonging to the world of song.

(Broadcast from A. I. R., Bombay, on the night of 7th August, 1941)

ভয়াবহ নির্মম মর্মন্তুদ সংবাদ

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার ডিরেক্টর ডঃ ইউ, আর, রাও সম্প্রতি আভাস দিয়েছেন যে পৃথিবীতে এখনই যে পরমাণু বোমা মজুত আছে তা ভয়ঙ্কর পরিণাম ডেকে আনতে পারে। ডঃ রাও বলেছেন মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু ১৫ টনের বেশী টি, এন, টির মকুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে এরই মধ্যে। তাঁর হিসাব অনুযায়ী এখনই যে পরিমাণ রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র ভাণ্ডার বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র গুলির হাতে রয়েছে তার এক চতুর্থাংশই পৃথিবীকে প্রাণীহীন করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। এইসব ভয়াবহ অস্ত্র তৈরী করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষের ক্ষুধা ও ব্যাধি নির্মূল হতে পারত সেই অর্থের এক দশমাংশ ব্যয় করা হলেই। ডঃ রাওয়ের আবেদন মানব কল্যাণের স্বার্থে সমস্ত উন্নত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কি তথাকথিত শক্তি অর্জনের নামে এই আহ্ব ও আত্মঘ্ন হননের পথ ত্যাগ করতে পারেন না। (পি টি আইর খবর)

এই বিষয়ে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ শিল্পী সাহিত্যিক ও মানবকল্যাণকামী সংস্থাগুলি একজোট হয়ে উন্নত দেশের রাষ্ট্রনায়কদের নিকট দাবী তুলতে হবে মানবধ্বংসী পরমাণু বোমা তৈরী বন্ধ করতে হবে, মানুষের ক্ষুধা ও ব্যাধি মোচনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বৈজ্ঞানিকদের নিকট আবেদন রাখতে হবে এঁরা যেন মানবধ্বংসী কাজে ব্রতী হয়ে তাঁদের প্রতিভার অপমান না করেন এবং মানব শত্রু বলে ধিক্কৃত না হন।

(সঃ বিপ্লবী বাংলা)

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয়, তবেই সে প্রকাশিত। দেশ মানুষের তৈরী, দেশ মাটিতে তৈরী নয়।

● ●

দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যারা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন, তাদের দানেই দেশ রচিত।

—রবীন্দ্রনাথ

Biplabi Bangla
Phone : 44-1795
Regd. WB/NC

বার্ষিক :—মফঃস্বল ১৫.০০ টাকা
বার্ষিক :—৮.০০ টাকা
মূল্য—৩০ পয়সা

30

2 JUN

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চাটার্জী
শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাবীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "ভোলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—২·০০,
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০, ৪। পৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১·২৫, ৬। কলিকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—·৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—·৬০
৮। স্বাধীনতারশহীদ মা ও মেয়ে—·৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—·৪০
ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—·৭৫, ১৩। দেশ যাদের চোলেনি (১)—১·০০, ১৪। দেশ যাদের চোলেনি (২)—১·০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—·৫০, ১৬। ১০ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১·০০, ১৭। রাজিক হত্যা প্রচেষ্টা—·৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪·০৫, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—·৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭
মৈথলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ১১ই আষাঢ় ১৩৮৯ ২৬শে জুন ১৯৮২	৩৮ সংখ্যা

ভারতের কোটি কোটি মানুষ কেবল অন্ন চাইতেছে। তোমরা কেবল শুষ্ক কথা শুনাইতেছ। নিরন্ন, ক্ষুধার্ত মানুষদের ধর্মকথা দর্শন শাস্ত্র, শোনানো ঘোরতর অন্যায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সম্পাদকীয়

জঙ্গলের রাজত্বের অবসান চাই

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মনে একটা উদ্বেগপূর্ণ প্রশ্ন জেগে উঠেছে এবং তার জবাব খুঁজছে। প্রশ্নটি হল, পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের রাজত্ব আর কতদিন চলবে। জবাব যেটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে সেটা হল, এই পরিস্থিতির অবসান ঘটবে কার মাধ্যমে এবং কতদিনে।

এই জঙ্গলের রাজত্বের নমুনা বিশেষ করে সবিস্তারে বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা খুললেই তার সম্যক পরিচয় মিলবে।

কংগ্রেস সভাপতির একটি বিবৃতিতে প্রকৃত অবস্থার কিছুটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দলীয় লোক বলে তার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, অত্যাচারিত, নিপীড়িত যারা তাদের মুখ থেকেই ত তথ্য প্রকাশিত হবে। অত্যাচারী যারা, তারা কখনই নিজমুখে নিজেদের অপকীর্তির কথা স্বীকার করবে না। বিভিন্ন খবরের কাগজের প্রতিবেদক নিজেদের নামে যে বিবরণ দিচ্ছেন, সেটাও গ্রহণীয়। কোন নেতা কোন পত্রিকাতে তাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করলেই সব দোষ ধুয়ে মুছে যায় না এবং প্রকৃত তথ্যকে ভিত্তিহীন বলে গ্রহণ করাও যায় না। সর্বোপরি যারা অত্যাচারিত, তাদের মর্মন্তুদ বিবৃতিকেও নস্যাৎ করা যায় না। বিধানসভার গণিতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে।

কংগ্রেস সভাপতি বলছেন, 'রাজ্য জুড়ে খুন, জখম, ঘর জ্বালানোর ঘটনা ঘটছে। চোখ উপড়ে ফেলার পঞ্চাশটি ঘটনা ঘটেছে।" কংগ্রেস কর্মীদের দিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর কুশাপুত্তলিকার মুখাগ্নি করানোর ঘটনার খবর মেদিনীপুর জেলা থেকে পাওয়া গেছে। ইন্দিরাজীর শ্রাদ্ধের জন্য টাকা আদায় করা হচ্ছে। কোথাও সুবিচার পাওয়া যাচ্ছে না। কংগ্রেস কর্মীরা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। সেই পথ নিলে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে।' যেটা তিনি বলেন নি সেটা হল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য মেয়েদের উপর ধর্ষণও করা হচ্ছে।

গতকাল বিধানসভার অধিবেশনের সময় উপস্থিত হল মেদিনীপুরের সবং থানার মুরারিচকের দুই মহিলা এবং অভিযোগ করেন যে 'তাদের উপর গণধর্ষণ হয়েছে।' তারা আরো বলেন আমাদের একমাত্র অপরাধ আমরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছি।' কংগ্রেসের পরিষদ দলীয় নেতা সাত্তার সাহেবের অভিযোগ 'তারা সি, পি, আই (এম) সমর্থক। ওই বাড়ির মালিকের মেয়ে ও পুত্রবধূ ধর্ষিতা হল।' দলাদলির প্রশ্ন টেনে না এনেও বলা যায় যে কোন মহিলা সত্য সত্য ধর্ষিতা না হলে, জনসমক্ষে তাদের এমন অসম্মানের কথা প্রকাশ করতে পারেন না নিছক দলবাজীর জন্য। পিতা কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অপরাধে স্বামীকে তার মেয়েকে তালাক দিতে বাধ্য করা হয়েছে নদীয়ার টেরিডাঙ্গা গ্রামে। নির্বাচনের ঠিক আগে দশটাকা রোজে জনমজুরির বিরাট ভাণ্ডার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত।

কংগ্রেস সমর্থক কৈজুল শেখ তা নেননি, ফল ফলল নির্বাচনের পরে তার মেয়ের জীবনটাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়ে। ভোটের অব্যবহিত পূর্বে এই ধরণের ঘুষ দেওয়া যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই বে-আইনী কাজ করা হয়েছে সমগ্র গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে। শ্রীশাকধরের

কি কিছুই করার নেই ? পশ্চিমবাংলার মুখ্যনির্বাচন কমিশনার শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ত জোর গলায় সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, এরাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। এখন কি তিনি শিলাভূত কৃষ্ণমূর্তিতে পরিণত হয়েছেন ? অথবা বোবার শত্রু নেই, এই নীতি অবলম্বন করেছেন ? তার ব্যক্তিগত লাভ এতে কতটা হবে জানিনা।

তবে গণতন্ত্র হত্যাকারী বলে তাকে দায়রার সোপর্দ করার কথা বিশেষভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে। অবিলম্বে বহু অভিযোগের তদন্ত হওয়া দরকার। তদন্তে যারা দোষী সাব্যস্ত হবেন, তাদের জন্য এমন শাস্তিবিধান করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কেউ কোনদিন আর এপথে এগুবার সাহস না পায়। কুচবিহারের জনৈক নায়েককে খুন, এগারজন মানুষকে পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনা এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত কিনা বলা শক্ত। তবে গোটা রাজ্যে যে অরাজকতা চলছে এবং যার গতি ক্রমবর্দ্ধমান হবার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বিরোধী পক্ষের সমর্থকদের ব্যাপক হারে খুন করা হচ্ছে, ঘরবাড়ী ছেড়ে জীবন বাঁচাতে হচ্ছে। প্রশাসক দলীয় কর্মীরা পুলিশ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহায়তায় একাজ অবাধে করতে থাকলে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটা যে জন্তু জানোয়ারের দাপটে জঙ্গলের রাজত্বে পরিণত হবে, এটা সুনিশ্চিত। গণতন্ত্র ও চিরদিনের মত এখান থেকে, এবং পরবর্তী ধাপে গোটা ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হবে, এটাও দিনের সূর্যালোকের মত পরিষ্কার।

কিন্তু দেশটাত আর লুটেরা, খুনী, অপদার্থ প্রশাসকদের কাছে কেউ ইজারা দেয়নি। এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার কিভাবে করা যায়, সেটা ভেবে দেখতে হবে এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে বিরোধী দলগুলির ও কেন্দ্রীয় সরকারকে। অন্যথায় তাদের অযোগ্যতাই শুধু প্রমাণিত হবে না, ভবিষ্যতের ইতিহাসে তাদের চরিত্রটা প্রতিফলিত হবে কলঙ্কমলিন বলে।

প্রথমেই, এখানকার বিরোধী দলগুলির কি কর্তব্য ও দেশের অগণিত মানুষ কি আশা করে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, খুনের বদলে খুন—এমন একটা নীতির কথা বলে থাকেন অনেকেই। কিন্তু আমরা মনে করি বর্তমান দুষ্কৃতকারীদের নীতি অনুসরণ করা উচিত হবে না। কিন্তু সমস্যার মোকাবিলা করতে ভয় পেলেও চলবে না। অহিংসার পূজারী গান্ধীজী অবশ্য বিধান দিয়েছিলেন যে কাপুরুষতার চেয়ে হিংসা ও তুলনামূলকভাবে ক্ষেত্র বিশেষে দোষণীয় নয়। কিন্তু আজকের দিনে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে যাওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে সংগঠন মজবুত করে প্রকৃত অবস্থাটার বিশ্লেষণ করে জনসমর্থন লাভ করে। নিজেদের সমর্থকদের নিকট ত বটেই, প্রশাসক দলগুলি যে সব মানুষদের কিছু টাকা পয়সা দিয়ে, কিছু খাদ্য বিলি করে, তাদের বিভ্রান্ত করেছে তাদেরও বুঝিয়ে দিতে হবে যে এ পথে তাদেরও আখেরে কোন কল্যাণ হবে না। অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যারা জন্তু জানোয়ার সুলভ কাজ করছেন, একদিন তাদেরও একই প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করতে হতে পারে।

বুঝিয়ে দিতে হবে, যা চলছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ঐতিহ্য আজ বিপন্ন কেন্দ্রীয়

(শেষাংশ আট পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস (ই) সম্পর্কে নুতন প্রত্যাশা

—সি, এস, পণ্ডিত

দিন কয়েক আগে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হটাৎ অফিসের সময় কং (ই)-র সদর দপ্তরে গিয়ে দেখেন একটি পিয়ন ছাড়া কেউ সেখানে নেই। খবরটা প্রায় সব কাগজেই বেরিয়েছিল। তার কারণ ব্যাপারটা কংগ্রেস (ই) র ব্যাধির একটা বহির্লক্ষণ স্বরূপ। অতীতের সেই কর্মচঞ্চল এ, আই, সি, সি অফিস আর নেই। নেই কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের সেই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ভূমিকা। তখন রাজনৈতিক মর্যাদায় সাধারণ সম্পাদককে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমতুল্য মনে করা হত।

বর্তমানে ক্ষমতা অন্যত্র কেন্দ্রীভূত। এ, আই সি, সি রবার স্ট্যাম্প মাত্র। ১৯৮০ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসার আগে কিছুকাল কংগ্রেসের সদর দপ্তর দলের কাজকর্মের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী ১২ নম্বর উইলিংডং ক্রিসেন্টে ফিরে এলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং এ, আই, সি, সি অফিসের গুরুত্ব হ্রাস পায়। ইন্দিরা যদি কংগ্রেসের সদর দপ্তরে কাজে ফাঁকি লক্ষ্য করে থাকেন, তাহলে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। দলের সাধারণ অবস্থা এবং কর্মীদের নিষ্ঠাহীনতার পরিচয়ই তাতে প্রকাশ পেয়েছে।

সর্বস্তরে অ্যাডহক নিয়োগ দলে যে কায়েমী স্বার্থ গড়ে তুলেছে এটা নিঃসন্দেহে তারই প্রতিক্রিয়া। গত দশ বছর যাবৎ কোন সাংগঠনিক নির্ব্বাচন হয় নি। প্রায় সকল প্রদেশ ও জেলা কমিটি এবং তাদের কর্মকর্তারা অ্যাড হক ভিত্তিতে কেন্দ্র কর্তৃক মনোনীত। এমন একটি সময় ছিল যখন বড় বড় সিদ্ধান্তগুলি নিতেন দলের ওয়ার্কিং কমিটি এবং তার-পর সেগুলি রাষ্ট্র শাসনের মৌল নীতি হত। তার জন্য ঘন ঘন ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসত। তা ছাড়া ছিল পার্লামেন্টারি বোর্ড সেখানে দেশের সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি আলোচিত হত। তাই অধিবেশনগুলি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

বছরে একবার কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন এবং কমপক্ষে দুবার এ, আই, সি, সি র অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত এবং সেখানে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হত, ওয়ার্কিং কমিটি তার ওপর লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত নিতেন। কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা এই সকল অধিবেশনের মাধ্যমে দেশের প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারতেন ফলে সাধারন কর্মীদের মনে দলের সহিত নিবিড়তার উপলব্ধি জাগত, দায়িত্ববোধ সঞ্চারিত হত এবং শক্তি বাড়ত। এ সবের কিছুই এখন নেই। ১৯৯০ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর, একবার মাত্র এ, আই, সি, সি ও ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হয়েছে এবং তাতেও কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয় নি।

গত মিনি-সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে চারটি রাজ্যের বিধান সভার প্রার্থী বাছাই নিয়ে পার্লামেন্টারি বোর্ডের কতকগুলি সভা অবশ্য বসেছিল কিন্তু সেখানও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ভার ছিল সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ওপর। তার কারণ বোর্ডের সদস্যরা কেউই প্রতিষ্ঠিত নেতা নন। রাজ্যগুলিতে যাঁদের কিছু প্রভাব আছে তাঁরা বোর্ডে নেই, কিংবা কোনভাবে বাদ পড়েছেন এ অবস্থায় শিখর সংস্থা থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না।

কংগ্রেস (ই)-র এই পরিস্থিতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী দুটি গোষ্ঠী আছে। এক পক্ষের

অভিমত হল, সংগঠনে অতিমাত্রায় গণতান্ত্রিক রীতি ছড়িয়ে দিলে, নির্বাচিত সদস্য এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও দলাদলি বৃদ্ধি পেতে পারে এবং শ্রীমতী গান্ধীর সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ আসবে। বর্তমানে দলে যে শৃঙ্খলা আছে এবং নির্বাচনী লড়াইয়ে দল যে তৎপরতা দেখাতে সক্ষম, নেত্রী কেন্দ্রিক হলেও তা যথেষ্ট শক্তিশালী। ১৯৮০ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য হলেও, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। যদিও ১৯৮০ সালের মত এবারকার নির্বাচনেও শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনী অভিযান গড়তে যথাশক্তি চেষ্টা করেছেন।

১৯৮০ সালের নির্বাচন ছিল ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা প্রমাণের লড়াই। দেশ পরিচালনায় ইন্দিরা নেতৃত্বের বিকল্প নেই এই ছিল সে নির্বাচনের মূল বক্তব্য। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলিতে সে প্রশ্ন তেমন জোরদার ছিল না। ভবিষ্যৎ নির্বাচনেও তা থাকবে না বলেই ধরা যায়। এ কথা সত্য যে, এখনো ইন্দিরাগান্ধী ভোটারদের মন জয় করতে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি রাখেন, কিন্তু ভোটারদের মন জয় করা আর ব্যালটপত্রগুলি তাদের দিয়ে ব্যালট বাক্সে জমা দেওয়া এক নয়। শেষোক্ত কাজ সম্পন্ন করতে যে একনিষ্ঠ কর্মীদল আবশ্যক, দুঃখের বিষয় বর্তমানে কংগ্রেস (ই) সংগঠনের নীচের তলায় তার একান্ত অভাব।

অপর গোষ্ঠীর অভিমত হল, দলের ভিতরটা ধীরে ধীরে অন্তঃসার শূন্য হয়ে উঠেছে। শ্রীমতী গান্ধী যতদিন নেতৃত্বে আছেন ততদিন কংগ্রেস (ই) রাজনৈতিক শক্তিরূপে টিকে থাকলেও, দলে যদি প্রতিভাময় নতুন রাজনীতিকের প্রকাশ না ঘটে, তাহলে ভবিষ্যতে দল তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে। সুতরাং এখনই এর প্রতিবিধান আবশ্যক এই ধরণের কথা কংগ্রেস (ই) দলের অনেকের মুখেই শোনা যাচ্ছে।

এই অভিমতের সমর্থনে একটি বিষয় প্রায় সকলকেই আকৃষ্ট করেছে তা হল, প্রতি গ্রামে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে একজন নিষ্ঠাবান সৎ কংগ্রেস সেবী আছেন কিন্তু বর্তমান সাংগঠনিক ব্যবস্থায় দলে তার কোন স্বীকৃতি, স্থান অথবা ভূমিকা নেই। নির্বাচন অনুষ্ঠানে কদাচিদ্ তাঁর কথা ভাবা হয়। নির্বাচনী অভিযান যারা গড়তে আসেন তাঁরা সব শহর ঘেঁষা মানুষ, তাঁরা গ্রামের এই সকল মানুষকে জানেন না। এঁদের সাহায্য নেবার বদলে, নির্বাচন সংগঠকরা টাকা খরচ ও বাহ্যিক প্রচার কর্মের ওপর নির্ভর করে থাকেন। হরিয়ানা এবং হিমাচল রাজ্যের নির্বাচনে এই ব্যবস্থার ছিল এক প্রকট দৃষ্টান্ত। দিল্লির ২নম্বর মতিলাল মার্গে বসতেন শ্রীরাজীবগান্ধী এবং তাঁর জি. ও. সি, শ্রীঅরুণ গান্ধী এবং দুই রাজ্যের নির্বাচনী কাজ চলত সেখান থেকে।

নির্বাচনী প্রচার অভিজান খুব নিঁখুত ভাবে চালানো হয়েছিল। চার্ট, ম্যাপ, পরিসংখ্যানে সব কিছু অফিসে সাজান ছিল। কাজও হত সাময়িক নিয়মানুবর্তিতার মাপে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখাগেল দুইটি রাজ্যে কংগ্রেস (ই) কেবল সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছে, তাও সম্ভব হয়েছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বার কয়েক বটিকা সফরের জন্য এবং কংগ্রেসের পুরাণো নামের জোরে। দুটির একটি রাজ্যেও কংগ্রেস (ই) একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি। ফলে, দলত্যাগী ও বিদ্রোহীদের তোয়াজ করে দলে টেনে এনে সরকার গড়তে হয়েছে, আদর্শ ও দলের শৃঙ্খলা বিসর্জন দিয়ে।

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস (ই) খুব খারাপ করে

নি। বিধান সভায় কংগ্রেস (ই)-র সদস্য সংখ্যা বেড়েছে এবং প্রদত্ত ভোটের এক বিরাট অংশ কং (ই)-র অনুকূলে পড়েছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস(ই) কে দুটি বড় অসুবিধার মধ্যে লড়াই করতে হয়েছিল। প্রথমটি হল দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়টি, পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস (ই) তে এমন কোন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতা নেই যার ওপর জনগন নিশ্চিন্তে আস্থা স্থাপন করতে পারেন এবং যাকে রামফ্রন্ট নেতা জ্যোতিবসুর চেয়ে অধিকতর যোগ্য ভাববেন। কংগ্রেস (ই) র এ দুটি প্রতিবন্ধক আরো প্রমাণ করে যে, দলকে অচিরে যদি সাংগঠনিক দিক থেকে মজবুদ না করা যায়, তাহলে নির্বাচনী অভিযান যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তার সুফল ধরে রাখা যাবে না। বর্তমানে সেই চিন্তাই কংগ্রেস (ই) হাই কমাণ্ডের মধ্যে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। মনে হয় শ্রীমতী গান্ধী বোঝেন, পাশ্চাত্যের উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত ভারতকে এক সারিতে ফেলা যায় না। ভারতের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চেতনাকে রাতারাতি পালটে দেওয়া সম্ভব নয়।

ভবিষ্যৎ এবং বিশেষ করে ১৯৮৫ সালে বিরোধী-দের কি ভাবে মোকাবেলা করা হবে তা নিয়ে শ্রীমতী গান্ধী দলের এবং বাইরের অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। কিছু শক্তিশালী বিদ্রোহীকে দলে ফিরে নেবার উদ্দেশ্যে তিনি ইতিমধ্যে কম করে ছয়টি প্রদেশ কং (ই) কমিটি পুনর্গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মধ্য প্রদেশে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন সিং এবং ভি পি শুক্ল এবং হরিয়ানায় ভজন লাল ও বংশীলালের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টার মধ্যে তার সত্যতা বোঝা যায়। নীচের তলায় কং (ই) কর্মীরা দলের সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত না হলে এই কৌশলের সাফল্য যে সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে কং (ই) সংগঠনে সেই জিনিসটারই একান্ত অভাব।

শ্রীমতী গান্ধীর তরফে বলা হয়, তিনি চান যাতে কংগ্রেসে সাংগঠনিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বহুকাল এই নির্বাচন হয় নি। কিন্তু যখনই সাংগঠনিক নির্বাচনের কথা ওঠে, বর্তমান আড্ হক ব্যবস্থায় দলে যে কায়েমী স্বার্থ ভোগী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে তারা কোন না কোন অজুহাতে নাকচ করে দেয়।

এ বছর সাংগঠনিক নির্বাচনের কথা হয়েছিল কিন্তু চারটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রশ্নে প্রস্তাব মুলতবী রাখা হয়। ঠিক সেই কারণে কংগ্রেসে সাংগঠিক নির্বাচন ১৯৮৫ সালের আগে অনুষ্ঠিত হতে পারবে না, যেহেতু আগামী বছরেও কতকগুলি রাজ্যে নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচন শেষ হতে না হতে বছর খানেক পরেই সাধারণ নির্বাচনের জন্য তৈরি হতে হবে।

কিন্তু সাংগঠনিক নির্বাচন না করার অনুকূলে এই যুক্তিগুলি কি সত্যই গ্রহনযোগ্য? যাঁরা এই যুক্তি মানতে চান না, তাঁদের কথা হল, সাংগঠনিক নির্বাচন না করে আড্ হক নিয়োগের ব্যবস্থা বহাল রাখার মূলে ইন্দিরা গান্ধী। শ্রীমতী গান্ধী চান না যে, দলে তাঁর অনুকম্পা না নিয়ে, সংগঠনের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভর রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব ঘটে। আজ কংগ্রেসে যাঁরাই ক্ষমতার অধিকারী তাঁরা সবাই তাঁর কাছে বাধিত। খুব সম্ভব অতীতে কংগ্রেসে সুপ্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর অভিজ্ঞতাই তাঁকে এ পথে এনেছে, কিন্তু দল মজবুদ করার প্রয়োজনে সাংগঠনিক নির্বাচন না

(শেষাংশ আট পৃষ্ঠায়)

ইজরাইল লেবানন থেকে সৈন্য সরাও

—কালীপদ সরকার

মিশরের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট সাদাত এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্টার পোর্ট ডেভিড চুক্তির দ্বারা আরব ও ইজরাইলের বিরোধ মেটাবার পথে যে বলিষ্ঠ সূচনা করেছিলেন তা এখন প্রায় শেষ। দুই রাষ্ট্রনায়কের কেউই এখন রঙ্গমঞ্চে নেই। সাদাত নিহত, কার্টার নির্বাচনে পরাজিত। পশ্চিম এশিয়া একটি উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চল। এই উত্তেজনার অনেক কারণ আছে। তার একটি হল বাস্তুহারা ২০ লক্ষ পালেস্তাইনী আরবদের পুনর্বাসন সমস্যা। সমস্যাটি খুবই জটিল।

১৯৪৮ সালে পালেস্তাইনকে দুই ভাগ করে, বৃহত্তর অংশে স্বাধীন ইজরাইল রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার সময় থেকে এই উদ্বাস্তু সমস্যার উদ্ভব। ১৯৪৮ সালে এই ঘটনা ঘটলেও, ইহুদীদের স্বতন্ত্র বাসভূমি গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯১৭ সালে বালফোর ঘোষণার দ্বারা। সিদ্ধান্ত নেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্ররাষ্ট্রপক্ষ। পালেস্তাইন নিঃসন্দেহে ইহুদীদের ঐতিহাসিক বাসভূমি কিন্তু সে ইতিহাস হাজার বছর আগের।

পালেস্তাইনের ওপর মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হলে ইহুদীগণ দলে দলে দেশ ত্যাগ করে ইউরোপ ও এশিয়ার নানাদেশে আশ্রয় নেন। ইউরোপ ছেড়ে অনেকে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। কিন্তু এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া কোথাও তাদের বসবাস নিবিঘ্ন হয় নি। অনেক দেশে দীর্ঘকাল বাস করেও ইহুদীগণ সে সব দেশের পূর্ণ নাগরিক অধিকার পান নি। ইহুদীগণ একেশ্বরবাদী এক প্রতিভাময় প্রাচীন জাতি। নিজেদের ঐতিহ্য ও ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন এবং সেই কারণে খৃষ্টান কিংবা মুসলমান কেউই তাদের প্রতি সৌহার্দ্যের হাত বাড়ান নি। পক্ষান্তরে সুযোগ পেলেই—সংখ্যালঘু ইহুদীদের ঠেঙ্গিয়েছেন। হিটলার আমলের জার্মানী যার এক নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত। পালেস্তাইনে ইহুদীদের দেশছাড়া হবার পর সেখানে আরব মুসলমানদের বসতি বিস্তার ঘটে। সামান্য কয়েক লক্ষ ইহুদী যারা দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে স্বদেশে থেকে যান তারা ছাড়া পালেস্তাইন আরবদের বাসভূমিতে পরিণত হয়। প্রায় হাজার বছরে এই পরিবর্তন সমাপ্ত হয়। ১৯১৮ সালে পালেস্তাইনের একাংশে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র ইজরাইলের জন্মলাভকে আরব রাষ্ট্রগুলি মেনে নিতে অস্বীকৃত হয়। অবশ্য সমগ্র পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ এবং সোভিয়েত রাশিয়া ইজরালইকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়।

ইজরাইল—আরব বিরোধিতা নিয়ে তিনটি বড় রকমের যুদ্ধ হয়ে গেলেও সমস্যার সমাধান হয় না। মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাতই প্রথম আরব নেতা যিনি বাস্তব অবস্থা মেনে নিয়ে ইজারাইলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং ইজরাইলের সহিত পোর্ট ডেভিডে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তার জন্য তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ইজরাইল আরব বিরোধ যে কত গভীর এ থেকে বোঝা যায়।

প্যালেস্তাইনের আরব উদ্বাস্তুরা আছেন লেবানন, জর্ডন এবং সিরিয়ার অস্থায়ী শরনার্থী শিবিরে। শিবিরের ব্যয়ভার বহন করেন জাতিপুঞ্জ সংস্থা। আবশ্যক অর্থের সিংহ ভাগ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এই শিবিরগুলি দণ্ডকারণ্যের শিবির নয়। শিবিরগুলি সবই পাকা বাড়ি ব্লক ও ফ্লাটে বিভক্ত এবং তাদের অবস্থান শহর সংলগ্ন আরব অধ্যুসিত অঞ্চলে, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে। সেখানে স্কুল, কলেজ

হাসপাতাল, শিশুশালা ইত্যাদি আছে। শরণার্থী-দের জন্য উন্মুক্ত আছে আরবরাষ্ট্রগুলিতে কর্মসংস্থান ব্যবস্থাও। সেখানে অনেকে কাজও পেয়েছেন। নানা দেশে ছড়িয়েও তারা পড়েছেন।

কিন্তু গত চল্লিশ বছরে আরব শরণার্থী সংখ্যা এক স্থানে বসে নেই। চতুর্গুণ কি তারও বেশী হয়েছে। সংখ্যা কুড়ি লক্ষে দাঁড়িয়েছে। যারা শরণার্থী হয়ে প্রথমে এসেছিলেন তাদের সকলেই যে চাপে পড়ে কিংবা নির্যাতিত হয়ে দেশ ত্যাগ করেছিলেন এমন নয়। অনেকেই মোটা টাকার লোভে ইহুদীদের কাছে স্বেচ্ছায় জমি বেঁচে জাত-ভাইদের কাছে এসেছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেরই এক্সোডাস হয়েছে। এখন যারা উদ্বাস্তু শিবিরে আছেন তারা নতুন যুগের মানুষ। রীতিমত রাজ-নীতি সচেতন। তাদের সংগঠিত করেছে পি, এল ও। (প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানিজেসন) মিঃ আরাফাত হলেন পি, এল, ও সংস্থার নেতা। এদের একটি দুর্ধর্ষ সমরার্থী বাহিনী বলা যায়।

আরব শরণার্থীদের প্রশ্ন হল, কতকাল আমরা এই অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবিরে কাল কাটাবো? আমা-দের না আছে ভবিষ্যৎ, না জীবনের নিশ্চিয়তা। লেবানন একটা ছোটদেশ, দেশবাসীর অর্ধেক আবার খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টান লেবানীজরা আরব উদ্বাস্তুদের বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না। লেবাননের রাজধানী বেইরুটে অবস্থিত শরণার্থী শিবির হল পালেস্তাইন মুক্তি সংস্থার সদর দপ্তর। সেটিও খ্রীষ্টানদের কাছে চক্ষুশূল।

ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা মানুষকে বে-পরোয়া করে। প্যালেস্তাইনী আরবদের অবস্থা এখন তাই। তাঁরা চান অবিলম্বে এ অবস্থার পরিবর্তন হোক। তাঁদের দাবি, প্যালেস্তাইনে একটি স্বতন্ত্র আরব রাষ্ট্র গড়ে, সেখানে তাঁদের পুর্ণবাসন দেওয়া হোক। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তাঁরা ইজরাইলের ওপর হামলা চালাতে থাকবেন। ইজরাইল ছোট হলেও শক্তি-শালী রাষ্ট্র, ইহুদীরা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, তাঁরা আরব উদ্বাস্তুদের হামলার উত্তর দিতে সদা সর্বদা প্রস্তুত। এই নিয়েই যুদ্ধ।

বর্তমানে লেবাননে আরব উদ্বাস্তু উপনিবেশ ও সদর দপ্তর বেইরুটের ওপর ইজরাইলী আক্রমণের কারণ হল প্রতিশোধ নেওয়া। এটি অসমানের লড়াই। পি, এল, ও যত দুঃসাহসীই হোক না কেন তাঁরা রাষ্ট্রহীন, বাইরের সাহায্য নির্ভর, অপর দিকে ইজরাইল সুগঠিত যুদ্ধ নিপুন দেশ। খবরে প্রকাশ, ইজরাইল চরম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত।

যুদ্ধ এখনো থামে ইজরাইলের হাতে প্যালেস্তিন ও লেবানীজ আরবদের নির্মম হত্যাকাণ্ড থামানোর জন্য আরব লীগের প্রেসিডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রেগন, সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ এবং রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব জাভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলারকে অবিলম্বে হস্ত-ক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছেন। অন্যদিকে ইজরাইল বাহিনীর সেনাপতি রাফেল এইতান বলেছেন, লেবাননে প্যালেস্তিন মুক্তিবাহিনীর রাজনৈতিক ও সামরিক ঘাঁটিগুলি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বেইরুট দখলের কোন অভিপ্রায় তাঁদের নেই।

ইজরাইল যুদ্ধ বন্ধ করে লেবানন থেকে সৈন্য সরিয়ে না আনলে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। সৌদি আরব হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি লেবানন থেকে ইজরাইলীদের দ্রুত সরিয়ে না দিতে পারে, তাহলে সৌদি আরবই তার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। সৌদি

আরব হল আমেরিকার সব চেয়ে বড় তেল যোগানদার।

ভারত বরাবর পালেস্তিনী আরবদের জন্য একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র বাসস্থান গড়ার অনুকূলে প্রয়াস চালিয়ে আসছে। আলাপ আলোচনার পথে বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে ইজরাইল ও পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলির একটা সমঝোতার আসার মাঝেই এই প্রয়াসের সাফল্য নির্ভর করে। অশান্ত পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের এটিই হল একমাত্র পথ। ভারত যে পালেস্তিনী আরবদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন তার অনেক পরিচয় ভারত অতীতে দিয়েছে এবং পালেস্তিন মুক্তি সংস্থাও তা আন্তরিক ভাবে স্বীকার করেছে। সাম্প্রতিক লড়াই-এ আহত প্যালেস্তানীদের চিকিৎসার্থে ভারত একটি মেডিকেল ইউনিট পাঠিয়েছে।

ভারত চায়, লড়াই নয়, আপস ও সমঝোতা হোক বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক নীতি।

●

(২য় পাতার শেষাংশ)

সরকারকেও যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করতে হবে। যে কোন রাজ্যে যদি অরাজকতা চলতে থাকে, তাকে প্রতিহত করতে হবে সংবিধান সম্মতভাবে। প্রয়োজন হলে. অযোগ্য ও গণতন্ত্র বিনাশকারী প্রশাসনকে ভেঙ্গে দিতে হবে। অন্যথায়, অন্যান্য রাজ্যেও অন্যায়কারী অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। গণতন্ত্রকে বাঁচতে হলে, অন্য পথ দেখা যায় না। জঙ্গলের রাজত্বের অবসান চায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। এটা করা প্রয়োজন শুধু পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে ই, সমগ্র ভারতের স্বার্থে-ই। একটা কিছু করুন, এই এরাজ্যের মানুষের দাবী।

(৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করার পক্ষে এটি কোন যুক্তি হতে পারে না

দলকে নবশক্তিতে সঞ্জীবীত করতে হলে আর একটি ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক দলের জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বভার দিতে হবে কেবল এ, আই, সি, সি,-র ট্রেজারারদের ওপর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীরা সেই ভাবে অর্থভাণ্ডার গড়ার প্রচেষ্টা চালাবেন, কিন্তু কখনও নিজেদের হাত দিয়ে টাকা তুলবেন না।

কোম্পানী কর্তৃক অর্থদানের ওপর যে বাধানিষেধ আছে তাও তুলে নেওয়া উচিত। অনেক আগেই তা করা উচিত ছিল। এটি হল একমাত্র ব্যবস্থা যার দ্বারা রাজনৈতিক দলে কাল টাকা প্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব।

(সমীক্ষামূলক প্রবন্ধটি ১০/৬/৮২ তারিখে অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদ : প্রতিবেদক বি: বা: । অমৃতবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকায়—
ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজ

—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ ও আজাদহিন্দ ফৌজের জন্মকথা, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগের সভাপতি রূপে রাসবিহারী বসু কর্তৃক সুভাষ চন্দ্রকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক পদে বরণ, নেতাজী কর্তৃক ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন, ব্রিটেন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ভারত অভিমুখে মুক্তি অভিযান, গান্ধীজীর স্বাধীনতা সংগ্রামের কৌশল (Strategy) পরিবর্তণ এই প্রবন্ধে তথ্যভিত্তিক আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে। এতে এই বিষয়ে উৎসাহী পাঠকদের বিভ্রান্তিমূলক গবেষণার সংশয় দূর করতে সাহায্য করবে।

(১)

১৯২৩ সালে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুকে জাপান সরকার জাপানের নাগরিক বলে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত রাসবিহারীকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে চলাফেরা করতে হত, নিজের গতিবিধি গোপন রাখতে হত, কারণ ইংরেজ গুপ্তচর সর্বদাই ফন্দিতে ছিল রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। এই অবস্থায়ও রাসবিহারী চুপ করে বসে ছিলেন না জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদদের ও বিদগ্ধ জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তাঁর রাজনৈতিক ধ্যাণ ধারণা প্রকাশ করতেন। রাসবিহারীর বক্তব্য পরবর্তী মহাযুদ্ধ থেকে শুরু হবে এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধের যুগ ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া মিশরো, সেলিবিশ, চীন, ফিলিপাইন, কোরিয়া মরোক্কো আলজেরিয়া, কংগো, আলজেরিয়া, কেনিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে শুরু হবে মুক্তিযুদ্ধ এই বিরাট মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে ভারতকে। তদুদ্দেশ্যে ভারতের বাইরে গঠন করতে হবে মুক্তি বাহিনী। এই পরিকল্পনার রূপ দেওয়ার জন্য জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করার পরই রাসবিহারী প্রকাশ্যে ১৯২৪ সালে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ গঠন করলেন। এশিয়া ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য স্থাপন করলেন অল এশিয়া পীপলস অর্গানেজেসন (All Asia pe plis organisation). উভয় সংগঠনের সভাপতি ছিলেন রাসবিহারী বসু।

১৯২৬ সালের ১লা আগষ্ট A. A. P. O র প্রথম সভা হয় জাপানের নাগাসাকিতে। উপস্থিত ছিলেন ২৭ জন জাপানী, ১২ জন চীনা ৮ জন ভারতীয়, ১জন আফগান, ১জন ভিয়েতনামী ও ১ জন ফিলিপিন। ব্রিটিশ হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন হতে কি করে এশিয়া মহাদেশকে মুক্ত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। এই সংস্থার শাখা স্থাপিত হয়েছিল পিকিং, সাংহাই, কোরিয়া, ফরমোজা টোকিয়ো, ইয়াকোহামা, নাগাসাকি, হিরোসীমা, ব্যাংকক, জাভা, বালি, সুমাত্রা, হংকং প্রভৃতি স্থানে। প্রতিটী শাখাতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও সংগঠিত হল জাপানের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ সালে গড়ে তুললেন ভারত জাপান মৈত্রী সমিতি। এশিয়ার ছাত্রদের সমাবেশের জন্য সেই বছরই টোকিয়োতে স্থাপিত হল ভিলা এশিয়ানস"। এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের নেতারূপে ১৯০৪ সালে

কোরিয়ার বুদ্ধিজিবী ও সাংস্কৃতিবান নাগরিকরা রাসবিহারীকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন।

১৯৩৭ সালে শুরু হল চীন জাপান যুদ্ধ। রাসবিহারী ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ আরও জোরদার করার জন্য মনোযোগ দিলেন। টোকিয়ো 'রেনবোতে' ৩০ জন নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের নিকট তিনি ঘোষণা করলেন 'এশিয়াবাসীদের জন্য এশিয়া, সাদা মানুষ ফিরে যাও'। সে বছরই ২৮ অক্টোবর টোকিয়োর সাংকাইডোতে রাসবিহারী নিখিল এশিয়া যুব সম্মেলন আহ্বান করলেন এবং এশিয়াবাসীর জন্য এশিয়া, সাদা মানুষ ফিরে যাও এই রাজনৈতিক ধ্বনী (Slogan) প্রচারের জন্য জাপান স্থিত বিভিন্ন সহর পরিভ্রমণ করলেন। চীন কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলের যুবকরাও প্রচুর সাড়া দিল।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইয়োরোপে যুদ্ধ বেঁধে গেল। জাপান ১৯৪১ সালের শেষের দিকে অক্ষ শক্তির পক্ষে যোগদান করে এ্যাংলো আমেরিকান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপানী নৌবহর পার্লহার্বার আক্রমণ করে আমেরিকান নৌবহরকে পর্যুদস্ত করল। জাপানী সেনাবাহিনী মালয়ে অবতরণ করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে লাগল। এমতাবস্থায় রাসবিহারী বসু ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগের সভাপতিরূপে জাপানী সামরিক বিভাগের সঙ্গে পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়রা মিত্ররাষ্ট্রের নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য চুক্তি করলেন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আনন্দ মোহন সহায়, দেশপাণ্ডে গুপ্ত, লিংগম রামমূর্তি, জেনারেল নারায়ণ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করে টোকিয়োতে জাপানবাসী ভারতীয়দের এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। সম্মেলনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগঠিত হওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হল এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সিদ্ধান্ত হল। ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ রাসবিহারী বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম গঠন করে টোকিয়ো শহরে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াবাসীর ভারতীয়দের সম্মেলন আহ্বান করলেন, সম্মেলনে মালয়ের বন্দী শিবির থেকে যুদ্ধবন্দী ক্যাপটেন মোহন সিং উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং পূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিনিধি নিয়ে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্স লিগ পুনর্গঠন করে জুন মাসে ব্যাঙ্ককে অধিকতর প্রতিনিধিমূলক সভা ডাকা স্থির হল। টোকিয়ো সম্মেলনে যাওয়ার পথে স্বামী সত্যানন্দ পুরী ওরফে প্রফুল্লকুমার সেন সহ চারজন ভারতীয় বিপ্লবী বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। সত্যানন্দ পুরী ব্যাংককে এক কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। সত্যানন্দ পুরীর জন্মস্থান ফরিদপুর জেলায় (বাংলাদেশ), রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারত অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার সময় বেনারসে একজন সংগঠক ছিলেন।

১৯৪২ সালের ১৫ থেকে ২৩ শে জুন নয়দিন ব্যাপি ব্যাংককে লিলা প্যার্কন হলে সম্মেলন হল। সম্মেলন উদ্বোধন করলেন থাইল্যানডের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবিচিত্র বদকর্ণ। বার্মা, মালয়, থাইল্যানড, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, জাপান, চীন; বোর্নিও; জাভা; সুমাত্রা, হংকং এবং আন্দামান থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে

যোগ দিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাপান; জার্মানী ও ইতালীর রাষ্ট্রদূতগণ। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠিয়েছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো, থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল বিপুল সংগ্রাম এবং জার্মানী থেকে সুভাষচন্দ্র।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং অন্যান্য বন্দী ভারতীয় সামরিক অফিসাররা সম্মেলনে ব্রিটিশের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রত্যাহার এবং সর্ব্বান্তকরণে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করালেন।

পূর্ব এশিয়া থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগকে স্বীকৃতি দান এবং ক্যাপটেন মোহন সিং এর অধিনায়কত্বে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় ও প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে সশস্ত্র সেনাদল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল।

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগের কাজ পরিচালনার জন্য রাসবিহারী বসুকে সভাপতি এন, রামরণ কে পি, কে মেনন লেঃ কর্ণেল গিলানী ও ক্যাপটেন মোহন সিংকে সদস্য করে একটী কাউন্সিল অব অ্যাকশন গঠিত হল।

বিপুল উৎসাহ নিয়ে কাজ আরম্ভ হলেও মাস কয়েকের মধ্যেই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল, ফৌজের মধ্যে দেখা দিল ব্রিটিশ পঞ্চমবাহিনীর কার্যকলাপ। ক্যাপ্টেন মোহন সিং কারারুদ্ধ হলেন বিরোধ মিমাংসার জন্য রাসবিহারীকে বৈঠকের পর বৈঠক ডাকতে হল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর দপ্তর নিয়ে এলেন সিঙ্গাপুরে লীগ ও সামরিক পরিষদের জরুরী বৈঠক ডাকলেন। বৈঠকে তিনটী প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গৃহীত হল (১) ভারতীয় স্বাধীনতা লিগের সভাপতিকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হল উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করা, আঞ্চলিক কমিটীর সভাপতি বাছাই করা, কোন অঞ্চল লিগের কর্মকর্তা নির্বাচন স্থগিত রাখা, মুক্তি আন্দোলন জোরদার করার জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রণয়ন করার সম্পূর্ণ অধিকার সভাপতির উপর অর্পণ করা হল।

(২) ফৌজের কেহ কোন রাজনৈতিক কার্য্য কলাপে যোগ দিতে পারবে না।

(৩) এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জাপানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে জার্মানি হতে জাপানে আনার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত হল।

১৯৪১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি নয়টার পর অতন্দ্র ব্রিটিশ প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে মুসলমান মৌলভীর বেশে, মটরে ভ্রাতা শরৎ চন্দ্র বসুর দ্বিতীয় পুত্র ডাঃ শিশির বসুকে মটর চালক করে সুভাষ চন্দ্র এলগিন্ রোড বাড়ী হতে উধাও হলেন। বিভিন্ন ধরণের বিপর্যয় কাটিয়ে কাবুলে উপস্থিত হন এবং উত্তম চাঁদ মালহোত্রার সাহায্যে সুভাষ চন্দ্র কাবুলের ইতালীয় রাষ্ট্রদূতের সহিত সংযোগ স্থাপনে সফল হলেন। ইতালীয় রাষ্ট্রদূত রোমস্থ পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করে সুভাষ চন্দ্রকে মস্কো, রোম অথবা বার্লিনে পৌছে দিতে সম্মত হলেন। ১৯৪১ সালের ১৮ই মার্চ সুভাষ চন্দ্র অরল্যাণ্ডো ম্যাজিট্রে নামে একটি ইতালীয় ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট নিয়ে কাবুল থেকে মটরে আফগান রুশ সীমান্ত পার হয়ে ট্রেনে মস্কো উপনীত হলেন, সঙ্গী ছিলেন দুইজন জার্মাণ ও একজন ইতালীয় কূটনীতিবিদ ২৮ মার্চ মস্কো থেকে বিমানে বার্লিন গেলেন।

জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে জার্মানীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও

আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করলেন। ১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে বার্লিনের আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে সুভাষ চন্দ্র ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘও স্থাপন করলেন, যোগ দিলেন আবিদ হাসান, নাম্বিয়ার; শর্মা, সুলতান, ডাঃ মল্লিক, গানপুলে, গিরিজা মুখার্জি, কুসুম পাল প্রমুখ প্রবাসী ভারতীয়রা। বার্লিনের তিয়রগার্থে খোলা হল আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সদর দপ্তর, বার্লিনের কেন্দ্র স্থল ৬নং সোফিয়েন ট্রাসে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ভবন হল নেতাজীর বাসস্থান। আবশ্যক অর্থ জার্মাণ সরকারের নিকট থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হল। ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে সুভাষ চন্দ্র আবার বেতার ভাষণ দিলেন।

সুভাষ চন্দ্রের প্রথম পরিকল্পনা হল জার্মাণী উত্তর আফ্রিকা অধিকার করে পশ্চিম এশিয়ায় প্রবেশ করলে জার্মাণীর সহায়তায় ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পথে মুক্তি অভিযান করবেন। জার্মাণীর উত্তর আফ্রিকা অভিযান পরিত্যাগ হওয়ায় সেই পরিকল্পনা সুভাষ চন্দ্রকে বাতিল করতে হল। ইতিমধ্যে পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশের অভাবনীয় পরাজয় এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে জাপানের উপস্থিতি ও রাসবিহারীর নেতৃত্বে টোকিয়ো সম্মেলনের খবর জেনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হতে মুক্তি অভিযান পরিচালনা করা স্থির করলেন।

১৯৪২ সালের ২২ শে মে সুভাষ চন্দ্র তাঁকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পাঠাবার ব্যবস্থা করার জন্য জার্মান সরকারকে লিখলেন। পত্রের উত্তরের অপেক্ষা না করে ২৮ শে মে সুভাষ চন্দ্র জার্মাণ রাষ্ট্রনায়ক হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করে পূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কয়েক দিন পর ব্যাংকক সম্মেলনে গৃহীত ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেনডেন্স লিগের আমন্ত্রণও তাঁর কাছে পৌঁছল। সুভাষ চন্দ্র পূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হলেন।

১৯৪২ সালের ৫ই ডিসেম্বর নেতাজী পুনরায় জার্মান সরকারকে লিখলেন রাসবিহারী বসুও জাপান সরকারকে সুভাষ চন্দ্রের জাপানে আগমন সুগোপনে ব্যবস্থা করার জন্য তাগিদ দিলেন।

জার্মানী ও জাপানের পররাষ্ট্র বিভাগ শেষ পর্যন্ত সুভাষ চন্দ্রের পূর্ব এশিয়ায় আসার ব্যবস্থা করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ আজাদ হিন্দ সংঘের ভার সহকারী অধিনায়ক শ্রীনাম্বিয়ার উপর ন্যস্ত করে ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী সুভাষ চন্দ্র জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে সাবমেরিনে পূর্ব এশিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গী অ্যাডজুট্যান্ট আবিদ হাসান। দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ চারিদিকে দৃষ্টি রেখে সাবমেরিণ কমাণ্ডার হের মুসেকবার্গ ১৯৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল সাবমেরিণ ভারত মহাসাগরের পশ্চিমভাগে মাদাগাস্কার দ্বীপের উপকূলে দাড় করালেন। সেখানে জলের নীচে অপেক্ষারত ছিল একটী জাপানী সাবমেরিন। ২৮শে এপ্রিল সঙ্কেত বিনিময়ের পর দুইটী সাবমেরিণ ভেসে উঠল জলের উপর। রবার বোটের সাহায্যে সুভাষ চন্দ্র ও আবিদ হাসান জার্মান সাবমেরিন ছেড়ে জাপানী সাবমেরিণে উঠলেন। ১৯৪৩ সালের ৬ই মে তিন মাসের বিপদ সঙ্কুল দীর্ঘযাত্রা শেষে মালয় উপদ্বীপের পেন্যাং বন্দরে অবতরণ করলেন এবং সেখান থেকে বিমানে ১৬ই মে টোকিয়ো পৌঁছলেন।

(চলবে)

বিগত নির্ব্বাচনের শিক্ষা ও কংগ্রেসের কর্ত্তব্য

জনৈক প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী

(প্রথম পর্ব)

গত ১৯শে মে নির্বাচনের সময় যে ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত রিগিং হয়েছে, সেটা আদৌ অপ্রত্যাশিত ছিল না। ভোটের ফলাফল যে এইরকম হবে, সেটা অনুমান করাও শক্ত ছিল না। যা ছিল প্রত্যাশিত তারই বাস্তবায়ণ প্রতিফলিত হতে দেখলেন পশ্চিমবাংলার মানুষেরা গভীর মনোবেদনার সঙ্গে।

কিন্তু নির্ব্বাচনের পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও নেতারা কি ভাবছেন এবং তার থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন জানিনা। কংগ্রেসের উপর এই রাজ্যের অসংখ্য মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস আছে, এটাই প্রমাণিত হয়েছে। ঘন মেঘের মধ্যে এটাই হল রূপালী রেখা। কংগ্রেসের সংগঠন যদি সময়মত অবহিত হয়ে মানুষের সমর্থন যদি কোন কাজে লাগাতে পারত, তবে এই নির্ব্বাচনের ফলাফল যে একেবারে ভিন্ন রকমের হত, সেটা সন্দেহাতীত।

এই রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই যে কংগ্রেস অনুরাগী এবং শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের উপর আস্থাশীল, সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করার কৃতিত্ব বহুলাংশে শ্রীমতী গান্ধীর এবং রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন বহু মানুষের। এরাজ্যের কংগ্রেস সংগঠন ও নেতারা এই আবহাওয়াকে নিজেদের অনুকূলে কাজে লাগাতে পারেন নি, বরং ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা পূরণের জন্য বহু অযোগ্য প্রার্থীকে দাঁড় করিয়ে, অন্তর্দ্বন্দ্বে নিমগ্ন থেকে একটা সুবর্ণ সুযোগকে নষ্ট করেছেন মাত্র, এই প্রধান শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আগামীদিনের জন্য।

অবশ্য এই সত্য কথাটাও স্বীকার করতে হবে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত যদি কারচুপি এবং রিগিং করার সুযোগ না পেত বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলগুলি তবে কংগ্রেসের পক্ষে এই অবস্থায়ও আরো অনেক আসন লাভ করা সম্ভব হত, হয়ত বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করাও অসম্ভব ছিল না।

নির্ব্বাচনের ফলাফল থেকে প্রথম ও প্রধান শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, সেটা হল আত্মকলহ বিসর্জন দিয়, নতুন পরিবেশে সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তোলা। তারা যদি অন্ধ না হন, তারা যদি বধির না হন, তারা যদি হস্তীমূর্খ না হন, তবে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন, কি বিরাট সুযোগের তারা অপচয় করেছেন, কি চরম সর্বনাশ করেছেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কি নিদারুণ ভাবে হতাশ করেছেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী স্বদেশ প্রেমিক মানুষদের। একটি দিনও নষ্ট না করে, তাদের এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে. যেমন করে থাকে বিশেষ করে সি পি আই (এম) দল। এই পদ্ধতি কৌশল তাদের থেকে শিক্ষা করতে কোন কুণ্ঠাবোধ থাকা উচিৎ নয়।

গণতান্ত্রিক কাঠামোকে বয়কট করে যে পর্বত প্রমাণ ভুল করেছিল এ রাজ্যের কংগ্রেসীরা, তার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কারণ, নির্বাচন বয়কট করে কোন রাজনৈতিক দলই গণতান্ত্রিক কাঠামোতে টিকে থাকতে পারে না। অতীত ভুলের জন্য আজ নতুন করে দোষারোপ, ঝগড়াঝাটি করে কোন লাভই হবে না। অতীত ভুলের জন্য অনুতাপদগ্ধ হয়ে সংগঠনকে জোরদার করার কাজের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই পথে যারা বাধা সৃষ্টি

করতে চাইবে ব্যক্তিগত ক্ষমতালাভের লোভে, তাদের বেটিয়ে বিদায় করে দিতে হবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে। হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল।

কিছু লোককে বাদ দিতে হবে পুরোপুরি ভাবে, কিছু লোককে কাটছাট করে নতুন পরিবেশের উপযোগী করে তৈরী করতে হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি হবে দেশপ্রেম ও জনসেবার অধিকারী মানুষদের পাদ প্রদীপের সামনে এনে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া, রাজনীতিকে যারা ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করে শুধু ব্যক্তিগতভাবে মুনাফালিকার করতে চায়, ন্যায় নীতি উচ্চাদর্শ মানবীয় মূল্যবোধ, দেশপ্রেমের অস্তিত্ব নেই যাদের মধ্যে তাদের সমর্থনে কোন অদৃশ্য হস্তের অস্তিত্বকেও ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে। দেশের মানুষের আস্থা, সমর্থন লাভ করতে হলে, কংগ্রেস কর্মীরা ও নেতারা যে কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও গৌরবকে পুনপ্রতিষ্ঠা করতে সঙ্কল্পবদ্ধ, তার বাস্তব স্বাক্ষর রাখতে হবে। দেশের মানুষ রাজনীতিক্ষেত্রের চরম অবনতি দেখে হতাশাগ্রস্ত, ক্ষুব্ধ এবং উদাসীন হয়ে পড়ছেন।

সহজ সত্যকে স্মরণ ও মনন করে কাজ করতে হবে, তা না পারলে, কোন সদুদ্দেশ্যই সাধিত হবে না। রাজ্যের ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও এই আদর্শ সামনে রেখে, ভবিষ্যতে পথ পরিক্রমা করতে হবে। অন্যথায় ব্যর্থতা অনিবার্য্য।

জনসমর্থন লাভের সুযোগ শীঘ্রই আসবে। কলিকাতা কর্পোরেশনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। এখনই কাজ শুরু করতে হবে ভোটার তালিকার সংশোধন, সংযোজন ও ভুয়াভোটার পরিবর্জন করার কাজ। নিষ্ঠা নিয়ে, ধৈর্য্য নিয়ে কাজে ব্রতী হতে হবে। এই কাজের মাধ্যমেই দুর্নীতি ও মিথ্যাচারের উৎস পঞ্চায়েত গুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিতে হবে। এইভাবে জনসংযোগ স্থাপন করতে হবে। সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে কোন চোরাগলি দিয়ে, কোন অন্যায় দুর্নীতি ও পঙ্কিলপূর্ণ অন্ধকার পথে বর্ত্তমান শাসকদল এবার ক্ষমতা পূর্ণ দখল করেছে। এরই মাধ্যমে যেখানে সাধারণ মানুষদের (যারা কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে) উপর অত্যাচার অবিচার চলেছে, যেভাবে তাদের খুন করা হচ্ছে, তার প্রতিবাদ ও তাকে প্রতিরোধ করতে হবে নিপীড়িত জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে। আইন শৃঙ্খলার শোচনীয় অবনতি, দলবাজীর নগ্নস্বরূপকে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকাশিত করে দিতে হবে। মানুষকে অভয়দান করতে হবে, তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অংশভাগী হতে হবে।

সর্ব্বোপরি তাদের জান-মান বাঁচাতে বদ্ধপরিকর হয়ে সাহসের সঙ্গে পূতিগন্ধময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সংগঠনের শাখা প্রশাখা বিস্তার গ্রামে, গঞ্জে, শহরে ছড়িয়ে দিয়ে সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে। দুষ্কৃতকারীদের সময় দিলে তারা ইত্যবসরে ঘর গুছিয়ে নেবে। অগ্রাধিকার দিয়ে এই নীতি বাস্তবায়িত করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সব দ্বন্দ্ব, সব ব্যক্তিগত লোভ আকাঙ্খা ক্ষমতা মদ মত্ততাকে বিসর্জন দিয়ে কাজ না করলে, সাফল্যলাভ করা সম্ভব হবে না, এই বাস্তবতাবোধকে জাগ্রত করতে হবে নিজেদের মনে।

কিন্তু কিভাবে একাজ করা সহজতর হবে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুচারটি কথা বলতে চাই আজকের নিবন্ধে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে আজ বহু বদ রক্তের আমদানী হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে একজন রোগীর দেহে নতুন রক্ত সঞ্চালন করে যেমন জীবনদান করা সম্ভব হয়, প্রতিষ্ঠানের নব জীবনলাভের

জন্য, বলসঞ্চারের জন্য নতুন রক্ত ইনজেকশান করতে হবে।

আজও এরাজ্যে হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী বেঁচে আছেন, যারা রাজ্যের কল্যাণ সাধণের জন্য তাঁদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে, ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে এই রাজ্য থেকে দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে চান। তাঁরা আজো কিছু দিয়ে যেতে চান মনুষ্যত্বের ও মানবীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করতে, প্রতিদানে কিছু না চেয়ে। দেশের মধ্যে আজো বহু বুদ্ধিজীবি শিক্ষিত মনস্বী বেঁচে আছেন, যারা সর্বতোভাবে সহায়তা করতে চান, রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে দূষিত পরিবেশ দূর করতে। আজো হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী যুবক যুবতী আছেন, যারা আদর্শলাভের জন্য চরম দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে, এমনকি জীবন আহুতি দিতেও প্রস্তুত। তাদের ডাক দিতে হবে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। তবে সে কাজের অন্যতম প্রধান সর্ত হবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে একটা পরিচ্ছন্ন রূপ দিয়ে ঢেলে সাজতে হবে। মাস্তান নির্ভর রাজনীতি ও রাজনীতিবিদ্‌দের চিরদিনের জন্য বর্জন করতে হবে।

এদের এবং এবার যারা নবাগত, দলের সেইসব ব্যক্তিদের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে কাজ করার জন্য। মৌল কথা হল, বর্তমানে যা চলছে তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। ডাক দিলে উপযুক্ত লোকের অভাব হবে না, এটা ধ্রুব সত্য, রাজ্যস্তরের এবং কেন্দ্রীয় স্তরের কংগ্রেস নেতাদের আমরা সম্পূর্ণ আশ্বাস দিতে পারি, নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে। আমরা বিশেষভাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি এবং অনুরোধ করি তিনি যেন নিজে অগ্রণী হয়ে কাজে অগ্রসর হন। তাঁর কাছে আরো অনুরোধ, কেন্দ্রীয় স্তর থেকে যেন কেউ ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বলিয়াদ স্থাপন করার জন্য, প্রদেশ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে একটি সাক্ষী গোপাল হিসাবে ব্যবহার না করেন। কমিটি গঠিত হবার পর তাদের বিচার বুদ্ধিমত কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। দিল্লীর হস্তক্ষেপের ভয়ে যেন তাদের তটস্থ না থাকতে হয়। তাদের চিরদিনের জন্য 'রাম-খোকা' করে না রেখে যেন সাবালক হতে দেন।

একাজ না করলে, সংগঠন কখনও মজবুত হবে না, প্রদেশের কর্ণধারেরাও দিল্লী থেকে হুকুম জারী করার আস্রাবহ থাকবেন। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ না করলে প্রদেশে নেতৃত্ব গড়ে ওঠার কোন সুযোগই পাবে না। গোটা দেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চতম নেত্রীর উপর নির্ভরশীল হবে। তার ফল কারো পক্ষে ভালো হবেনা—না দলনেত্রীর পক্ষে, না প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। এর মারাত্মক ফল হবে যে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা স্তিমিত হবে, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধের অবক্ষয় ঘটবে কেন্দ্র নির্ভর করে একটি ডাকঘরে পরিণত হবে গোটা প্রতিষ্ঠানে। এই মৌলিক প্রশ্নকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিচার বিবেচনা না করলে, কংগ্রেসের ইহকাল নষ্ট হবে, পরকালও ভ্রষ্ট হবে। আনন্দের কথা শ্রীমতী গান্ধী এসত্য উপলব্ধি করেছেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা প্রয়োজন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে, কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজের কর্মপন্থা সমস্ত কংগ্রেস কর্মীকে জানাতে ও বুঝিয়ে দিতে হবে। দেশের যেখানে সে কোন রকমের অত্যাচার অবিচার ঘটবে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, সুষ্ঠু জনমত গড়ে তুলতে হলে এটা একান্ত ভাবেই প্রয়োজনীয়। কংগ্রেসের প্রচার মাধ্যম অত্যন্ত দুর্বল, পক্ষান্তরে

প্রতিপক্ষ এ বিষয়ে দক্ষ।

প্রতিপক্ষের মিথ্যা প্রচারের মোকাবিলার জন্যই উন্নত ধরনের প্রচার মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মহাত্মা গান্ধীকেও তাঁর মতাদর্শ প্রচার ও অনুকূল জনসমর্থনলাভের জন্য তিন তিনটি পত্রিকা চালাতে হয়েছিল।

আরো একটি প্রশ্ন গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখতে হবে। আদর্শবাদ, নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের সব সময়ের জন্য কাজ করার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে। এ সি পি আই (এম) ছয় থেকে দশ হাজার কাডারকে ভাতা দেবার ব্যবস্থা করেছে বলে শোনা যায়। যাইহোক টাকার অভাব কোন বড় প্রশ্ন নয়। বরং সঠিক কর্মী নির্ব্বাচন ও সাহায্য বণ্টন ব্যবস্থাটা ত্রুটিপূর্ণ না হওয়া দরকার। প্রত্যেক শাখাকে হারাহারিভাবে এই অর্থ সাহায্য দেওয়া যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। প্রত্যেক ইউনিট যত টাকা তুলবে, হারাহারিভাবে তাদের সেই পরিমাণ বা তার বেশী পরিমাণ সাহায্য দেওয়া যেতে পারে।

এতে স্থানীয় কর্মীদের দায়িত্ব বাড়বে, কাজ করার আগ্রহ বাড়বে, কাজ না করে শুধু শুধু পয়সা আয় করার প্রবৃত্তিও দমিত হবে। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলে নির্বাচনের সময় যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয় তার পরিমানও যথেষ্ট কমে যাবে। উচ্চতম ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের এই প্রস্তাবটি বিশেষভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি এবং অনতি বিলম্বে চালু করতে অনুরোধ করি। ব্যালান্স সিট তৈরী করে দেখলে এই ব্যবস্থাই মিতব্যয়ী হবে পরিশেষে। পরিশেষে, আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকের নিবন্ধ শেষ করব।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত নির্বাচনে ১৪০টি কেন্দ্রে রিগিং হয়েছে বলে শ্রীপ্রিয়দাস মুন্সী বলছেন। তাঁর হাতে অকাট্য প্রমাণ আছে একথাও বলছেন। বর্তমান নির্বাচন সংক্রান্ত যা আইন আছে তাতে ইলেকসান কমিশনার কিছু করতে পারেন না বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এত বড় অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে। প্রয়োজন হলে আদালতের বিচার প্রার্থী হতে হবে। কিছুই হবে না বলে কোন রকমে নৈরাশ্যজনক মনোভাব গ্রহণ করলে বিরাট ভুল হবে। জনসাধারণকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে বামফ্রন্টের তথাকথিত বিরাটভাবে জনসমর্থনলাভের দাবী কত ভুয়া এবং কি ধরণের কারচুপির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এতে জন সংযোগ ঘটবে, সমর্থকদের মনোবল ফিরে আসবে এবং প্রশাসক দলের ভুয়া গণতন্ত্র প্রীতির নগ্ন প্রকাশ ঘটবে। তা ভিন্ন, গোটা দেশের গণতন্ত্রের উপর যে আঘাত হানা হয়েছে, হীন ও জঘন্য কৌশল অবলম্বন করে তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে, তার অবলুপ্তি ঘটাতে হবে দেশের মঙ্গলের জন্যই।

নির্বাচন যদি একটা প্রহসন হয়, তবে গণতন্ত্র ধ্বংস হবে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে নির্বাচন আহ্বণের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায় দেশের চরম সর্বনাশ কেউ রোধ করতে পারবে না। এটা শুধু দলীয় স্বার্থের জন্য নয়, জাতীয় কর্তব্যের হিসাবে পালন করতে হবে।

(চলবে)

Regd No. R N. 24911/71 | Biplabi Bangla | Regd WB/NC 77
Phone 4-1704
বার্ষিক :—মূল্য ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

130

সম্পাদক –
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাবীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। গৌরাঙ্গী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বোমার সংগ্রাম কাহিনী—.৫০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০ ৮। স্বাধীনতারশহীদ মা ও মেয়ে—.৫০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৫০ ১২। ভারতের মডেজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, দেশ বাঘের ডোরেমি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বাঘের ডোরেমি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৫.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭
নৈহাটী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৪

মূল কার্যালয়—৪ নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ৩২ শে আষাঢ় ১৩৮৯ ১৭ই জুলাই ১৯৮২	৪১ সংখ্যা

নবযুগ আসে বড়ো দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না, যদি এর প্রয়োজন না থাকত।

—রবীন্দ্রনাথ

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসে সৌন্দর্য আর সুষমার অপূর্ব মণিকাঞ্চনযোগ

—বাংলার হস্তশিল্প

বাংলার হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। শুধুগৃহসজ্জার উপকরণ নয়, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রেও হস্তশিল্পের নিজস্ব শিল্প সৌকর্য ও রুচিবোধ বিস্ময়কর। দীর্ঘদিনের সাধনা আর শিল্পবোধের ফলে হস্তশিল্পের প্রতিটি জিনিসই যেমন আকর্ষনীয়, তেমনি বাহারী। কারুকার্য আর রঙের বৈচিত্র্যে অননুকরণীয়। হস্তশিল্পের যেকোন দোকানে পাবেন নিত্যব্যবহার্য নানান সামগ্রী। জুট ও চামড়ার ব্যাগ, বাঁশ ও বেতের ট্রে, ম্যাট, পর্দা বিছানার চাদর এবং আরো কত কী প্রতিটি জিনিসই বর্ণসুষমা আর শিল্পসৌকর্যে অনন্য। প্রয়োজনীয় অথচ শিল্পবোধে ভাস্বর। আজই আসুন হস্তশিল্পের দোকানে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীও যে কত সুন্দর ও মনোহর হতে পারে, নিজেই দেখে নিন।

আজই আসুন লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প বিকাশ নিগম পরিচালিত বিপণি 'মঞ্জুষা' তে ও গ্রামাঞ্চলের গ্রামীণ শিল্প বিপণিতে।

বাংলার হস্তশিল্প ঘরে বোনও তৃপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার

আই, পি, এ,৭৯৬৫ —৮২

সম্পাদকীয়

বজ্র-বিদ্যুৎ ঘন ঝড়ের আগমনী

পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশে ঈশান কোণে যে সর্বনাশের মেঘ ঘনিয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে, আজ তা বজ্র-বিদ্যুৎ ঘন ঝড়ের আগমনী প্রায় অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। বলা বাহুল্য, এই দুর্ঘটনার দায়িত্বের সিংহভাগ পড়ছে, সি. পি. আই (এম) এর উপর। বামফ্রন্টের মধ্যে অন্য কয়েকটি দল আছেন বটে, তবে তাদের অবস্থাটা ত উল্টে করে দেওয়া কচ্ছপের মত যে অবস্থানে তাদের নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা সম্ভব হয়না। কর্তার ইচ্ছা হলেই তারা কিছু বলতে বা করতে পারেন। তাদের মতামতের কোন মূল্য দেয়না সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। এ জন্য কোন প্রতিবাদ করাও সম্ভব হয় না। কারণ সরকারে থাকতে হলে সি-পি-আই (এম) এর করুণা ভিন্ন সেটা সম্ভব হয়না। তাই এই সর্বনাশা পরিস্থিতির জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেই সব দায়িত্ব বহণ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত পশ্চিম বাংলার সব বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর। অবশ্য এ কথাও অনস্বীকার্য্য যে ছোট দলগুলিরও পশ্চিমবাংলাকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, তাদেরও দায়িত্ব আছে। তারা যদি এই ভ্রান্তপথে চলবার জন্য কোন প্রতিবাদ করতেন, তবে সেটা নিশ্চয়ই তাদের সুনাম রক্ষা করত। তা ভিন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে অন্ধভাবে সহায়তা ও সহযোগিতা করার পুরস্কার হিসাবে তিনটি করে মন্ত্রীত্বলাভ না করতেন, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ না করতেন, তবে তাদের পক্ষে কিছু বলার থাকত। কাজেই নিন্দাবাদ তাদেরও অবশ্য প্রাপ্য।

পশ্চিমবাংলার কি অবস্থা হয়েছে এবং আরো কি হতে চলেছে ! তার সমীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। গত পাঁচ বছর ধরে রাজনৈতিক স্বার্থে বেকুবের মত টাকা পয়সা শুধু বে-হিসেবীর মত খরচাই করেন নি, টাকা পয়সা নিয়ে নিজেদের খেয়ালখুসী মত ছিনিমিনি খেলেছেন। অর্থ-নৈতিকভাবে পশ্চিম-বঙ্গকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে রাজকোষ প্রায়শূন্য। এ অবস্থা একদিনে হয়নি, হয়েছে দিনে দিনে এদেরই অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে। রিজার্ভব্যাঙ্ক থেকে যদইচ্ছা ওভারড্রাফট্ নিয়ে খরচা চালিয়েছেন। অথচ লোককে ধাপ্পা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে ৩৪০ কোটি টাকার ওভারড্রাফট্ তারা নেননি। ইঙ্গিতটা ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার মিথ্যা কথা বলছেন এবং সে কাজ করছেন বর্ত্তমান জনদরদী সরকারকে হটিয়ে দেবার জন্য। আজ কিন্তু সুবোধ বালকের মত সেই হিসাবই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। পরের ধনে পোদ্দারী করব, আর সকাল বিকাল সন্ধ্যাবেলায় তাদের মুণ্ডপাত করব খবরের কাগজে মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে ও ধোকা দিয়ে, বেশীদিন কিন্তু একাজে চলে না। অঙ্কের যোগবিয়োগের ফল ত আর কারো হুকুমমত নির্দ্ধারিত হয়না। ঝুলি থেকে আজ বেড়াল আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী প্রগতিশীল, জন সরকারকে ফেলে দেবার জন্যই ওভারড্রাফট্ নেওয়া বন্ধ করেছে, এ কৈফিয়ৎও অচল। কারণ এটা সর্ব ভারতীয় ব্যবস্থার অঙ্গ মাত্র। কেন্দ্রীয় অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে

হলে এই ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। জ্যোতিবাবু প্রমোদ বাবু ও তার সমর্থকদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য গোটা ভারতের স্বার্থকে বিপন্ন করা যায়না।

সব চেয়ে উদ্বেগের কথা হল, এই টাকাটা নিয়ে জনস্বার্থে যদি খরচ করা হত, তবে পশ্চিমবঙ্গ বাসী কিছুটা লাভবান হত। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সুস্থ এবং জনকল্যাণের পথে এরা পদক্ষেপ করেনি। কারো কারো পক্ষে যে সাময়িক স্বার্থসাধন করা হয়নি, একথা বলাটা ভুল হবে। দল ও দলীয় ক্যাডারদের বেশ কিছুটা লাভ হয়েছে। দলের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার বাড়ী গাড়ী কেনা হয়েছে, গ্রামীণ স্তরে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বেশ কিছু দলীয় লোকেরা টাকা পয়সার কোন হিসাব দেয়নি। বারবার বলা সত্বে দিচ্ছেও না। হিসাব পরীক্ষক পাঠান হলে, তাদের সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতা ত করেই নি, যে দুই একজন কঠোর হতে চেয়েছেন এই দুর্নীতি ও লুঠের বিরুদ্ধে তাদের কারো কারো জীবনও দিতে হয়েছে। যে ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই আজ এদের উপর থাবা মারতে চাচ্ছে।

বর্ত্তমান প্রশাসক দল কেন একাজ করেছেন, এ প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। কয়েকটি কারণের মধ্যে দু একটি প্রধান কারণের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ক্ষমতায় এসেই হয়ত এরা বুঝে ফেলেছিল যে ক্ষমতার আসনের বাইরে থেকে আবোল তাবোল বলাটা যতটা সহজ, দক্ষ প্রশাসন চালানো ততটা সহজ নয়। ব্যর্থতা যখন আসবেই, তখন ঘর গুছিয়ে নেওয়াই ভাল। সেজন্য যথাযথ কাজকর্মে টাকা খরচ করার কোন নীতি বা মানসিকতাই এদের ছিলনা। শেষপর্য্যন্ত যদি কেন্দ্র ক্ষমতা দখল করে নেয়, তবে এদের অপকর্মের সব দায় দায়িত্বটা কেন্দ্রের ঘাড়ে পড়বে। তাদেরই নতুন করে এই রাজ্যের অর্থ-নীতি গড়ে তুলতে হবে, কারণ তারা ত একটা অঙ্গ রাজ্যের ধ্বংসের ত নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারবেন না। ইতিমধ্যে যা কিছু গুছিয়ে নেওয়া যায়। আর নিজেদের কাডার সৃষ্টি করে নেওয়া যায়। যে রাজ্যের নূন আনতে পান্তা ফুরায় তাদের খরচের সমীক্ষা করলেই এটা পরিষ্কার হবে। এরা কি করেছে? সরকারি ও আধা-সরকারী কর্মীদের প্রাপ্তিযোগ যতটা পেরেছেন বাড়িয়েছে, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে ঢালাও খয়রাতি ও অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। এই দুই খাতে বামফ্রন্ট সরকার প্রায় হাজার কোটি টাকা খরচা বাড়িয়েছে। বে-সরকারী পর্য্যায়ে নিজেদের ও সম্ভাব্য সমর্থকদের পাইয়ে দেওয়ার জন্যও কোটি কোটি টাকা খরচা করেছে। সিনেমার ছবি তুলতে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছে, 'প্রগতিশীল লেখকদের' (বলা বাহুল্য দলীয় আনুগত্য থাকলে) অচল বই ছাপার জন্যও লক্ষ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছে। দু'ইকোড় অসংখ্য সংস্থাকেও লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়ে দিয়েছেন।"

বলার অপেক্ষা রাখেনা এর কোনটাই উন্নয়নমূলক কাজ নয়। বস্তুতঃপক্ষে এর দ্বারা রাজ্যের অর্থ-নীতির দামগ্রিকভাবে কেনে মঙ্গল হয়নি। এরফলে রাজ্যে শিল্পোৎপাদন বাড়েনি। কৃষিউৎপাদন বাড়েনি, বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়েনি, অর্থনৈতিক বিকাশের পথ সুপ্রসারিত হয়নি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়েনি, বেকারী ভয়াবহরূপ নিয়েছে। ভূতের মত প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধু পশ্চাৎপদ হয়েছে। নির্লজ্জের মত কৈফিয়ৎ দিতে চেয়েছে যে রাজ্যগুলির "সীমিত" ক্ষমতার জন্য এরাজ্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। এই

ভারতবর্ষে যেন অন্য কোন রাজ্য নেই পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন। তারা ক্রমেই অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে কি-ভাবে। সেটা একমাত্র বামফ্রন্টের দলগুলি এবং বদ্ধউন্মাদ ভিন্ন সকলেই বুঝতে পারবেন।

যে হাল এই রাজ্যটির হয়েছে, একে বাঁচাতে হলে এখন কেন্দ্রীয় সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নেই কেন্দ্র সে কাজ করুন, এটা পশ্চিমবঙ্গবাসী অবশ্যই চায়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এদের হাতে টাকা তুলে দিলেও সেই একই ধরণের হালচাল বজায় থাকবে। কেন্দ্র যে সাহায্য দেবেন, তার প্রতিটি নয়াপয়সার হিসাব ত নিতেই হবে, অধিকন্তু দেখতে হবে এই রাজ্যের রাজস্ব কিভাবে ব্যয়িত হচ্ছে। এরা "দণ্ডে তৃণ ধরি" যদি স্ব দোষ স্বীকার না করে, পুরাণো স্বভাবের পরিবর্তন করার স্বাক্ষর না রাখতে পারে, তবে সাহায্য দিলে ত দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষার কাজই হবে। যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অর্থনীতিবিদ এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের এই হাল করেছেন, তিনিত আজ ধরাশায়ী, "বাতাহত কদলী বৃক্ষবৎ"। তাকে কৈফিয়ৎ দিতে এখন বাধ্য করা যাবে কিনা জানিনা। কিন্তু তাকে আবার পেছনের দরজা দিয়ে অর্থকমিশনের চেয়ারম্যান করার যে অপপ্রয়াস চলছে, তাতে বাধা দিতে হবে। সোজা বলে দিতে হবে যে এর হাতে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব দিলে, এক পয়সার সাহায্য কেন্দ্র থেকে মিলবে না। তার ভবিষ্যতের ভাবনা দলীয়স্তরেই আবদ্ধ থাক, জনসাধারণের রক্ত জল করা টাকা দিয়ে তাকে প্রতিপালন করা চলবে না। ডাঃ অর্জুন সেন-গুপ্ত এসেছিলেন এ রাজ্যে। অর্থমন্ত্রী ও অর্থসচিবের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। তবে আলোচনার বিষয়বস্তু জনসাধারণের অজ্ঞাত। এই রাজ্যের অধিবাসীদের দাবী তাদের ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলতে যেন না দেন কাউকে কেন্দ্রীয় সরকার।

এই শোচনীয় হাল বুঝতে পেরে শ্রী প্রমোদ বাবু কাডারদের সম্মুখে বলতে সুরু করেছেন যে যেকোন সময় তাদের ফেলে দেওয়া হতে পারে; সুতরাং সকলে প্রস্তুত থাকুন। এটা সমর্থকদের ভয় মনোবল পুনরুদ্ধার করা, না লড়াই করে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখল করার মহড়া, তা জানা যায় না। কেন্দ্রকে বলতেই হবে যে এই রকম অপপ্রচার চালালে, কোন সাহায্যই দেওয়া হবে না।

জনগণ যা ভাবছে, সেটা একজন কবির কথায় (সামান্য একটু বদল করে) বলাচলে যে কল্যাণ চাহ সখা, লজ্জা কি লজ্জা, দেউলিয়া দেয়া কাঁদে নিষ্ফল সজ্জা, ভেঙ্গে গেছে বিপ্লবের মেরুদাড়া মজ্জা।

শেষ কথা হল, যে প্রশাসনের আমলে মেয়েদের উপর গণবর্ষণ হয় ব্যাপকভাবে, তাদের প্রশাসন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেওয়াই উচিৎ বলে মনে করেন বহু চিন্তাশীল, দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী, নারীপুরুষ নির্বিশেষে।

———

নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রথম পর্ব সমাপ্ত কি ?

কালীপদ সরকার

গত ১৫ই জুন আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিল, "কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে শনিবার এগারজন মানুষকে পিটাইয়া মারার ঘটনার যে মিথ্যা বিবরণ রবিবার কলিকাতার রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে আই,জি পুলিশ দিয়াছেন তাহাতেই প্রমাণিত হয় এই সরকার কী জঘন্য ধরণের গোয়েবেলসি প্রচারের মাধ্যমে রাজত্ব চালাইতেছেন। ঘটনাটি স্রেফ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। ক্ষমতাসীন দলের পাশবিক দমননীতির ভয়াবহতম উদাহরণ। নিহতদের অন্তত ছয়জনকে যে সি,পি,এম-এর লোকেরা সর্বজন সমক্ষে পিটাইয়া মারিয়াছে স্থানিয় মানুষের তাতে সন্দেহ নাই। অথচ কলিকাতায় বসিয়া আই,জি পুলিশ সত্যব্রত বসু সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের জানাইতেছেন : চোর সন্দেহে এগারজনকে ক্ষিপ্ত জনতা পিটাইয়া মারিয়াছে। জেলার পুলিশ সুপার খবর দিয়াছেন, ইহাদের নিকট চোরাই মালও পাওয়া গিয়াছে। একটা জঘন্যতম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে ক্ষিপ্ত জনতা কর্তৃক চোর পিটাইয়া মারার ঘটনারূপে চালানোর কী ঘৃণ্য গোয়েবেলসি প্রয়াস দেখুন !"

এই সুস্পষ্ট অভিযোগের প্রতিবাদে সরকার আনন্দবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা আনেন নি। এ থেকে বোঝা যায় সরকারী বিবৃতিই সঠিক ছিল না। সাহসিকতার সহিত পুলিশের বড় কর্তার মুখোষ খুলে দেবার জন্য আমরা আনন্দবাজার পত্রিকাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কোচবিহার শহরেই এই ঘটনার কয়েকদিন আগে এক হতভাগিনী নার্স বর্ণালী ধর্ষিতা হয়ে মারা যান। এ কি নৈরাজ্য ও পাশবিক লালসার দৃষ্টান্ত নয় ? জানা যায়, তুফানগঞ্জে এগারজনকে পিটিয়ে মারার দিন রাজ্যের মুখ্যসচিব অমিয় সেন কোচবিহার শহরে ছিলেন। সার্কিট হাউসে তাঁকে আনন্দ দেবার জন্য সাঁওতালী নাচের আসর বসানো হয়েছিল। জেলা শাসক, পুলিশ সুপার প্রমুখরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যসচিব, জেলাশাসক এবং এস, পি, ঘটনার দিন তুফানগঞ্জে যাবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

গত ২রা জুলাই ঝারগ্রাম এলাকায় ছয়জন লোধা সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসীকে পিটিয়ে খুন করেছে একদল অ লোধা আদিবাসী। ৬২ বছরের এক বৃদ্ধাকে গণ ধর্ষণের ঘটনার পর লোধাদের হত্যা করা হয়। কিন্তু ধর্ষণকারীরা লোধা ছিল কিনা জানা যায় নি এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রাজনীতি ছিল কিনা তাও অপ্রকাশ। লোধাদের রক্ষায় পুলিশ কিছুই নাকি করে নি।

কিছুদিন আগে কসবায় যে আঠার জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে নারকীয় ভাবে পিটিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল তার পিছনে কারা ছিল তা এখনো সরকারীভাবে জানা যায়নি। এ ধরণের হত্যাকাণ্ড এখন পশ্চিমবঙ্গে নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হত্যাকাণ্ডের সহিত যুক্ত হয়েছে আর একটি উপদ্রব তা হল সংঘবদ্ধ নারীধর্ষণ।

গত পাঁচ বছরে যে হাজার কয়েক নরহত্যা সংগঠিত হয়েছে সে সম্পর্কে পুলিশ কতগুলি কেস আদালতে তুলেছে এবং কতজন অপরাধীর শাস্তি হয়েছে জনসাধারণ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নিকট তার বিবরণ চায়। অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং দণ্ডবিধান ঠিকমত না হওয়ার কারনে যে হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানি

এবং ধর্ষণের ক্রমবিস্তৃতি ঘটছে সে সম্বন্ধে কি সন্দেহের কোন হেতু আছে? গণ-আন্দোলন গণ-বিক্ষোভের মত লাঠিপেটাই, ডাকাতি, নরহত্যা এবং নারীধর্ষণের আগে 'গণ' কথাটি বসিয়ে দিলেই কি অপরাধের গুরুত্ব লঘু হয়ে যায়, না তার নিন্দা-গ্লানি এবং ভয়াবহতা ধুয়ে মুছে যায়?

এই সব জঘন্য সমাজবিরোধী কাজের পিছনে রাজনীতি আছে কিনা এবং থাকলে কোন রাজনৈতিক দল তার পিছনে আছে তার অনুসন্ধান এবং জনসমক্ষে সেই রাজনৈতিক দলের স্বরূপ তুলে ধরা যেমন দরকার, তেমনি দরকার তার আগে এ ধরণের নিন্দনীয় ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব নিঃসন্দেহে রাজ্য সরকারের কিন্তু সরকার যদি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন, তাহলে সরকারকে সচেতন করতে জনসাধারণকেই উদ্যোগী হতে হবে। এ কাজ করতে হবে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের মনে অন্যায় ও অবৈধ হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শক্তি জাগিয়ে। রাজ্যের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দলমত নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে হবে আন্দোলন গড়তে। কারণ, বাঙ্গালীর শিক্ষা সংস্কৃতির সুনাম রক্ষার দায়িত্ব তাঁদের।

দলবদ্ধ আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসাবে আজকাল 'গণরোষ' শব্দটি আকছার ব্যবহৃত হচ্ছে। সাংবাদিকরা তো কথাটি যত্র তত্র ব্যবহার করছেনই, এমন কি পুলিশও দায় এড়াবার উদ্দেশ্যে 'গণরোষ' শব্দটির আড়ালে নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকবার চেষ্টা করছে। 'গণরোষ' শব্দটি কিন্তু গণবার্তা, গণ-আদালত গণ-উৎসবের ন্যায় একটি লজিকের ফ্যালাসি। মুষ্টিমেয় কিছু সংঘবদ্ধ লোক সাধারণ মানুষকে ধোকা দিয়ে কাজ হাসিল করার কৌশল হিসাবে যে 'গণ' শব্দটি ব্যবহার করে একটু গভীরে দৃষ্টিপাত করলেই তা বোঝা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা এই তথাকথিত 'গণরোষের' শিকার হচ্ছেন, তারা হলেন বিপুল সংখ্যক অসংগঠিত জনসাধারণের কেউনা কেউ।

নিগৃহীত এবং নিহতরা যদি সন্দেহভাজন ব্যক্তিও হন তাহলেও কিছু দলবদ্ধ লোক কোন অধিকারে তাদের নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করবে? ডাকাত বা চোর বলে যাদের খুন করা হচ্ছে তারা সত্যিই ডাকাত কিংবা চোর নাও হতে পারে। এ ধারণার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। প্রমাণও আছে সংবিধান নাগরিকদের ধনপ্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সে প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্ব সরকারের। সমাজ শাসনের জন্য আছে পুলিশ, আইন, আদালত এদের ব্যয়ভার বহন করেন জনসাধারণ। আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেবার কোন অধিকার নেই কারো। তাহলে সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়ে যে সরকার ক্ষমতায় বসেছেন সেই সরকার এ জাতীয় অবৈধ হত্যাকাণ্ড চলতে দেন কেমন করে?

মজার কথা যে, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার নারকীয় হত্যাকাণ্ডগুলিকে যথোপযুক্তভাবে নিন্দা করেন না এবং সংবাদপত্রগুলি 'পিটিয়ে ডাকাত খুনের ঘটনা প্রভৃতিকে' হেড লাইন করে ছাপিয়ে এক ধরণের কৌতুক পরিবেশন করেন পাঠকবর্গকে। প্রকারান্তরে তাদের এই কাজ দলবদ্ধ দুষ্কৃতিকারীদেরই উৎসাহ দেয় কিনা ভেবে দেখা উচিত।

পশ্চিম বঙ্গের পুলিশ বিশেষ করে কলিকাতা পুলিশের দক্ষতা সম্পর্কে দেশের লোকের মনে একটা উচ্চ ধারণা ছিল। পুলিশ দপ্তরে যে সৎ কর্মঠ ও দক্ষ অফিসার নেই এমন নয়। তাই সর্বত্র যখন পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও অপদার্থতার অভিযোগ ধ্বনিত

তখন জনসাধারণ জানতে চান, পুলিশ প্রশাসনে এমন কি ঘটেছে যার ফলে তার পারদর্শিতার ঐতিহ্য বিলীন হতে বসেছে। রাজ্য প্রশাসনে পুলিশের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা মনে রেখে পুলিশের কর্তা ব্যক্তিরা কি একবার মুখ খুলবেন? দিনের পর দিন পুলিশের বিরুদ্ধে এই নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কতকাল তাঁরা মুখ বুজে সইবেন এ কথা কিন্তু তাঁদের জেনে রাখা উচিত যে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। আস্তে আস্তে হাতে গড়া দৈত্য একদিন তাঁদের ওপরই ঝাঁপিয়ে যে পড়বে না তা কে বলতে পারে?

আইনকে নিজের হাতে তুলে নেবার পিছনে অপর যে হেতুটি আছে তা হল পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা। থানায় খবর দিয়ে যখন কিছুই হয় না তখন নিজেরাই বিচার ও দণ্ডবিধান করি না কেন— এমন মনোভাব। মনোভাবটি কিন্তু ভয়ংকর বিপজ্জনক। হাটুরে মারের কথা অনেকেই শুনেছেন হয়ত, এই গণরোষ কিংবা ক্ষিপ্ত জনতার কাণ্ড সেই হাটুরে মারের এক আধুনিক সংস্করণ নয় কি?

পশ্চিম বাংলা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার শোচনীয় অবনতির কথা তুললেই পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির দিকে তাকাতে বলতেন। এর চেয়ে বড় অবিমৃশ্যকারীতা হতে পারে না। বর্তমানে এই রাজ্য ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ এবং ব্যাংক লুঠে আশে-পাশের রাজ্যগুলিকে এত পিছনে ফেলেছে যে মুখ্য-মন্ত্রীমহোদয়ের সে কথা বলার উপায়ও নেই।

ডাকাত দমনে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করতে না পেরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বপ্রতাপ সিং সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরূপ কুমারী বক্সীর ওপর দোষ না চাপিয়ে মুখ্য-মন্ত্রী নিজেই সকল দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে পশ্চিমবাংলা সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর অনেক আগেই পদত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হত। সে কথা থাক। জ্যোতিবাবু পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রিত্ব করার পর পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

মুখ্যমন্ত্রী কারখানার শ্রমিকদের অযথা ঘেরাও করতে নিষেধ করেছেন, সরকারী কর্মচারীদের সময়-মত হাজিরা দিতে বলেছেন, এবং খুবই জোরের সঙ্গে বলছেন, শুধু বেতন আর ভাতার দাবিতে সোচ্চার হলে চলবে না, কাজ করতে হবে। তাঁর এই অনুরোধ কিভাবে পালিত হবে কেউই জানে না। তবু মুখ্যমন্ত্রীর এই সতর্কবাণী প্রশংসনীয়। মুখ্য-মন্ত্রীমহাশয় আলস্য তন্দ্রাচ্ছন্ন পুলিশ বিভাগকে যদি একটু নড়ে চড়ে বসতে বলেন তাহলে জনসাধারণ নিজেদের কৃতার্থ মনে করবে।

পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ইংরেজি ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই পরাধীন ভারতবর্ষে এক সম্ভ্রান্ত বাঙালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। স্বাধীন ভারতে তিনি যে ভারতরত্ন হয়ে শুধু পঃ বঙ্গে নয়—সারা ভারতবর্ষের মুখোজ্জলকারী দেশনায়করূপে পরিচিত হবেন তা কিন্তু ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নিজেও অনুমান করতে পারেন নি। কেননা, তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যায়—'ভাল ছেলে ছিলাম না, কোন উচ্চাভিলাষ সেখানে ছিল না—পরীক্ষায় ভাল ফল আশা করতাম না, পাস করে যেতাম। কত জনে তো ভাবেন বড় নেতা হবো—সংস্কারক হবো, লেখক শিল্পী বা বিজ্ঞানী হবো। আমার কিন্তু সে সব মনেই হতো না। এক আধবার ভেবেছি হয় ইঞ্জিনিয়ার হবো, নয় ডাক্তার। এছাড়া ছাত্র অবস্থায় আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না।'

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যে দেশের সেরা চিকিৎসক হয়েছিলেন, তা কিন্তু তাঁর ভাগ্যলিপির ফলেই। কেননা, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হওয়ার আগেই ডাক্তারীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ তিনি লাভ করেন। কিন্তু নিছক পেশাদার ডাক্তার তিনি হলেন না। ডাক্তারী পড়বার সময়ই তিনি এদেশের আর্ত মানুষের প্রকৃত চেহারা দেখেছিলেন। তাঁর নিজের কথাতেই বলি: 'এই ডাক্তারী পড়তে গিয়েই আমরা দেখেছি আমাদের দেশের মানুষকে। আমাদের দেশের মানুষ কী অপরিসীম দুঃখ দুর্দশার মধ্যে রয়েছেন, কত কষ্টই না তাঁদের ভোগ করতে হচ্ছে। তখন থেকেই এঁদের জন্যে কিছু করবার, লড়বার, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করবার একটা তাগিদ অনুভব করতে থাকলাম।'

এই সহজাত মানব প্রেমিকতাই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে সর্বোচ্চ চিকিৎসক পরিণত করেছিল।

মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা সমাপন করে ডাক্তার রায় বিলেতে আরো উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে ব্রতী হলেন। এক বৎসরের ব্যবধানে তিনি এম, আর, সি, পি এবং এফ, আর, সি, এস কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে স্বদেশে ফিরে এলেন। চিকিৎসা বিদ্যার অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয়ও দিলেন। কিন্তু এইখানেই তাঁর জীবনপথ থেমে রইল না।

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সংগ্রামীজীবন এবং দেশপ্রেমের কথা আমাদের সকলেরই তো জানা। ডাক্তার রায় স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্বদেশ চিন্তার মধ্যে কোন কাঁকফাঁকি ছিল না। কোন দলীয় মতবাদ বা দলবাজীর চিকিৎসা ডাক্তার রায়ের পলিটিক্যাল জীবনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি বিবেকের নির্দেশেই চলতেন। এ বিষয়ও তিনি নিজের কথায় বলেছিলেন, 'আমি পলিটিক্যাল বিলাসকার নই! কাকে বলে গণতন্ত্র কাকে বলে সমাজতন্ত্র তা আমি জানি না। আমি শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছি যে কি ভাবে, কোন পথে আরো দেশবাসীর সেবা করা যায়। আমি যে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলাম তার একমাত্র কারণ আমি ভেবেছিলাম যে ঐ সংগঠনের মধ্য দিয়েই সবচেয়ে বেশী কাজ করা যেতে পারে। যদি আমার মনে হতো কংগ্রেস নয়, অন্য কোন সংগঠনের মধ্য দিয়েই আরো বেশী কাজ করা যাবে, তবে আমি তাতেই যোগ দিতাম। আমি কাউকে বলি না এ দলে বা এ সংগঠনে যোগ দিন, কারণ এ ব্যাপারে আপনার বিবেকেই আপনার সেরা বিচারক। বিবেকের নির্দেশ মেনে চললে আমরা বিপথগামী হবো না। আমাদের শুধু আমাদের নিজেদের প্রতি আন্তরিক হতে হবে—কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।'

বিবেকের নির্দেশেই ডাক্তার রায় রাজনীতিতে নেমেছিলেন, চিকিৎসক বৃত্তিতে তখন তাঁর বিপুল পসার, কিন্তু সেই পসারকে একটি সীমার ক্ষেত্রে সীমিত রেখে তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলেন। কেননা, তাঁর ধারণা ছিল চিকিৎসকরূপে দেশের আর্ত জনগণের সেবার যে আদর্শ তিনি গ্রহণ করেছিলেন রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি তাকে আরো প্রসারিত করতে পারবেন।

আর তিনি যেতা পেরেছিলেন তার বিপুলতর পরিচয় আমরা স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নব নব রূপায়নে দেখতে পেয়েছি। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গঠনমূলক যা যা কাজ হয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়েরই আনুকূল্যে। কল্যাণী, দুর্গাপুর, জলঢাকা, শীতলখণ্ডি, ব্যাণ্ডেল, সি. এম, ডি, এ, স্বাস্থ্যের পরিবহণ, মেট্রোরেল, ম্যালেরিয়া, পশ্চিমবঙ্গে এক থেকে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা সংস্কার, হাসপাতাল বৃদ্ধি, হলদিয়া, সল্টলেক, আরো কত কি। ক্ষুদ্র সীমানায় বিভক্ত বঙ্গভূমি, উদ্বাস্তু, বেকার, শিক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের অবদান অতুলনীয়, বিপুল কর্মযজ্ঞের সে পরিধি তাঁর পরবর্তীকালে কি আর প্রসারিত হয়েছে? প্রগতি তো নয়ই, বরঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ আজ অধোগতির পথে

গভীর আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ় মানসিকতা এবং বিবেকবোধ—এরই অধিকারী ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

ডাক্তার রায়ের নিজের কথার আর একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি—'মেডিকেল কলেজের ছাত্র জীবন ভালভাবেই কাটছিল, কিন্তু একটা ঘটনা ঘটলো ফাইন্যাল পরীক্ষায় দিন পনেরো পূর্বে। বেলা তখন দশটা। আমি দাঁড়িয়েছিলাম মেডিকেল কলেজের মেইন গেটের প্রবেশ পথে। দেখলাম আমার অধ্যাপক কর্ণেল শেক তাঁর ডহাম মোটর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসছেন। সেটা ১৯০৬ সালের কথা। উত্তর কলকাতায় তখন সবে বিদ্যুৎচালিত ট্রাম চালু হয়েছে। ট্রামটি আসছিল দক্ষিণ দিক থেকে। শেকের গাড়ি তখন মেডিকেল কলেজ গেট পার হয়েছে—চলন্ত ট্রামের গায়ে ধাক্কা লাগল শেকের গাড়ির। শেক সাহেবের ডহাম মোটর ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অধ্যাপক শেক নেমে এসে ট্রাম চালককে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। অভিযোগ করলেন যে ট্রামচালকই দোষী। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি আমার সমর্থন চাইলেন, কিন্তু আমি তাতে রাজী হলাম না। আমি বললাম, এ দুর্ঘটনার কারণ ট্রামের চালক নয়, আপনারই গাড়ির চালক। ফাইন্যাল মেডিকেল পরীক্ষার মাত্র আটদিন বাকী। অধ্যাপক শেকের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজী না হওয়ার ফলে ধাত্রী বিদ্যায় ফলিত পরীক্ষায় আমি অকৃতকার্য হলাম। অধ্যাপক শেক যে আমাকে ফেল করিয়েছেন সেকথা বললাম প্রিন্সিপাল লুকিসকে: লুকিস বিস্ময় প্রকাশ করে আমাকে পনের দিন পরের অনুষ্ঠিতব্য এল, এম, এস পরীক্ষা দিতে বললেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কর্ণেল শেক আছেন। পরীক্ষা হলে আবার মুখোমুখি হলাম কর্ণেল শেকের, এবং তিনি আমাকে দেখেই রাগে চিৎকার করে বললেন, তুমিতো সেই ছোকরা যে এফ, বি পরীক্ষায় ফেল করেছে। আমি বললাম, আপনিই তো আমাকে ফেল করিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে যদি আসতে তা হলে পাস করিয়ে দিতাম। আমি বললাম, পরীক্ষার্থী হিসেবে আমি তার প্রয়োজন বোধ করিনি। এরপর কর্ণেল শেক বললেন, তোমাকে পরীক্ষা করার আর দরকার নেই। যাও, তুমি পাস করেছে। স্বাধীনচেতা, নির্ভীক এবং বিবেক পরিচালিত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জীবন ভরা এমনিই কত কাহিনীই না আছে।

ইংরেজি ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই ডাক্তার রায় পরলোক গমন করেছেন। তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ হলো কই?

উৎপাদনে সয়ন্তরতা চাই-ই চাই

—বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত স্বাধীন হয়েছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ব্বে অথচ বৈষয়িক অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার পদক্ষেপ ঈপ্সিত ফল লাভে সক্ষম হয়নি কেন? এর মূলে একদিকে সরকারী দীর্ঘসূত্রীতা ও অপরদিকে জনগণের সম্যক সচেতনতার একান্ত অভাব। এদেশের কি কৃষক, কি শ্রমিক, কি অফিস-কর্ম্মচারী, কি প্রশাসনে যুক্ত কর্মীরা, এক কথায় প্রতিটি কর্মীই কর্ত্তব্যে উদাসীন। উপরোক্ত সবাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তারা যে রকম শ্রম স্বীকার করে সে তুলনায় তারা ন্যায্য মজুরী বা উপযুক্ত বেতন পায় না।

অন্তত: বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ঐরূপ ধারণা সৃষ্টি করে শ্রমিক—কর্মচারীদের মানসিকতায় এমন মারাত্মক ভুল তথ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে যা সত্য নয় একদিকে: অপরদিকে বিকৃত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। খেতে খামারে, কলে-কারখানায়, অফিস-কাছারিতে, খনি-গর্ভে পর্ব্বত গাত্রে এককথায় এদেশের মানুষ যে যেখানে কর্মরত, সেখানেই সে পরিপূর্ণ উৎসাহ নিয়ে কর্ম করে না প্রথমত:, দ্বিতীয়ত: যদি কেউ একটু বেশী উৎসাহ দেখায় তবে তার ক্ষতি সাধনের জন্য অন্যান্যেরা সবাই মিলে দল বেঁধে পেছু লেগে যায়। ফলে শ্রমিক কর্মচারীরা কেউ কেউ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কাজে ফাঁকি দেয়, আবার কেউ কেউ অপরাপরের চাপের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাকৃত ভাবে কাজে ফাঁকি দিতে বাধ্য হয়। ভারতীয় শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের প্রশ্রয়ে যথানির্দ্দিষ্ট কর্মে গাফিলতি দেখাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বহুকাল পূর্ব্বেই। ফলে এদেশে সর্ব্বক্ষেত্রেই মন্থর গতিতে কর্ম চলে, যার ফলশ্রুতি বৈষয়িক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিরাট বাধা ও আকাঙ্খিত ফল লাভ কোন মতেই সম্ভব হয় না।

সরাসরি বিচার করলে একথা প্রমাণিত সত্য বলে স্বীকৃত হবে যে, ট্রেড-ইউনিয়নিজমের ভুল ব্যাখ্যায় ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে অত্যধিক স্পর্শকাতরতা ও ভ্রান্ত পথ অনুসরণে একাগ্রতা ও একতাবদ্ধতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক সময়েই জাতীয় ক্ষতির কারণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে প্রতীত হয়। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা স্বাধীনোত্তর ভারতের বৈষয়িক উন্নতির পথে বহু বিচিত্র রকমের বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন দলীয় স্বার্থে অন্ধ হয়ে, যা জাতীয় শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিরাট ভাবে ক্ষতি করেছে। বেকারী বাড়ার মূলেও ভ্রান্ত ট্রেড-ইউনিয়নিজম ও সরকারী অবিমৃষ্যকারীতা।

সদ্য স্বাধীনতালব্ধ দেশে প্রতিটি কর্মোদ্যোগে কি সরকারী, কি বেসরকারী, সর্বত্রই কর্ম্মী ও ম্যানেজমেন্টের পূর্ণোদ্যমে কঠিন শ্রম স্বীকার করা যেখানে অত্যাবশ্যকীয় সেখানে ভারতের চিত্র ভিন্নরূপ। এখানে শ্রমিক কর্মচারীরা যেয়াল খুসীর ওপর নির্ভর করে কাজ করে, হাতে রেখে কাজ করে, কাজে যথেষ্ট বেশী স্বেচ্ছায় ফাঁকি দেয় ইউনিয়ন নেতাদের উস্কানিতে ও পাইয়ে দেবার ষড়যন্ত্রী রাজনীতির লোভানিতে ভুলে। তারা মনেই করতে পারে না যে, তাদের এই চক্রান্তের ফলে তারা নিজেরাও ভোগ্য পণ্যের বাজারে যখন ক্রেতা হয়ে ঢুকবে তখন তাদেরই অতীত কৃতকর্ম্মের ফলে প্রতিটি ভোগ্য পণ্যের জন্য অধিক মূল্য দিতে তারাই বাধ্য

হবে। এদেশের শিল্প বাণিজ্যের মালিক ও পরিচালকরাও বহু ধরণের কারসাজি করে, শ্রমিক-কর্মচারীদের ঠকায়।

তাদের ন্যায্য মজুরী দিতে কার্পণ্য করে, খাতার হিসাবের মার প্যাঁচ কষে সঠিক বোনাস দিতেও নানা অন্যায় অজুহাত দেখিয়ে তাদের বঞ্চিত করে। মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের এ সব ন্যায়-নীতিহীন কার্যা-কারণের ফলে দেশের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে বহুকাল ধরেই। তবুও কারো চৈতন্যোদয় আজো হয় নি। সরকারকে দৃঢ়তার সঙ্গে উভয় পক্ষকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য শ্রম নীতি ও বর্ত্তমান আইনের আশু পরিবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হতেই হবে, অন্যথায় দেশের সর্বাত্মক বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব নয়।

সরকারের এব্যাপারে গাফিলতি বড় কম নয়। সরকারের দায়িত্ব জনগণকে তাদের মঙ্গলের জন্য সতর্কীকরণ ও সঠিক পথে চলার মত অবস্থার সৃজন। বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এব্যাপারে এতদিন পরে কিছুটা সচেতন হয়ে ১৯৮২ সালকে উৎপাদনের বছর হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সেদিকে লক্ষ্য স্থির রেখে সরকার আগে চলতে ইচ্ছুক দেখা যায় কিন্তু কেবলমাত্র ঘোষণা ও গতানুগতিক পথে বিচরণ কোন সুফল দিতে পারবে না।

বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগে শ্রমিক-কর্মচারীদের যুক্তি তর্ক দিয়ে সন্দেহাতীত ভাবে বোঝাতে হবে যে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর যেমন ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার স্বীকৃত তেমনই দেশের উৎপাদনকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায় ও দায়িত্ব ঐ শ্রেণীর উপর মূলত বর্ত্তেছে। ফলে শ্রমিককর্মচারীরা দেশের প্রাণ শক্তির স্ফুরণে উদ্যোগী না হলে বা, উৎপাদন বাড়াতে মনস্থ না করলে দেশ পেছিয়ে পড়বে ও কার্য্যতঃ বেকারী বেড়েই চলবে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, সে দায় ও দায়িত্ব বিভিন্ন ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের এবং দেশের শিক্ষিত জনমানসেরও। দেশকে সমৃদ্ধিশালী, স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব সকলেরই, কিন্তু কোথায় সে শুভ প্রচেষ্টা? কেবল খেয়োখেয়ি, দলাদলি, পরস্পরের গায়ে কাদা ছোঁড়াছুড়ি প্রভৃতি নোংরা কাজে নেতৃবৃন্দ যদি সদাব্যস্ত ও সদা নিযুক্ত থাকেন, তবে দেশ গড়ার মহান দায়িত্ব নেবে কে? কাজেই সবাই মিলে এদেশের উৎপাদনের মাত্রা যাতে ক্রমশই বাড়তে পারে সে দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন, অন্যথায় দেশের এরূপ অধোগতিতে আমরা সবাই কষ্ট পাব ও দারিদ্র্য দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থায়ী বাসা বাঁধতে থাকবে অতীতের মত আজও।

শ্রম বিরোধ আইন ও অন্যান্য শ্রমজীবি সংক্রান্ত আইন নূতন দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে, এদেশের জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ চিন্তায় ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রেখে একদিকে, অপরদিকে ঐ শ্রেণী যাতে ভুল নেতৃত্বের কুক্ষিগত হয়ে জনগণের ও স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বার্থ হানিকর কোন কাজেই না উৎসাহ পায় তাও দেখা সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য। জনগণ ও সরকার উভয়ে সচেতন হলে তবেই শিল্পে শান্তি বজায় রাখা ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব, নচেৎ নয়।

দেশে সর্বস্তরে উৎপাদন বৃদ্ধি মানসে সবাই যদি সচেষ্ট হয় ও সেই প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করতে অগ্রসর হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয় উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে। কিন্তু অনেক রাজা সরকার মুখে

উৎপাদন বাড়াবার কথা প্রকাশ করলেও কাজে তার কিন্তু কোন আভাস পাওয়া যায় না।

'এসমা' ও 'নাসা' আইন কেন্দ্রীয় সরকার চালু করতে চাইলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার বিরোধী-তায় পঞ্চমুখ। বর্তমানে এদেশে কিছু কঠোর ব্যবস্থা না নিলে কোথাও উৎপাদন বা কর্মসম্পাদন সঠিক গতিলাভ করবে না। রেল, ডাক-তার বিভাগ ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ সংস্থা প্রভৃতি জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান যেরূপ ঢিলেঢালা ভাবে, অনিয়মিত ভাবে ও খেয়াল খুশীমত চলছে তাতে কিছুতেই দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিও যাতে নিয়ম নিষ্ঠা মেনে সঠিক গতিতে চলে তারজন্য প্রয়োজনবোধে আরো কঠোর আইন প্রণয়ন দরকার। শ্রীমতী গান্ধী যতই দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন না কেন তা কিছুতেই সফল হবে না; যদি না বিরোধীদলগুলি এই অত্যন্ত জরুরী কাজে অগ্রাধিকার দেবার জন্য একমত না হন ও তাঁদের দলের শ্রমিক সংগঠনগুলিকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাপ সৃষ্টি না করেন।

বহুদিন ধরে এদেশে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে একশ্রেণীর মানুষ ও নেতা স্বাভাবিক উৎপাদনকেও নানা ছল-ছুতায় নিম্নমুখী ও নিম্নমানের মধ্যে স্থিতিশীল রাখার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কিষাণ মজদুরদের ধোঁকা দিয়ে বিপথগামী করেছে। তাদের সেই দুষ্ট প্রভাব থেকে ও পাইয়ে দেবার হীন রাজনীতি থেকে খেটে খাওয়া মানুষ-জনকে সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনতে হলে চাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সমাজ কর্মীদের, যারা শ্রমিক অসন্তোষকে প্রশমিত করবে ও উৎপাদনের গতিকে ঊর্দ্ধমুখী ও উচ্চমানের করতে বিশেষ সাহায্য করবে।

ব্যক্তি স্বার্থ গোষ্ঠীস্বার্থ দলস্বার্থ প্রভৃতি নিকৃষ্ট স্বার্থবোধের হাত থেকে কিষাণ মজদুরদের রক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে ঐ সব খেটে খাওয়া মানুষদের রুখে ওঠার মত সাহস জোগাতে হবে, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের তাদের পাশে দৃঢ়তার সাথে দণ্ডায়মান হয়ে, তবেই ঘন ঘন শিল্প ধর্মঘট, রেল-ডাক-তার ধর্মঘট, ডক ধর্মঘট, সরকারী উদ্যোগে বা সংস্থায় ধর্মঘট ইত্যাদি মারাত্মক দেশস্বার্থ বিরোধী সামাজিক ক্ষতিকর কাজগুলি বন্ধ করা সম্ভব হবে।

বুদ্ধিজীবিদের, শিক্ষকদের, সমাজসেবীদের সর্বাগ্রে এগিয়ে এসে উক্ত ধর্মঘটগুলির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে হবে উৎপাদনের গতিকে উন্নত করার প্রচেষ্টায় ও শ্রমিক-কর্মচারী শ্রেণীর মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে সুযুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যে, তথাকথিত শ্রমিকনেতারা তাদের নিজ নিজ দলের রাজনৈতিক মুনাফা তোলার জন্য মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত উপায়ে খেটে খাওয়া মানুষদের ভুল বুঝিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নানা মিথ্যা তথ্য ও ভুল যুক্তি দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষতি করছে, দেশের ক্ষতি করছে ও সমাজের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট করছে। দেশের বৃহত্তম কল্যাণ সাধনের আশায় শ্রীমতী গান্ধী বহু প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতিত ঐ সব প্রকল্প সঠিক ভাবে রূপায়ণ অসম্ভব ও অনিশ্চিত।

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হয়ে এদেশের তৈরী মালামাল উৎকৃষ্ট মানের ও স্বল্প-মূল্যের না হলে টিঁকে থাকা দুরূহ, বিশেষ করে রপ্তানী বাণিজ্যে। দেশকে যদি বিশ্বের দরবারে

প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতে হবে। শিল্পে, কৃষি কর্মে, খনিতে, তৈল কূপে সর্ব্বত্র শান্ত পরিবেশ বজায় রাখা ও অসন্তোষ দূরীকরণ বিশেষ আবশ্যক জাতীয় স্বার্থে। উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপন্ন মালের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিও দেশস্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। বিদেশের অঙ্গুলি হেলনে এদেশের একশ্রেণীর লোক দেশের প্রকৃত ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে কিষাণ মজদুর ভাইদের বিপথগামী করার জন্য বহু হীন কৌশল ও ষড়যন্ত্র অবলম্বন করছে।

এর বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক সৎ নাগরিকদের সংঘবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টা চালান খুবই দরকার আজ কিন্তু অনেকেই এখনো বুঝতে পারছেন না যে, এর মূলে কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার হাত প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। তাই ভারতকে খুবই হুঁশিয়ার হয়ে উৎপাদন বাড়াতেই হবে।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির অন্যতম কর্মী ও সংগঠক প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী দীনেশ বিশ্বাস গত ২৯ শে জুন ৮২ বিরাড়া সেবাসদনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বৎসর। তিনি অকৃতদার ছিলেন। ফরিদপুর (বাংলাদেশ) এর এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান দীনেশবাবু কৈশোরেই অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সভ্যপদ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে, কলিকাতা, রাজশাহী, কোচবিহার, পূর্ণিয়া, মালদহ, ভাগলপুর প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তিনি অনুশীলনের সক্রিয় সংগঠক হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে নিয়োজিত থাকেন – সুদূর বর্মাতেও তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড প্রসারিত হয়। বৃটিশ রাজশক্তি একাধিকবার কারারুদ্ধ করেও এই অদম্য সংগ্রামীর স্বাধীনতাস্পৃহাকে রুদ্ধ করতে পারেনি।

আমরা পরলোকগত বিপ্লবীর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ও অগনিত গুণমুগ্ধদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকায়—
ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লিগ ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজ

—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সিঙ্গাপুর ত্যাগের সময় নেতাজীর সহিত তাঁর যে ছয়জন সহকর্মীকে সংঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করতে জাপ কর্তৃপক্ষ রাজী হয়েছিলেন, সাইগণ পৌঁছার পর তাও নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল। তখন দখলদার কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করা ছাড়া জাপ সরকারের গত্যান্তর ছিল না। নেতাজীর অন্যতম তরুণ সহকর্মী শ্রীপ্রীতম সিং যিনি সিঙ্গাপুর থেকে সাইগণ পর্য্যন্ত নেতাজীর সহযাত্রী ছিলেন শাহ-নওয়াজ তদন্ত কমিশনের সামনে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন ১৭ই আগষ্ট অপরাহ্নে সাইগণ বিমান বন্দরে নেতাজীর সহিত তাঁর শেষ সাক্ষাৎ করে। তিনি স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে জাপানীরা নেতাজীকে একা কোন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। বিমান ক্ষেত্রের একটী বিশ্রাম ঘরে নেতাজী একা বসেছিলেন, অপর প্রান্তে বসেছিলেন দুইজন জাপানী সামরিক অফিসার। নেতাজীকে বিমর্ষ ও চিন্তাচ্ছন্ন দেখাছিল। নেতাজীর সহকর্মীরা তাঁর সহযাত্রী হওয়ার জন্য অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। তাই কর্ণেল প্রীতম সিং এ সম্বন্ধে নেতাজীর জাপ কর্তৃপক্ষের সহিত যে কথাবার্ত্তা হয়েছে তার ফল কি হল জানতে চাইলে নেতাজী প্রীতম সিংকে বলেন -"They are taking me to an unknown destination alone. এই ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শেষ বাক্যালাপ।

১৭ই আগষ্ট বেলা ৫টার সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে নিয়ে জাপ বোমারু বিমান সাইগণ বিমান বন্দর থেকে উড়ে গেল। বিমান জাপ সামরিক অফিসারদের নিয়ন্ত্রাধীন ছিল। এই পর্য্যন্ত তথ্য। পরের সংবাদ সংস্থার যুক্ত এবং দখলদার কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

নেতাজী পরিচালিত মুক্তি বাহিনীর ভারত অভিযান সম্পূর্ণ সফল না হলেও ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উপর ইংরেজ সরকারের আস্থা চলে গিয়েছিল। সারাদেশ ব্যাপী ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন তুষানলের মত জ্বলছিল, যে কোন মুহূর্ত্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত ছিলেন, তাই ব্রিটিশ সরকার মন্দের ভাল নীতি অনুসরণ করে ভারতের কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা করে শাসন ক্ষমতা ওদের হাতে হস্তান্তর করলেন। এই পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টিকারক সুভাষ চন্দ্র ও রাসবিহারী তাই স্বাধীনতালাভে সুভাষ চন্দ্র রাসবিহারীর অবদান অনস্বীকার্য্য।

এই সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বক্তব্য উল্লেখ করে যবনিকা টানছি।

রমেশ বাবু লেখছেন "কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, সশস্ত্র বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদ, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগিতা ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ এর বিদ্রোহের ন্যায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক পরাভব প্রকৃত প্রস্তাবে সাফল্যের স্তম্ভবিশেষ। এই সংগ্রামগুলিই ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভকে সম্ভব করেছিল।

এর অর্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারন ক্রমেই বেশি করে বুঝতে পারছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৃষ্টি থেকে ব্রিটীশ বুঝেছিল যে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সে আর ভারতীয় বাহিনীর আনুগত্যের উপর নির্ভর করতে পারে না। নতুবা ব্রিটিশ কখনও স্বেচ্ছায় ১৯৪৭ সালে চলে যেত না। ব্রিটিশ রাজনীতিকরা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপুল অর্থ ও প্রাণ হানির পর ইংলণ্ডের পক্ষে কেবল গোরা সৈন্যের দ্বারা ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।

(সমাপ্ত)

পাঠকদের প্রতি আবেদন

'বিপ্লবী বাংলা' গত ২৫ বৎসরাধিক কাল ধরে সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দেশসেবার আদর্শকে বহন করে নিয়ে চলেছে। এ আমার, আপনার. সকলের কাগজ। তাই একে বাঁচানোর দায়িত্বও আমাদের সকলের। অধিকতর সংখ্যায় গ্রাহক ও বিজ্ঞাপণ সংগ্রহ ক'রে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে আরো দীর্ঘদিন আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।

চিরদিনই মানুষের সভ্যতায় এক দল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই সভ্যতার বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই। দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম পরে, কম লিখে, বাকি সকলের পরিচর্য্যা করে ; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান।....তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলোক পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

(রবীন্দ্রনাথ)

Biplabi Bangla
Phone : 35-1705
Regd. WB/NC 77

বার্ষিক —মূল্য ১৫.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক —৮.০০ টাকা
এক—৭৫ পয়সা

130

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
৪৪।৫ ॥
২৫-৫-৮১
ঘ ঘী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী

শ্রীকালীপদ সরকার

শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীবাবীন ঘোষ

বেহালা—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "ভোলে ব্রিশ বছর ও পরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—২০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। গেরিলা সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বোমার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—
৭। স্বাধীনতাসংগ্রাম মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০
বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৪০, ১ [illegible]—ও সুভাষচন্দ্র—.৪০
-ারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবে[illegible] দেশ বন্ধুর
ডোলেন্সি (১)—১.০০, দেশ বন্ধুর ডোলেন্স (২)—১.০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৩ই এপ্রিল জালিয়ান শহীদ দিবস—১.০০, চাপিত হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল[illegible], ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

21 JUL 1982

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭
বৈশাখী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ৭ই শ্রাবণ ১৩৮৯ ২৪ শে জুলাই ১৯৮২	৪২ সংখ্যা

বিপ্লবের দ্বারা আনীত পরিবর্তন সব সময়েই মূলগত পরিবর্তন। অল্প সল্প উপর উপর সাধিত পরিবর্তনকে কোন মতেই বিপ্লব বলা যেতে পারে না। সরকারের বা মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিবর্তনও বিপ্লব নয়, কারণ তার দ্বারা জাতির জীবনে কোন পরিবর্তন আসে না।

—নেতাজী।

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

গত ১২ই জুলাই ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পর্ব সমাধা হয়েছে যথাযথ ভাবে। বলা বাহুল্য কংগ্রেস দল সমর্থিত প্রার্থী শ্রীজ্ঞানী জৈল সিং বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছেন। বিভিন্ন দলগত বিন্যাস যা ছিল, তাতে শ্রীজৈল সিং-এর জয়লাভ সুনিশ্চিতই ছিল। বরং ভোটের ফলাফল সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, যে কংগ্রেস দল ব্যতীত অন্যান্য অনেক দলও তাঁকে সমর্থন করেছেন।

একটি গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপতির পদে বা অন্য যে কোন পদের জন্য প্রার্থী হবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। এই নির্ব্বাচন গুলিতে জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক দেশে এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে বিভিন্ন প্রার্থীর বক্তব্য কৌশল ও অনুসৃত নীতি নিয়ে। এবারকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে সেই প্রশ্নটাই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল এবং তার দোষগুণ সমালোচনার পর্য্যায়ভুক্ত হয়েছে।

এবার নির্বাচনে দুই জন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন শাসকদল ও বিরোধী দলগুলি। শাসকদলের প্রার্থী ছিলেন শ্রীজৈল সিং, বিরোধী দলগুলির প্রার্থী ছিলেন শ্রীহংসরাজ খান্না। শ্রীখান্নার নাম বিরোধীদের তালিকায় প্রথম দিকে ছিল না। তারা চেষ্টা করেছিলেন বর্ত্তমান উপরাষ্ট্রপতি শ্রীহিদায়েতুল্লাকে দাঁড় করাতে। উদ্দেশ্যটা খুব সাধু ছিল না। শ্রীহিদায়েতুল্লার মাধ্যমে শাসক দলকে বেকায়দায় ফেলবার দুরাশা ছিল। উপরাষ্ট্রপতি তাঁর পদের মর্য্যাদা রেখেছেন বিরোধীদের অপকৌশলের শিকার না হয়ে। দ্বিতীয় মনোনয়ন যাঁকে দেওয়া হল, শ্রীহীরেন মুখার্জি, তাঁর নামই পাওয়া গেল না ভোটার তালিকায়। এই ঘটনা প্রমাণ করল, বিরোধীদের অন্তরঙ্গ একটি দলের ভোটার তালিকা প্রণয়ণ করবার কৌশল ও পদ্ধতি। হীরেন বাবুদের দলের সঙ্গে এদের তখনও পর্য্যন্ত কোন আঁতাত গড়ে ওঠেনি বলেই কি হীরেন বাবু ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন সে আলোচনা এখন অপ্রাসঙ্গিক। রূপকথায় শোনা যায় যে শূন্য রাজাসনে বসাবার জন্য একটি হাতীকে ছেড়ে দেওয়া হত এবং সেই হাতিটি যাকেই ধরে নিয়ে আসত, তাকেই রাজাসনে বসিয়ে দেওয়া হত। অর্থাৎ অস্ত্রিমলগ্নে বিশল্যকরণী প্রয়োগের ব্যাপারের মত। বিরোধী দল দিশেহারা হয়ে শেষ লগ্নে ছুটে গেলেন শ্রীখান্নার কাছে। বলা বাহুল্য, শ্রীখান্না তাদের বাঞ্ছিত করেছিলেন নির্ব্বাচন প্রার্থী হয়ে।

কি কারণে শ্রীখান্না এই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন, সেটা দুর্বোধ্য। বিরোধী দলগুলি যদি তাঁর কাছে প্রথমেই যেতেন এবং তাঁকে আলাপ আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ এবং সময় দিতেন,

তবে ব্যাপারটা এত দুর্বোধ্য হত না। শ্রীখান্নাও তাঁর কথা জন সমক্ষে তুলে ধরতে পারতেন এবং সমর্থন লাভের চেষ্টা করতে পারতেন। ফলাফল কিছু ইতর বিশেষ হত না এটা জানা কথা। শ্রীখান্না জেনে শুনে পরাজয়ের গ্লানি বহন করুন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। সাধারণ মানুষের তাতে কোন প্রশ্ন জাগত না। কিন্তু ঘটনাবলীর সমীক্ষা করলে, একটা গুরুতর প্রশ্ন উঠছে এবং অতি সঙ্গত কারণেই।

শ্রীখান্না রাজনীতি করেন নি কোনদিন প্রত্যক্ষভাবে। হঠাৎ তিনি রাজনীতির শিকার হতে গেলেন কেন ? তিনি ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি যদি কোন বিশেষ দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেন, তবে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে এই রাজনৈতিক প্রবণতা তাঁর মধ্যে কবে জাগ্রত হয়েছে বিচারপতি থাকা কালীন যদি হয়ে থাকে, তবে তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব হয়নি। খান্নারা আসবেন যাবেন. এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু কোন প্রাক্তন বা বর্ত্তমান বিচারপতির পক্ষে এমন কোন কাজ করা উচিৎ হবে না যার ফলে দেশের মানুষের বিচারালয়গুলির উপর আস্থাহানি ঘটতে পারে। আমাদের বিশ্বাস এবং আশঙ্কা খান্নার কাজকর্ম ও কিছু উক্তির ফলে, এই সর্বনাশা ধারণাই বদ্ধমূল হতে চলেছে। ভোটের ফলাফল নিশ্চিত প্রমাণ করেছে যে খান্নার কৌশল সফল হয়নি। এতে বিরোধী দলগুলির চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং খান্না তার মর্য্যাদা হারিয়েছেন।

শ্রীখান্না তাঁর পরাজয় নিশ্চিত জেনেই (যেটা তার মত বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে আগেই বোঝা উচিৎ ছিল) কি তিনি এই নির্বাচনে 'বিবেক' শব্দটি আমদানী করেছিলেন ? বিবেক অনুসারে ভোট দেবার আবেদনটার অর্থ ত এই দাঁড়ায় যে কংগ্রেস দলভুক্ত বিধায়কেরা, দলীয় নির্দ্দেশ অমান্য করে তাঁকেই ভোট দিন। দলীয় নির্দ্দেশ মান্য করে চলা ত গণতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রত্যেক দলীয় ভোটারদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এটাই গণতন্ত্রের অঙ্গ। শ্রীখান্না কি বলতে চান যে দলীয় নির্দেশ মান্য করে তাঁকে ভোট না দিলে বিধায়কদের 'বিবেক' বলে কোন কিছু নেই ? আর গণতন্ত্রের সব রীতিনীতি ভঙ্গ করে তাঁকে ভোট দিলেই বিধায়কদের বিবেকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে ? বিবেক বস্তুটার একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল বটে, সেই সঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের একজন প্রাক্তন বিচারপতির বিচার বিবেচনারও নমুনা মিলল। যিনি দেশের সর্বোচ্চ পদাভিলাষী এই কি তাঁর যোগ্য কাজ ? কোনকালে ন্যায়াসনে বসেছেন যিনি, তাঁর পক্ষে এই হাতিয়ার প্রয়োগ করা মানায়না। দলীয় নির্দেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই প্রথার যিনি ধারক বাহক হতে চান রাষ্ট্রপতি রূপে, তিনি ত প্রকারান্তরে গণতন্ত্রের অঙ্গহানি করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, এটা শুধু অসমর্থন যোগ্য নয়, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে। আমরা দুঃখিত যে একজন প্রাক্তন বিচারপতি এই গণহত্যার পথ প্রশস্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে যারা শেষ মুহূর্তে দাঁড় করিয়ে উপহাসাস্পদ করেছেন, তাদের কথা না বলাই ভাল। তাদের চরিত্র সম্বন্ধে দেশের মানুষ একটা যে পরিষ্কার ধারণা করে নিয়েছে, সেটা হল ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে ক্ষমতা দখল করে ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থ পুষ্ট করা। বিরোধী ঐক্যের কথা এরা বলে থাকেন, কিন্তু 'অহং' ভাবটা কেউ ত্যাগ না করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ক্ষমতায় এলে কি করেন, তারও প্রমাণ দিয়েছেন অতি সাম্প্রতিক কালে। মুখে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বললেও প্রয়োজন

হলে গণতন্ত্রকে হত্যা করতেও তারা বিবেকের কোন দংশন অনুভব করেন না। যাত্রা যদি তাঁর আধুনিক সমর্থকদের বিবেক জাগ্রত করতে পারেন, সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য, তবে দেশবাসী তাঁকে সাধুবাদ জানাবে নিঃসন্দেহে।

বিবেকের বাণী আজ নীরবে, নিভৃতে কাঁদছে দেখে দেশের মানুষ আজ শঙ্কিত, ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত। শ্রীজৈল সিং-এর জয়লাভ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। শ্রীসিং সংখ্যালঘু-শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত. তিনি একটি অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মানুষ যাদের মধ্য থেকে আজো পর্যন্ত কেউ এই উচ্চপদ লাভ করেন নি। সর্বোপরি, শ্রীসিং একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। হঠাৎ পদ লোভে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হননি। বহু বছর ধরে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের বিরাট ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে তিনি দেশ সেবা করেছেন। বহু বিশিষ্ট পূর্বাচার্যদের সঙ্গে যোগাযোগের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। কংগ্রেস দলভুক্ত হওয়াটা তাঁর একটি অবগুণ বলে যারা প্রচার করেছিলেন, তারা যোগ্য প্রত্যুত্তর পেয়েছেন শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে।

শ্রীজৈল সিং-এর নির্বাচন ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতি যথাযথ মর্য্যাদা দানের স্বীকৃতি। তাই দেশবাসী নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জৈল সিংকে অভিনন্দন জানাচ্ছে সর্বান্তঃকরণে।

———

পাঠকদের প্রতি আবেদন

'বিপ্লবী বাংলা' গত ২৫ বৎসরাধিক কাল ধরে সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দেশসেবার আদর্শকে বহন করে নিয়ে চলেছে। এ আমার, আপনার. সকলের কাগজ। তাই একে বাঁচানোর দায়িত্বও আমাদের সকলের। অধিকতর সংখ্যায় গ্রাহক ও বিজ্ঞাপণ সংগ্রহ ক'রে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে আরো দীর্ঘদিন আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।

রাজনীতি ও শ্রেয়োনীতি

সুবোধ মজুমদার (২)

আজকের পশ্চিমবংগ সরকার জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত এবং জনকল্যাণে বিশ্বাসী। সরকারী দলের নেতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী। অধিকাংশ সরকারী নেতা ও কর্মচারীরা আজ মার্ক্সবাদী। সরকার পক্ষের রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পূর্ণ জনস্বার্থের সমর্থক। তার ওপর প্রত্যক্ষভাবে কোনো অসামাজিক বা সমাজবিরোধী শক্তির চাপ নেই। বরং অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, শ্রমিক, চাষী, প্রভৃতি এই সরকারের সমর্থক। তবে কেন তাঁরা নিজেদের সরকারের প্রতি এত উদাসীন? কেন তাঁরা জনগণকে শোষণ ক'রে অর্থ লাভ ক'রেও প্রতিদানে জনগণের সেবা করেন না? কেন তাঁরা দিগন্তব্যাপী সামাজিক অবিচার, অনাচার, ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে না গিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন?

এর মূল কারণ নিহিত আছে অমার্ক্সীয় ও অলেনিনীয় জড়বাদী শ্রেয়োনীতির মধ্যে। মানুষের সামাজিক আচরণ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তার শ্রেয়োনীতিক চেতনা দ্বারা। আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতি মানুষের আচরণকে সমাজনিষ্ঠ করে। জড়বাদী শ্রেয়োনীতি মানুষের আচরণকে ব্যক্তিনিষ্ঠ করে। জড়বাদী শ্রেয়োনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি—অসাম্য ও ইন্দ্রিয়পরতা। জড়বাদীরা জড়বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলে :—

১) আমাদের ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। ইন্দ্রিয়জ্ঞান বলে এই বিশ্বে কোনো একটা বস্তু আরেকটা বস্তুর সমান নয়। একই গাছের কোনো একটি পাতা আর একটি পাতার সমান নয়। কোনো একটি প্রাণী আর একটি প্রাণীর সমান নয়। একটি মানুষ আর একটি মানুষের সমান হয় না। সাম্য-ধারণাটা হচ্ছে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের কল্পনা-প্রসূত অতএব সামাজিক সাম্য একটা অবাস্তব ধারণা।

২) ইন্দ্রিয়ই আমাদের কর্মের প্রধান উদ্দীপক। ইন্দ্রিয়ের তাগিদ জীবনের শ্রেষ্ঠ তাগিদ। অতএব ইন্দ্রিয় তোষণের জন্য মানুষ যা করে তার মধ্যে অন্যায় কিছু থাকতে পারে না। সামাজিক মূল্যবোধ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানতে পারিনে, অতএব সামাজিক মূল্যবোধ যদি ইন্দ্রিয় তোষণের অন্তরায় হয় তাহলে তাকে উপেক্ষা করা যেতে পারে।

এই দুই তত্ত্বের সংযুক্ত ফল রূপায়িত হচ্ছে আজ মার্ক্সবাদের সমর্থকদের মধ্যে। তাঁরা মনে করেন সমাজের অপর সকলকে দাবিয়ে রেখে নিজেকে সম্পদ স্ফীত করার মধ্যে অন্যায় নেই কিছু। তাই তাঁরা যে-কোনো উপায়ে ধনী হওয়ার মধ্যে কোনো অন্যায় দেখেন না। ঘুষ নেওয়া, প্রতারণা করা, কালো-বাজার করা, খাদ্যে-ওষুধে-সিমেন্টে ভেজাল দেওয়া কোনো কিছুই অন্যায় নয় তাঁদের কাছে। কর্তব্য কর্মে ফাঁকি দিয়ে আলস্য উপভোগ করাকে নীতিসম্মত মনে করেন তাঁরা।

অসাম্যবোধ ও ইন্দ্রিয়পরতার কুফল সুদূরপ্রসারী মার্ক্সবাদীরা সাময়িক সুবিধার জন্য নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থকেও বিসর্জন দিতে সদাই প্রস্তুত। যেসব অমার্ক্সীয় কাজের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম ঘোষিত আছে সেসব কাজকেও তাঁরা সমর্থন করে যাচ্ছেন। মার্ক্স আর এংগেল্‌স্‌-এর নামে তাঁরা এমন সব কাজ ক'রে যাচ্ছেন যা মার্ক্স ও এংগেল্‌স্‌ সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেন। মার্ক্সবাদ প্রভাবিত অঞ্চলে পৌত্তলিকতা উৎকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। দুর্গাপূজা,

কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা রাজরাজেশ্বরী পূজা, শীতলাপূজা, সন্তোষী-মায়ের পূজা সবই মার্ক্সবাদীরা জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে বারোয়ারী পূজা রূপে উদ্‌যাপন করে। প্রকৃত মার্ক্সপন্থী নেতারা এসব কাজের যুক্তিহীনতা উপলব্ধি করেন কিন্তু কোনো তাত্ত্বিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে পারেন না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা তাত্ত্বিক প্রতিবাদ না জানাবেন ততক্ষণ মার্ক্সীয় ঝাণ্ডার আশ্রয়ে অমার্ক্সীয় কাজ চলতেই থাকবে।

মার্ক্সবাদ কী? শ্রেয়োনীতি কী? শ্রেয়োনীতিক পটভূমিতে মার্ক্সবাদের তাৎপর্যই বা কী? মার্ক্সবাদের প্রথম তত্ত্বটি হচ্ছে :—প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় সমাজও বিবর্তিত হয় প্রাকৃতিক নিয়মে, কোনো অপ্রাকৃতিক নিয়মে নয়। দ্বিতীয় তত্ত্বটি হচ্ছে :—সামাজিক বিবর্তনের নিয়মটি জেনে সেটিকে প্রয়োগ করতে হবে সমাজবাসীদের দুঃখ-মোচনের উদ্দেশ্যে। তৃতীয় তত্ত্বটি হচ্ছে :—সমাজ বিভক্ত অর্থনীতিক শ্রেণীতে বিভক্ত যাদের মধ্যে প্রধান সম্পর্কটা হচ্ছে শোষক শোষিতের সম্পর্ক। চতুর্থ তত্ত্বটি হচ্ছে :—বর্তমান ব্যক্তি-মালিকানা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে সমাজ মালিকানা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করতে হবে। এই তত্ত্ব চারটি পর্যালোচনা করলেই আমরা মার্ক্সীয় শ্রেয়োনীতির সন্ধান পাই। মার্ক্স মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করেছেন, বলেছেন যে মানুষ ইচ্ছে করলে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রয়োগ করে নিজের দুঃখ দূর করতে পারে। তিনি আরও বলেছেন মানুষ যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চেষ্টা না করে দৈবের সাহায্যে নিজের দুঃখ দূর করতে চায় তাহলে তার দুঃখ কোনোদিনই বিদূরীত হবে না। শ্রেয়োনীতির একটি প্রধান কাজ হচ্ছে মানুষের কোন্ কাজটা ভাল আর কোন্ কাজটা মন্দ তা নির্ধারণ করা। মার্ক্সীয় শ্রেয়োনীতি বলে সমাজের দুঃখ মোচন করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ভাল কাজ। মানুষ সমাজ-বিজ্ঞান চর্চা করে জানবে কী নিয়মে সমাজ পরিবর্তিত হয়, তারপর সে সেই নিয়ম অনুযায়ী সমাজকে ভালর দিকে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করবে। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ সম্পদ-বৈষম্য দ্বারা পীড়িত। সমাজের অধিকাংশ লোক আজ দুর্দশাগ্রস্ত। এই দুর্দশা দূর করতে হলে সমাজের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হবে সমাজ, তারপর সমাজ সে-সম্পদ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করবে সম-শ্রমের ও সম-প্রতিদানের ভিত্তিতে।

এসব তো অতি সহজ ও সুস্পষ্ট কথা। মার্ক্সবাদের মধ্যে কোথাও তো কোনো জটিলতা নেই। তবে সারা বিশ্বে তথা ভারতে মার্ক্সবাদীরা আশানুযায়ী ফল পাচ্ছেন না কেন? বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গের মার্ক্সবাদী নেতৃবৃন্দ নিজেদের আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এমন বিব্রত বিপদগ্রস্ত কেন? এর ঐতিহাসিক কারণ মার্ক্সের পরমায়ুর স্বল্পতা। মার্ক্স মনোবিজ্ঞান নিয়ে, বিশেষ করে ব্যক্তি-চরিত্র নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা করে যেতে পারেননি। ফলে তিনি দুটি অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব তাঁর মতবাদের অন্তর্ভুক্ত করতে সময় পাননি।

প্রথম তত্ত্বটি হচ্ছে এই যে শোষণ প্রবৃত্তিটা হচ্ছে মানব চরিত্রের একটা স্বাভাবিক অংগ। অর্থনীতিক পরিবেশ অনুকূল হলে এই প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী মানুষের শোষণ-প্রবৃত্তিটি অবস্থার আনুকূল্যে সক্রিয় থাকে বলে একথা মনে করা ঠিক নয় যে অন্যদের মনে শোষণ প্রবৃত্তিটি একেবারে অনুপস্থিত। কারুর মনে এটা থাকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কারুর মনে সক্রিয় অবস্থায়। কারুর মধ্যে বিরাজ

করে সচেতন মনে, কারুর মধ্যে অবচেতন মনে, আর কারুর মধ্যে অচেতন মনে। প্রকৃতির চোখে মার্ক্সবাদী আর অমার্ক্সবাদীতে কোনো ভেদ নেই। অবস্থার আনুকূল্য মার্ক্সবাদীকেও শোষণমুখী করে তোলে। নেতা কর্মীকে শোষণ করে, ওপরওয়ালা অধস্তনকে শোষণ করে, সরকারী কর্মচারী জনসাধারণকে শোষণ করে, ডাক্তার রোগীকে শোষণ করে, উকীল মক্কেলকে শোষণ করে, দোকানদার গ্রাহককে শোষণ করে, শিক্ষক ছাত্রকে শোষণ করে।

এর কি প্রতিকার নেই? নিশ্চয়ই আছে। আর আছে যে এই সত্যটা মার্ক্সবাদীরা ভালমতোই জানেন। কিন্তু তাঁরা মার্ক্সবাদী পৌত্তলিকতার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত যে! তাঁরা জানেন—সমাজ ভাবনা একটা আদর্শবাদ, আর শুধুমাত্র আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতিই মানুষের সমাজ ভাবনাকে শক্তিশালী রাখতে পারে। তাঁরা জানেন ব্যক্তিগত জীবনে কার্ল মার্কস ছিলেন একনিষ্ঠ আদর্শবাদী, আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতিই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল সহজলভ্য সম্ভোগময় জীবন পরিত্যাগ করে বঞ্চিতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে। তাঁরা জানেন লেনিন ছিলেন তাঁর শহীদ দাদার কাছে আদর্শবাদী মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত আর তিনি অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদ মেনে নিয়েও ব্যক্তিগত আদর্শনিষ্ঠার শক্তিকে স্বীকার করে গেছেন কিন্তু এত জেনেও জড়বাদী সুলভ আক্ষরিক পৌত্তলিকতা বশতঃ আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতিকে গ্রহণ করতে পারছেন না তাঁরা।

কার্লমার্ক্সের সময় ইউরোপের স্বৈরাচারী রাজা ও পুরোহিতরা সকলেই নিজেদের আদর্শবাদী বলতেন এবং ভগবানের নামে নানারকম অত্যাচার ব্যাভিচার করতেন। এজন্য মার্ক্স আদর্শবাদের বিরোধিতা করতেন। কুসংস্কার-প্রভাবিত আদর্শবাদের বিরুদ্ধে তিনি বৈজ্ঞানিক ও বৈষয়িক আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। নিজের জীবন দিয়ে তিনি তা দেখিয়ে গেছেন জড়বাদী স্বার্থপরতা বা ইন্দ্রিয়পরতার স্বপক্ষে একটি বাক্যও তিনি উচ্চারণ করেননি। এতসব জেনেও একমাত্র রাজনৈতিক আতংকবশতঃ মার্ক্সবাদীরা সত্যকে স্বীকার করতে পারছেন না। ফলে ঘুষ, ভেজাল, কালোবাজার, চোরাকারবার, ব্যাংক-লুঠ, নারী ধর্ষণ খুন, কোন কিছুর বিরুদ্ধেই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছেন না।

পুঁজিবাদী ও সম্ভোগবাদীরা মুখে যাই বলুক, কার্যতঃ তারা জড়বাদী ও ইন্দ্রিয়বাদী। ব্যক্তিগত সম্ভোগের জন্য সমাজের অনিষ্ট সাধন করতে দ্বিধা করে না তারা। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের কাজকর্মের সঙ্গে মার্ক্সবাদীদের কাজকর্ম এতই মিলে মিশে গেছে যে মার্ক্সবাদীরা মনে করেন একমাত্র লক্ষ আর নাম দিয়ে তাঁরা তাঁদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারেন। সকল পুঁজিবাদীরা মুখে নিজেদের আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতির সমর্থক বলে, অতএব সকল মার্ক্সবাদী নেতাই মুখে নিজেদের জড়বাদী শ্রেয়োনীতির সমর্থক বলেন। আর তার অবশ্যম্ভাবী সাংঘাতিক কুফল দেখা দেয় সাধারণ মার্ক্সবাদীদের মধ্যে। যেখানেই তারা কিছু ক্ষমতা লাভ করেছে সেখানেই তাদের শোষণ প্রবৃত্তি ভীষণ তীব্র রূপ ধারণ করেছে।

শ্রেয়োনীতির কাজ হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিভাবনাকে সংযত করে সমাজ-ভাবনাকে উদ্দীপিত করা। জড়বাদী শ্রেয়োনীতি এবং আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতি উভয়েরই লক্ষ্য এটা। কিন্তু উভয়ের সাফল্য এক নয়। কারণ, জড়বাদী জীবনদর্শন জড়বাদী শ্রেয়োনীতির সঙ্গে সহযোগিতা করে না; আদর্শবাদী জীবনদর্শন আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতির

সঙ্গে সহযোগিতা করে। শ্রেয়োনীতিক চেতনা হচ্ছে সততা, সরলতা, সাহসিকতা, সংযম, স্নেহ, মমতা, কর্তব্যপরায়ণতা, শালীনতা, শ্লীলতা, প্রভৃতি কতকগুলি মূল্যবোধের সমষ্টি। আদর্শবাদী জীবনদর্শন বলে এই মূল্যবোধগুলি বাস্তব অতএব পালনীয়. জড়বাদী জীবনদর্শন বলে এই মূল্যবোধগুলি আস্তব অতএব এদের অস্বীকার করলে কোনো ক্ষতি বা অন্যায় হয় না। ফলে জড়বাদীরা সমাজ-স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ আদৌ ত্যাগ করতে পারে না; মূল্যবোধকে তুষ্ট করার জন্য ইন্দ্রিয়ের তাগিদকে সংযত করতে পারে না। অথচ মূল্যবোধের অনুপ্রেরণাই হচ্ছে সমাজবাদ তথা মার্ক্সবাদের উৎস।

এখানে স্মরণীয় মার্ক্সের দুটি উক্তি—

১) পার্থিব ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করলেই দার্শনিকের কর্তব্য শেষ হয় না; পৃথিবীকে পরিবর্তন করাই তাঁর শেষ লক্ষ্য।

২) পৃথিবীর কল্যাণকর পরিবর্তন কখনও আপনা থেকে ঘটে না; তার জন্য বিজ্ঞানসম্মত সুপরিকল্পিত চেষ্টা প্রয়োজন। অর্থাৎ মার্ক্সীয় শ্রেয়োনীতি সম্মত কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে ও সমাজকে সঠিকভাবে জানা, সামাজিক কার্যাবলীর গতি প্রকৃতি জানা, মানুষের কল্যাণ কীসে হয় তা জানা, এবং এসব জ্ঞান অনুযায়ী সমাজকে পরিবর্তিত করা। সামাজিক পরিবর্তন সাধন করতে হলে পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন একটা চরম ও পরম লক্ষ্যের। এই পরম লক্ষ্যটি যদি সমাজের কল্যাণ হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে কল্যাণের স্বরূপ কী?

জড়বাদী শ্রেয়োনীতি বলে মানুষের কল্যাণের স্বরূপ হচ্ছে আনন্দ। ইন্দ্রিয়সুখ, বৌদ্ধিক সুখ আর আত্মিক সুখ এই তিন সুখের সুসমন্বয় থেকে আসে আনন্দ। সে-আনন্দই হচ্ছে আদর্শবাদীদের পরম কাম্য। মার্ক্স লেনিন ইন্দ্রিয়সুখ কম পেলেও আনন্দ পেয়েছেন প্রচুর। আমাদের দেশের অনেক মার্ক্সবাদী আত্মত্যাগী কর্মীর কপালেও ইন্দ্রিয় সুখ বিশেষ না জুটলেও আনন্দ জোটে প্রচুর। এই জীবন্ত সত্যটাকে স্বীকার না করলে মার্কসবাদীদের অগ্রগতি চিরতরে প্রতিহত হয়ে যাবে।

এখানে স্মরণ করতে হবে দুটি কথা। মার্কস্ মার্কসবাদী ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ মার্কস্ যখন তাঁর মতবাদ রচনা করেন তখন তিনি বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের আশ্রয়ে ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে সব কথা খুলে বলা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, মার্কসের সমসাময়িক ম্যাক্স-মূলারের গবেষণার ফলে বৈদান্তিক সাম্যবাদ সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন।

জনগণের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং

—কালীপদ সরকার

কংগ্রেস (ই) প্রার্থী জ্ঞানী জৈল সিং বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ভারতের সপ্তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী ২৫শে জুলাই তিনি কার্যভার গ্রহণ করবেন। জৈল সিং যে জয়ীই হবেন সে কথা সকলেই জানতেন, তবে কত ভোটের ব্যবধানে তিনি জয়ী হন সেটিই ছিল গবেষণার বিষয়। এ ব্যাপারে জৈল সিং নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে কিছুটা চমক সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তিনি বিরোধী ভোটও অনুকূলে টেনেছেন। পক্ষান্তরে বিরোধী দলগুলির মনোনীত প্রার্থী হংসরাজ খান্নার বিবেক ভোটের ডাক মাঠে মারা গেছে। কংগ্রেস (ই) ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধে একটি মনোলিথ স্তম্ভের ন্যায় দৃঢ়তা দেখিয়েছে। বিরোধী দলগুলি অহরহ যে প্রচার চালান কংগ্রেস (ই) একটি অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত অ-সংগঠিত দল, তা সর্বৈব মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে।

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি উচ্চ শিক্ষিত ডিগ্রিধারী নন বলে দেশের অনেক শিক্ষিত লোকের মনে তাঁর সম্পর্কে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আছে কিন্তু শিক্ষা কি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতু:সীমার আবদ্ধ? এক নিষ্ঠ দেশ সেবা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাজনৈতিক সততা এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষালাভ ঘটে তা কি কলেজী শিক্ষার চেয়ে কোন অংশে কম মূল্যবান? এই গুণগুলির অধিকারী হিসাবে জৈল সিংকে মাটির কুটীর থেকে ধাপে ধাপে উপরে তুলেছে এবং রাষ্ট্রপতি ভবনে অধিষ্ঠিত করেছে। ফরিদকোটের তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামীটি একদিন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিলেন। সেদিন নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ দেশ সেবার স্বাক্ষর ছাড়া তাঁর কোন নিদর্শন পত্রই ছিল না।

তারপর, দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে জ্ঞানী জৈল সিং এর বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক কর্ম-জীবন চলেছিল একটি ধারায় সতত সামনের দিকে এগিয়ে অপ্রতিহত বেগে। তিনি কেবল সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি নন, তিনি দেশের অগণিত অনগ্রসর মানুষের একজন। জৈল সিং-এর একমাত্র পুত্র পিতার রাজনৈতিক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে একজন 'সুরেশ কুমার, 'কান্তি কুমার', কিংবা 'চন্দন কুমার' হন নি, পক্ষান্তরে যৎকিঞ্চিত পারিবারিক কৃষিভূমির চাষ আবাদের ওপর নির্ভরশীল জীবন যাপন করছেন তা থেকেই জ্ঞানীজীর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের রাজনীতিতে এমন দৃষ্টান্ত সত্যই বিরল।

নির্বাচনী প্রচার পর্বে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা জৈল সিংকে 'ক্যালিগুলার ঘোটক', 'সার শঙ্করণ নায়ারের বডিগার্ড' এবং একটি বিদেশী পত্রিকা তাঁকে জেরুজালেম গামী যীশুখৃষ্টের নিরীহ বাহন' প্রভৃতি বলে যে সব উপহাস করেছিল, এখন জৈল সিং-এর বিরাট সাফল্যের বিচারে সেগুলিকে তাদেরই নীরবে হজম করতে হবে। এই সব নিন্দনীয় উক্তি ভারতের প্রতি অবমাননাকর। নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা নামকরা বাগ্মী না হতে পারেন, তাতে কিছু আসে যায় না। গাছের ডালে বসে ডাল কাটার বুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতজন অপেক্ষা বাস্তব বুদ্ধি মানুষের প্রয়োজন সংসারে যে অধিক সে কথা কে অস্বীকার করতে পারে?

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হয়, সংবিধান মতে রাষ্ট্র-

পতি কেবল দেশের প্রধানতম শাসকই নন, তিনি স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীরও সর্বাধিনায়ক। রাষ্ট্রপতি তাঁর মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করলেও, বিশেষ অবস্থায় তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। তিনি মন্ত্রীপরিষদ তথা প্রধানমন্ত্রীর রবার স্ট্যাম্প নন।

সকলেই জানেন, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিন প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সীমা নিয়ে মতভেদ ছিল। ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতি পুরোপুরি ব্রিটেনের রাজার ন্যায় মন্ত্রীপরিষদের হাতের পুতুল, ড: রাজেন্দ্র প্রসাদ সে কথা স্বীকার করতেন না। তবে তাঁদের এই মত পার্থক্যকে তাঁরা জনতার দরবারে তুলেন নি। একবার শুধু, খুব সম্ভব হিন্দু কোডবিলে সম্মতি দেবার সময় ড: প্রসাদ বিলের যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যে- কারণে পড়ে পণ্ডিত নেহেরু এটর্নি জেনারেল এম, সি শীতলবাদকে এ সম্পর্কে আইনগত অভিমত পাঠাতে নির্দেশ দেন।

শীতলবাদ তাঁর মূল্যবান প্রতিবেদনে বলেন, ভারতীয় সংবিধান মতে রাষ্ট্রপতিবর ক্ষমতা ব্রিটেনের রাজার মতই। রাষ্ট্রপতিকে সংসদ তথা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েই চলতে হবে। তবে বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন সংসদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল জনগণের বিশ্বাস হারিয়েছে, তাহলে ব্রিটেনের রাজার ন্যায় তিনি সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারেন। এই ব্যাখ্যা ড: রাজেন্দ্র প্রসাদ মেনে নিয়ে হিন্দু কোড বিলে সই দেন। সেই ব্যাখ্যা এখনো বহাল আছে।

রাজেন্দ্র প্রসাদের দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে পণ্ডিত নেহেরুর আপত্তি ছিল বলে জানা যায়। তবে তাতে কোন ফল হয় না। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি ড: রাধাকৃষ্ণন ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে একজন অ-রাজনৈতিক ব্যক্তি। পেশা বা দলগত রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। কিন্তু চীনের সহিত সীমান্ত যুদ্ধে ভারতের বিপর্যয়ের পর ড: রাধাকৃষ্ণন কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের সাহায্যে পণ্ডিত নেহেরুকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে সরাতে চেয়েছিলেন। ড: রাধাকৃষ্ণনের চেষ্টা সফল হয় না (Major C. L. Datta : with two presidents) রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের কার্যকাল শেষ হয় ইন্দিরাগান্ধীর প্রধান মন্ত্রীত্বকালে। ড: রাধাকৃষ্ণান দ্বিতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রপতিপদ প্রার্থী হলে, তাঁকে কংগ্রেস থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয় না। পূর্বোক্ত ঘটনাই তার কারণ ছিল।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার সিদ্ধান্তেও রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ নাকি প্রথমে তাঁর সম্মতি দিতে না-রাজি ছিলেন। এরূপ আরো কিছু ঘটনার ইতিহাস আছে। তবে সেগুলি নিয়ে কখনো শাসন তান্ত্রিক সংকট দেখা দেয় নি এবং ঘটনাগুলি লোক-চক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে।

এ সব অভিজ্ঞতার বিচারে বলতে হয়, যে দোদুল্যমান সাংবিধানিক খড়্গের নীচে বসে প্রধান মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপরিচালনা করতে হয় তাতে তাঁর পক্ষে এমন ব্যক্তিকে কখনো রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করা চলে না, যিনি খড়্গটির কথা মোটেই ভুলতে চান না। প্রধান মন্ত্রী প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সংখ্যা-গরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের নেতা, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপতি অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন। এ দুয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। এ অবস্থায় উৎকৃষ্ট পন্থা হল রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী সমমর্যাদাসম্পন্ন দুই ব্যক্তি হওয়া। কে বড় কে ছোট সে প্রশ্ন আর তখন থাকে না। প্রধান মন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী

প্রতিশ্রুতি পালনে রাষ্ট্রতরণীকে তখন অন্তত: পাঁচ বছরের জন্য অবাধে লক্ষ্যের দিকে চালাতে পারেন।

জ্ঞানী জৈল সিং এর রাষ্ট্রপতি পদে নির্ব্বাচন সে বিচারে সুসঙ্গত এবং সঠিক অর্থবহ বলে মনে করা যেতে পারে। কিছু সংবাদপত্র বলতে চেয়েছে জ্ঞানীজীকে রাষ্ট্রপতিপদে নির্ব্বাচিত করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে রাষ্ট্রপতিপ্রধান শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সংবিধান সংশোধন এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ যাতে সহজ হয় তার জন্যই শ্রীমতী গান্ধী এক-জন বশংবদ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করলেন। রাষ্ট্রপতিপ্রধান শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা হয়ত নিছক কল্পনা বিলাস। শ্রীমতী গান্ধী এবং কেন্দ্রিয় সরকারের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা একধিকবার বলেছেন তেমন কোন চিন্তা সরকার করছেন না।

তবে দেশের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন যদি সত্যই আবশ্যক বলে বিবেচিত এবং তদনুযায়ী সংবিধান সংশোধিত হয়, তাহলে যিনিই রাষ্ট্রপতি থাকুন, তিনি সরে যাবেন এবং তাঁর স্থলে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আসবেন। সে কাজ বিধিসঙ্গত স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হবে, তাতে বশংবদ রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন হয় না। সংবিধান সর্বজনমান্য। বর্তমানে একে অলস জল্পনা কল্পনা বলেই ধরতে হয়। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জৈল সিং বলছেন, তিনি সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকবেন এবং দলমত নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য কাজ করে যাবেন। জনগণের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের শুভেচ্ছা বাণী ও অভিনন্দনবার্তা আসা শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপতি পদে জৈল সিং নির্ব্বাচিত হওয়ায় সর্বপ্রথম তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন লিওনেদ ব্রেজনেভ ও জিয়াউল হক।

পরলোকে স্বাধীনতা সংগ্রামীর

প্রবীণ বিপ্লবী এবং অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট কর্মী গোবিন্দ লাল দাস গত ২০শে জুন তারিখে তাঁর কলিকাতাস্থ বাস ভবনে ৬০ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেছেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী গোবিন্দলাল বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী ও দুটি অবিবাহিত কন্যা রেখে গিয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাহার অবদান স্মরণীয়। বন্ধু বৎসল অমায়িক এই প্রবীণ বিপ্লবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং পরিবার বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি?

এবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইন্দিরাজী বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন

ষ্টাফ রিপোর্টার

এবারের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন অষ্টম নির্ব্বাচন। আগের নির্বাচনগুলি হয়েছিল ১৯৫২, ১৯৫৭ ১৯৬২ ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭৪, ১৯৭৭ সালে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে ড: রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৬২ সালে ড: রাধাকৃষ্ণণ, ১৯৬৭ সালে ড: জাকির হোসেন, ড: জাকির হোসেনের আকস্মিক মৃত্যুর পর ১৯৬৯ সালে ভি, ভি, গিরি, ১৯৭৪ সালে ফকরুদ্দিন আলি আমেদ, ফকরুদ্দিন ফকিরুদ্দিন আলি আমেদের আকস্মিক মৃত্যুতে ১৯৭৭ সালে এন, সঞ্জীব রেড্ডি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এন সঞ্জীব রেড্ডি ছাড়া এঁদের সকলেই কংগ্রেস মনোনীত। কেবলমাত্র ভি, ভি গিরি নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেও শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী ও তাঁর সমর্থক এম, পি ও এম, এল দের সমর্থন পেয়েছিলেন।

এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জৈল সিং।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদাতা হল লোকসভার ও রাজ্য সভার সদস্যবৃন্দ এবং রাজ্য বিধান সভাগুলির সদস্যগণ। এবারের নির্বাচনে মোট ভোট দাতার সংখ্যা ৪৫৯৪। এঁরা হলেন লোকসভার ৫৪১, রাজ্যসভার ২৩২ এবং রাজ্য বিধান সভাগুলির ৩৮২১ জন সদস্য। এঁদের মোট ভোট মূল্য ১০, ৮৬, ৭৬৩। কোন একটী নির্দিষ্ট রাজ্যের একজন এম, এল, এর ভোট মূল্য হবে সেই রাজ্যের মোট জন সংখ্যাকে বিধান সভার মোট আসন অর্থাৎ মোট এম, এল, এর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার পর ভাগফলকে হাজার দিয়ে ভাগ করলে যা দাঁড়াবে সেটা। সেই কারণে উত্তর প্রদেশের একজন এম, এল এর ভোটমূল্য ২০৮, সিকিমের একজন এম, এল, এর ভোটমূল্য ৭। পশ্চিমবঙ্গের এম, এল, এদের ভোট মূল্য ১৫৮। সব রাজ্যের মোট এম, এল, এদের ভোটের মূল্যকে সংসদের উভয় কক্ষের মোট সদস্য দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যাবে সেটা হবে এম, পি দের ভোটমূল্য। এবারে একজন এম পির ভোট মূল্য হয়েছে ৭০২। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে হলে মোট ভোটের অর্দ্ধেকের বেশী ভোট পেতে হবে। মোট ভোটের অর্দ্ধেকের কম হলে 'এলিমিনেশন প্রসেসে' যে প্রার্থী সব চেয়ে কম ভোট পেয়েছেন তাঁর দ্বিতীয় পছন্দকে নিতে হবে। এই ভাবে বাদ দিয়ে দিয়ে যখন দেখা যাবে কোন প্রার্থী দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী অর্দ্ধেকের বেশী ভোট পেয়েছেন তখনই তিনি নির্বাচিত হবেন।

কংগ্রেস প্রার্থী জৈল সিং ৬৬ বছর আগে ১৯১৬ সালে ৫ই মে সাবেক ফরিদকোট রাজ্যের সাঁধওয়ান নামে এক নগন্য গ্রামের কুঁড়ে ঘরে জন্মেছিলেন। বাবা ছিলেন ছুতোর। বাবা মা, কিসান সিং ইন্দর কাউর ছেলের নাম রেখেছিলেন জারনেইল সিং। জৈল সিং এর ছেলে এখনও খুড়োদের সঙ্গে ফরিদ কোটের মাঠে জমি চাষ করে। জারনেইলের ছোট বয়সেই কীর্ত্তন গায়ক হওয়ার বাসনা ছিল। তারই প্রস্তুতিপর্ব্বে তিনি গুরুদ্বারে গুরু গ্রন্থসাহেব পাঠ করার ব্রত নিয়েছিলেন। খাওয়া, শোওয়া বিশ্রামের সময়টুকু ছাড়া তার কাজই ছিল ধর্মপ্রাণ খালসা জনতার জন্য গ্রন্থসাহেব একটানা পাঠ করে যাওয়া। গুরু গ্রন্থ সাহেব যার কণ্ঠস্থ সেই ব্যক্তিই ধার্মিক,

শিখদের চোখে জ্ঞানী। আঠার বছর বয়সে শিখ জনতার কাজ থেকে জারনেইল 'জ্ঞানী' উপাধি লাভ করেন।

ধর্মপ্রাণ জারনেইল সিং স্বাধীনতা সংগ্রামের নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারলেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিলেন, দীর্ঘ কারাবাস হল। জেলে ঢোকার সময় নাম জিজ্ঞাসা করার রহস্য করে বলেছিলেন আমার নাম জৈইল, সেই থেকে জৈইল বা জৈল সিং নামই প্রচলিত হয়েছে। রাজনীতির সূত্রে পরিচয় হয় বিপ্লবী নায়ক ভাই পরমানন্দ ঝাঁসি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে। স্বাধীন ভারতের নতুন দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপল। প্রতাপ সিং কায়রোঁর মন্ত্রী-সভার একজন মন্ত্রী হলেন, পরে রাজ্য সভার মুখ্য-মন্ত্রী হলেন। ইন্দিরাজী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। এই হল জ্ঞানী জৈল সিং-এর ৬৬ বছরের অভিজ্ঞতা। তবুও তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্য নন বিরোধী দল নেতারা বলেন, কারণ. তিনি ইংরাজী ভাল জানেন না। এই অপরাধে তিনি চরণ সিং, বাজপাইদের মত আংরেজি হটাও ওয়ালাদের কাছে পতিত। জৈল সিংকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী কংগ্রেস নির্ব্বাচন করায় বিরোধীদলের নেতারা দিশেহারা হয়ে ব্যক্তিগত কুৎসা রচনায় মুখর হয়েছেন। বি-জেপির অধিনায়ক অটলবিহারী বাজপাইর মত লোক জৈল সিংকে একটি নিরেট ভাঁড়, ইন্দিরা গান্ধীর হুকুম বরদার, হস্তিমূর্খ এই সমস্ত বিশেষণে ভূষিত করেছেন। বাজপাই আরও বলেছেন এহেন ব্যক্তি আবার নামের আগে উপাধী লাগান জ্ঞানী, যেন তিনি জন্মেছেন জ্ঞানী হয়েই। জৈল সিং রসিক ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বলেন কে বলে আমি ইংরাজী জানি না. টেলি-গ্রাফিক ইংলিশ আমি বলতে পারি। তিনি বলেন আমি জুতো সেলাই করতে পারি, সড়ক বাঁধতে পারি কৃষাণ বানাতে পারি, গুরু গ্রন্থসাহেবের সিংহাসন বানাতে পারি। এইসব স্বীকার করতে সিংজীর সামান্যতম দ্বিধা নেই। এতে এঁর মনের প্রসারতাই প্রকাশ পায় এবং সাধারণ শ্রমজীবীদের প্রতি ওঁর মমতার লক্ষণ, এটাই রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রধান যোগ্যতা।

ইন্দিরাজী জৈল সিংকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী নির্ব্বাচন করে রাজনৈতিক পণ্ডিতদের ঠকিয়ে-ছেন। তাঁরা কল্পনাতেও ভাবতে পারেন নাই কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করবেন জুতো সেলাই থেকে গুরু গ্রন্থসাহেব পাঠে পটু জ্ঞানী জারনেইল সিং ওরফে জৈল সিংকে। জৈল সিং ইন্দিরা গান্ধীর রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত প্রার্থী অনেকদিন আগে হতেই। ইন্দিরাজী জৈল সিংকে সর্বভারতের নেতৃত্ব তুলে ধরার জন্য আসাম, পাঞ্জাব প্রভৃতি নানা সমস্যা সমাধানে এগিয়ে দিয়ে কোন প্রকার ব্যর্থতার গ্লানি হতে মুক্ত রাখার জন্য সরিয়ে এনেছেন। বিরোধী দলের নেতারা এ বিষয়ে কোন আঁচ করতে পারেন নাই। তাই জৈল সিংকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী নির্ব্বাচন করে ইন্দিরাজী রাজনীতিতে অঘটন ঘটিয়ে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন, ফলে রাজনৈতিক বিশারদরা ভীমরতিতে আক্রান্ত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে ইন্দিরাজী ভারতের রাজ-নীতিতে একটি মৃদু "এটম" বোমা ফাটায়েছেন।

১৪/৭/৮২ ইং

অবক্ষয়ে বিপর্য্যস্ত দেশ

—বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

সুদূর অতীতকাল থেকে ভারতবর্ষ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, আদর্শবাদ, মূল্যবোধ ও ভাবধারা অনুসরণ করে চলার পথে অগ্রসর হতে অভ্যস্ত ছিল এতকাল। বৈচিত্রের মধ্যেই ছিল তার ঐক্য বোধ। পরকে আপন করার যাদু ছিল তার আচার-আচরণের মধ্যে নিহিত, ধন বৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য শ্রেণী বৈষম্য প্রান্তিক বৈষম্য থাকা সত্বেও একজাতি, একপ্রাণ, একতা বোধের অভাব হয়নি আপদ-কালে কখনো। ভারতবাসীর মনে পবিত্র ধর্ম বোধ ছিল এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, উক্ত বৈষম্য মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় হয়নি কোন দিন: বরং মনুষ্যত্বের প্রকাশ ও বিকাশ পরিলক্ষিত হত প্রায় সর্বক্ষেত্রেই। এর মূলে ছিল পাবার বাসনা নয়, দেবার মহৎ আগ্রহ।

ভোগের লিপ্সা নয় ত্যাগের আকাঙ্খা। দুর্বলকে রক্ষা, দুঃস্থকে সাহায্য দান ও দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দান এবং তাকে সংশোধনের জন্য পথ নির্দেশ ছিল বিহিত ব্যবস্থা কিছুকাল আগেও। পুরাতন মূল্য-বোধের উপর বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠা ছিল অধিকাংশ ভারতী-য়ের। ফলে সমাজ সুস্থ, সবল ও প্রাণবন্ত ছিল বৃটিশ শাসনের জগদ্দল পাথরে নিষ্পিষ্ট হয়েও। সামাজিক ন্যায়-নীতি-নির্দেশ সবাই মেনে চলতে আগ্রহ দেখাত, আপন মঙ্গল চিন্তায়।

সমাজপতিরা নিরপেক্ষতা, সত্যতা, ও সুবিচারের মাধ্যমে সকলকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হতে খুবই সাহায্য করতেন। বিশাল ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিটি মানুষের মনে আধ্যাত্ম চিন্তা, জীবসেবার আগ্রহ, অতিথি বাৎসল্য ও মানুষকে বিশ্বাস করার প্রবণতা ছিল অপরিসীম।

সবার উপরে মানুষ সত্য চণ্ডীদাসের এই বাণী ভারতীয়দের মনে প্রকৃত সত্য ছিল তাই তারা মানুষের প্রাণ সংহারে কোনরূপ উৎসাহ বোধ করতো না, বরং আর্ত মানবের সেবায় আত্মনিয়োগে আনন্দ লাভ করতো। প্রবল স্বজাত্য প্রীতি ছিল প্রায় সর্বত্রই, অবশ্য ব্যতিক্রম হয়তো বা কোথাও কোথাও কিছু কিছু ছিল,—সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। মোট কথা একটা সুস্থ প্রাণবন্ত সমাজ ছিল ভারতে, যে সমাজ ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতো, আবার সাজাও দিত এবং প্রয়োজন বোধে সংশোধন করে মানুষকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য ও সহযোগীতা দিত। সে মধুর দিনগুলি কোথায় যে অন্তর্হিত হলো ও কেন এমন হলো? এটাই প্রশ্ন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সর্বপ্রথম লক্ষ্যে করা যায় যে, পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে কারো কারো ন্যায় ভারতীয়রাও আত্মসর্বস্ব চরম স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু, জড়বাদে বিশ্বাসী, উৎকোচে—বশীভূত, বিবেকহীন, সনাতন মূল্যবোধে অবিশ্বাসী, প্রেম-প্রীতিহীন পাশব প্রবৃত্তির সহায়ক এক অবক্ষয়িত মনুষ্যসমাজের গোড়া-পত্তনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নয়; বরং ঐরূপ নিম্নগামী হতেই তারা যেন হঠাৎ বদ্ধপরিকর। অর্থের বিনিময়ে গৃহস্থ ঘরের গ্রামীন ও শহুরে নারীরাও কেউ কেউ আত্মসম্মান ও মর্য্যাদা লুটিয়ে দিতে পশ্চাদপদ নয়।

পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা যেন মূল্যহীন বোধ হয় অনেকেরই কাছে, অথচ পুরাতনের বদলে নূতন ব্যবস্থা যে প্রেরণা দেয় তা শুভ তো নয়ই; বরং আরো বিপদজনক ও সর্বসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকারক তা। ফলে মানুষে মানুষে বিবাদ-বিসংবাদ, অবিশ্বাস প্রতারণার কু-প্রবৃত্তি প্রভৃতি নানারকম দুষ্ট দৃষ্টান্ত

ঘটতে থাকে অহরহ। এই অবস্থান্তরে মানুষ দিশেহারা হয়ে আর্থিক সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় নীতি ভ্রষ্ট, স্বৈরাচারী ও মূলতঃ অসৎ হতে শুরু করে প্রায় জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই; যার জন্য প্রত্যেকেরই নানা জটিলতার মধ্যে পদস্খলন ঘটতে থাকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

মানুষ অবস্থার দাস, কাজেই ঐরূপ মারাত্মক অবস্থার চাপে পড়ে বহু প্রকৃত সৎ, আদর্শনিষ্ঠ, ও পুরান মূল্যবোধে আস্থাশীল মানুষও ক্রমশ ধাপে ধাপে আদর্শ ভ্রষ্ট, লোভী ও সহজে ধনী হবার পন্থা আবিষ্কারে হীন ও জঘন্য সব কাজে নেমে পড়ে পরস্পরের প্ররোচনায় ও প্রতিদ্বন্দ্বীতায়। শুভবুদ্ধি লোপ পায় অধিকাংসেরই, সমাজও নিম্নগামী হতে থাকে ধাপে ধাপে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালের শেষে, তবুও যে বিষাক্ত আবহাওয়া তখন ভারতের সর্বত্র অন্ন বিস্তর প্রসারিত যুদ্ধের কুফলে, তা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে।

মানুষ আত্মস্থ হতে শিক্ষাগ্রহণ করে না। উল্টে উক্ত নিম্নগামীতা দেশ ও সমাজের সর্বস্তরে আস্তে আস্তে বিস্তৃত লাভ করে। মানুষের চেয়ে কালো টাকার দাম অনেক বেশী মূল্যবান বলে গ্রহণীয় হয়, যার পরিণামে খাদ্যবস্তুতে, ঔষধে, শাক্‌সবজীতে, ভোগ্য পণ্যে শিশু খাদ্যে, পশুখাদ্যে সবেতেই ভেজাল মেশান চলতে থাকে অতিরিক্ত মাত্রায়। মানুষের ওষ্ঠাগতপালিত জীবজন্তুর বাঁচার পথে নিশ্চিৎ বিপদ ঘটাতে উক্ত অতিলোভীরা একটুও ইতঃস্তত করে না, বরং প্রসাদ লাভ করে ও ঐসব কালো টাকার জোরে গাড়ীবাড়ী নির্মান করে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আয়োজন করে।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এইযে, বহু গন্য মান্য শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি ও আধুনিক শিক্ষিত পুরুষ সমাজ তাদের স্ব প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সংস্থার নানান অনুষ্ঠানে ঐ সব কাল টাকার মালিকদের হয় সভাপতি আর না হয় প্রধান অতিথি রূপে সম্মানিত করে, শুধু মোটা অংকের চাঁদা আদায়ের লোভে। এই হচ্ছে আধুনিক সামাজিক চিত্তার ধারা ও তার অনুসরণ ও অনুকরণ প্রায় সর্বত্রই। অথচ ইতি পূর্ব্বেই ঐ হীন পন্থায় অর্জিত অর্থে অর্থবান ধনীদের মানুষ মনে মনে ঘৃণা করতো ও তাদের সামাজিক মান-মর্য্যাদা দিতে কেউই অগ্রসর হতো না তৎকালীন সমাজের সমালোচনার ভয়ে এবং শাসনের ভয়েও বটে। পূর্বে বিদ্বান ব্যক্তি ধনীদের চেয়ে সর্বত্র অধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করতো, কিন্তু বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে পণ্ডিত ও প্রকৃত জ্ঞানী-গুনী জন তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় না—এটাই সমাজের নিম্নগামীতার লক্ষণ। বর্ত্তমান যে সমাজে আমরা বাস করছি সে সমাজ যে কত বিপদজনক, কত কুরুচিপূর্ণ, কত মূল্যবোধ হীন, কত বিকৃত ও কত স্বার্থসর্বস্বতা ভাবলেও মন ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দুঃখই বাড়ে কেবল, অথচ এর এখন প্রতিকার প্রায় অসম্ভব।

যুব সমাজ সচেতন ও আত্মস্থ হলে এর প্রকৃত প্রতিকার বাস্তবে সম্ভব, কিন্তু তারাওতো বিভিন্ন বিদেশী ইজিমের ধাক্কায় বিপর্য্যস্থ, বিভিন্ন বিকৃত রুচির ছায়াছবির প্রদর্শনীর বিষয় বস্তুর নকারজনক ব্যবস্থাপনার আওতায় বিমূঢ় ও আদর্শ সন্ধানে ব্যর্থ। কাজেই হাল ধরবে কে চিরদিনই তারুণ্য আদর্শের ধ্বজা তুলে ধরে, তারাইতো দেশের জাগ্রত প্রাণ শক্তি। তারা ঘুমিয়ে থাকলে কে রক্ষা করবে এই দারুণ অবক্ষয়ের হাত থেকে মানুষকে ও তার সমাজকে তথা ভারতবর্ষকে। তাদের শুভবুদ্ধি জাগুক, তারা আবার সচেতন হোক। দেশ আবার গর্বে মাথা তুলে দাঁড়াক বিশ্বের দরবারে। ভারতের স্বাভাবিকতা ফিরে আসুক। জয় ভারত, জয় জগত।

চিঠিপত্র

মাননীয় সম্পাদক
"বিপ্লবী বাংলা পত্রিকা"

আগামী ৮ই আগষ্ট রবিবার প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি, আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকায় এই অনুষ্ঠানের সংবাদটি যথারীতি প্রকাশ করিয়া আশা রাখি সহযোগীতা করিবেন।

৮ই আগষ্ট রবিবার ৮২ হুগলী জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রীতি সম্মেলন।

স্থান—নিঃস্বপ্লানন্দ গার্লস কলেজ, সময় সকাল ১০টা। ভদ্রকালী (সখের বাজার) হুগলী

পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদের সম্বর্ধনা।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা অবলম্বনে ভাষন প্রতিযোগীতা।—

(নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য)

৪। হুগলী জেলার তথা পশ্চিম বাংলার শ্রমিক নেতা শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন।

রাধা চরণ চক্রবর্ত্তী

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রমোদ চন্দ্র ঘোষ, ৭৭ বছর বয়সে গত ১৬ই জুলাই, চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী অবহেলিত অবস্থায় এন, আর এস্ হাঁসপাতালে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে দেহত্যাগ করেন। বহু বছর যাবৎই তিনি বাতে পঙ্গু ছিলেন। ১৬ বছর বয়সে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম জেলে যান ৭ মাস সাজা নিয়ে। পরে ১৯২৪ সালের অক্টোবরে ১৯ বছর বয়সে বিনা বিচারে ৪ বছর আটক থাকেন। জেল থেকে বেরিয়ে প্রয়াত মুজাফ্ফর আহাম্মদ, বংকিম মুখার্জি, শ্রীআবদুল মমিন প্রভৃতির সাথে যুক্ত হোয়ে শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৯ সালের জুট মজদুর ধর্মঘটের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৩০ সালে বন্দীও বিনা বিচারে আটক থাকেন ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত। পরে কম্যুনিস্ট দলের সাথেই থাকেন।

আমরা এই বীর বিপ্লবীর মৃত্যুতে আমাদের আন্তরিক বেদনা জানাচ্ছি।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

JUNE—1982

Dist—CALCUTTA

Basu Smt Prafulla Bala w/o Late Surendra Nath Bose Chowdhury, Nimta, Calcutta 49
Basu Smt Nilima w/o Late Mohit Chandra Bose 10 Meharali Road Cal 17
Bhaduri Bhabesh 75 Shyambazar Street, Calcutta 4
Bhattacharjee Anil 87-B Raja Dinen ra Street, Calcutta 6
,' Santosh Kumar 24 Suren Tagore Road, Calcutta 19
Dasgupta Himangshu Lal 131E Netaji Subhas Road, Calcutta 40
Maniodranath Tevoli Court F28 Ballygunge Circular Road. Calcutta 17
,, Smt Nitya Rani w/o Late Ratanlal 80 Miilanpalli, D. P. Nagar, Cal. 56
Dey Amal Chandra 77/20 Ibrahampur Road Calcutta 32
Dutta Dhrubajyoti 60/2 Biren Roy Road, Barisha, Calcutta 8
,, Smt Helena 4 Bhabanands Road, Calcutta 26
Ghosh Smt Mukul Rani w/o Late Subodh Ch 81A Kabi Bharat Ch Road, Cal. 28
Gupta Smt Rama w/o Late Sushil Kumar 2 Motilal Colony, Rajarhat, Calcutta 81
Lahiri Taranath 87 B/1 Raja Subodh Mullick Road, Cal.47
Majumdar Smt Bakulrani w/o Late Himangshu Majumdar P-85 Block-P New Alipur Cal. 53
Mitra Smt Radharani w/o Late Mukunda Behari, P-150 Lake Town, Calcutta 55
Mukherjee Bimala w/o Late Bhutnath Mukherjee 12 Baishnabghata Road, Calcutta 47
M. Nagasundaram 38/2 Elgin Road, Calcutta 20
Pal Smt Amiya Kana w/o Late Prafulla Ranjan Pal 9/B Dum Dum Road, Cal
Rakshit Smt Aruna w/o Late Nanigopal, 15 Vivekananda Garh, Calcutta 55
Roy Smt Manorama w/o Late Chittaranjan, 200 SP Mukherjee Road, Calcutta 26
Roy Smt Niharkana w/o Late Probhat Kr 24/8 New Ballygunge Road, Cal. 39
Roy Chowdhury Renuka w/o Santosh, 5/5 B, T, Road, Mitra Bagan Calcutta 56
Sen Smt Chinu Rani w/o Late Parimal Kumar, Calcutta 56
Siddhanta Jnanendra Nath 4A Russa Road, Calc tta 33
Talukdar Kumari Parbati d/o Chittaranjan 26 Belegbata Main Rd. Cal. 10

Dist—24 Parganas

Acharjee Smt Uma w/o Late Manindra Chandra, Ashoknagar
Chakraborty Smt Lakshmirani w/o Late Dhirendra Ch. H B, Town Road, Sodepur
Chatterjee Kanti Ranjan, Barasat
Ghosh Smt Pramilabala w/o Late Santosh Kumar, Dinabandhu Nagar Bongaon
Guha Smt Renuka w/o Late Nityagopal 18 Park Children School, Ichapur
Khastagir Sushil Kumar Garia Station Road
Mukherjee Smt. Ranu w/o Late Sunil Kumar Mukherjee, Station Road, Garia

Dist—Nadia

Dutta Smt Chinurani w/o Late Sudhirchandra Dutta 9 Kathuriapara, Nadia

Dist—Burdwan

Chowdaury Smt Belarani w/o Late Dhananjay Chowdhury, Kashipur, Sahebbagan

Dist—Bankura

Deb Smt Uma w/o Late Pabitra Kr. Feeder Road, Bankura

Dist—Midnapore

Jana Surendra Nath, Srirampur. Midnapore

Maity Smt Subhadra w/o Nanigopal Maity, Panchrol Midnapur

Ghorai Smt Shantesbila, w/o Late Probhat Kumar, Talda

Dist—Cooch Behar

Talukdar Kumari Hena d/o Late Monindra Mohan Talukdar, Coochbehar

Dist—Hooghly

Chatterjee Kumari Nivedita d/o Late Smt Prasadibala & Late Tridibendra Chatterjee 48 Bhagirathi Lane, Mohesbtola

Kheta Smt Kusumbala w/o Nandalal, Harohar, Panswarah, Hooghly

Dist—West Dinajpur

Laha Smt Ashalata w/o Late Nishikanta Laha, Binwara, Teor

ReedNo R. N .24511/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. WB/NC 77

বার্ষিক .—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

430

সম্পাদক—

শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী

শ্রীকালীপদ সরকার

শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—

বেহা[illegible] 27.7.82 [illegible]

নন্দগোপী[illegible]

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জাতে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী [illegible] মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব [illegible] দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। দৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। কেস যাদের তোলেনি (১)—১.০০, ১৪। কেস যাদের তোলেনি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯৩ এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৮.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

টেলিফোন—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ১৪ই শ্রাবণ ১৩৮৯ ৩১ শে জুলাই ১৯৮২	৪৩ সংখ্যা

অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে, তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে। একথা অনিবার্য্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।

রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদকীয়

যা চলছে তা চলতে দেওয়া চলে না

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রাম, বাস, দুগ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দাম বাড়াবার বিষয় ভাবনা চিন্তা করছেন বলে সম্প্রতি পত্র পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হচ্ছে। মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই অপদার্থ সরকার একটা দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলির তালিকা দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

সরকার পক্ষের দলগুলির কোন চক্ষু লজ্জার বালাই নেই। প্রকৃত অবস্থার বিশ্লেষণ না করে কোন সমস্যার কোন সমাধান কেউ কোনদিন করতে পারেনি, এটাই ইতিহাসের সাক্ষ্য। যে কারণগুলি এইসব ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সেই মৌলিক ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার কোন সৎ প্রচেষ্টা নেই। কর্মীরা বিরাট সংখ্যায় অনুপস্থিত থাকে, দলবাজীর খাতিরে বহু কাউকে চাকরী দেওয়া হয়েছে, যেটা অর্থনৈতিক দিয়ে এইসব সংস্থাগুলির লোকসানের বহর ক্রমশঃই বাড়িয়ে চলেছে। কাজ করব না, অথচ ক্রমবর্দ্ধমান এবং অযৌক্তিক দাবী দাওয়া আদায় করব, দাদারা যদি পেছনে থাকেন, তবে তাদের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না, কোন কর্তব্য পরায়ণ অফিসার যদি কাজ করিয়ে নিতে চান, তবে ঘেরাও করে তার জীবন বিপন্ন করে তুলব এবং সেজন্য কোন শাস্তিভোগ করতে হবে না, নিজেদের কর্তব্যচ্যুতির ফলে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেলেও কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, এই প্রকার দুষ্ট মানসিকতাই সেসব সর্বনাশের জন্য মূলতঃ দায়ী।

সে সত্য জেনে বুঝেও কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন না। কারণ সেটা করলে দলীয় কাডারদের পেলব অঙ্গে আঘাত দিতে হয়। তা ভিন্ন এই মানসিকতা বহু বৎসর ধরেই, আজ যারা প্রশাসন যন্ত্র দখল করে আছেন, তারা সৃষ্টি, লালন ও পালন করে এসেছেন। এইভাবে যে ফ্রাঙ্কস্টাইনের সৃষ্টি করেছেন সেই দৈত্যই আজ তাদের উপর আঘাত হানছে। এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার নৈতিক অধিকার তারা হারিয়ে ফেলেছেন। এখন মুখ্যমন্ত্রী থেকে সুরু করে অনেক মন্ত্রীই চি চি করছেন বটে, তবে পরিস্থিতিটা ইতিমধ্যে তাদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছে।

ধরুন যানবাহনের কথা। প্রথমেই স্টেটবাসের পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে এই সংস্থাটি মাথা ভারী। কাজ না করা, জিনিসপত্র চুরি করে বিক্রী করা, বাস মেরামতি ও তদারকী না করাই কর্মীদের অবশ্য করণীয় কাজে পরিণত হয়েছে। ফলে, একটা প্রাইভেট বাসের মালিক যেখানে বাসপ্রতি মাসে তিন চার হাজার টাকা আয় করে, সেখানে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাকে রাজ্য

সরকারকে ভর্তুকী দিতে হয় তিরিশ কোটি টাকা। ট্রামেরও সেই অবস্থা, যে কোন ডিপোতে গেলে, একমাত্র মন্ত্রী দলবাজ ছাড়া প্রত্যেকেরই চোখে পড়বে বহু সংখ্যক ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ভাড়া বাড়ালেই এই সমস্যার সমাধান হবে, একমাত্র বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া যেকোন সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোকই তা বুঝবেন। একটি চৌবাচ্চা থেকে যতটুকু জল প্রবেশ করে, তার দ্বিগুণ পরিমাণ জল বেরিয়ে গেলে, চৌবাচ্চা ও খালিই হয়ে যাবে। সেখানে প্রয়োজনীয় জল থাকবে না কোনদিনই।

আসা যাক্, দুগ্ধ প্রকল্পের কথায়। দীর্ঘকাল অবহেলার ফলে, যন্ত্রপাতির শোচনীয় অবস্থা। এর সঙ্গে যুক্ত আছে কর্মীদের অনুপস্থিতি, বোতল ভাঙ্গা, চুরি করে দুধ বিক্রী করে দেওয়া। এ সব বন্ধ না করতে পারলে, দুগ্ধ সরবরাহ স্বাভাবিক হবে? লোকসানের পরিমাণ কমবে? দাম বাড়ালে কি অবস্থার পরিবর্তন হবে? এতে জনসাধারণের পকেট কাটা যাবে, দুঃখ কষ্ট যা আছে, তাই থাকবে বরং মৌলিক সমস্যার সমাধান না করলে, পরিস্থিতি উত্তরোত্তর খারাপই হবে। তবে অতিরিক্ত তলব বোনাস ও অন্যান্য সুযোগ দলীয় কাডারদের পাইয়ে দেওয়া যাবে। এই জনদরদের নমুনা, এই জনসেবার স্বাক্ষর?

পক্ষান্তরে ডানকুনির মাদার ডেয়ারীর অবস্থার সঙ্গে একটু তুলনা করলেই বোঝা যাবে বেলগাছিয়ার দুগ্ধকেন্দ্রের পার্থক্য কোথায়। সেখানকার কাজকর্ম এমন নিখুঁতভাবে, পরিকল্পনা মত চলে, তা দেখে নাকি বেলগাছিয়ার লোকদের মনে হয়েছে এটা যেন একটি বিদেশী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত। দুটোই রাজ্য সরকারের সংস্থা। তবে ডানকুনির সংস্থাটি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত। টাকা ধার নিয়ে যে কারখানা চালু হয়েছিল, সেটি একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। দামটা তুলনায় বেশী, কিন্তু সরবরাহ নিয়মিত, দুধের গুণগত মানও ঢের বেশী। কিন্তু দাম কম কি বেশী, সেটাই একমাত্র সমস্যা নয়।

প্রধান সমস্যা দূষিত পরিবেশ, যেখানে প্রশাসনিক অক্ষমতার জন্য সংস্থাটির সর্ব অঙ্গ দূষিত হয়ে পড়েছে। লিটার প্রতি দ্বিগুণ দাম বাড়ালেও দুগ্ধ প্রকল্পের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না। লোকসানের মর্দমা নিয়ে বর্দ্ধিত মূল্যের সব টাকাই বেরিয়ে যাবে। অথবা জনসাধারণের উপর একটা অর্থনৈতিক বোঝা চাপান হবে। মানুষের কি দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে, সেদিকে কারো কোন খেয়াল নেই—না কর্তৃপক্ষের, না তাদের। আগাম টাকা জমা দিয়ে, প্রতিদিন সকাল বেলায় দুধের ডিপোর সামনে তীর্থকাকের মত অপেক্ষা করতে হবে, যদি সরকার সেদিন দুধ মেশানো জল বা জলমেশানো দুধ দেন। তিনদিন অন্তর একদিন ফাঁক যাবেই। এতেও ভোগান্তির শেষ নেই। যদি বা দুধ পেলেন, বাড়ী নিয়ে উনুনে চাপালেই দেখলেন দুধ ছানায় পরিণত হল। শিশু, বৃদ্ধ, রোগীর মুখে কি দেবেন? এত স্নায়ুচাপের মধ্য দিয়ে যে দিনের সুরু, লোডশেডিং, পানীয় জলের অভাব, চলাফেরা করতে জীবনকে বিপন্ন করে দিন শেষ। এই সরকারী দক্ষতার নমুনা। এদের লজ্জা নেই, বিবেকের দংশন নেই, জনদরদের কথা ও নিছক বোকাবাজী। কোন মুখে এরা উচ্চারণ করে দুধের দাম বাড়াবার কথা? তবে কি এদের সেই অবস্থায় উত্তরণ পর্বসমাপ্ত, যাকে চলতি কথায় বলে, যার এক কান কাটা সে একটু ঢেকে ঢুকে চলে, আর যার দুই কান কাটা, সে বেপরোয়াভাবেই ঘোরাফেরা করে।

পরিস্থিতি গুরুতর। প্রয়াত বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মশত বার্ষিকীতে তার নামের পরিকল্পনা দুটিরই রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ও দুগ্ধ প্রকল্প—সমাধি রচনা করার ব্যবস্থা পাকাপাকি। ডাঃ বিধানচন্দ্র মরিয়া বাঁচিয়াছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা ত 'বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরি নিতি নিতি।' অবশ্য বিপ্লবী সরকার যদি বলেন যে যেদেশে শতকরা পঞ্চাশভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, সেখানে প্রতিদিন দুধ খাওয়াটা বা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করাটা একটা বুর্জোয়া মানসিকতা মাত্র, সেকথা আলাদা।

দুগ্ধ প্রকল্পের অবস্থাটা আরো খারাপ হওয়ার আশঙ্কা আছে শোচনীয় বিদ্যুৎ পরিস্থিতির জন্য। সুতরাং দাম বাড়াবার যুক্তি নেই কোন দিক থেকেই। মহম্মদ তুঘলকের নবতম সংস্করণ দিনদিনই তার ভয়াল রূপ প্রকাশ করছে।

এর প্রতিবিধানই শুধু নয়, শোচনীয় অবক্ষয়ের প্রতিরোধ করতে হবে। এরাজ্যের বিরোধীদলগুলির থেকে মানুষ এই দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাহায্য প্রত্যাশা করে। তারা কি শুধু কাগজে কলমে বক্তৃতি দিয়ে বা ব্যক্তিগত ধান্দা চরিতার্থ করেই কাজ শেষ করবেন? সাধারণ মানুষের কোন সংগঠন নেই তাই তাদের প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও রোষের স্বাক্ষর রাখা সম্ভব নয়। এদের নেতৃত্ব দেবার কি কেউ নেই? বাংলাদেশ বিপ্লবের পীঠস্থান। এই জঘন্য অত্যাচার ও অবিচারের রাজত্বকে খতম করার দায়িত্ব বাঙালী-কেই নিতে হবে।

সেই তিমির বিদায় উদার অভ্যুদয় কবে; কোথায় কিভাবে ঘটবে তারই প্রতীক্ষায় নিপীড়িত, নির্য্যা-তীত, অপমানিত বাঙালী জাতি দিন গুনছে। চূড়ান্ত বিপর্য্যয়ের অশনি সঙ্কেত আজ বাঙালী জাতির সামনে। হয় তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নতুবা চরম অবলুপ্তি মেনে নিতে হবে। কবি গুরুর সেই আপ্তবাক্য স্মরণে রাখতে হবে অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে বিধাতার রুদ্ররোষ উভয়কেই তৃণ সম দহে।

বর্তমান সরকার সাধারণ মানুষের উপর খরচ বাড়াবার যে চেষ্টা করছেন সেটা হবে কেবল দিনে রাত্রে। জল ঢেলে ফুটাপাত্রে। বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবার সামিল। এ রাজ্যের রাজকোষ ত প্রায়শূন্য। খরচ মেটাবার জন্য ট্যাক্স বা দাম বাড়িয়ে টাকা সংগ্রহের এটা একটা প্রাথমিক অপচেষ্টাও হতে পারে। তাই প্রতিবাদ করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বাঁচতে হলে বাঙালীকে আজ মরার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কোটি কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে হবে হয় দক্ষ প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করো, নইলে গদী ছেড়ে দাও। দৃপ্তকণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বলতে হবে যা চলছে, তা চলবে না, চলতে দেওয়া হবেনা। এ ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই।

———

এসেছে বরসা, এসেছে ভুবন ভরসা

—কালীপদ সরকার

পশ্চিমবাংলার মানুষ রৌদ্র তপ্ত আষাঢ়ের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছে, বৃষ্টি তুমি কোথায়? মাস শেষ হয়ে এল কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। সমুদ্র গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছে, বুকে তার চাপ সৃষ্টি নেই। মৌসুমী বায়ু এখনো দূরে। চাষের কাজ বন্ধ। সর্বত্র দুশ্চিন্তা, হাহাকার। দুচার দিনের মধ্যে বর্ষা না নামলে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবতেও পারছে না কেউ।

আমাদের ছোট বেলায় অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আষাঢ় মানে এমন খরা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তখন সত্যই 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই' থাকত না, মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে যেত। বাদলের ধারা নামত ঝর ঝর করে এবং গুরুজনের দৃষ্টি এড়িয়ে এক ফাঁকে আমরা বেরিয়ে পড়তাম নতুন বৃষ্টির জলে ভিজতে। ওপরে গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি, গরজে গগনে গগনে, আর তার নীচে জলে ভিজে ছুটাছুটি করতে কি আনন্দই না হত।

"ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে,
কাঁপিছে কানন বিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কল কল্লোলে
এলো পল্লীর কাছেরে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে,
ময়ূরের মত নাচেরে॥"

সে দিন আর নেই। নেই বয়স ও পরিবেশ। কালস্রোতে সব ভেসে গেছে। নির্বাসিত জীবনে পুরানো দিনের স্মৃতিসুখ অনুভবই শুধু সম্বল।

এই যে বৃষ্টিহীনতা, এই যে খরার প্রকোপ এ কি প্রকৃতির খেয়াল? না প্রকৃতির প্রতিশোধ? পৃথিবীতে মরুভূমি বাড়ছে, এই ভারতেও তার করাল গ্রাসে প্রতিবছরই কিছু সরস ভূমি অন্তর্হিত হচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গেও ভূমির উষরতা এবং রুক্ষতা কৃষিবিদদের চিন্তার কারণ হয়েছে। কৃত্রিম সার প্রয়োগ এবং নলকূপের জলের সেচ ক্রমাগত ব্যবহার করার ফলে মাটির ক্ষার এবং রুক্ষতা দেখা দিচ্ছে। অবশ্য অনেক এমন নৈসর্গিক পরিবর্তনের পিছনে যে মানুষের অপরিণামদর্শী নির্দয় কাজ বর্তমান সে কথা অস্বীকার করা চলে না। গত একশত বছরে এই পশ্চিমবঙ্গে যে হারে বৃক্ষ ধ্বংস করা হয়েছে, যে ভাবে বনভূমিকে উচ্ছেদ করে আবাদী জমীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং আবাদী কৃষিভূমি নষ্ট করে শত শত কলকারখানা ও বাস গৃহ নির্মিত হয়েছে তাতে এই রাজ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাই বর্ষায় আমরা বৃষ্টি পাই না, শীতে শীত হয় স্বল্পস্থায়ী, বসন্ত প্রায় অদর্শন।

এই বৃক্ষপাতন কেবল সমতল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়, পর্বতের সানুদেশে, উঁচু নীচু ঢালাইয়ে এবং গিরিনদীতটেও চলেছে। সেখানে সেই ঘন শাল-পিয়াল বন, অভ্রংলেহী দেবদারু শ্রেনী এবং নাম না জানা ঘন আগাছার ঝোঁপ জঙ্গল নির্মূল প্রায়। কিছু সংরক্ষিত বনভূমি আছে বটে, কিন্তু সেখানেও পরিনত বয়সের বৃক্ষ কদাচিদ্ দেখা যায়। মানুষের ক্রমবর্ধমান লোভ ও ক্ষুধা প্রকৃতিকে নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠন করছে। তাই পল্লবিত দীর্ঘ তরুদল আজ যদি মেঘকে নীচে নামতে না ডাকে, তাদের বিস্তৃত শিকড়গুলি গিরি-মাটিকে ধরে রেখে নদনদী প্রবাহে পলি জমতে বাধা না দেয় এবং বাতাসকে দোষমুক্ত না করে, তাহলে তার জন্য দায়ী কি মানুষই নয়?

তাই কি সব? ক্ষতির আরো অনেক কারণ আছে। কল কারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া, ময়লা

এবং গ্যাস বাতাসকে দূষিত করছে। সেই বিষাক্ত বায়ু গাছেরা নিঃশব্দে গ্রহণ করে তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, তেজ এবং ফুলফল দানের শক্তি হারিয়ে অকালে মারা যাচ্ছে। বর্তমানে শহর ও পল্লীর জন্য জল সরবরাহে এবং কৃষির জন্য ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চালিত গভীর নলকূপের ওপর নির্ভরশীল। ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর সর্বত্র একরূপ নয় এবং ঋতু অনুযায়ী কমে বাড়ে। উদ্ভিদ জগৎ ভূ-নিম্ন জল এবং মাটির সরসতা আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। সূর্যের আলো এবং পাতালের জল উদ্ভিদের প্রাণশক্তি স্বরূপ। উদ্ভিদ পৃথিবীর আদি সন্তান এবং সৃষ্টিরক্ষায় অনন্তকাল ধরে নীরবে কর্তব্য করে যাচ্ছে। বৃক্ষের চেয়ে বড় নিরুপদ্রব আকাল বন্ধু মানুষের আর নেই। সারাবছর ধরে শত সহস্র গভীর নলকূপ থেকে জল তোলায় ভূগর্ভস্থ জলের উচ্চতা হ্রাস পাচ্ছে এবং উদ্ভিদকুল মাটির সরসতা থেকে খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বনমহোৎসব এবং বৃক্ষ-রোপন অনুষ্ঠানের সঙ্গে বৃক্ষজীবনের এ সব সমস্যাও ভেবে দেখা দরকার।

কিছু ভূ তাত্ত্বিক বলেন, পরমাণুশক্তি ব্যবহার, পরীক্ষামূলক আনবিক বিস্ফোরণ প্রভৃতি ভূ পরিবেশে যে তেজোস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে চলেছে তাতে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। বৃষ্টির স্বল্পতার অন্যতম কারণ হয়ত এই তেজোস্ক্রিয়তা। বিজ্ঞান আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে তা আমরা জানি নে। প্রযুক্তিবিদ্যা সর্বস্ব আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। বিশ্বকবি তাই একদিন মনোদুঃখে লিখেছিলেন—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এনগর,
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,"

নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা কবির কথায় সাড়া দেয় নি। শহর বেড়েই চলেছে। বহুতল বাড়ীতে শহর ভরে উঠলে স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহ প্রতিহত হবে। সুউচ্চ গৃহের বাসিন্দারা কোটরে যে বন্দী জীবন যাপন করবেন তাতে না থাকবে করুণাঘন মৃত্তিকার স্পর্শ, না প্রকৃতির মুক্ত আলো বাতাসের আনন্দদোলা। বৃক্ষেরা ঊর্ধ্বশীর্ষে আলোকের প্রথম বন্দনার গৌরব থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের বিজয় ধ্বজা হবে নতশির। লিখতে লিখতেই হঠাৎ মুক্ত বাতায়ন পথে নজরে এল আকাশে মেঘ জমেছে। ঢাকা পড়েছেন সূর্যদেব। আশা করছি, লেখাটা যখন ছাপা হয়ে বেরুবে তখন ঝর ঝর ধারে নামিবে বাদল, পথ প্রান্তর হবে কর্দম পিচ্ছল। তরুপল্লব কাঁপিবে হরষে নববরষণ পরশে।

মন বলছে, বিলম্বিত তুমি এসেছ, তাতেই আমরা ধন্য। হে বৃষ্টি, তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো। জানি, বকুল শাখায় নির্জনে কেউ দুলবে না, নীপতরুমূলে মোহন বাঁশরি বাজবে না, ছায়াদেরা দীঘির জলে বিরলে গলা ডুবিয়ে কেউ মেঘের সঙ্গে কথা বলবে না।

কলিকাতা সহসা জলে ভেসে যাবে, ট্রাম পথের মাঝে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে, দুর্গম ফুট-পাথের অদৃশ্য গহ্বরে পড়ে হয়ত ভবলীলা সাঙ্গ হবে, কিংবা ময়লা, কালি, বিড়াল ইন্দুরের গলিত শব বাহিত জল প্রবাহে প্রাণ হাতে নিয়ে পথ চলতে চলতে পথের নিশানাই হারিয়ে যাবে। তা যাক, তবু বৃষ্টি তুমি এসো, এসো মুক্তধারায়, চুল এলো করে, ঘন ঘোর রূপে, হিল্লোল বহিয়ে ধরিত্রীর অঙ্গে অঙ্গে।

বলব তখন, "এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা গগন ভরিয়ে এসেছে ঘন ভরসা/দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা।" ক্ষণিকের জন্য ভুলে যাব রুদ্ধ দুয়ার হৃদয়ের নিবিড় দুঃখ ভাবনা, ভুলে যাব আশা নিরাশা হতাশার অকরুণ বঞ্চনা।

মনে মনে নীরবে ভাবব, "ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহ-বন্ধন/ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা। /ওরে ভাষা নাই নাই বৃথাবসে ক্রন্দন/ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা। /আছে শুধু পাখা, আছে মহা-নভ-অঙ্গন

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অব্যাহত

—বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বার্তা বহন করে দিকে দিকে। বিজ্ঞান সাধনার মূল উদ্দেশ্য, মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধকরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি উপশমের ও আরোগ্যের ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে। মানুষ রোগ মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে শস্যউৎপাদনের নব নব পন্থায়ও নূতন ধরণের শস্য বীজ, সার ও উৎকৃষ্ট ফলনের ব্যবস্থায় উপকৃত হয়েছে মানুষ বিজ্ঞানের কৃপায়; তার খাদ্যাভাব দূরীভূত হয়েছে কতকাংশে। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানব জীবনে স্বস্তি এনেছেও পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচিয়েছে অনেকাংশে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিজ্ঞান সাধনার উদ্যোগ—আয়োজন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে; কারণ বিজ্ঞান সাধনা ব্যতিত মানুষের পক্ষে সুস্থ সবল, দীর্ঘজীবি, স্বাবলম্বি, নিরুদ্বেগ, নিরাপদ ও সুখী জীবনের আশা বার্থ হতে বাধ্য। একালে সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বলোকে বিজ্ঞানের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, কারণ বিজ্ঞানের শক্তি অপরিসীম ও অনন্ত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্ব্বত্র. প্রসারিত এত ব্যাপকভাবে যে সকলেই বিজ্ঞান ভিত্তিক উন্নয়ন চায় ত্বরিত গতিতে ও নিশ্চিতভাবে। তাই আজ বিজ্ঞানের কদর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়েই চলেছে সব দেশেই।

ভারতও বিজ্ঞান সাধনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে বিশেষ আগ্রহী দেখা যায় বহু গবেষণাগার নির্মান করে তথায় যোগ্য বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্বাবধানে গবেষণাকার্য্য চালাতে সর্বপ্রথম জওহরলাল নেহেরুই উদ্যোগী হয়েছিলেন দেশের দুঃখ, দারিদ্র ও বেকারী দূর করার মহৎ উদ্যোগ নিয়ে। তারই সুফল ফলছে আজ এবং সেকারনেই ভারত অধুনা খাদ্যে স্বয়ম্ভর, সমুদ্র গর্ভ থেকে বম্বেহাই এলাকায় পেট্রোলিয়াম উত্তোলনে সফল, ভারতে প্রস্তুত স্যাটিলাইট সাহায্যে আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি নিরুপনে সফল, এ্যাটম বোমা তৈরীতে পারঙ্গম, রকেট ও নানাধরণের ক্ষেপনাস্ত্র তৈরীতে সফল, দেশরক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নির্মানে দক্ষ, চিকিৎসার ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ও ঔষধ প্রস্তুতে সুদক্ষ, খনিগর্ভে আধুনিক যন্ত্র সাহায্যে অধিক পরিমাণে খনিজ দ্রব্য উত্তোলনে বিশেষ ব্যবস্থায় লাভবান, মৃত্তিকার অভ্যন্তরভাগে সঞ্চিত কোথায় কোন্ ধাতু ও আকরিক মূল্যবান পদার্থে পাওয়া সম্ভব তা স্থিরিকরণে প্রায় ক্ষেত্রেই নির্ভুল, সূর্য্যরশ্মি থেকে শক্তি আহরণে বা সূর্য্য চুল্লী নির্মানে তৎপর, ভারিজল তৈরীর প্রচেষ্টায় গবেষণারত, রোগনিরাময়ে ও প্রতিবেধক আবিস্কারে সদা কর্ম চঞ্চল—এক কথায় বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে ভারত অন্যান্যদেশের চেয়ে কোনদিক দিয়েই পেছিয়ে নেই; বরং অনেক ক্ষেত্রেই অপরাপর বহু অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে বেশ কিছু অগ্রবর্তী বলেই মনে হয়।

ভারত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে আরো উন্নত ধরণের সংস্থায় রূপান্তরিত করার মানসে সম্প্রতি বিদেশে অবস্থিত কৃতী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও গবেষক গণকে দেশে ফেরার জন্য আকৃষ্ট করতে সকলরকম সাধু ও সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগ নিয়েছে; যার ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত অদূর পূর্ব সাফল্য অর্জনে শীঘ্রই উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেবে প্রতীয়মান হয়। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর পিতার মতই

বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সবিশেষ আগ্রহী।

গবেষণার জন্য সব সময়েই প্রধান মন্ত্রী উদার হস্তে সরকারী অর্থব্যয়ে বহুশীল এ্যাটম বোমা আবিষ্কারে শ্রীমতী গান্ধীর উৎসাহ উদ্দীপনা ও সহযোগিতা ভারতীয় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের প্রভূত সাহায্য করেছিল কয়েক বছর পূর্বে। বর্তমানেও তাঁর শুভ সংকল্প দেশকে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের পীঠ-স্থানে পরিণত করা ও তারজন্য প্রায় সম্ভাব্য সব রকম ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যোগ্য মানুষদের সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে যাতে দেশ ও দেশের মানুষ বিজ্ঞানের শুভ প্রয়োগের ফলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্তরোত্তর উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণে সফল হয় এবং সবাই এর ফল লাভে বঞ্চিত না হয়।

আনবিক শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। মারণাস্ত্র নির্মাণে আনবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে ভারত চায় না বরং ঐ শক্তি দিয়ে মানব কল্যাণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরীতেই ভারতের আগ্রহ ও সদিচ্ছা পরিদৃশ্যমান। শান্তির পূজারী ভারত চিরকাল, তবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই তাকে সদা প্রস্তুত থাকতে হয় দেশরক্ষার মহান কর্তব্য বোধে। নেহেরুজী প্রায় সাতাশটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্বাধীনোত্তর কালে নির্মাণ করিয়ে ভারতের বুকে বিজ্ঞান চর্চার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে ছিলেন।

ভারতের জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের আশায়, তাঁর ঐ শুভ প্রচেষ্টা যা আজও বিদ্যমান ও বিশেষ সুফলপ্রসূ দেখা যায়। শ্রীমতী গান্ধী তারাপুরে আনবিক শক্তি দপ্তরের অধীনে যে সংস্থা নির্মান করিয়েছিলেন তা ভারীজলের অভাবে অকেজো হবার পথে, তাই বর্তমানে ভারীজলের কারখানা স্থাপনে তিনি বিশেষ উদ্যোগী। বিদেশীরা ভারতকে চুক্তিমাত্র ভারী জল না পাঠালেও যাতে তারাপুরের আনবিক সংস্থাটি বিপদ গ্রস্থ না হয় সেদিকে শ্রীমতী গান্ধী খুবই সজাগ ও সতর্ক।

ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান সাধনা ও বৈজ্ঞানিক কর্ম প্রচেষ্টা যাতে সর্বদা সাফল্যের পথে এগিয়ে যায় সেদিকে ইন্দিরাজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তিনি বিদেশী সাহায্যের চেষ্টা ছেড়ে এখন স্বদেশেই সন্তুষ্ট হতে চান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্ব্ব ব্যাপারে। এর জন্য তিনি সময় ও অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত নন কোন সময়েই। ফলে ভারত অন্য নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞান সাধনায় এখন ক্রমশই ইপ্সিত ফল লাভে উপকৃত হচ্ছে। ধাতব পদার্থ, পেট্রোলিয়াম প্রকৃতিক গ্যাস, আকরিক সীসা ও তামা এবং উৎকৃষ্ট ধরণের কয়লা খনিগর্ভ থেকে উত্তোলনের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে চলেছেন বেশ কিছু দিন থেকেই। তাঁর শুভ প্রচেষ্টার ফলে বহু মূল্যবান ধাতু ও রাসায়নিক পদার্থ ভূগর্ভ হতে উত্তোলিত হয়েছে ও হচ্ছে বর্তমানে যা ভারতের বৈষয়িক উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করছে ও অদূর ভবিষ্যতে করবে বলে মনে হয় তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ভারত আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও এবিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শে এবং ব্যবস্থাপনায় অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হতে বদ্ধ পরিকর। বিজ্ঞানের অমিত শক্তিতে আস্থাশীল ভারত সর্ব ব্যাপারে বিজ্ঞানের আধুনিকি করণে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে সদা চেষ্টিত দেখা যায়। ফলে ভারতের অগ্রগতি অব্যাহত বৈষয়িক প্রতিটি ক্ষেত্রেই।

(এর পর ৯-এর পাতায়)

পরলোকে চিরস্মরণীয় বি পি কৈরালা

—প্রতিবেদক বিঃ বাঃ

নেপালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ এবং প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা গত ২১শে জুলাই তাঁর কাঠমাণ্ডুস্থ বাস-ভবনে পরলোক গমণ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭। তিনি কয়েক বছর ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছিলেন। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে তাঁকে ব্যাংককের হাসপাতাল থেকে কাঠমুণ্ডুতে আনা হয়। কৈরালার পুত্র শশাংক বড় ডাক্তার। মৃত্যু আসন্ন জেনে পিতার ইচ্ছানুসারে তিনি কৈরালাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনেন। নেপালের মানুষ, গিরি, নদী বৃক্ষলতা এবং পশুপাখিকে যিনি প্রাণাপেক্ষা ভাল বেসেছিলেন তাদের মাঝেই তিনি শেষ শয্যা রচনা করে চলে গেলেন।

জীবন মৃত্যুর অধীন। এই অমোঘ বিধানকে কে অস্বীকার করতে পারে? বি, পি, কৈরালাকেও সেই চিরন্তন বিধানের নিকট নতি স্বীকার করতে হয়েছে। দেশে ও বিদেশে তাঁর অনেক চিকিৎসা হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত পরাজিত হল। কৈরালাই প্রথম নেপালী যিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে তাই সর্বত্রই শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯১৪ সালে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে বি পি কৈরালার জন্ম। শিক্ষালাভ কলিকাতা ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রবস্থাতেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংস্পর্শে আসেন। আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমোহন লোহিয়া এবং পণ্ডিত নেহেরুর সহিত তাঁর পরিচয় হয়। বি পি কৈরালা ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে তিনি যে রাজনৈতিক চেতনা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন তিনি তা বহে নিয়ে যান নেপালে।

সে সময় নেপাল ছিল বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন একটি রুদ্ধদ্বার দেশ। শাসন ছিল স্বৈরতন্ত্রী। জনগণ অশিক্ষিত ও দরিদ্র। নেপালের রাজার নামে দেশের ওপর প্রভুত্ব করতেন রাণা বংশীয় অমাত্যবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রীর পদও ছিল বংশ পরম্পরা রাণাদের। নেপালের দেড় কোটি অধিবাসীর কোন কথাই চলত না রাজ্য প্রশাসনে। বিংশ শতাব্দীতে এমন অবস্থা একটি সুপ্রাচীন সভ্য সমাজে কি করে বহাল ছিল ভাবাই যায় না।

স্বদেশে ফিরে গিয়ে বি পি কৈরালা গড়লেন নেপালী জাতীয় কংগ্রেস এবং শুরু করলেন দেশ-ব্যাপী গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের সংগ্রাম। সংগ্রাম প্রথমে নিরস্ত্র হলেও; ১৯৫০-৫১ সালে সশস্ত্র হয়ে ওঠে এবং রাজকীয় সেনাবাহিনীর কিছু অংশ সংগ্রামে যোগ দেয়। রাজা অবস্থা উপলব্ধি করে শাসন সংস্কার করতে সম্মত হন। ১৯৫৯ সালে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নেপালে সর্ব প্রথম যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে নেপালী কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং বি পি কৈরালা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এই ঘটনা একটি রাষ্ট্রবিপ্লবের সহিত তুলনীয় ছিল।

বিপ্লবের ফল কিন্তু স্থায়ী হতে পারে না। রাজা প্রধানমন্ত্রী কৈরালাকে তাঁর চিরাচরিত স্বেচ্ছাচার-মূলক ক্ষমতা প্রয়োগের পথে প্রবল বাধা স্বরূপ মনে করেন ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন। বি, পি, কৈরালা পুনরায় আন্দোলন শুরু

করেন এবং বার বার কারাদণ্ড ভোগ করেন। শেষে তাঁকে নেপাল থেকে নির্বাসিত করা হয়। জীবনের শেষ দিন এই পরিস্থিতির মধ্যে কৈরালাকে কাটাতে হয় এবং তিনি আর আদর্শ অনুযায়ী দেশ গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

রাষ্ট্রশক্তি মানুষকে দমন করতে পারে কিন্তু মুছে দিতে পারে না মানুষের চিন্তাধারাকে। বি পি কৈরালা নেপালের জনগণের মনে যে গণতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চারিত করেছিলেন তার প্রভাব নেপালাধীশ অস্বীকার করতে পারেন নি। পার্লামেন্টারী শাসন প্রথা তুলে দিলেও তাঁকে প্রবর্তন করতে হয়েছে পঞ্চায়েতী গণতান্ত্রিক শাসন। তার মধ্যে কৈরালার জয় সূচিত হয়েছে।

বি পি কৈরালা শেষ জীবনে ভারতের প্রতি তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না বলে মনে হয়। এই অসন্তুষ্টির কারণ যদি হয় নেপালের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে ভারতের নিরপেক্ষ মনোভাব তাহলে ভারতের পক্ষে কিছুই করার ছিল না। নেপাল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং ভারতের মিত্র। নেপালের ভিতরে যাহাই ঘটুক, তাতে ভারতের নাক গলানো অনুচিত। সেই নীতি অনুসরণ করেই ভারত চলেছে। অবশ্য কৈরালা অকপটে স্বীকার করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ট বন্ধু যে কয়জন ছিলেন তাঁরা সকলেই ভারতীয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের শাসনতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে, কোনটি সর্বোত্তম সে কথা কেউ বলতে পারে না। নেপালের পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রেরও পরীক্ষা চলেছে। বি পি কৈরালার রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব নিশ্চয়ই তার ওপর পড়েছে। আমরা মনে রাখব কৈরালাকে একজন বিপ্লবী সংগ্রামীরূপে এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করব তাঁর দেশসেবা ও দুঃখ বরণের ঐতিহ্য মণ্ডিত স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

(৭-এর পাতার পর)

খেতে—খামারে, বীজ—সার সংরক্ষণাগারে, রাসায়নিক পদার্থ নির্মানের কারখানায়, যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সূক্ষ ধরণের যন্ত্রপাতি যথা ঘড়ি—মাইক্রোসকোপ—ডা ক্তা রি র জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ যন্ত্র বিমান নির্মানের বা ট্রাক্টার নির্মাণের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কমিউনিকেশনের জন্য তার বা যন্ত্রপাতি দেশরক্ষার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির কারখানায়, খনিগর্ভে, শিল্পসম্ভার নির্মানের কারখানায় এক কথায় প্রতিটি উৎপাদন মূখী ব্যবস্থায় আজকাল সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাজ চালাবার ব্যবস্থা নেওয়া হয় ভারতে। ফলে উৎকর্ষমানের দ্রব্য সামগ্রী নির্মানে ভারত এখন বেশ পটু।

বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরতাই ভারতকে সাফল্যের পথে ক্রমশ এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। উন্নত দেশ গুলির তুলনায় এখনো ভারত অনেক পেছিয়ে, তবুও তার উক্ত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা তাকে অদূর ভবিষ্যতে অনেকখানি আরো উন্নত হতে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব (প্রয়োজনের তুলনায়) অনুভূত হয় ভারতে। ফলে ঐ দিকে সরকার মনোযোগ দিয়েছে, কিন্তু সৌর শক্তি করায়ত্ত করতে পারলেই কয়লা ও বিদ্যুতের অভাব আর তেমন অনুভূত হবে না। রাষ্ট্র এবিষয়ে বেশ সজাগ উদ্যোগী। মনে হয় অচিরে এ অভাব মিটে যাবে।

মরিশাসে রাজনৈতিক ভূমিকম্পের তাৎপর্য

—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস

ভারত মহাসাগরের একটী ছোট্ট দ্বীপ মরিশাস। মরিশাস দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে। ভারত মহাসাগরের মাদাগস্কারের প্রায় ৫০০ মাইল পুবে অবস্থিত মরিশাস।

দ্বীপ বসতি উপযোগী হলে বিভিন্ন সময়ে আরব ও পর্তুগীজরা এ দ্বীপে পর্যটনে এলেও কোন বসতি বাঁধে নাই। ১৫৮৯ সালে ডাচ্‌রা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে এবং দ্বীপটীর নামাকরণ করে মরিশাস। ১৭১০ সালের মধ্যে অধিকাংশ উপনিবিষ্ট ডাচ্‌ পরিবার নিজ দেশে ফিরে যায়। ১৭১৩ সালে ফরাসীরা দ্বীপটী কবজা করে। প্রায় ১৭ বছর ফরাসীদের অধীনে থাকার পর ইংরেজরা এসে ফরাসীদের হাত থেকে ১৮১০ সালে দখল করে নেয়। ১৮১৪ সালে প্যারিস চুক্তি অনুসারে আনুষ্ঠানিক ভাবে দ্বীপটী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬৮ সালের ১২ই মার্চ ব্রিটিশের কমনওয়েলথের মধ্যে রেখে মরিশাসকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ১৯৬৮ সালেই মরিশাস পায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ।

মরিশাসের আয়তন ৭৯০ বর্গমাইল। মোট জন সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬০ হাজার, ১ লক্ষ ৭৯০ এর মধ্যে রাজধানী পোর্ট লুইয়েই বাস করে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ১২ জন। মোট জনসংখ্যার ৬৭ জনই ভারতীয় বংশোদ্ভূত, শতকরা ২৮ জন ক্রেওল, চীনা বংশোদ্ভূতের সংখ্যা শতকরা তিন।

সরকারী ভাষা ইংরেজী হলেও মরিশাসে চালু আছে ক্রেওল হিন্দী, উর্দু এবং ফরাসী। শতকরা ৪৭ জন হিন্দু শতকরা ৩৪ জন খৃষ্টান, মুসলমান শতকরা ১৬ জন। মরিশাসের রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান, গভর্ণর জেনারেল স্যার আব্দুল রহমান ওসমান। ১৯৭১ সাল থেকেই এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

কৃষি নির্ভর দেশ মরিশাস। শিল্পপণ্য হল একমাত্র চিনি। খাতু বিশেষ একটা নেই। প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আখ, চাল তামাক, আলু পেঁয়াজ। নারিকেল কলা ও উৎপন্ন হয় প্রচুর। গবাদি, ভেড়া-ছাগল, পলট্রির প্রাচুর্য। মরিশাসের মানুষ মৎস্য শিকারে পটু, লবণ মিশিয়ে মাছ চালান দেয় দেশ বিদেশে মাছ ছাড়াও রপ্তানী করে চিনি, গুড়, তামাকপাতা, চা, নারিকেল। আমদানী করতে হয় চাল, গম, সুতিবস্ত্র, পেট্রলজাত দ্রব্য সামগ্রী সার যন্ত্রপাতি এবং নানারকমের ভোগ্যপণ্য।

ব্রিটিশ ১৯৪৭ সালে স্যার সিউসাগর রামগুলামকে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে। ১৯৬৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর লেবার পার্টির নেতা হিসাবে তিনি আবার প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে রাজনৈতিক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটতে পারে অজুহাত তুলে ক্ষমতাসীন লেবারপার্টি ১৯৭৬ সাল পর্য্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখে। রামগুলাম সরকার ১৯৭৬ সালের নির্বাচনে অল্পের জন্য বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঁচে যায়। সেই ডরাডুবি ঘটল ১৯৮২ সাল। ১৯৮২ সালের নির্ব্বাচনে বামপন্থী দল মরিশাস মিলিট্যান্ট মুভমেন্ট (এম, এন, এস) ও তার সহযোগী মিত্র মরিশাস সোস্যালিষ্ট পার্টি জাতীয় পরিষদের সব কয়টী আসন দখল করে। ৭০ টী আসনের মধ্যে এম, এম, এস পেয়েছে ৬৮ টী আসন, সোস্যালিষ্ট পার্টি পেয়েছে ২টী আসন, কাজেই এম, এম, এস এর একচ্ছত্র আধিপত্য। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী, কমনওয়েলথের সেক্রেটারী জেনারেল ৮১ বছরের বৃদ্ধ স্যার সিউ-

সাগর রামগুলামের পশ্চিমী ঘেঁষা লেবার পার্টি মরিশাস হতে একেবারে মুছে গেল। ৭০ সদস্যের জাতীয় পরিষদে এই পার্টি একটী আসনও লাভ করতে পারে নাই। এর আগে ১৯৭৬ সালে ২০ ডিসেম্বর মরিশাসে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে ৭০ আসনের জাতীয় পরিষদে এম, এম, এস পেয়েছিল ৫৪ টী আসন। সে সময় অন্য কয়েকটী ছোট পার্টি লেবার পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করে সরকার গঠন করেছিল। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্যর সিউসাম রামগুলাম।

১৮৮২ সালের নির্ব্বাচনে এম, এম, এস এর নির্ব্বাচন প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল :—

১) দিয়েগো গার্সিয়াকে মুক্ত করতে হবে। (দিয়েগো গার্সিয়া মরিশাস দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেই ছিল. ব্রিটিশ মরিশাসের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় দিয়োগা গার্সিয়া নিজেদের হাতে রেখে দিয়ে পরে মার্কিন সরকারকে বহু টাকার বিনিময়ে ইজারা দিয়েছে। মার্কিন প্রশাসন ভারত সাগরে আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নৌ ও বিমান ঘাঁটি গঠন করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। ভারত মহাসাগর উপকূল বর্ত্তী ৪০ টী দেশের তীব্র প্রতিবাদ ও আপত্তি সত্বেও বৃটেন ও আমেরিকা কোন আলোচনায় রাজী হয় নাই)।

২) কোন বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ মরিরশাসের বন্দর ব্যবহার করতে পারবে না।

৩) গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে কূটনৈতিক ভাবে দিয়েগো গার্সিয়ার ওপর আমাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত করব

৪) দেশের ৫০ হাজার বেকারের রুজি রোজগারের ব্যবস্থার জন্য নিয়োজিত হবে আমাদের কর্মশক্তি

৫) লেবার পার্টির নেতা ও কর্মীরা দুর্নীতিবাজ। জাতীয় অর্থনীতি বিপত্তি করে দিয়েছে একটা অচল অবস্থার দাঁড় করিয়েছে। ২৩ শতাংশ হারে মুদ্রাস্ফীতি চলছে। কঠোর হস্তে ইহার প্রতিবিধান করতে হবে।

৬) চিনি কলগুলি সীমিতভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে।

৭) ফরাসী প্রেসিডেন্ট মিঁতেরার ধাঁচে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন করব।

৮) কঠোর ভাবে বেজোট নীতি অনুসরণ করব

৯) পশ্চিমী দুনিয়ার বাইরে আমদের আসতে হবে।

১০) বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে, এখনই সম্পর্কের ছেদ ঘটবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার সব সম্পত্তি এখনই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হবে না।

১১) আমদানী কারক ও পর্যটন সংস্থাগুলির দক্ষিণ আফ্রিকার উপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে।

১২) মরিশাসের বিমান বন্দরে দক্ষিণ আফ্রিকার কোন বিমান অবতরণের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা এখনই থাকবে না।

এম, এম, এস এর নেতা মরিশাসের নতুন নায়ক পল বেরেঙ্গার বয়সে তরুণ, মাত্র ৩৬ বছর বয়স। মতামতে মার্কসবাদী। জঙ্গী মনোভাবের মানুষ দলের সেক্রেটারী সরকারের অর্থমন্ত্রী। দলের প্রেসিডেন্ট অনিরুদ্ধ জগন্নাথ ভারতীয় বংশোদ্ভূত, জগন্নাথই হবেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু মূল সংগঠনটী রয়েছে বেরেঙ্গারের হাতে। ফরাসী বংশোদ্ভূত

বেরেঙ্গারের রাজনীতির হাতে খড়ি হয়েছিল প্যারিসে। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সে তীব্র ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। মরিশাসের বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘট পরিচালনার অপরাধে বেরেঙ্গারকে ১৯৭২ সালের বেশীর ভাগ সময়ই মরিশাসের জেলে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু জঙ্গী মার্কসবাদী বিপ্লবী হলেও বাস্তব অবস্থা মেনে চলতে বেরেঙ্গার দ্বিধা নেই। নির্বাচনী ইস্তাহারে এবং নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মরিশাসের রাজনীতিতে ভারতের আগ্রহের কারণ এই দ্বীপের অধিবাসীদের অধিকাংশই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকে মরিশাসে আখের জমিতে কাজ করার জন্য শ্রমিক ধরে নিয়ে যেত। বর্ত্তমান মরিশাস বাসীরা তাদেরই বংশধর। ভারতের আগ্রহের অন্যতম কারণ দ্বীপটীর গুরুত্বপূর্ণ ভৌগলিক অবস্থান। ভারত মহাসাগরকে বৃহৎ শক্তির সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কবল থেকে মুক্ত রাখতে ভারত আগ্রহী। ভারত আশা করে মরিশাসের বর্ত্তমান বামপন্থী সরকার ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতি ও দুই বৃহৎ শক্তি থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখার নীতি সমর্থন করবে। রামগুলাম সরকার দিয়েগো গার্সিয়া মার্কিন কবল থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে নাই। মরিশাসের এম, এম, এস দল নির্বাচনে মার্কিন বিরোধী প্রচার তুঙ্গে তুলেছিল দিয়েগো গার্সিয়া থেকে মার্কিন ঘাঁটি হটাতে হবে এই দাবীতে। ভারত এই দাবী সমর্থন করবে।

নির্বাচনের কতকদিন আগে জগন্নাথ ও বেরেঙ্গার দুইজনই দিল্লী সফর করে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে গেছেন। কাজেই মরিশাস ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব অঙ্কুর না থাকার কোন কারণ নাই। নিকটবর্ত্তী রিইউনিয়ান এবং সেশেলস দ্বীপেও বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত। তাদের সঙ্গে মরিশাসের নতুন সরকারের শক্তি ও আন্দোলন যুক্ত হয়ে ভারত সাগরে মার্কিন উপস্থিতির বিরুদ্ধে জনমত তীব্রতর হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ান স্বাভাবিক ভাবে এই আন্দোলন সমর্থন করবে এবং মদত দিবে। এতে ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা ঘোষণা করার ভারতের দাবী জোরদার হবে। এই সমুদ্রে বৃহৎ শক্তির নৌবহরের যাতায়াত বা ঘাটি নির্মান যুদ্ধের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। ভারত সহ সমস্ত উপকূলবর্ত্তী রাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে তা হানিকর। মরিশাসের সমস্যা তার তরুণদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, জীবন-যাত্রার নিম্নমান এবং কতিপয় গোষ্ঠীর হাতে দেশের সম্পদের সন্নিবেশ। মার্কিন ঘেষা লেবার পার্টি এই সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হওয়ায় মরিশাসবাসী একযোগে সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব অর্পণ করেছে বামপন্থী তরুণ নেতৃত্বের হাতে। বামপন্থী মরিশাস সরকার ভারত সাগরের উপকূলবর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতায় মরিশাসের সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে যাবে আশা করা যায় এবং পশ্চিম ঘেঁষা নীতির প্রভাব হতে মুক্ত হতে কোন দ্বিধা করবে না।

মরিশাসের এই নিঃশব্দ রাজনৈতিক ভূমিকম্পনে মার্কিন সরকার বিস্মিত ও আতংকগ্রস্থ। ইন্দিরাজীর মার্কিন সফরে রেগন প্রশাসন ভারত মহাসাগরে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির আঁচ করার চেষ্টা করবে এবং বুঝবে মরিশাসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতি ও যুদ্ধপ্রস্তুতি নিরপেক্ষদেশগুলি বরদাস্ত করবে না।

২০-৬-৮২ ইং

RegdNo.R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—ডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

সম্পাদক –
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চাটার্জী
শ্রীনগেন ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী বাংলা

পড়ুন

ও

পড়ান

৫/30

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "ভোলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—অজেন্দ্র দাস

—কীরোদ বুক ষ্টল

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। গেরিলা সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। চাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা যাদুঘর সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৯০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামী মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, দেশ বাঁচার ছোরেলি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বাঁচার ছোরেলি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪.০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ২৮শে শ্রাবণ ১৩৮৯ ১৪ই আগষ্ট ১৯৮২	৪৫ সংখ্যা

CALCUTTA

স্বাধীনতা দিবস
সংখ্যা
১৯৮২

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই !'

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবস

মহাকালের প্রয়াণ পথে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর একটি একটি করে পঁয়ত্রিশটি বছর কেটে গেল। স্বভাবতই আমরা কি চেয়েছিলাম কি পেয়েছি, তার একটা হিসাব মেলাতে আমাদের মনের মণি-কোঠায় একটি ইচ্ছা জেগে ওঠে।

দীর্ঘকাল ধরে পরাধীনতার গ্লানি আমরা অনুভব করেছি। দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, নির্যাতন নিপীড়ন ভোগ করতে হয়েছিল আমাদের। জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে চেয়েছিল পরদেশী শাসকেরা। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে মুছে দিয়ে তাদের পদানত করে রেখে দিতে চেয়েছিল তারা। স্বল্প কথায় বলা যায় যে এই পরদেশী শাসকেরা আমাদের মনুষ্যেতর জীবে পরিণত করতে সব রকমের হীন কৌশল অবলম্বন করেছিল। আমাদের গর্ব যে আমরা সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছি, বহু শ্রম, বহু ঘর্ম, বহু রক্ত ও অশ্রুজল খরচ করে। এই স্বাধীনতা আকাশ থেকেও পড়েনি, মাটি ফুড়েও ওঠেনি। এই স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি সংগ্রাম করে, বহু শহীদের আত্মদান ও বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দুঃখকষ্ট ভোগের মাধ্যমে। তাই আমরা আমাদের স্বাধীনতা পরম সম্পদরূপে গণ্য করি ও আমাদের ধ্যানের ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে চাই ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্য, তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য, স্বাধীনোত্তর যুগে।

একথা অনস্বীকার্য, আজো পর্যন্ত আমাদের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে পারিনি। অবশ্য ভারতের রূপকারদের পথযাত্রা শুরু করতে হয়েছিল একটা ঘাটতি স্থিতিপত্র নিয়ে। অত্যাচার, অবিচার, নিপীড়নে দেশের আপামর জনসাধারণ ক্লিষ্ট, পিষ্ট এমন কি মানবোচিত সদ্গুণাবলী বিস্মৃত। মনে আশা নেই, ভরসা নেই, নেই অতীতদিনের ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠা, নেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার সাধনা ও আত্মবিশ্বাস। অর্থনৈতিকভাবে চরম শোষিত নৈতিকভাবে প্রায় মেরুদণ্ডহীন। এই মৃত-প্রায় জাতির মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তি উদ্বুদ্ধ করে, দেশের মানুষকে আবার মানুষ করে গড়ে তোলার কাজ সহজ ছিল না। কিন্তু পরম গৌরবের সঙ্গে আমরা স্বীকার করি যে দেশের নেতৃবৃন্দ আমাদের জাতির ইতিহাসে নতুন মোড় ফিরিয়েছেন। কাজ এখনও অনেক বাকী সন্দেহ নেই। কিন্তু সঠিকভাবে পথ নির্দেশ করে এগিয়ে চলতে পারলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

যে মহামূর্খ ও বিদেশী শত্রুদের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করে বলে 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়', তাদের আমরা করুণা করি। তাদের উদ্দেশ্যে নিন্দাবাদ জানিয়ে শুধু বলি ভারতের স্বাধীনতা অকৃত্রিম, সমুজ্জ্বল সর্বজনস্বীকৃত ও অভিনন্দিত।

সত্যের খাতিরে আমরা অবশ্যই স্বীকার করব যে মৌল লক্ষ্যে আজো আমরা পৌঁছুতে পারিনি। এজন্য এখনও কঠোর সংগ্রাম করতে হবে ত্যাগ ও সেবার ব্রত নিয়ে। মোকাবিলা করতে হবে ভিতরের ও বাহিরের শত্রুদের সঙ্গে। দেশের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ প্রভৃতির মত অশুভশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে, তাকে সমূলে বিনষ্ট করতে হবে আমাদেরই। ধনী দরিদ্রের মধ্যে যে মর্মান্তিক বৈষম্য আছে, তাকে দূর করতে হবে। অগণিত দেশবাসী যারা অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার মধ্যে আছেন, তাদের জ্ঞানের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সব ভারতবাসীই, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের সকলের ভাই, এই মানসিকতা প্রতিষ্ঠিত করাই আজকের দিনে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এই কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করার শপথ নিতে হবে এবার স্বাধীনতা দিবসেও।

যারা মতলববাজ তারা বলে বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে কিছুই হয়নি। সবকিছুই তারা করে দেবে, ক্ষমতা তাদের হাতে এলে। এটা যে কতবড় ধোকাবাজি তা এদের প্রশাসনের অধীনে বাস যারা করছেন, তারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন।

সত্যিই কি স্বাধীন ভারতে কিছুই করা হয়নি? এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা এবং অভিসন্ধিমূলক। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়ত যে দেশ, সে দেশ আজ খাদ্যশস্য উৎপাদনে শুধু স্বয়ম্ভরই হয়নি প্রয়োজন মত ভিন্ন দেশের মানুষের মুখেও অন্ন যোগাচ্ছে। শিল্প, কৃষি, কৃৎকৌশল বিদ্যায় আজ আমাদের অগ্রগতি সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃত। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন প্রভৃতি বিভাগেও আমাদের অগ্রগতি প্রভূত। জগৎ সভায় আজ আমরা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিব্যাপী যে যুদ্ধের দামামা বাজছে, মানব জাতির অবলুপ্তির পথ যেভাবে প্রশস্ত হচ্ছে, সেই সর্বনাশা পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা এবং বৈদেশিক নীতি সর্বজন স্বীকৃত ও আদৃত। যারা অগ্রগতির রথচক্রকে রুদ্ধগতি সম্পন্ন করে দিচ্ছেন; দুর্ভাগ্য ক্রমে তারা আমাদেরই দেশের লোক, হয়ত বা বিদেশী ভারতবৈরী কোন দেশের অনুগ্রহ ভাজন কিছু লোকও আছেন।

আজ যদি দেশের অভ্যন্তরে সকলে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নতির জন্য শ্রম নিয়োগ করত, তবে একাজ আরো সহজ হত ও উন্নতির হারও আরো বেড়ে যেত। কিন্তু এদের অপকর্ম সত্ত্বেও দেশ এগিয়েছে, এগুচ্ছে এবং এগুবে, কোন অশুভশক্তি তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। বরং দেশের জাগ্রত শক্তির জোয়ারে এরা ভেসে যাবে এবং যাচ্ছেও।

আজ বিশ্বের সমগ্র দেশই কিন্তু আমাদের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা স্বীকার করছে। ভারতের সামরিক শক্তি যাই হোক না কেন, সমগ্র বিশ্বের নানা প্রকার সমস্যার সমাধানে ভারতের ভূমিকা আজ বিশ্ব

ব্যাপী সমাদৃত। আমাদের সীমিত শক্তির মধ্যেও, বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশকে তাদের বেঁচে থাকার এবং বেড়ে ওঠার কাজে আমরা যে সাহায্য করছি সম্পূর্ণ মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, সে ভূমিকাও আজ বিশেষ ভাবে প্রশংসিত। শুধু নিজের জন্যই নয়, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য ভারতবর্ষের অবদানের স্বীকৃতিও মিলছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে উথান্ট পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে।

নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তাদের কোন স্থান নেই ভারতে। 'নতুনের সজন বেদন' কিছুটা ভোগ করতে হচ্ছে। সেটা স্বাভাবিক। কারণ নির্দয় নবযৌবন আসে ভাঙ্গনের মহারথে।

আজকের এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শপথ নিতে হবে এগিয়ে চলার জন্য, সঙ্কল্পবদ্ধ হতে হবে উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত চরম ত্যাগ স্বীকার করতে। জয় আমাদের হবেই, এই বিশ্বাসও রাখতে হবে।

আজ এই পুণ্যদিবসে আমাদের পূর্বসূরী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে আমরা সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাদের উদ্দেশ্যে আরও বলি যে তাদের স্বপ্নকে রূপায়িত না করা পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।

জয় হিন্দ।

পাঠকদের প্রতি আবেদন

'বিপ্লবী বাংলা' গত ২৫ বৎসরাধিক কাল ধরে সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দেশসেবার আদর্শকে বহন করে নিয়ে চলেছে। এ আমার, আপনার, সকলের কাগজ। তাই একে বাঁচানোর দায়িত্বও আমাদের সকলের। অধিকতর সংখ্যায় গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ক'রে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে আরো দীর্ঘদিন আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।

শ্রীঅরবিন্দ লহ প্রণাম

আজ ১৯৮২/১৫ই আগস্ট ভারতের ৩৫তম স্বাধীনতা দিবস এবং শ্রীঅরবিন্দের ১১০তম জন্ম দিবস—এক সঙ্গে দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে। বিধাতার নির্বন্ধ দুটি ঘটনাকে একসূত্রে বেঁধেছে। শ্রীঅরবিন্দ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরমপন্থা অর্থাৎ সশস্ত্র বৈপ্লবিক মতবাদের মন্ত্রগুরু। সংগ্রাম যখন ধূর্জটির জটাজাল ছিন্ন করে জাহ্নবী ধারার মত উদ্দাম বেগে প্রবাহিত হল, সাধক চলে গেলেন দূরে শান্ত আশ্রম জীবনে। ভারতের পরাধীন জাতির নিগ্রহ একদিন তাঁকে যেমন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে টেনে এনেছিল তেমনি আর একদিন তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল বিশ্বমানবের মুক্তির পথ দেখাতে। দুই-এর মূলেই ছিল একই লক্ষ্য—মানব কল্যাণ।

শ্রীঅরবিন্দকে দেশনায়ক, সাধক, মহাযোগী দার্শনিক, তত্ত্বদর্শী বললে তাঁর জীবন সম্বন্ধে বোধহয় কিছুই বলা হয় না। শ্রীঅরবিন্দকে এ সকল জাগতিক উপাধিতে ধরা যায় না। তিনি এমন

শ্রীঅরবিন্দের দেশনায়ক, সাধক, মাযোগী, দার্শনিক তত্ত্বদর্শী বললে তাঁর জীবন সম্বন্ধে বোধহয় কিছুই বলা হয় না। শ্রীঅরবিন্দকে এ সকল জাগতিক উপাধিতে ধরা যায় না। তিনি এমন একটি জ্যোতির্ময় লোকে পৌঁছেছিলেন, যেখানে জরা মৃত্যু স্থান ও কালের সীমা বন্ধন নেই। সেই মানব চিন্তার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিচার বিশ্লেষণ বিজড়িত দৃষ্টিভঙ্গি।

শ্রীঅরবিন্দের দিব্য মহিমা ভাবিত বাণী ও নিগূঢ় সিদ্ধান্তগুলি খুব সহজবোধ্য নয়, তার যৎকিঞ্চিৎ অনুধাবনের জন্যও মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন হয়। তবে যতবার শ্রীঅরবিন্দের ভাবনা ও সিদ্ধান্তগুলি পড়ি এবং সেগুলি নিয়ে একান্তে বসে ভাবি তখনই বিক্ষুব্ধ ও সংকটাবৃত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা জাগে, ঘনায়মান অন্ধকারে আলোর ক্ষণিক ভ্রান্তি যেন দৃষ্টিপথে ভেসে উঠে। এ কথা বলার নয়, বলছি শুধু বিপ্লবী বন্ধুদের অনুরোধে। আমি একান্তই অজ্ঞ, অক্ষম, অনবহিত।

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি দিয়ে কিছু বলতে গেলেও তা অনেক বড় হয়ে যায়। তাই দুটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করব তাও সংক্ষেপে। রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তির প্রয়োজন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: 'সমাজের বিকাশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি। রাষ্ট্রের মৌল শক্তি সামরিক। বহিঃ আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য এই শক্তি আবশ্যক। জাতির বিভিন্ন অংশকে ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ রাখা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রতিহত করা হল কেন্দ্রের কাজ। প্রতিহত করার মত শক্তি কেন্দ্রের হাতে অবশ্যই থাকা চাই। এর কাছে অস্ত্রশক্তি প্রধান হলেও নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও খাটাতে হয়।

দেশের বিভিন্ন অংশে বংশ, ভাষা, আঞ্চলিক স্বার্থ নিয়ে বিরোধ দেখা দিতে পারে কিন্তু তাদের দাবি যত প্রখরই হোক না কেন কেন্দ্রীয় শক্তির উচিত হবে সেগুলিকে দমন করা। কারণ কেন্দ্র হচ্ছে সংহতি ও সার্বিক কল্যাণের প্রতীক। অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যের দাবি কেন্দ্রের সম্মিলিত শক্তি ও জাতীয় নীতির নিয়ন্ত্রণাধীন। কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতি অঙ্গরাজ্যগুলির আনুগত্য বাধ্যতামূলক।

যদি কখনো কেন্দ্রীয় শক্তি কোন একটি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের সহিত একীভূত হয়, তখন দেশে বিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধ দেখা দিতে পারে, সে অবস্থায় কেন্দ্রকে শৈথিল্যের পরিবর্তে অধিকতর

শক্তি প্রয়োগ করে বিদ্রোহ দমনে তৎপর হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ তখনই সম্ভব যখন বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রহীন করা যায়। দেশ ও জাতির সর্ববিধ সামরিক শক্তি ও অস্ত্রপাতি কেন্দ্রের আয়ত্তে রাখতে হয়।

মানুষ মানুষই আছে। আদর্শ ও শান্তিবাদ যত বেশিভাবে প্রচার করা হোক না কেন, শস্ত্রশাসন মানুষের সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রা ও ভাগ্যবিধায়ক।'

—The Human Cycle etc :
Sri Aurobindo.

জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচ্য নিবন্ধ শেষ করব। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : মানুষ প্রতিবার জন্মগ্রহণ করে এবং প্রতিবারই তাহার অতীত বিবর্তন ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অনুসারে বিশ্ব প্রকৃতির উপাদান হইতে নূতন মন, প্রাণ এবং দেহ গঠিত হয়।

দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়া গেলে প্রাণসত্তা প্রাণভূমিতে চলিয়া যায় ও কিছুকাল সেখানে অবস্থান করে, সময়ে আবার সেই প্রাণকোষও অন্তর্হিত হয়। সকলের মনোময় কোষের বিলয়। অবশেষে অন্তরাত্মা বা চৈত্যপুরুষ চৈত্যজগতে প্রবেশ করে ও নূতন এক জন্ম আসন্ন হওয়া অবধি সেখানে বিশ্রাম করে।

যে সকল মানুষের সাধারণ ধারায় আত্মবিকাশ হইয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহাই মোটামুটি পথ। ব্যক্তি হিসাবে মানুষের প্রকৃতি বিকাশমাত্রা অনুযায়ী ইহার তারতম্যও হয়। যেমন মনের যদি সুদৃঢ় বিকাশ হইয়া থাকে তাহা হইলে মনোময় পুরুষ বর্তিয়া থাকিতে থাকিতে পারে; সেইরূপ প্রাণসত্তাও থাকিয়া যাইতে পারে, যদি অবশ্য ইহারা সত্য চৈত্যপুরুষের দ্বারা সুসংহত ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই অবস্থান করে, চৈতসত্তার অমরত্ব তাহারাও লাভ করে।

পুরুষ জীবনের অভিজ্ঞতারাজির সারাংশ আহরণ করিয়া চলে এবং বিবর্তনের ধারায় উহাকেই আত্মবিকাশের ভিত্তি করিয়া লয়। পুণরায় জন্মগ্রহণ করিলে উহা স্বীয় মনোময়, প্রাণময় ও শারীর কোষ পরিগ্রহের সময় ততখানি কর্মও সঙ্গে লইয়া থাকে যতখানি নূতন জীবনে পূর্ণতর অভিজ্ঞতার জন্য তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়। [পুরুষ = Being চৈত্যপুরুষ = Psychic Being]

—যোগের পথে আলো : শ্রীঅরবিন্দ।

(পাঠকবর্গ যদি চান এ বিষয়ে আরো আলোচনা ও তুলনামূলক ভাবে বিবিধ প্রতিপাদ্য বিচার করা যেতে পারে)

আনন্দমার্গী হত্যা সম্পর্কে সি, আই, বি, রিপোর্ট

ষ্টাফ রিপোর্টার

আনন্দ মার্গীদের হত্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ তদন্ত করে যে রিপোর্ট দাখিল করেছে গত ২৫শে জুলাই এর Organiser সাপ্তাহিক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক-বর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য তার সারানুবাদ দেওয়া হল।—প্রতিবেদক : বি: বা:।

গত ৩০শে এপ্রিল ২৪ পরগনার ডিলজলা কসবা এলাকায় দুজন নারী সহ ১৭জন আনন্দ মার্গীর হত্যা প্রভূত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ষাট দশকের শেষভাগে কলিকাতার খুনোখুনিকে এই ঘটনা নৃশংসতায় হার মানিয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে কসবা থানার অন্তর্গত বিজন সেতুর কাছে দুষ্কৃত-কারীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওত পেতে থাকে এবং ট্যাক্সি থেকে আনন্দ মার্গীদের টেনে নামিয়ে হাজার হাজার মানুষের সামনে পিটিয়ে পুড়িয়ে খুন করে। হত্যা সম্পর্কে পুলিস ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করলেও পৈশাচিক ঘটনাটি এখনো রহস্যাবৃত। অনেকেই মনে করে হত্যাকাণ্ডের পিছনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল ছিল।

তদন্তে প্রকাশ, গত ২৮শে এপ্রিল ডিলজলার দুটি শিশু সহ দুজন নারী আনন্দ মার্গীকে ছেলেধরা সন্দেহে কিছু লোক ধরে। তর্কাতর্কি চলাকালে আনন্দমার্গের বিশ্ব জাগৃতি ভবন থেকে কিছু স্বেচ্ছা সেবক সেখানে আসে। ছেলে ধরা সন্দেহে আনন্দ মার্গী নারী দুটিকে যারা ধরে তাদের অধিকাংশই ছিল সি, পি, এম-এর সমর্থক। ইতিমধ্যে পুলিস এবং স্থানীয় এম, এল, এ শচীন সেন সেখানে আসেন। শচীন সেনের নির্দেশে পুলিস আনন্দ মার্গীদের গ্রেপ্তার করে। পরদিন স্বেচ্ছাসেবকরা জামিনে খালাস হয়, সন্ন্যাসিনী দুজন থাকেন হাজতে পুলিস তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

এই ঘটনার পর ২৯শে এপ্রিল স্থানীয় পার্টি অফিসে শচীন সেনের সভাপতিত্বে সি, পি, এম কর্মীদের এক সভা হয়। সভায় পার্টির লড়াকু ক্যাডাররা উপস্থিত ছিলেন। ৩০শে এপ্রিল আনন্দ মার্গের ধর্ম/সাংস্কৃতিক সম্মেলন পণ্ড করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার পর সন্ধ্যার দিকে কসবা এলাকায় সি, পি, এম সেচ্ছাসেবকরা একটি মিছিল বের করে। আনন্দ মার্গীদের কালো হাত ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও শ্লোগান তুলে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে।

সভার সিদ্ধান্ত মত, প্লান অব অ্যাকসান রচিত হয়। সি, পি, এম অ্যাক্টিভিস্টরা কিছু স্থানীয় কুখ্যাত সমাজ বিরোধীদের সহিত হাত মেলায় এবং তিনটি উপদেশ ভাগ হয়ে ঘটনার দিন বিজন সেতু, বালিগঞ্জ রেল মাল গুদাম এবং বালিগঞ্জ স্টেশনের আশেপাশে ওত পেতে থাকে। জানা যায়, গ্রুপ তিনটি পরিচালনা করেন বাবলু চক্রবর্তী, রামনাথ সিং ও নির্মল হালদার। সকাল ৭-৫০ নাগাদ আনন্দমার্গীরা ট্যাক্সি করে বিজন সেতু দিয়ে ডিল জলা আশ্রমের দিকে যেতেই সি, পি, এম, এর বাহিনী তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। ছেলে ধরা পেটানোর নামে পৈশাচিক গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়। হত্যা সম্পর্কে পুলিস যাদের গ্রেপ্তার করেছে তাদের মধ্যে সি, পি, এম-এর সুপরিচিত কর্মী রাম নাথ সিং, শম্ভুনস্কর, খুদিরাম সর্দার এবং গোপাল রায় থাকায় গণহত্যার ব্যাপারে সি, পি, এম জড়িত বলে বোঝা যায়।

শম্ভু নসকরের বাড়ি থানা তল্লাস কালে শম্ভুর হেপাজত থেকে পুলিস নিহত সন্ন্যাসিনী সুপ্রিয়ার সোনার ঘড়ি এবং কম্বল উদ্ধার করে। রাম নাথ সিং-এর মুক্তি দাবি করে বাবলু চক্রবর্তী একদল সি, পি, এম সমর্থক নিয়ে কসবা থানার ইনসপেক্টার, সি, আই, ডি ইনসপেক্টার এবং আর, পি, এক ইনসপেকটারকে লাসায়।

আনন্দমার্গের সহিত সি, পি, এম-এর বিরোধ নতুন নয়। ১৯৬৪ সালে আনন্দ মূর্তি পি, আর সরকার যখন বিহারের জামালপুর থেকে তাদের সদর কার্যালয় পুরুলিয়ার আনন্দ নগরে স্থানান্তরিত করেন তখন থেকে বিরোধের শুরু। ১৯৬৭ সালের ৫ই মার্চ দুই পক্ষের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ হয়। একখণ্ড জমি উপলক্ষ্য করে ৫০০০ স্থানীয় লোক তীর ধনু বর্শা নিয়ে আনন্দমার্গ আশ্রম আক্রমণ করে পাঁচ জন আনন্দমার্গীকে হত্যা করে। ১৯৬৯ সালের আগস্টে কোচবিহার জেলার খাগরাবাড়িতে আনন্দ মার্গীদের সহিত স্থানীয় সি, পি, এম কর্মীদের একাধিক সংঘর্ষের বিবর জানা যায়। এই সংঘর্ষ গুলি ঘটে সি, পি, এম অধ্যুসিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে।

বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরাতে সি, পি, এম ও আনন্দ মার্গের মধ্যে বিরোধের খবর পাওয়া যায়। ত্রিপুরার স্বধাসিত উপজাতি জেলা পরিষদ গঠনে বাঙ্গালী_ দের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে আশংকা করে 'আমরা বাঙ্গালী' দল বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে, আনন্দ মার্গ 'আমরা বাঙ্গালী দলকে উৎসাহ দেয়। উপজাতিদের নিকট থেকে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু গণ যে সব জমি কিনে নিয়ে চাষ আবাদ করছে, সে সব জমি উপজাতীদের প্রত্যার্পন বিলেরও আনন্দ মার্গ বিরুদ্ধতা করে।

সম্প্রতি তিলজলার আনন্দ মার্গের বিশ্ব জাগৃতি ভবন নির্মানের ফলে স্থানীয় সি, পি, এম এবং আনন্দ মার্গের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হয়। অকলটি সি পি এম-এর অন্যতম শক্ত ঘাঁটি। সি পি এম সেই কারণে আনন্দমার্গের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করতে থাকে। স্থানীয় উদ্বাস্তু বাসিন্দাদের এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে আনন্দ মার্গ কেবল তাদের বাস্তু জমি গ্রা স করবে তাই নয়, তাদের ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে মার্গের মতবাদে দীক্ষা দিয়ে সন্ন্যাসী বানাবে।

১৯৮১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কিছু স্থানীয় লোক একটি ছেলের খোঁজে বিশ্ব জাগৃতি ভবনে যায়এবং ছেলেটিকে সেখানে দেখতে পায়। এই ঘটনা ছিল ছেলে চুরির জনরবের মূলে। ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী স্থানীয় লোকেরা আশ্রমে ঢুকে আনন্দ মার্গীদেরদের মারপিট করে এবং আসবাবপত্র ভাঙ্গ চুর করে।

এ বছর ৬ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় এম এল এ শচীন সেনের সভাপতিত্বে তিলজলায় সি পি এম সমর্থক নাগরিক সমিতির কনভেনসন হয় তাতে আনন্দ মার্গের প্রভাব বিস্তার বন্ধ করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা হয়। কনভেনসনে আনন্দ মার্গের বিরুদ্ধে সি পি এম পরিচালনার জন্য 'আনন্দ মার্গ বিরোধী প্রচার কমিটি' নামে একটা সমিতি গঠিত হয়। আনন্দ মার্গের 'সন্ত্রাস মূলক' কাজ শক্তহাতে রুখবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে ইস্তাহার বিলি করা হয়। সি পি এম আনন্দ মার্গের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে পোস্টার মারে, আনন্দ

(১৭ পৃঃ দেখুন)

স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছর পরে

কালিপদ সরকার

আজ ১৫ই আগষ্ট, ভারতের স্বাধীনতা দিবস। ৩৫ বছর আগে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট গণ-পরিষদ ভবনে সদস্যগণের সামনে পণ্ডিত জহর লাল নেহেরু জাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন : "বহুকাল আগে ভাগ্যের নিকট আমরা নতি স্বীকার করে-ছিলাম। আজ ভাগ্যের বিধান পরিবর্তিত হতে চলেছে। একটু পরেই রাত্রি ১২টার পর বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন, ভারত জেগে উঠবে স্বাধীনতার নবালোকে। ইতিহাসে এমন দুর্লভ মুহূর্ত কদাচিৎ আসে। অতীতকে পিছনে ফেলে নবযুগের যাত্রা হবে শুরু এবং জাতির অবরুদ্ধ অন্তরাত্মা বাঙ্ময় হবে।

বিস্ময় চকিত, অবিশ্বাস তাড়িত এবং অজ্ঞা-নাচ্ছন্ন অনেকের মন নেহেরুর ঐতিহাসিক ঘোষণার তাৎপর্য সেদিন পুরোপুরি বুঝতে পারে নি। মোহা বৃত কেউ বলেছিল এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। তার-পর একদিন এবং প্রতিদিন দেশের ও বিদেশের মানুষ বুঝতে পারল ভারত সত্যই স্বাধীন হয়েছে। তারপর দশটা বছর কেটে যেতে না যেতে সবাই জানল, ভারত শুধু স্বাধীনই হয় নি, ভারত জগৎ-সভায় তার প্রাপ্য আসন অধিকার করে বসেছে। আজ দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম শক্তি, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং শান্তির নির্ভরতম পৃথিবৃৎ ভারতের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় শিবিরই অত্যুৎসাহী। এ কি কম কথা?

পৃথিবীতে এমন দেশ নেই, যে দেশ কোন না কোন বিষয়ে বিদেশের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই সব দেশেই আমদানী ও রপ্তানী বানিজ্য বর্তমান। বিকাশশীল দেশে আমদানীর পরিমাণ সাময়িকভাবে রপ্তানীর চেয়ে বেশী হলেও, পরিণামে তা থাকে না। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের রপ্তানী বানিজ্য কাঁচামাল, চা পাট ও তুলা নির্ভর ছিল; শিল্প সামগ্রী রপ্তানী তো দূরের কথা দেশের প্রয়োজনেরও ৫ শতাংশ দেশে উৎপাদিত হত না। একটি আলপিন কি সূচের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হত। আর এখন শিল্পে ভারত শুধু আত্মনির্ভরই নয়, ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য বিশ্বের কত দেশে রপ্তানী হচ্ছে। প্রতিযোগীতায় উন্নত দেশকে হটিয়ে দিয়ে ভারত এগিয়ে চলেছে।

স্বাধীনতা লাভ কালে দেশের সর্বাধিক উর্বর দুটি ভূ-ভাগ সিন্ধু উপত্যকা এবং গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্থানে চলে যায়। দুই পাকিস্থান থেকে এ পর্যন্ত যত অ-মুসলমান দেশ ছেড়ে ভারতে এসেছে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগও মুসলমান ভারত ছেড়ে পাকিস্থানে যায় নি। ভারতে খাদ্যাভাব ছিল, তারপর উদ্বাস্তু আগমনজনিত নতুন চাপ, ভারতের খাদ্যাভাবকে একটি স্থায়ী সমস্যা করে তোলে। দেশের ভিতরের ও বাইরের নিন্দুকরা তখন ভারতের এই খাদ্যাভাব নিয়ে কত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও পরিহাসই না করত! এখন ভারত শুধু খাদ্যে স্বয়ম্ভরই নয়, খাদ্য রপ্তানীও করছে। কি করে ভারত এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে এবং বর্দ্ধিত ৬৮ কোটি মানুষের অন্ন যোগাচ্ছে তা বিশ্বের বহু কৃষি বিজ্ঞানী ও রাজনীতিক কে রীতিমত হতচকিত করেছে। মজার কথা, এই কৃষি বিপ্লব ঘটাতে মার্কস তান্ত্রিক সর্বহারার কয়েদ-খানা গড়তে হয় নি গ্রামে গ্রামে।

ভারতের বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ প্রভৃতি

প্রতিভা এবং সংখ্যার বিচারে বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। এমন দিন হয়ত খুব দূরে নয়, যখন তাঁরা প্রথম স্থান নিতে সক্ষম হবেন। তারপর আসুন দেশ গঠন উদ্যোগ এবং সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে, সেখানেও দেখবেন উন্নতি কম হয় নি। বন্টিত জাতীয় আয় সকল শ্রেণীর মানুষের ওপর সমভাবে বন্টিত না হলেও, শ্রমজীবী এবং কৃষকগণও সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের সুফল যে আয়ত্ত করেন নি এমন নয়। স্বাধীনতা সর্বচেয়ে বেশী যেটি সর্বসাধারণকে দিয়েছে তা হল অধিকার-সচেতনতা, যার নাম আত্মিক জাগরণ।

প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতাকে কিন্তু বিষয়-সম্পদ-কামান-বন্দুকের প্রাচুর্যের বিচারে উপলব্ধি করা যায় না। স্বাধীনতা মনের ব্যাপার, বুদ্ধি দিয়ে তাকে বোঝানোও সম্ভব নয়। স্বাধীনতা আত্মসম্মান ও আত্মপ্রত্যয়ের জন্মহেতু। পশুশালার সিংহ যে চেতনাবশে অনায়াসলব্ধ আহার, বাসস্থান এবং কখনো সহবন্দী সঙ্গিনীকে ত্যাগ করে সুযোগ পাওয়া মাত্র বনের উদ্দেশ্যে ছোটে, স্বাধীনতা হল সেই চেতনা। যাদের কাছে সেই স্বাধীনতা মানে বেশি ভাল-রুটি-মাংস, কম কাজ-বেশি আয়, কুটীরের বদলে কোঠাবাড়ি, কিংবা কাউকে না মেনে চলা—তাহলে বলতে হয় তারা স্বাধীনতা কি তা বোঝেন না।

স্বাধীনতা যেহেতু মনের বস্তু, তাই আইন করে কাউকে স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। আইন অধিকার দিতে পারে কিন্তু চেতনা সঞ্চারী মেরুদণ্ড দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি' বই-এ এক স্থানে লিখেছেন— "সকাল বেলায় এখো গুড় দিয়া যে বাসি লুচি খাইতাম, নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র যে-অমৃত খাইয়া থাকেন তাহার সঙ্গে তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। কারণ অমৃত জিনিষটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে—এই জন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।" স্বাধীনতা হল অমৃতের সেই স্বাদ। আমাদের দেশে এখনো কিছু লোক আছেন, তারা কখনো কখনো বলেন, "এ কি স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতাই কি আমরা চেয়েছিলাম? এর চেয়ে ইংরাজ রাজত্বেই ছিলাম ভাল" রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত কথার মধ্যে আত্মাশ্বকরা তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাবেন। এদের সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি বলতে ঘৃণা বোধ হয়।

ইংরাজ কবি রুডিয়ার্ড কিপলিং বলেছিলেন: "পরমেশ্বরের দুর্জ্ঞেয় বিধান ভারত শাসনের গুরু-দায়িত্ব ইংরাজ জাতির ওপর ন্যস্ত করেছে।"

১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে কমনস সভায় চার্চিল বলেছিলেন: "এসব তোমরা কি বলছ, ভারত সাম্রাজ্য হারালে ইংলণ্ডের সর্বনাশ হবে। অচিরে ইংলণ্ড একটি অস্থিচর্মসার দীনহীন জাতিতে পরিণত হবে।"

১৯৪০ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে চার্চিল সদম্ভে বলেছিলেন: "সাম্রাজ্য বিকিয়ে দেবার জন্য আমি ইংলণ্ডেশ্বরের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসি নি।"

তারপর কংগ্রেসের ক্রম-বর্ধমান দাবির উত্তরে চার্চিল বলেছিলেন: "কুকুরগুলো ঘেঁউ ঘেঁউ করুক, সাম্রাজ্যের রথ এগিয়ে যাবেই।"

রোম সাম্রাজ্যের চেয়ে বিশালতর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর মোট ৫কোটি ৪০ লক্ষ বর্গমাইল ভূমির ১কোটি ৬০লক্ষ বর্গমাইলের ওপর। বিস্তৃত ছিল। যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। সেই সাম্রাজ্যের হৃদয়কেন্দ্র ভারতবর্ষ ছেড়ে ইংরাজ

চলে গেল। তারপর সমগ্র সাম্রাজ্য ছেড়ে একে একে।

১৫৯৯ সালে ওলন্দাজ বণিকদের চড়া মশলার দাম কমতে লণ্ডনের ২৪ জন দোকানদার মাত্র ৭২ হাজার পাউণ্ড মূলধন নিয়ে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি খুলেন। রাণী এলিজাবেথের অনুমতি পেয়ে ১৬০০ সালে কোম্পানী বোম্বেটে নাবিক হকিনসকে প্রতিনিধি করে পাঠায় ভারতে। ছয় মাস জলযাত্রার শেষে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে হকিনসের পালের জাহাজ 'হেকটর' ভিড়ে সুরাট বন্দরে। সুরাট থেকে হকিনস যান কয়েকটি সুন্দরী এবং সুরা উপহার নিয়ে আগ্রায় বাদশাহ জাহাঙ্গিরের দরবারে। বাদশাহ ইংরাজ বণিকদের ভারতে ব্যবসার অনুমতি দেন। বাদশাহের দরবার দেখে হকিনসের চোখে ধাঁধা লেগেছিল। বাদশাহের তুলনায় রাণী এলিজাবেথকে তাঁর কাছে ক্ষুদ্র পল্লীশাসক বলে মনে হয়েছিল। তবু হকিনস তখনো দিল্লি দেখেন নি।

তারপর কি করে 'ধণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে পোহালে শর্বরী,' সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে সাম্রাজ্য ও রাজদণ্ডও আজ অতিতের স্মৃতি। 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন, ধনমান।'

১৯৪৬ সালে 'ম্যানচেস্টার গার্ডেন' লিখেছিল ভারতের অবস্থা হল বিস্ফোরণমুখী আগ্নেয়গিরি তুল্য। লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনানীদের বিচার করতে গিয়ে কি ভুলই না করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার! ক্যাবিনেট মিশন অবস্থা বুঝে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দেবার পর, ১৯৪৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এটেলি কমনস সভায় ঘোষণা করেন: "১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর হাতে ভারতবর্ষের শাসনভার হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত করেছে।" নিস্তব্ধ সে সভাঘরে সদস্যগণ বিষাদ-বিস্ময় ধৈর্য সহকারে প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক ঘোষনা শুনলেন। বিপুল ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হল। সদস্যগণ জেনে.ছলেন, সাম্রাজ্যের ভিত কাত হয়ে পড়েছে।

সে দিনের সেই সভায় চার্চিল বেদনার্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "হায়, কি দুর্ভাগ্য আমার! গৌরবময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যু আমাকে দেখতে হল! কত দেশের কত মানুষ ব্রিটেনের হয়ে ব্রিটেনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়েছে কিন্তু আত্মঘাতীকে কে বাঁচাতে পারে?"

কমনস সভায় শ্রমিক দলের সংখ্যাধিক্য থাকলেও লর্ডস সভায় সংখ্যাধিক্য ছিল রক্ষণশীল দলের। চার্চিল প্রভাবিত রক্ষণশীল দল ইচ্ছাকরলে ক্ষমতা হস্তান্তর দু-বছর পিছিয়ে দিতে পারত কিন্তু তারা তা করেনি। ভারতের অগ্নিগর্ভ অবস্থা দমন করার শক্তি ইংরাজ সরকারের তখন ছিল না। আই. এন. এ প্রভাব সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহোন্মুখ করে তুলেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর প্রধানমন্ত্রী এটেলি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। কলিকাতার রাজভবনে অবস্থান কালে কথাপ্রসঙ্গে রাজ্যপাল মি: এটেলিকে প্রশ্ন করেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের পর ব্রিটিশ এত তাড়াতাড়ি ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গেল কেন? প্রধানমন্ত্রী এটেলি জবাবে বলেছিলেন, "Becose of Subhas Bose." (সুভাষ বোসের জন্য)

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস এ বিষয় আরো স্পষ্ট করে বলেছেন: "Subhas Bose, The only one amongst Indian

leaders with clear-cut views of the world, was far away in Europe nurturing his plans to liberate India from outside..... Subhas seemed the embodiment of dynamic action, with Ghandhi now apparently supporting him.....it was to be the British who though they ignored him during the war, were to make him a legend after his death.

The ghost of Bose was to inhibit the Conference rooms four years later as India moved through the last days of British Rule and in death he was to have the success denied to him in life. The ghost of sudhas like Hamlet's father, walked the battlements of the Red Fort and su !denly his amplified figure over awed the Conferences that were to lead to indepen 'ence,"—Last years of British India.

স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য লগ্নে সর্বাগ্রে তাই স্মরণ করতে হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই নায়ক গান্ধীজী ও নেতাজীকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, স্বাধীনতা দিবসের প্রথম বর্ণাঢ্য উৎসব সমারোহে এই দুই নায়কের একজনও উপস্থিত ছিলেন না।

গান্ধীজী উৎসবের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে, উল্লাস কলরব মুখর রাজধানী নয়া দিল্লি থেকে অনেক দূরে, কলিকাতার বেলেঘাটায় হায়দারি ভবনের মেঝেতে মাদুরে বসে তখন প্রার্থনারত। নিঃসঙ্গ সহযোদ্ধা শিষ্য পরিত্যক্ত যীশুর ন্যায় একাকী গেথসিমেন উদ্যানে তিনি যেন পরম পিতার উদ্দেশে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলছেন, Father, Father every thing is possible for you. Take away this cup from me. Yet I want your will, not mine."

অন্যজন নেতাজী চূড়ান্ত সংগ্রামের শেষে হারিয়ে গেলেন গূঢ় রহস্য যবনিকার গভীর অন্তরালে। সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার সময় নেতাজী সহকর্মী সেনানী বন্ধুদের বিদায় অভিবাদনের উত্তরে সেই চির অম্লান বিশ্বজয়ী স্মিত হাসিতে ক্ষণিকের জন্য সংকট চিন্তা মুছে ফেলে বলেছিলেন, "আবার দেখা হবে। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুণ।

তারপর সব নিস্তব্ধ, অতল স্পর্শী অন্ধকার, সীমাহীন কাল পরিক্রমা।

> "Tighly closing eyelids.
> Heights; and cloudy spheres.
> Rivers, Waters, Boulders.
> renturies and years."
>
> —Boris Pasterrak.

এর নাম ইতিহাস। এর নাম সেই বাইবেলের প্রবাদ, একজনে ফসল বোনে, অন্যজনে সে ফসল কাটে। তা হোক, "Forget and smile. Not remember and be sad."

জগতে অবিমিশ্র সাফল্য নেই, দুঃখ-মুক্ত সুখ নেই, দুর্ভাগ্যহীন জীবন নেই। এই চিরন্তন সত্যকে মেনে নিয়ে স্বাধীন ভারত নতুন উৎসাহ ও নতুন শক্তি নিয়ে নব ভারত গড়ার কাজে এগিয়ে চলেছে। বিগত চৌত্রিশ বছরের কাজের বিচার করলে সকলকেই স্বীকার করতে হবে, দেশ অনেক এগিয়েছে। জাতির অবরুদ্ধ অন্তরাত্মা জেগেছেন। কবির ভবিষ্যৎ বাণী সফল করে যেদিন 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' —সে দিন খুব দূরে নয়। বন্দে মাতরম জয় হিন্দ।

খরাত্রাণ (!)

—মলয় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে চলতি বছরের খরা প্রসংগ নিয়ে দিল্লী কলকাতার মধ্যে অনেক চিঠি ও ফাইল চালাচালি হয়েছে। এই রাজ্যের অধিকাংশ জেলা জুড়ে ধান বোনার মরশুমে অনাবৃষ্টির ফলে যে ভয়াবহ সংকটের সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র যুদ্ধকালীন জরুরী ভিত্তিতেই যে তার মোকাবিলা করা উচিত একথা কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্যকভাবে বোঝাতে স্বয়ং মুখ্য মন্ত্রী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী, সেচমন্ত্রী, মুখ্যসচীব প্রভৃতি মিলিয়ে প্রায় আধডজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিয়মিতভাবে দমদম পালাম ছোটাছুটি করেছেন। তাঁরা দাবী করেছেন, রাজ্যের যোজনা বরাদ্দের অতিরিক্ত শুধুমাত্র খরাত্রাণের জন্য ৬৬ কোটি টাকার অংক, তার সঙ্গে সাম্প্রতিক যুক্ত হয়েছে ১৯ কোটি টাকার আরো একটি প্যাকেজ স্কীম। কেন্দ্রীয় সরকার এর পরিপ্রেক্ষীতে কৃষি ও সেচদপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসারদের নিয়ে গঠিত একটি সমীক্ষক দল পাঠিয়েছেন, যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় ঘুরে খরার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোর্ট দেবেন।

মানুষের দুর্দিনে তার দুর্দশার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণের চেয়ে অনেক বেশী জরুরী সমস্যা সমাধানের আশু প্রচেষ্টা নেওয়া। সেই হিসাবে, রাজ্য সরকারের চাহিদামতো Drought Relief এর পরিবর্তে সমীক্ষক দল পাঠানো কেন্দ্রের উচিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে। কেন্দ্র হয়তো এর উত্তরে গত বাম ফ্রন্ট সরকারের আমলের বন্যা পরিস্থিতির প্রসংগ তুলবেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, সেই সময় 'ফ্লাড রিলিফে' পাঠানো কোটি কোটি টাকার জিনিষপত্র শুধুমাত্র রাজ্যের শাসক দলের স্বার্থে নয়ছয় করা হয়েছে, পঞ্চায়েতগুলি কর্তৃক পাঁচহাতে লুণ্ঠিত হয়েছে ত্রাণসামগ্রী, দলীয় সংগঠনের সুবিধা অনুসারে বেছে বেছে কিছু রিলিফ দেওয়া হয়েছে, তাও পার্টির নামে—এক কথায় রিলিফের টাকা ও জিনিষপত্র নিয়ে চরম পার্টিবাজী হয়েছে। কেন্দ্র হয়তো এপ্রসংগ তুলবেন এবং বলবেন, সেইজন্যই এবছর আমরা রিলিফ পাঠানোর আগে দেখে নিতে চাই কোথায় এবং কি পরিমাণ সাহায্যের সত্যিকার প্রয়োজন।

রিলিফের এই প্রয়োজনের প্রশ্নেই আর একটি ক্ষুদ্র সংশয় উপস্থিত হয়। খরা যদি এবছর হয়ে থাকে বলে মেনে নেওয়াও যায়, যদি ধরে নেওয়া যায় বৃষ্টির অভাবে, সেচের অভাবে যথাসময়ে বীজ রোপণ করা যায়নি, অথবা রোপিত বীজ থেকে গাছ জন্মায় নি, অথবা সদ্যঅংকুরিত ধান গাছ শুকিয়ে মরে গেছে, তাহলেও প্রশ্ন আসে—রিলিফের প্রয়োজন এবছরই কেমন করে হচ্ছে? এবছরের অজন্মার দরুণ দুর্ভিক্ষ হ'লে তা হবে আগামী বছরে, যেহেতু অজন্মার দরুণ আগামী বছরের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ মজুত করা যাবেনা, মাঠের ধান সংরক্ষিত হবে না চাষীর মরাই এ অথবা সরকারী গুদামে। এ বছরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য তো গত মরশুমের ফসল থেকেই সঞ্চিত হয়ে আছে, এবং গত মরশুমে বৃষ্টির অভাবে অথবা আতিশয্যে কিংবা অন্য কোন

কারণে ফসল কম হয়েছে বলে কিছু শোনা যায়নি!

কোন কৃষিতত্ত্ববিদ্ হয়তো বলবেন, ধানের বীজতলার জন্য রিলিফের প্রয়োজন। বীজ নষ্ট হয়ে গ্যাছে অনাবৃষ্টির কারণে, নতুন বীজ যোগান দিতে হবে চাষীকে। সেক্ষেত্রে রেডিওর কৃষি বিভাগকর্তৃক প্রচারিত ঘোষণার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কলকাতা রেডিওর কৃষি বিভাগ থেকে প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কৃষিজীবিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয়—যাঁদের বীজ নেই তাঁরা অবিলম্বে জেলা কৃষি আধিকারীকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বীজ নিয়ে আসুন, মিনিকিটের যোগান প্রতিটি জেলাতে যথাযথ ভাবে রাখা হয়েছে। এবং রেডিও থেকে এ ঘোষণা করা হয় রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর থেকে প্রচারিত সার্কুলারের রেফারেন্স দিয়েই। সেক্ষেত্রে বীজতলার জন্য রিলিফের প্রয়োজনের কথা বাতিল হয়ে যায়।

অনাবৃষ্টি ও খরার জন্য সমস্যা এবং কিছু অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। প্রয়োজন আছে ত্রাণ সামগ্রীরও যদিও ইতিমধ্যেই দু একটি জেলা ছাড়া রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু এই খরাত্রাণের জন্য কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হওয়ার ততটা প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই টাকার পরিমাণ নিয়ে দরকষাকষি ও কাগজে গরম বিবৃতি দেওয়ার। প্রকৃত প্রয়োজন আন্তরিকতার, মানুষের দুর্দিনে সাহায্য করার মতো মানসিক গঠনের। বিশেষতঃ, রাজ্য সরকার যখন ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তাইনের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামের সমর্থনে লক্ষাধিক টাকার দানসামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন—রাজ্যেরই খরা-পীড়িত অসংখ্য কৃষিজীবি মানুষকে ন্যূনতম সহায়তা-টাও তাঁরা অনায়াসেই দিতে পারেন। মন্ত্রীসভার দপ্তর বন্টন নিয়ে জনগণের প্রতিনিধিদের যে উদ্যম ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখা যাচ্ছে তার সিকিভাগ প্রচেষ্টাতেই খরাত্রাণের কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

এঁদের কাছে খরাত্রাণের প্রশ্ন বড়ো নয়, বড়ো হলো যে কোন ইস্যুর ভিত্তিতে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষ ও ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক চাহিদার ট্র্যাডিশনটা বজায় রাখা। কমিউনিষ্ট সরকারের বিপ্লবী ইমেজকে বজায় রাখতে হলে, সহযোগিতা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার ধারাকে বজায় রাখতেই হবে—বিমাতৃ সুলভ আচরণের অভিযোগকে রাখতে হবে টিকিয়ে। ফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ কোন্দল আর রাজ্যের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা ঢাকতে এছাড়া আর অন্য পথ নেই।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত আলেখ্য

—জনৈক স্বাধীনতা সংগ্রামী

একটি একটি করে ভারতের স্বাধীনতালাভের পর পঁয়ত্রিশটি বছর অতিক্রান্ত হল। স্বাধীনোত্তর যুগে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। এই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য কি নিরলস সংগ্রাম চালাতে হয়েছে, কত সংগ্রামীকে আত্মদান করে শহীদ হতে হয়েছে, কত লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভবিষ্যৎ ত্যাগ করে, অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, সেটা ইতিহাসের পাতায় লিখিত থাকলেও আজকের দিনের মানুষ যেন সব ভুলে যেতে বসেছে। দেওটার কথা যেন গৌণ হয়ে পড়েছে, শুধু পাওয়াটার দাবী-টাই মুখ্য হয়ে উঠছে।

অথচ নতুন ভারত গড়তে হলে যে এখনও আদর্শ নিষ্ঠা, ত্যাগ, মানবীয় মূল্যবোধের ও দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা ততটা জরুরী, তারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না। এই বেপরোয়া স্বার্থপরতা, সুবিধা সুযোগলাভের অশোভন প্রবণতা দেশের পক্ষে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক হচ্ছে। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি বৈষম্যের অপদেবতারা তাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই অপকর্মে সহায়তা দান করছে দেশী ও বিদেশী কিছু কিছু দল, গোষ্টি ও মানুষেরা। তারা দেশের অগ্রগতির পথে মূর্তিমান বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজ স্বাধীনতা দিবসের শুভক্ষণে এই দেশবৈরীদের সঙ্গে মোকাবিলা করার শপথ নিতে হবে।

আজকের দিনে আমাদের স্মরণ করতে হবে আমাদের পূর্বসূরীদের। তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও বক্তব্য আমাদের মনন করতে হবে। সুখী সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে হবে তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। দেশকে বাঁচাতে হলে, তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের শুধু দিয়ে যেতে হবে, দিয়ে দিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যেতে হবে, কিন্তু প্রতিদানে কিছু না চেয়ে, যে কথা বলেছিলেন নেতাজী সুভাষ। ভারতবর্ষ ও ভারতের জনসাধারণের কল্যাণকল্পে, 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান। তারি লাগি কাড়াকাড়ি' করার যে অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখে গিয়েছেন, অনুসরণ করতে হবে কায়মন বাক্যে। এবারকার স্বাধীনতা দিবসে সঙ্কল্প আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং তৈরী হতে হবে, 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এই ব্রত গ্রহণ করে।

এই দিনে অতীত ইতিহাস আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। এই ভারতে দুইটি বিভিন্নপন্থী, কিন্তু একই উদ্দেশ্যমুখী, দুইটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং তাদেরই সমন্বয়ের ফলে দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়েছে।

এই দুটি ধারা হল, সহিংস ও অহিংস। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। নব ভারতের পথিকৃৎ রামমোহন শুরু করেছিলেন পরাধীন জাতির সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে। মঙ্গলপাণ্ডে ও তার সহকর্মীরা শুরু করেছিলেন প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দ দীক্ষিত করেছিলেন, দেশের মানুষকে অভীঃ মন্ত্রে। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার, লেখনীর মাধ্যমে সেই বিদ্রোহের সুরের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সর্বত্র। আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে ইংরেজদের আওতায় স্বায়ত্তশাসন লাভ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান,

শ্রীঅরবিন্দ রুদ্রের দূতরূপে আবির্ভূত হলেন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। তিনিই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রবক্তা।

উনিশ শতকের শেষ দশকের শেষে চাপেকার ভাইয়েরা নিজেদের জীবনদান করে অন্যদের শিখিয়ে গেলেন 'দেশের তরে মরতে হবে'। এই অমোঘবাণী ও দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন দেশবাসীর সামনে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে রেনেসাঁ বা নবযুগের সূচনা হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তা পরিচ্ছন্নরূপ ধারণ করল। ব্যারিষ্টার পি. মিত্র, দেশবন্ধু, সতীশ বসু প্রমুখ নেতারা ও আত্মনিবেদিতপ্রাণ যুবকেরা এগিয়ে এলেন ইংরেজ-রাজ শক্তির সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা কষতে।

১৯০২ সালে স্থাপিত হল অনুশীলন সমিতি যারা বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ শুরু করলেন। ১৯০৫ সালে শুরু হল শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার; উল্লাসকর উপেন্দ্রনাথ ও আরো অনেক দুর্ধর্ষ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা। শ্রীঅরবিন্দকে মুক্তি দেবার জন্য তদানীন্তন ব্যারিষ্টার পরবর্তীকালে যাঁকে দেশবন্ধু আখ্যা দিয়েছিলেন দেশের মানুষ, সেই চিত্তরঞ্জন তাঁর সমস্ত প্রতিভার সাহায্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু তবু অন্যান্যদের মধ্যে অনেকের দ্বীপান্তর হল, অনেকের দীর্ঘ কারাদণ্ড হল।

অত্যাচারী ইংরেজ বিচারককে হত্যা করার অপরাধে উনিশ বছরের বালক ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলেন জীবনের জয়গান। দেশব্যাপী স্বদেশ প্রেমের বন্যা ছড়িয়ে পড়ল। বিপ্লবীরা কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেন না। রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন বাঘা যতীন, বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। এঁরা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন মৃত্যুঞ্জয়ী বহু যুবককে। কিন্তু রাসবিহারীই প্রথম বিপ্লবী যিনি শুধু দেশের মধ্যে বিপ্লবের আগুন জ্বেলে দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। তিনি সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ইংরাজ রাজত্বের অবসান ঘটাতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং সফলতা তাঁর হাতের মধ্যে প্রায় এসেও গিয়েছিল, কিন্তু বাদ সাধল বিশ্বাসঘাতকেরা।

রাসবিহারীর অনুগামীদের অনেকেই ফাঁসির রজ্জু গলায় পরলেন, অনেকেরই হল দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড। বাঘাযতীন বন্ধুদেশপ্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করতে অগ্রসর হলেন। জাহাজ আসতে পারল না। কিন্তু মহানায়ক তাঁর অন্য চারজন সহকর্মীকে নিয়ে বালেশ্বরে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন। রাসবিহারী ইংরেজের চোখে ধূলা দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমালেন এবং জাপানে থেকে বিপ্লবী আন্দোলনকে আবার সংগঠিত করতে আজীবন নিরলস প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টার শেষ পরিণতি দেখা যায়, আজাদ হিন্দ বাহিনীর কীর্তি কলাপের মধ্যে। বলা বাহুল্য, নেতাজীর অবদান ছিল এক্ষেত্রে অপরিসীম। নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের একটি অংশ দখল করে, ত্রিবর্ণ পতাকাও উড্ডীন করেছিল ইম্ফলে। সবচেয়ে বড় অবদান হল তাদের যে তারা সেনাবিভাগে বিদ্রোহের বীজও বপন করেছিল, যার ফলে ইংরাজ ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজী ও তাঁর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার না করলে, ইতিহাসের চিত্রটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রথম যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটল দক্ষিণ-আফ্রিকা সংগ্রাম-বিজয়ী

মহাত্মা গান্ধীর। তিনি এসে নতুন করে ঢেলে সাজালেন তাঁর অহিংস নীতি প্রবর্তন করে। এলো জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, কালো আইন রাউলাট এ্যাকট পাশ বিল। ক্ষুব্ধ দেশবাসীর অসম্মান ঘুচাতে এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে চলে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম শুরু হল।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হল তাঁর নেতৃত্বে। দৃশ্যত এই আন্দোলন ব্যর্থ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেশবাসীর স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টা জোরদার হল। বিপ্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তিনি ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। ইতিমধ্যে রাজদ্রোহের অপরাধে গান্ধীজীর ছয় বৎসর কারাদণ্ড হল, স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে মুক্তি দিলেও, তিনি তাঁর কারাবাসের মেয়াদের মধ্যে সত্যরক্ষার খাতিরে আন্দোলন শুরু করেন নি।

ইতিমধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল গঠিত হল। উদ্দেশ্য, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সত্ত্বেও আইন সভাগুলির মাধ্যমে লড়াই করে ইংরেজদের স্বরূপ প্রকাশ করা। গান্ধীজী আইনসভার মাধ্যমে নিজে অংশ নিতে চান নি, কিন্তু তিনি এঁদের নিজ বিশ্বাস মত সংগ্রাম পরিচালনা করবার অনুমতি দিলেন। ১৯২৮ সালে কলকাতার অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে ইংরেজকে চরমপত্র দেওয়া হল ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার জন্য। সময় দেওয়া হল এক বৎসর। ইংরেজ সরকার কর্ণপাত করল না। তাই কংগ্রেস ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির পর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলো।

তারপর শুরু হল, ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন। লবণ আইন ভঙ্গ করতে এগিয়ে এলেন গান্ধীজী, মাত্র ৭৯ জন সহকর্মী নিয়ে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'হাম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে, তামাম হিন্দুস্থান উৎল পড়েঙ্গে'। হলও তাই। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী লবণ আইন ভঙ্গ করে কারাবরণ করল। তারপর একটা বোঝাপড়ার জন্য হল গান্ধী-আরউইন চুক্তি। বসল গোল টেবিল কনফারেন্স। সেটা ব্যর্থ হল, কারণ, ইংরেজ রাজ-শক্তি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী হল না। আবার ১৯৩২ সালে শুরু হল আন্দোলন।

ইতিমধ্যে বিপ্লবীবীরেরা চুপচাপ বসে থাকেন নি। মাস্টারদা সূর্যসেনের পরিকল্পনা মত তাঁরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করে সেখানে কয়েকদিনের জন্য ইংরেজ শাসনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের চরম শাস্তিবিধান করল বিপ্লবীরা। লোম্যানকে হত্যা করা হল, হত্যা করা হল মেদিনীপুরে ইংরেজ শাসকদের তিনজন প্রতিনিধিকে, রাইটার্স বিল্ডিং এর অলিন্দযুদ্ধে সিমসন নিহত হলেন। মৃত্যুবরণ করল বিনয় ও বাদল, দীনেশের হল ফাঁসী। 'ব্লাক এণ্ড টান' নীতির প্রবর্তক, তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর এণ্ডারসনের উপর আক্রমণ হেনেছিলেন বিপ্লবীরা, কিন্তু অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পান।

উভয় শিবিরের কত দিকপালের নাম আজ ভেসে উঠছে স্মৃতি-কোটায়। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে। কিন্তু ত্রৈলক্য মহারাজ, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, একদিকে, অন্যদিকে জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, এবং আরো বহুজনের স্মৃতি আজকের দিনে মনে পড়ছে স্বাভাবিক ভাবেই। এঁদের প্রকৃত পরিচয় দিতে হলে একটা আলাদা পুস্তক রচনা করতে হয়। স্বল্প পরিসরে সে কাজ অসম্ভব। এঁরাই জাতির অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে আলোকবর্তীকা-

রূপে কাজ করেছেন। এঁদের আদর্শনিষ্ঠা, এদের মানবীয় মূল্যবোধ, এঁদের দেশপ্রেম তুলনাহীন।

সশস্ত্র বিপ্লব ও অহিংস আন্দোলন এই দুই ধারাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজ নিজ অবদান রেখেছে। কোন কোন মহল বলে থাকেন যে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। আবর্তন ও বিবর্তনের আলোকে বিচার করলে, এই ধারণা ভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে হবে। একে ছিল অন্যের পরিপূরক, এটাই প্রকৃত ইতিহাস। সর্বশেষ পর্যায়েও 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র অভিযান ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দুর্গকে চুরমার করে দিয়েছে।

বহু ঐতিহাসিক এবং ইংরেজ চিন্তানায়ক বলেছেন যে নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্রিয়াকর্মের ফলেই ইংরেজরা এত তাড়াতাড়ি ভারত ছাড়তে বাধ্য হন। দেশের মধ্যে ভারত ছাড় ধ্বনি তুলে ভারতে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল, নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ তাকে বাস্তবায়িত করার পথে বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করে, রাসবিহারী বসুর আজীবন স্বপ্ন সাধনাকেও তারা বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে কত ভারত সন্তান যে বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার সোপান প্রস্তুত করেছিলেন, তার সঠিক হিসাব আজো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সশস্ত্র অভিযানের ধারক ও বাহক বিপ্লীবদের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মন্ত্রগুপ্তি ছিল তাদের মৌল একটি নীতি। চরম স্বার্থত্যাগ করাই ছিল তাদের ব্রত। জননী জন্মভূমিকে শৃঙ্খল মুক্ত করাই ছিল তাদের সঙ্কল্প সাধনা। কোন ভাবেই তারা প্রচার অভিলাষী ছিলেন না। তার ফলে বহু গৌরবজ্জ্বল ঘটনা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গিয়েছে। এখনকার ঐতিহাসিকদের কর্তব্য হল সেই অধ্যায়গুলি পুনরুদ্ধার করা ও দেশবাসীর সামনে যথাযথ ভাবে তুলে ধরা।

আজকের এই স্বাধীনতা দিবসে, সব খ্যাত, অখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাঁদের নিকট আমাদের অপরিশোধ্য ঋণস্বীকার করি। দেশবাসীর নিকট আবেদন করি যে তারা যেন পূর্বসূরীদের নিকট কিছু পরিমাণে অন্তত ঋণ পরিশোধ করতে সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তাদের ধ্যানের ভারতবর্ষকে সংগঠিত করে, প্রতিষ্ঠিত করে, ভারত যাতে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে, সেজন্য সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করেন।

(৭ম পৃঃ পর)

মার্গ ও সি পি এম-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব ছড়াবার অভিযোগ তুলে পোষ্টার মারে।

সুতরাং ৩০শে এপ্রিলের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দুই দলের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল তারই মর্মান্তিক পরিণতি। গণহত্যার পিছনে প্রকৃতঃ ছেলে চুরির গুজব ছিল বলে অনুমান করলেও, ঘটনাটি যে সুপরিকল্পিত ছিল তার প্রমাণ আছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় আনন্দ মার্গের প্রভাব নির্মূল করার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয় ছেলেধরার গুজব রটনা সেই চক্রান্তেরই অঙ্গ। গত জানুয়ারী মাস থেকে রাজ্যের নানা জায়গায় ছেলেধরার যে গুজব ছড়ায়, রাজ্য সরকার তা কানে তুলেন না এবং গুজব যে অলীক সে কথা জন সাধারণকে বুঝিয়ে সতর্ক করেও দেন না।

তিলজলা—কাণ্ডের ঘটনায় সি পি এম খুব বিব্রত হয়, এবং বামফ্রন্ট সরকার তাড়াতাড়ি হত্যা কাণ্ড সম্বন্ধে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়ে বিরোধীদের প্রচারের পথ বন্ধ করে দেন পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রীর ৪ঠা মে তারিখের বিবৃতিও সি পি এম কে ঘটনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করার উপায় উদ্ভাবনে সাহায্য করে না। আনন্দ মার্গীরা এই ঘটনার জন্য বিধান সভার সি পি এম সদস্য শচীন সেনকে দায়ী করে যে অভিযোগ তুলেছে মুখ্যমন্ত্রী তাকে উত্তেজনাকর বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন এই অভিযোগের জবাবে শচীন সেন যদি দশহাজার কর্মী ও সমর্থক নিয়ে আনন্দ মার্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামে তাহলে সেটি কি ভাল হবে।

(Organiser পত্রিকার সৌজন্যে)

স্বাধীনতার দৌলতেই আমাদের এই সুযোগ

"রাষ্ট্রের কল্যাণে এই ২০ দফা কর্মসূচী গোটা দেশের সার্বিক উন্নয়নের গোটা পরিকল্পনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কোন ক্ষেত্রে কতটা জোর দিলে উন্নয়ন কোন পর্যায়ে দ্রুত সফল হতে পারে তার নির্দেশ এই কর্মসূচী থেকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়ে।"

এই কার্যসূচীর সফল রূপায়ণ প্রত্যেক নাগরিকের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল

আসুন এই দিনে আমরা সবাই শপথ নি

"এই কার্যসূচী আমাদের প্রত্যেকের জন্য, আমাদের দেশের স্বার্থে, যে দেশ আমাদের নিজেদের এবং যে দেশকে সমৃদ্ধ মহান করতে হবে, সেবা করতে হবে, ভক্ত করতে হবে।"

—প্রধান মন্ত্রী
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

স্বাধীনতার ৩৬তম বর্ষ—নবম এশিয়াড ক্রীড়ানুষ্ঠানের বর্ষ।

dawp 82/208

রাজনীতি ও শ্রেয়োনীতি

সুবোধ মজুমদার (৪)

সমসাময়িক বিশ্বের অধিকাংশে মারাত্মক সমস্যার মূল উৎস হচ্ছে রাজনীতি ও শ্রেয়োনীতির দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র রূপে প্রকট হয়। হঠাৎ দেখলে মনে হয় না সমস্যাগুলির মূলে কোনো দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধরা যাক পারমাণবিক অস্ত্রের কথা। কয়েকটি দেশের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র আছে। এরা নিজেদের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে এরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে তাই সভ্যতা-লোকিত মানুষ আত্মধ্বংসের সম্মুখীন। বিপদ আরও বাড়ছে, কারণ সকল দেশই চাইছে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে। এই আত্মহনন থেকে মানব সমাজ রক্ষা পেতে পারে একটি মাত্র পথে। সে-পথটি হচ্ছে সমাজ-বিধ্বংসী অস্ত্র বর্জন। বিশ্বের জননায়করা এই পথের কথা জানেন। কিন্তু তাঁরা সবাই প্রায় জড়বাদী জীবনদর্শন দ্বারা পরিচালিত। অতএব তাঁদের পক্ষে একান্ত হয়ে এই সার্বজনীন কল্যাণের পথ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দ্বন্দ্বের রূপটি হচ্ছে এই :—

১) শ্রেয়োনীতি হচ্ছে আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার চোখে সকল দেশের, সকল বর্ণের, সকল বংশের, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সমান। শ্রেয়োনীতিকরা সকল মানুষকে সমানভাবে দেখে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হতে পারে।

২) রাজনীতি হচ্ছে জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তার চোখে সকল মানুষ সমান নয়। নিজের দেশের নিজের দলের, সর্বোপরি নিজের উপদলের মানুষ তার কাছে অপরাপর মানুষের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। রাজনীতিকরা তাই সকল মানুষকে সমানভাবে দেখে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে পারে না।

৩) শ্রেয়োনীতির প্রেরণাশক্তি হচ্ছে মানবিক ঐক্য আর সমন্বয়বাদ। রাজনীতির প্রেরণাশক্তি মানবিক বিভেদ আর দ্বন্দ্ববাদ।

ফলে আধুনিক দুনিয়ার কোনো সরকার অপর সরকারকে বিশ্বাস করতে পারছে না। পারমাণবিক অস্ত্রাদি পরিহার করতেও পারছে না কেউ। এখন তারা চাইছে অন্য কোনো নতুন দেশ যেন পারমাণবিক শক্তির অধিকারী না হতে পারে। এতে ক'রে মুষ্টিমেয় কয়েকটা দেশ অন্যান্য দেশগুলোকে শোষণ করতে পারবে। এখন পর্যন্ত তারা তাই করছে। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যেও যে রয়েছে দ্বন্দ্ব।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র ছেড়ে, সকল দেশ ও সমাজের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও চলেছে রাজনীতি ও শ্রেয়োনীতির দ্বন্দ্ব। রাজনীতি চায় বলপ্রয়োগ লোককে পদাধিকার দিতে, আর শ্রেয়োনীতি চায় যোগ্য লোককে পদাধিকার দিতে। ফলে প্রশাসন ক্ষেত্রে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিচার ক্ষেত্রে, আইন-প্রণয়ন ক্ষেত্রে দেখা দেয় একটা অদৃশ্য অন্তঃপ্রবাহী অরাজকতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তঃপ্রবাহী অরাজকতার মূলে রয়েছে ইউরোপীয়-আফ্রিকীয় বা শাদা-কালোর

দ্বন্দ্ব। আমরা আমাদের চারদিকে দেখতে পাই ধর্মীয় দ্বন্দ্ব, বংশীয় দ্বন্দ্ব, ভাষাগত দ্বন্দ্ব, দলীয় দ্বন্দ্ব, আরও কত কী। এসব দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে মানুষ খোঁজে জৈবিক ও নৈতিক নিরাপত্তা। সবাই চায় জীবন ও সম্ভ্রমকে নিরাপদ রাখতে, তারই ফলে শুরু হয় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংগে দ্বন্দ্ব।

রাজনীতির চরম নিয়ন্তা হচ্ছে ব্যক্তি-ভাবনা, আর শ্রেয়োনীতির চরম নিয়ন্তা হচ্ছে সমাজ-ভাবনা। রাজনীতিকের বিচারে ব্যক্তি-ভাবনাই জয়ী হয়। অপর পক্ষে, শ্রেয়োনীতিকের বিচারে জয়ী হয় সমাজ-ভাবনা। ১৯১৪-১৮-তে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন ছিলেন আগে শ্রেয়োনীতিক, পরে রাজনীতিক। তাই আমেরিকার রাজনীতিকরা পছন্দ করেন নি তাঁকে। শ্রেয়োনীতিক তাঁর বাক্য ও কর্মের মধ্যে সংগতি রক্ষা করেন, তাই শ্রেয়োনীতিক উইলসন চেয়েছিলেন তাঁর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ও গণতন্ত্রের বাণীকে কার্যে রূপায়িত করতে। কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশের নেতারা ছিলেন আগে রাজনীতিক, পরে শ্রেয়োনীতিক। তাঁদের কাছে স্বদেশের স্বার্থ বড় ছিল বিশ্বের স্বার্থের চেয়ে, এবং স্বশ্রেণীর স্বার্থ বড় ছিল স্বদেশের স্বার্থের চেয়ে। অতএব তাঁরা বাধা দিয়েছিলেন উইলসনের শ্রেয়োনীতিক কর্মধারাকে।

১৯২০—৩০ সনে বিশ্ব কম্যুনিষ্ট সংস্থার প্রথম যুগে লেনিন ছিলেন আগে শ্রেয়োনীতিক, পরে রাজনীতিক। তাই তিনি চেয়েছিলেন সকল স্বাধীন ও পরাধীন দেশে সমভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টি স্থাপন করতে। কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের কম্যুনিষ্ট নেতারা আগে ছিলেন রাজনীতিক, পরে ছিলেন শ্রেয়োনীতিক। তাই তাঁরা চাননি পরাধীন দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টি স্থাপন করতে। তাঁদের ভয় ছিল পরাধীন দেশের শ্রমিকদের শোষণ করতে না পারলে তাঁদের নিজেদের দেশের শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত যে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির অধীন ছিল, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি যে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহযোগিতা করেছিল, এবং সীমান্ত প্রদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি (কীর্তি পার্টি) স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য যে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তারও মূল রহস্য এখানে।

এমতাবস্থায় মনুষ্যজাতিকে আত্মহনন থেকে রক্ষা করতে হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকদের আগে শ্রেয়োনীতিক হতে হবে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশকে মূল্যস্ফীতি, মূল্যহ্রাসীতি, দুর্নীতি, খুনোখুনি থেকে রক্ষা করতে হলে জাতীয় রাজনীতিকদের আগে শ্রেয়োনীতিক হতে হবে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে মানুষকে কর্মে ও বাক্যে এক হতে হবে। সকল মানুষের পক্ষে যেটা ভাল তা বলতেও হবে করতেও হবে, আমাদের জীবনদর্শন আদর্শবাদী হলেই শুধু আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারে।

আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতির স্বরূপটি কী? তার আগে দেখা দরকার জড়বাদী শ্রেয়োনীতির স্বরূপ কী?

জড়বাদীরা জানেন যে, শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে নিজের ব্যক্তিগত সুখ বাড়ানো যায় বটে, কিন্তু খানিকটা বাড়িয়ে আর বাড়ানো যায় না; তখন দরকার হয় অপরকে শোষণ করা। তাই তাঁরা রাজনীতিতে যোগ দেন বহুকে শোষণ করে মুষ্টিমেয়ের ইন্দ্রিয়সুখ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। রাজনীতির

কারবার হচ্ছে সমাজ নিয়ে, আর শ্রেয়োনীতি না থাকলে সমাজে-জীবন যাপন করা যায় না। অতএব জড়বাদীরাও একটা শ্রেয়োনীতিক বন্ধন স্থাপন করতে বাধ্য হয়। তাদের শ্রেয়োনীতির চরম লক্ষ্য হয় ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখ বৃদ্ধি। কিন্তু জড়বাদীদের মধ্যে যাঁরা যুক্তিশীল তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, শ্রেয়োনীতির চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখ হলে তা দিয়ে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। তখন তাঁরা বললেন শ্রেয়োনীতির চরম লক্ষ্য সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়সুখ নয়। কিন্তু সর্বজন-চেতনা যে উদ্ভূত হয় কল্পনা থেকে, ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে নয়। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখের কামনা নিয়ে সর্বজনের ইন্দ্রিয়সুখ কামনা করা যায় না, উভয়ের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব বাধে।

এই ব্যক্তি ভাবনা ও সমাজ ভাবনার দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নেয় আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতি, যার পরম লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দ। দেহের সুখ, বুদ্ধির সুখ, আত্মার সুখ এই তিন প্রকার সুখের সমন্বয় থেকে উদ্ভূত হয় আনন্দ। ব্যক্তি সমাজের সংগে, ব্যষ্টি সমষ্টির সংগে, জীবাত্মা পরমাত্মার সংগে যখন ঐক্য উপলব্ধি করে তখনই সে আনন্দের আস্বাদ পায়। ব্যষ্টি সমষ্টি ঐক্যবোধ থেকে বিচ্যুত হলেই মানুষ নিমজ্জিত হয় দুঃখে। তখন কোনো ইন্দ্রিয়সুখই আর তাকে উদ্ধার করতে পারে না সে-দুঃখ থেকে।

আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতি বলে মানুষের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দলাভ। ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হবে, পরিবার সমাজের সংগে একাত্ম হবে, খণ্ড সমাজ অখণ্ড সমাজের সংগে একাত্ম হবে, তবেই মানুষ লাভ করবে অখণ্ড আনন্দ এবং জীবনের পূর্ণ সার্থকতা। আধুনিক বিজ্ঞান যখন এগিয়ে যাচ্ছে এই অখণ্ড আনন্দের দিকে তখন জড়বাদী জীবনদর্শন তাকে পেছন পানে টানছে এবং তার আবিষ্কারকে হানাহানির কাজে ব্যবহার করছে। আদর্শবাদ যখন বলছে সামাই হচ্ছে পরম সত্য, জড়বাদ বলছে বিভেদই হচ্ছে পরম সত্য। জড়বাদের মতে সমাজে শ্রেণীবিভেদ থাকবেই এবং শ্রেণী শোষণ আর শ্রেণী সংগ্রাম থাকবেই। অতএব অসম বণ্টন এবং বেতন বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, সামাজিক বিপন্নতা, জীবনের অনিশ্চয়তা প্রভৃতিও থাকবেই। এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

এমতাবস্থায় জড়বাদীরা দৃশ্যমান প্রাকৃতিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে অদৃষ্টবাদী হয়ে যায়। কিন্তু আদর্শবাদীরা মনে করেন দৃশ্যমান এই দ্বন্দ্বময় প্রকৃতির মূলে রয়েছে এক অতিপ্রাকৃতিক শক্তি, যার লক্ষ্য হচ্ছে সমন্বয় ও সাম্য, আর শ্রেয়োনীতিকদের কর্তব্য হচ্ছে সেই সমন্বয় ও সাম্যকে সমাজ জীবনে রূপায়িত করা।

স্বাধীনোত্তর ভারতে উন্নয়নের সাফল্য

—বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে স্বাধীনতা অর্জনের শুভ মুহূর্ত থেকে ভারত তার সামগ্রিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় গতিশীল। অদ্যাবধি সে গতি অব্যাহত। ফলে স্বাধীনোত্তর ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গুলির মাধ্যমে প্রায় সর্ব্ব ক্ষেত্রেই বিপুল অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয়রা ছাড়া বিদেশীরা এমনকি সমালোচকরাও ভারতের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় ভারতের কৃষি, শিল্প ও বহি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি বিশ্বের বিস্ময় জাগিয়েছে বলে অনেকেই সোচ্চার। যে ভারত ভারত স্বাধীন হওয়ার পাঁচ বছর পরেও বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার খাদ্য আমদানি করতে বাধ্য হতো, সে ভারত খাদ্যে স্বয়ম্ভর কংগ্রেসী শাসনের দূরদৃষ্টি ও সময়োচিত কর্ম প্রচেষ্টার ফলে এ সাফল্য একটা বিরাট সাফল্য, যার জন্য দেশবাসী প্রত্যেকটি নর-নারী গর্ব্ব অনুভব করতে পারে।

ভারত কৃষি প্রধান দেশ, কাজেই কৃষির উন্নতিতে ভারতের বৈষয়িক উন্নতিও সম্ভব হয়েছে ওতপ্রোতভাবে। বহু শিল্পের কাঁচা মাল কৃষি ক্ষেত্র থেকেই এখানে আহরণ করা হয়। কৃষিনির্ভর শিল্পগুলিও উন্নতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসরমান। যন্ত্র শিল্পে, রাসায়নিক শিল্পে, যন্ত্রাংশ নির্মাণের ক্ষেত্রেও ভারত পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে অনেক বেশী স্বনির্ভর। পরাধীন যুগে ভারত থেকে বিভিন্ন কাঁচা মাল নামমাত্র মূল্যে বিদেশের বাজারে রপ্তানী হতো এবং ঐসব কাঁচা মাল থেকে বিদেশে উৎপন্ন ব্যবহার্য্য পণ্য পাকা মাল (finished goods) হিসাবে এদেশে চড়া দরে আমদানি হতো।

স্বাধীনোত্তর ভারতে তার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে কংগ্রেস সরকারের আমদানি-রপ্তানী নীতির আনুকূল্যে, যা প্রকৃতই প্রশংসার দাবী রাখে। শিল্পে বর্ত্তমান ভারত প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে বিগত দশ-বার বছরের মধ্যে। ভারী যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক বিরাট কলকব্জা, খনিজ উত্তোলনের আধুনিক সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি ভারতেই প্রস্তুত হয় এখন যা পৃথিবীর যে কোনও দেশের নির্দ্ধারিত মান অনুযায়ী আদর্শস্থানীয়।

স্বাধীন ভারতেই সর্বপ্রথম জাহাজ নির্মাণ সম্ভব হয়, রেল ইঞ্জিন বাষ্প চালিত ও বৈদ্যুতিক উভয়বিধই তৈরী হয়, যুদ্ধাস্ত্র—রকেট-স্যাটিলাইট বহি ক্ষেপণাস্ত্র—ফ্রিগেট—যুদ্ধ জাহাজ সর্ববিধ—পারমাণবিক যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, এ্যাটমিক রিএক্টার প্রভৃতি তৈরী হয়, অটোমোবাইল কার ট্রাক্ ক্রেন—বৃহৎ জেনারেটার—অতিবৃহৎ টারবাইন্ ট্যাঙ্ক, ট্রাক্টার—সাঁজোয়া গাড়ী—ডেপথ্ চার্জ্জ (Depth charge) সাবমেরিন, বোমারু বিমান - বিমান বাহী জলযান—দেশরক্ষার জন্য বিভিন্ন আধুনিক মারণাস্ত্র—বিমান বিধ্বংসী কামান অটোম্যাটিক রাইফেল—লাইট মেসিন গান ব্রেন্ ষ্টেন গান-টমি গান—ডেষ্ট্রয়ার প্রভৃতি বহুবিধ অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়। এই সব উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় ভারত অগ্রগামী দেশগুলির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে যার জন্য ভারতবাসীরা গর্ববোধ করতে পারে নিঃসংশয়ে।

সাম্প্রতিক কানকুন্ সম্মেলনে ভারত উক্ত উন্নতির জন্য প্রশংসা লাভ করেছে সারা বিশ্বের দরবারে এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্বের

"স্বাধীনতার অঙ্গীকার"

স্বাধীনতার পর আমরা ৩৫ বছর পেরিয়ে এসেছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকি অর্জিত হয়েছে?

অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বিস্তৃত হয়েছে। দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হয়েছে। ধনী হয়েছে আরো ধনী।

সংসদীয় গণতন্ত্রের বিপদ বেড়েই চলেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা মাথাচাড়া দিচ্ছে।

জাতীয় সংহতিই আজ বিপন্ন।

শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে, কায়েমী স্বার্থ ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও চেতনার প্রসারই স্বাধীনতার শপথ।

ক্ষমতার ভারসাম্যকে নিপীড়িত মানুষের অনুকূলে আনাই আজকের অঙ্গীকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই, সি, এ—৭০০১/৮২

ঘোষণা

আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর '৮২

বিপ্লবী বাংলা'র ২৬ তম জন্মদিবস। এই উপলক্ষে মূল্যবান রচনাদি সহ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। দীর্ঘদিনের এই পত্রিকাটি সম্পর্কে পাঠক ও গ্রাহকবৃন্দের মতামত জানতে আমরা আগ্রহী। জাতীয়তাবাদী তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্য পাঠালে সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হবে। 'বিপ্লবী বাংলা'র এগিয়ে চলার পথে সকলের সহযোগিতা একান্ত কামা।

প্র-বি-বা

অধিকারী বলে বিবেচিত হয়েছেন। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতই শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে বলে বহু বিদেশী কূটনীতি বিশারদরা মনে করে। স্বাধীনোত্তর ভারতে পরাধীন যুগের বহু মারাত্মক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে, কিন্তু স্বাধীন ভারতে অত্যধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বহু নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে বেকারী গুরুতর বলে ধরা হয়, এছাড়া আর এক কঠিন সমস্যা দেখা যায়, তা হচ্ছে দূষিত জল, বাতাস ও সমগ্র পরিবেশ। এর কারণ মূলত: শিল্পের প্রসার, ডিজেল চালিত গাড়ী ও ইঞ্জিনের আধিক্য এবং বৃক্ষ সংহার, কারণ বা অকারণে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি বোধহয় সব কয়টি গভীর সমস্যার মূলে, যার সমাধান সরকারের চেয়ে জনগণের পক্ষেই বাস্তবে সম্ভব। সরকার জনসংখ্যা সীমিতকরণে বহু উদ্যোগ নিয়েছে, জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া তা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভবপর নয়, অথচ জনগণের একটা বিরাট অংশ এ ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য অংশ নিচ্ছে না। স্বাধীনোত্তর ভারতে যেটুকু উন্নতি সম্ভব হয়েছে তার মূলে কংগ্রেসের অবদান সর্ব্বাধিক, ভারতের অগ্রগতির জন্য ইন্দিরাজীর অবদান অনস্বীকার্য্য।

বহু শহীদের রক্তে রাঙা ভারত বিরাট ত্যাগ তিতিক্ষা ও ধৈর্য্যের বলে তার স্বাধীনতা অর্জন করে। যে স্বাধীনতাকে যারা শুভ মুহূর্তেই বুটা আখ্যায় ভূষিত করে আত্মপ্রাঘা অনুভব করেছিল, তারাও ভারত সন্তান, তবে তারা কমিউনিষ্ট, কাজেই তারা সব কিছুই একটু দেরীতে বুঝতে পারে। এখন সেই কমিউনিষ্টরাই ভারতকে স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে ও পূর্বের ভুল চিন্তাকে ভুল বলে অভিহিত করে। তারা কিন্তু ভারতের এই উল্লেখযোগ্য বিরাট বৈষয়িক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীক অগ্রগতিকে এখনো স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করে, যেহেতু কংগ্রেসের শক্তিতেই দেশ স্বাধীন হয়েছে ও কংগ্রেস শাসনেই দেশের অগ্রগতি ও সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে।

স্বাধীনতা দিবসের স্বরণোৎসবে উক্ত কমিউনিষ্টরা প্রায়শই যোগ দেয় না, তবে যে সব অঙ্গরাজ্যে ওরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সে সব রাজ্যে ওরা নমঃ নমঃ করে ঐ বিশেষ দিনটি পালন করে অত্যন্ত বাধিত হৃদয়ে, ইতিপূর্ব্বে বুটা বলার কারণেই বোধ হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী বন্ধুরা বিশেষ শ্রদ্ধা নিষ্ঠার সঙ্গে আগামী ছত্রিশতম স্বাধীনতা দিবসটি ১৫ই আগস্ট পালন করবেন। তাঁদের বিরাট অবদান আছে এদেশের স্বাধীনতা অর্জনে, তাই তাঁরা উক্ত বিশেষ দিনটিকে মর্য্যাদা সহকারে ও সাড়ম্বরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে পালন করেন প্রতি বছরই। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। ভারতের অধিবাসী মাত্রেই পুলকিত চিত্তে স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রীয় পতাকাকে অভিবাদন করবে, যদি দেশপ্রেম বা দেশভক্তি তাদের ন্যূনতম থাকে, ভারতের জয়গানে আগামী ১৫ই আগস্ট আকাশ-বাতাস মুখরিত হবেই। বিশ্বাস রাখবো যে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবেই।

— —

Regd No. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষান্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩৫ পয়সা

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

(সম্পাদক —)

শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী

শ্রীকার্তু[illegible]

শ্রীপ্র[illegible]চার্জী

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী বাংলা

পড়ুন

ও

পড়ান

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—২·০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—২·০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০, ৪। গেরিলা সংগ্রাম কাহিনী—১·০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১·২৫, ৬। কলকাতা বোমার সংগ্রাম কাহিনী—·৫০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—·০
৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—·৫০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬০
বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০, ১১ মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—·৫০
ভারতের রক্তাক্ষর ও চট্টগ্রাম বিপ্লবচেষ্টা—·৭৫,
ডোসেনি (১)—১·০০, ১৪। দেশ যাদের ডোসেনি (২)—২·০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—·৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১·০০, ১৭। হাসিম হত্যা প্রচেষ্টা—·৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

সৈলজা—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

একাদশ বর্ষ	শনিবার ৪ঠা ভাদ্র ১৩৮৯ ২১শে আগষ্ট ১৯৮২	৪৬ সংখ্যা

দুইটি জিনিষ হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

(সম্পাদক —)

শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী

শ্রীকালীপদ সরকার

শ্রীপুষ্প চাটার্জী

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী বাংলা

পড়ুন

ও

পড়ান

বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতি

সপ্তষষ্ঠিতম স্মারক দিবস

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ ঐতিহাসিক বালেশ্বর চাষখণ্ড প্রান্তরে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে মহান্ বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বীর বিপ্লবীচতুষ্টয়ের আত্ম-নিবেদনের সপ্তষষ্ঠিতম পবিত্র স্মারক দিবস উদ্‌যাপিত হইবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সকাল ৯ ঘটিকায় কলিকাতায় আজাদ হিন্দ্ বাগে যতীন্দ্রনাথের মর্মর মূর্তির সম্মুখে। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন প্রখ্যাত বর্ষীয়ান বিপ্লবী নায়ক শ্রীভবেশ চন্দ্র নন্দী।

আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

নিবেদক

শ্রী পঞ্চানন চক্রবর্তী

১৫ আগষ্ট ১৯৮২

৪ বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

বিঃ দ্রঃ—১০ সেপ্টেম্বর বালেশ্বর অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য রক্ততীর্থ যাত্রিগণ ৯ সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকায় হাওড়া হইতে যাত্রা করিবেন। যাতায়াতের ভাড়া ত্রিশ টাকা মাত্র।

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

সম্পাদকীয়

দেশবাসী আসাম সমস্যার অবসান এখনই চায়

আসামে একদল বিচ্ছিন্নতাকামী আজ দীর্ঘ দুই বৎসর যাবৎ যে সব কাজ কর্ম করে আসছে, সেটা দেশদ্রোহিতা ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থপ্রণোদিত। আসামে দীর্ঘকাল ধরে একটা বাঙ্গাল-খেদা আন্দোলন চলে আসছে। এবারকার আন্দোলনের মূলেও এই দুষ্ট মানসিকতা কাজ করছে। তাদের কার্য্যকলাপের ফলে যে আসামের প্রকৃতস্বার্থ ও সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থও বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, এই চেতনা ও বোধ তাদের নেই। তাদের এই সর্বনাশা অপপ্রচেষ্টার সঙ্গে সফলভাবে মোকাবিলা না করতে পারলে যে সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। হয়ত দেশী বিদেশী কায়েমী স্বার্থ এতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। কিন্তু আরও সময় যেতে দিলে পরিস্থিতিটা যে আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে, সে সম্ভাবনাও আছে।

অনেক আলোচনা এদের সঙ্গে হয়েছে। বিদেশী বলতে এরা বাঙ্গালীদেরই মনে করে, এটাই সত্য। দেশবিভাগের পর তৎকালীন বহু পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দু সর্বস্বান্ত হয়ে আসামের পতিত জমি উদ্ধার করে নিজেদের পুনর্বাসিত করেছেন, এটাত তাদের কোন অপরাধ নয়। আসামের জমিতে বঞ্চিত পরিমাণে ফসল ফলিয়েছে, ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছে। তার সুফল ত তারা একাই ভোগ করেনি। আসামবাসী অসমীয়া, উদ্বাস্তু হিন্দুরা সকলেই ভোগ করেছে। তবে কেন তাদের প্রতি এই অমানবিক ব্যবহার? কেন তাদের আবার বাস্তুহারা করার এই নিন্দনীয় মনোভাব? কেন বহু সম্ভাবনা পূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ আসামকে আরো কঠোর পরিশ্রম করে, পুরাতন ও নবাগত বসবাস-কারীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, আসামকে একটা সমৃদ্ধিশালী অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার কাজে আত্ম-নিয়োগ করছেনা আসামের এই বিপথগামী যুবকের দল? তারা যদি শ্রমবিমুখ, আলস্যপরায়ণ হয়, তবে সে দোষ তাদেরই। আসাম কর্তৃপক্ষ বরাবর পূর্ববঙ্গ থেকে লোক ডেকে, নিয়ে এসে চাষবাসের কাজ করিয়েছে। অন্যের পরিশ্রমলব্ধ ধনেই ত তারা বেঁচে থেকেছে। আসামে প্রাকৃতিক তেলও অন্যান্য খনিজ সম্পদের যে বিরাট ভাণ্ডার আছে তার সদ্ব্যবহার করে, আসামকে, তথা সমগ্র ভারতকে সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ না করে যাযাবর করাটাই একমাত্র কর্তব্য বলে গণ্য করতে হবে? সে কাজে যারা বাধা করবে, তারা ত দেশের শত্রু। কাজেই বিনা দ্বিধায় দেশদ্রোহীদের যে দণ্ড প্রাপ্য, তাদের তাই দিতে হবে। অন্যথায় দেশের অন্যত্র প্রাদেশিকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দেবেই। দেশবিভাগ জনিত ছিন্নমূল নরনারীদের পুনর্বাসন দিতে ভারত সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের পক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি খেলাপ করা সম্ভব নয়।

উদ্বাস্তুদের বোঝা একা আসাম বহন করবে কেন, এমন একটা অদ্ভুত যুক্তি এই আন্দোলনকারীরা তুলেছে। ভারতরাষ্ট্রটা এক এবং অভিন্ন। যে কোন প্রদেশে যে কোন প্রদেশবাসী বসবাস করার

সংবিধান সম্মত অধিকার আছে। উদ্বাস্তুদের ও বিশেষ দাবীই আছে। এজন্য যদি আসামের উপর অসহনীয় আর্থিক চাপ পড়ে, তবে সেজন্য অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিশেষ অনুদান দাবী করতে পারে এবং সে দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের মেনে নেওয়াও অবশ্যই কর্তব্য।

এর মূলে আছে সঞ্চিত বাঙ্গালী বিদ্বেষ। আর থাকতে পারে বিদেশী শত্রুদের নিকট থেকে নগদ পাওনা। আসল আর একটি কারণ আছে এর মূলে বলে অনেকেই মনে করেন। এ সকল চাকুরী প্রত্যাশী যুবকেরা এই পথে আখের গুছিয়ে নিতে চায়। অবশ্য যোগ্যতার নিরিখে একজন অসমীয়া প্রার্থীকে গ্রহণ করা হয়নি, এমন অভিযোগ ত শোনা যায়নি। যাহোক, এই মানসিকতা নিয়ে যারা কাজ করছে, তাদের আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ হবেনা।

ভারতের শান্তিপূর্ণ নীতি, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধানের নীতিকে এই হুল্লোড়বাজরা দুর্বলতা বলে মনে করছে। চাপ দিলে ভারত সরকার তাদের কাছে নতিস্বীকার করবে। এটাই এদের দুরাশা। তাদের এই দুরাশা তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া দরকার।

ভারত সরকার বিরোধী দলগুলির সঙ্গে এ নিয়ে পরামর্শ করতে চেয়েছিলেন। তারা অনুপস্থিত। এটাই এদেশের বিরোধীদলগুলির নীতি। গঠনমূলক সমালোচনা এদের ধাতে নেই। জাতীয় স্বার্থের চেয়ে দলগত স্বার্থই এদের নিকট অগ্রগণ্য। ভোটযুদ্ধে অসমীয়া এই যুবকদের সমর্থন হারাবার ভয়ে এরা দেশের সর্বনাশে আসন্ন দেখেও লুকোচুরি খেলছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ত এই সমস্যা অনাদি অনন্তকাল জীইয়ে রাখতে দিতে পারেন না। তাদের যথাকর্তব্য পালন করতেই হবে, অন্যথায় তারা অযোগ্য প্রশাসক বলে কুখ্যাত হবেন।

সন্ধিক্ষণ আজ উপস্থিত। সময় অপহরণ করা অত্যন্ত অসঙ্গত হবে। উৎখাত করতে দেওয়া হবে না, এই শেষ কথা আগামী ২৫শে আগষ্টের সভায় দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিতে হবে। ভারতের সঙ্গে যদি কোন ক্ষুদ্র দল বা গোষ্ঠী শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চায় দাঙ্গাহাঙ্গামা করে, লুটপাট করে, নিরীহ মানুষদের জীবনহানি করে, তবে তার যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে হবে। অন্যথায় দেশে ও বিদেশে ভারত রাষ্ট্রের সম্মান ক্ষুণ্ন হবে। আসামের দুএকটি বালখিল্যের দল স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বয়কট করার যে চেষ্টা করছে, তার দ্বারা তারা প্রমাণিত করেছে যে তারা দেশের শত্রু। আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে বহু রক্ত ও জীবন বলিদান করে। তাই এই দিনটি আমরা পালন করি আনন্দের সঙ্গে, গর্বের সঙ্গে। এই দেশে বসবাস করে যারা বন্ধ উন্মাদের মত আচরণ করে এই দিনে, তাদের কোন ক্ষমা থাকতে পারেনা। সুতরাং দেশবাসী আসাম সমস্যার সমাধান চায় এখনই। আমরা বিশ্বাস করি আসামে বিবেকবান, দেশপ্রেমিক মানুষ আছেন বহু সংখ্যায়। এদের হিংস্রতার দরুণ, তারা নীরব থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। সরকার কঠোর হলে তাঁরা ভারতের ঐক্য ও সংহতি-বিনষ্টকারী এই আন্দোলনকে কখনই সমর্থন করবেন না বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই আসামের সঙ্কট মোচন করতে আর একটি দিনও দেরী করা উচিৎ হবে না গোটা জাতির স্বার্থে।

সংবাদ বিচিত্রা

ধনঞ্জয় বৈরাগী

॥ যার বিয়ে তার মনে নেই
পাড়াপড়শীর ঘুম নেই ॥

'ইন্দিরা গান্ধী নিজেকে ক্ষমতায় বহাল রাখার ফিকির খুঁজছেন'—লিখেছেন সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার (আঃ বাঃ ৬।৮।৮২)। শ্রী নায়ার আগামী ম্যাগসাসে পুরস্কার লাভের জন্য মনে হচ্ছে উঠে পড়ে লেগেছেন। শ্রীমতী গান্ধী তো ক্ষমতাতেই বহাল আছেন। অদূর ভবিষ্যতে তার কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। ইন্দিরা বিরোধীরাও স্বীকার করেন, বর্তমানে ইন্দিরা-নেতৃত্বের বিকল্প নেই। আসলে কারো বিরুদ্ধে যখন বলার কিছু থাকে না, তখন মনগড়া কিছু লিখতে হয়। নইলে চাকরি বা থাকে কি করে আর কাগজের পাতাই বা পুরে কি ভাবে। এর নাম স্বাধীন সাংবাদিকতা!

•

॥ কাণা মেঘের বৃষ্টি, ক্ষেত বুঝে দৃষ্টি ॥

সি পি এম সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রদূত জনাব ফৈজল আহমদকে আপ্যায়নে তুষ্ট করে তাঁর হাতে এক লক্ষ টাকার একখানি চেক উপহার দিয়েছেন। পি. এল. ও-র প্রতি সি পি এম লাল সেলাম দিয়ে জনাব ফৈজলকে সম্বর্ধনাও জানিয়েছেন। তাঁকে আরো সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও জানানো হয়েছে। (অমৃত বাজার ১১।৮।৮২) কাজটা ভালই হয়েছে। তবে লেবাননে অবরুদ্ধ পি. এল. ও গেরিলাদের উদ্ধারের জন্য সি, পি, এম কিছু লড়াকু ক্যাডার পাঠাবেন কিনা জানা যায় নি।

হায়রে বাঙালী বাস্তুহারা, তোমরা একবার নয়ন তুলে চেয়ে দেখ, সি, পি, এম-এর অন্তরে কত করুণা ধরা আছে। আর চেয়ে দেখ দূর থেকে মরিচঝাঁপির অভিশপ্ত লাঞ্ছিত উদ্বাস্তুগণ, সি, পি, এম-এর উদ্বাস্তু-দরদ। আর পার তো ভুলে যেও, কাদের মিথ্যা আশ্বাসে ভর করে তোমরা দণ্ডক ছেড়ে এসেছিলে পুনর্বাসন নিতে সুন্দরবনে এবং শেষে কারা তোমাদের কুঁড়ে ঘরে আগুন দিয়ে, মেরে ধরে জলে ডুবিয়ে তাড়াতে পুলিস লেলিয়ে দিয়েছিল।

॥ আমার নাম রণরঘু, ভিটাতে চরাই ঘুঘু ॥

পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ পরীক্ষা ফলের বিচারে এই রাজ্যে শীর্ষস্থানে। এক দুর্গম জঙ্গল ভূমি সাফাই করে মিশনের সন্ন্যাসীরা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের আনুকূল্যে গড়ে তুলেছিলেন এই শিক্ষায়তন। শান্ত আশ্রমিক পরিবেশে জীবন গঠন ও বিদ্যালাভের অপূর্ব এই সুন্দর কেন্দ্রে সম্প্রতি রণরঘুরা ঢুকে পড়েছে। ফেস্টুন, শ্লোগান, মিছিল ও দাপাদাপির দ্বারা বিদ্যাপীঠের শান্তি ও পবিত্রতা ধ্বংস করতে এরা উদ্যত। বিদ্যাপীঠে ছাত্র সংখ্যা সাড়ে ছয় শত। এদের মধ্যে ভিন রাজ্যবাসী ছাত্রও আছে। তাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন!

বিদ্যাপীঠের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দলীয় রাজনীতিতে দীক্ষা দিয়ে রণরঘুরা এই ধ্বংসের কাজে নেমেছে। এখানকার আশ্রমিক পরিবেশ, পঠন-পাঠনের রীতিনীতি, শিক্ষক-ছাত্রের আত্মিক সম্পর্ক এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা—আজ লাল

খাওয়ার জয়ধ্বনির তলে বিলীন হতে বসেছে। (আ: বা: ৬। ৮। ৮২ প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে)

।। দক্ষরাগাজির কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়ে না ।।

বি. জে. পি-র রাজনীতি একটা. যে কোন ভাবে পার হটাও ইন্দিরা কুৎসা। এ যেন সেই দক্ষরাগাজির কুড়ুল, নড়ে চড়ে পড়ে না। বি. জে. পি-র মুখপত্র সাপ্তাহিক অর্গানাইজার পত্রিকা (৮। ৮। ৮২) লিখেছে সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পুত্র রাজীবকে উত্তরাধিকারী রূপে প্রধানমন্ত্রিত্বের গদিতে বসানোর ব্যবস্থাটা পাকা করে আনা। ভাবটা এমন যেন যুক্তরাষ্ট্রের ঘাস অছিগিরিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন। প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন মস্কো সফরে তাঁর সঙ্গে রাজীব গেলেও আবার ঐ কথাই হয়ত বলা হবে। এ ধরণের গুজব পরিবেশনের চেয়ে গ্লানিকর জাতীয় অবমাননা আর কি হতে পারে? অথচ এরাই আবার অবাধে সাংবাদিকতার ধ্বজাধারী!

* *

কতকাল আর রইবে বসে
লক্ষ্মণের মত ফল ধরে হাতে? ।।

প্রশ্নটি পশ্চিম বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস (ই) কর্তাদের প্রতি। রাজ্যে একটার পর একটা কং (ই) কর্মী ও সমর্থক খুন হচ্ছেন। প্রতিকারহীন এই অবস্থা চলছে গত পাঁচ বছর ধরে। কি করেছেন প্রদেশ কং (ই) নেতারা তার প্রতিরোধে? একটা সম্মেলন ডেকে রাজ্যের কংগ্রেস সমর্থকদের কাছে কি কিছু বলেছেন, না তাদের পরামর্শ ও সমর্থন চেয়েছেন?

গত ১১ই আগষ্ট বর্ধমান জেলার দেওয়ানচকে খুন হয়েছেন প্রাক্তন কং এম. এল. এ কালীনাথ ভা তার দিন দুই আগে খুন হয়েছেন নদীয়া জেলা যুব কং (ই) সাধারণ সম্পাদক স্বপন বসু। এই ভাবে বেছে বেছে সাহসী এবং কর্মঠ কংগ্রেস কর্মীদের খুন করে দলের অনুগামীদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি হল এই সব খুনের লক্ষ্য। অভিযোগ, হত্যাকারীরা সি, পি, এম। অভিযোগের সত্যমিথ্যা যাচাই হয় আদালতে। যেখানে খুনী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারই হয় না, সেখানে আদালতের কথা ভাবা অবান্তর নয় কি? তাই খুনীরা ধরাও পড়ে না, তাদের বৈধভাবে চেনাও শক্ত।

খুনের প্রতিবাদ জানানো হয় বনধ ডেকে, শোক মিছিল করে এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে। কিন্তু তাতে কিছু ফল হয়েছে কি? যে রাজনৈতিক দলের নেতারা দলের কর্মী ও সমর্থকদের জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ, তাঁরা কোন নৈতিক অধিকারে দলের নেতা হয়ে প্রদেশ অফিসে বসেন? এই সব নেতাদের দ্বারা দল চালানোও যায় না। কতকাল এঁরা লক্ষ্মণের ফলধরা হয়ে রাজা নেতৃত্বে থাকতে চান?

কংগ্রেস (ই) সমর্থক রাজ্যবাসী প্রদেশ নেতাদের কাছে আজ একটি অনুরোধই শুধু করে, হয় তাঁরা দিল্লির কং (ই) বড় কর্তাদের কাছ থেকে একমাসের মধ্যে খুনের রাজনীতি বন্ধ করার উপযুক্ত প্রতিশ্রুতি আনুন, নতুবা প্রদেশ ও জেলা কং (ই) কমিটিগুলির সকল সদস্য একযোগে প্রতিবাদে পদত্যাগ করুন।

॥ খবরের নামে ঢুঢ় পাতাভরা বিজ্ঞাপন
দিনে দিনে বাড়ে দাম, নেশায় ছুটে তবু মন ॥

বিহারের যে প্রেস বিল নিয়ে এত হৈ চৈ তা হল—ভারতীয় দণ্ডবিধি (বিহার সংশোধন) বিল, ১৯৮২। এই বিলে রাজ্যের সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং অন্যান্য পত্রিকায় অশ্লীল, কুরুচিকর এবং ভিত্তিহীন খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। বিলটি বিহার রাজ্য বিধান সভায় পাশ হয়ে গিয়েছে এখন যাবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য। বিলটি উত্থাপন কালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্র বলেছিলেন: "তাঁর সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করতে আদৌ চান না। দৈনিক পত্রিকাগুলির ওপর সরকারের কোন রাগ নেই। রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থেই অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করাই বিলের উদ্দেশ্য।"

বিতর্কিত বিলটির আইনগত বিষয়টি আইন বিশেষজ্ঞদের বিচার বিবেচনাধীন। তবে বলগা ছাড়া সাংবাদিকতা নিশ্চয়ই প্রশংসার বস্তু নয়। সংবাদপত্রের দায়িত্ব কম নয়। কুৎসা ও গুজব ছড়িয়ে পাঠকদের মনে মিথ্যা চমক সৃষ্টি এই দায়িত্ব বোধের পরিচয় নয়, যা ছোট বড় অনেক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা হামেসাই করে থাকে। সংবাদ পরিবেশনে সততা ও শালীনতা থাকা অত্যাবশ্যক। বিহারের পত্র পত্রিকাগুলি সেই পবিত্রতা নষ্ট করছেন কিনা সে কথা স্থির করবেন বিহারের মানুষ। আদালত কিন্তু বিলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে চাই সাংবাদিক ও প্রতিবেদকদের সত্যনিষ্ঠা, নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও শালীনতা বোধ।

●

পাঠকদের প্রতি আবেদন

'বিপ্লবী বাংলা' গত ২৫ বৎসরাধিক কাল ধরে সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দেশসেবার আদর্শকে বহন করে নিয়ে চলেছে। এ আমার, আপনার, সকলের কাগজ। তাই একে বাঁচানোর দায়িত্বও আমাদের সকলের। অধিকতর সংখ্যায় গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ক'রে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে আরো দীর্ঘদিন আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।

শিক্ষিত বেকারে পশ্চিম বাংলা শীর্ষে কেন ?

বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের রহস্য কি ?

—ষ্টাফ রিপোর্টার

পি, টি, আই নয়া দিল্লী হতে গত ২৪ জুলাই জানায়েছে এ বছরের ৩১ মার্চের হিসাবে শিক্ষিত বেকারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ২৮ লক্ষ, ৩৯ হাজার। সারা ভারতের কর্ম সংস্থান কেন্দ্রের চালু রেজিষ্টার অনুযায়ী মোট বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ ২৯ হাজার। উত্তর প্রদেশে জনসংখ্যা সর্বাধিক কিন্তু শিক্ষিত বেকার মাত্র ১৫ লক্ষ ১০ হাজার। পক্ষান্তরে বিহারে বেকার সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৬৯ হাজার। কেরলে তুলনামূলক ভাবে লোক সংখ্যা কম কিন্তু বেকার যুবকদের ক্ষেত্রে কেরলের স্থান তৃতীয় ১৮ লক্ষ ৪৮ হাজার। মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও তামিল নাড়ুতে বেকারের সংখ্যা যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৫ লক্ষ ৬৮ হাজার, ১৪ লক্ষ ২৬ হাজার ও ১২ লক্ষ ৬০ হাজার।

পশ্চিমবঙ্গে অন্যরাজ্যের তুলনায় এত বেশী শিক্ষিত বেকার হওয়ার কারণ কি ? পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে দিন দিনই পিছিয়ে পড়লেও শিল্পে কর্মিসংখ্যা অন্যান্য রাজ্য হতে কম নয়। এবং শ্রমিক ও কর্মি নিয়োগও তুলনামূলক ভাবে কম হয় না। তবুও বেকারে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে হওয়ার প্রধান কারণ পশ্চিমবঙ্গের যুবকরা নিজ রাজ্যের শিল্পে স্থান পেতেছে না। রাজ্যের কর্মখালি পদে রাজ্যের যুবকদের দাবী অগ্রাহ্য এই রীতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি থাকলেও রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় সুযোগে বা সরকারকে হাত করে নানাপদ্ধতিতে রাজ্যের শিল্পগুলিতে অন্যরাজ্যের যুবকরা ভিড় করছে। শিল্পের মালিকরাও বাংগালী যুবকদের নিয়োগে অনীহা। বৃটিশ আমল হতেই বাংগালী কারিগরদের খ্যাতি ছিল। কোথাও নতুন শিল্প গড়ে তুলতে বাংগালী কারিগরদের ডাক পড়ত, সুষ্ঠুভাবে কাজ সুসম্পন্ন করে বাংগালীর শিল্প প্রতিভার সারা দেশের শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখেছে কিন্তু আজ বাংলা দেশের শিল্পে বাংগালী কারিগরদের অকর্মণ্যতা ও গাফিলতির জন্য উৎপাদন কম হতেছে এই রটনায় বাংগালী কারিগররা সব বিষয়ে পিছিয়ে পড়ছে। এই ব্যাপারে সাঁওতালডি বাংগালীর কলঙ্ক। বর্তমানে রিপোর্ট এত ঘন, ঘন বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী যন্ত্র নয় দায়ী প্রশাসন। গত কয়েক বৎসর ধরে সাঁওতালডিতে কোন গোলমাল হলেই মন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যবিদ্যুৎ পর্ষদের বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা পর্যন্ত এক যাকো যন্ত্রের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের দায় এড়াবার চেষ্টা করে এসেছেন। সাঁওতালডিতে যে সব যন্ত্র আছে তা জেলের তৈরী। দেশী যন্ত্রের অনেক দোষ। নিজেদের বক্তব্য জোরাল করতে তাঁরা বেণ্ডেল সাক্ষী মানতেন, বেণ্ডেলের যন্ত্রগুলি বিদেশের তৈরী। তাই সাঁওতালডিতে ঘন ঘন যান্ত্রিক গোলমাল, বেণ্ডেল তা থেকে মুক্ত। এবারের গোলমাল বেণ্ডেলের চারটী ইউনিটের মধ্যে তিনটী ইউনিট একেবারে বিগড়ে গেছে। এটা যন্ত্রের দোষ নয়। এর কারণ যন্ত্রগুলির যে বার্ষিক বিশ্রাম ও মেরামতের প্রয়োজন তা হয়নি। বিদ্যুৎ ঘাটতি মিটাতে চারটী ইউনিটকেই একসঙ্গে চালান হয়েছে। ফলে এই বিপর্যয়। এর জন্য যন্ত্র দায়ী নয়; দায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে থাকা বিশেষজ্ঞরা কিংবা

প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত।

সাঁওতালডিতে যন্ত্রের অভিযোগ ঠিক নয়। ভেলের তৈরী একই মেশিনে অন্যত্র সাঁওতালডির চেয়ে অনেক বেশী উৎপাদন করা সম্ভব হতেছে। কেন্দ্রিয় বিদ্যুৎ সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মহারাষ্ট্রের কোয়াডিতে ভেলের তৈরী মেশিনে উৎপাদন ক্ষমতার ৬৪ শতাংশ ও অন্য কটক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ভেলের তৈরী মেশিনেই উৎপাদন হতেছে যথাক্রমে ৭৬ শতাংশ ও ৬১ শতাংশ, অথচ সাঁওতালডিতে একই মেশিনে উৎপাদনের হার গড়ে ৩৮ শতাংশ। একই যন্ত্রে অন্যত্র বেশী উৎপাদন হলে সাঁওতালডিতে এত কম কেন? এর জন্য নিশ্চয়ই যন্ত্র দায়ী নয়— বিশেষজ্ঞদের সাথে দায়ী পরিচালনার অব্যবস্থা। এই সাঁওতালডিই অধিক উৎপাদনের জন্য ১৯৭৬ সালে পুরস্কৃত হয়েছিল। তারপর থেকে পরিচালনায় অব্যবস্থা প্রশাসনে দুর্নীতি শ্রমিক ধর্মঘট ইত্যাদি কারণে সাঁওতালডির আজ এই অবস্থা। পুরস্কৃত হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে অনুপ্রেরণা না পেয়ে বিপরীত ফল হল।

ডি, ভি. সির চন্দ্রপোরার তিনটী ইউনিটের যন্ত্রই ভেলের তৈরী। সেখানে এখন উৎপাদন ক্ষমতার ৭৫ শতাংশ উৎপাদন হতেছে। কিন্তু রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সাঁওতালডির উৎপাদন দিনের পর দিন হ্রাস পেতেছে কেন?

বেণ্ডেলের পঞ্চম ইউনিট চালু হওয়ার সরকারি সময়সীমা অনেক দিন পার হয়ে গিয়েছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নির্দেশ দিয়েছেন যেমন করেই হউক পূজার আগে পঞ্চম ইউনিট চালু করতে হবে। এই পঞ্চম ইউনিট চালু করতে এত বিলম্ব কেন? সেখানেও পর্ষৎ কর্তাদের এতদিন ছিল দেশী যন্ত্রের দোষ ধরার বাহানা, কিন্তু তা প্রমাণ করতে না পারায় এখন তাঁদের অভিযোগ ভেল যে হাজার শক্তির বয়লারের কিট পাম্পের ডিজাইন করেছে তাতে গোলমাল আছে। ভেল এই অভিযোগ মানতে রাজী নয়, তাঁরা বলেছেন ডি. ভি. সি বয়লারে একই ডিজাইনের কিট পাম্প বসিয়েছে যেখানে কোন অসুবিধা এখনও দেখা দেয়নি। ডি, ভি, সির কর্তৃপক্ষ কোন অভিযোগ করেন নি। তাহলে কাজ শুরু করার আগেই এই অভিযোগের কারণ কি?

সাঁওতালডি বাংলার কলঙ্ক। এই কলঙ্ক সৃষ্টি করেছে প্রশাসন। অধিক উৎপাদনের জন্য সাঁওতালডি ১৯৭৬ সালে পুরস্কৃত হয়েছিল। বর্তমানে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, প্রশাসনিক দুর্নীতি সাঁওতালডির বাংগালী কুশলীদের দুর্নাম ডেকে এনেছে। কর্ম প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হতেছে। কাজেই সাঁওতালডি শিল্পে বাণিজ্যে, বাংলার অগ্রগতির পথ রোধ করছে। এই অবরোধ হতে মুক্ত করতে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ। কাজেই সারা বাংলার জনগণের মুখর হতে হবে আওয়াজ তুলতে হবে বিদ্যুৎ পর্ষদের দুর্নীতি ও খামখেয়ালী ব্যবস্থার অবসান চাই। ভিতরের গলদ প্রকাশ করতে হবে এবং কঠোর হতে হবে। বাংগালী কর্মকুশলতা ম্লান হতে দিবে না। সরকারের সীমাহীন গড়িমসির কৈফিয়ৎ চাই।

রুশ বিপ্লবের পর দেশগঠনে বিদ্যুৎ এর প্রয়োজনীয়তার জরুরী প্রয়োজন বুঝাবার জন্য মহামতি লেনিন বলেছিলেন বিদ্যুৎই সমাজতন্ত্র। লেনিনের সেই বাণী মার্কসবাদীরা স্মরণ করুন। দপ্তর ভাগাভাগিতে সময় নষ্ট না করে বিদ্যুৎ বিপর্যয় সমাধানে বেহাল না হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলুন, মার্কসীয় তিভিক্ষার প্রমাণ দিন। ১/৮/৮২ ইং

মার্কসবাদীরা কি অমার্কসীয় পথে চলেছেন ?

কালিপদ সরকার

(১)

দেশে এমন কিছু সুধীজন আছেন যাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিতে চান না, কিন্তু মনের ভিতরে কমিউনিজম সম্পর্কে মমত্ব পোষণ করেন। তাঁরা কার্ল মার্কসকে একজন গৌতম বুদ্ধ অথবা যিশুখৃষ্ট বলে ভাবতে ভালবাসেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ভি. আই. লেনিন মুক্তি ও শান্তির দেবদূত এবং বিশ্ব মানবতার সুহৃদ। এই সকল ব্যক্তি সম্পর্কে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই যৌবনে কোন না কোন সময়ে কমিউনিজমের মধুর সাইরেন ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে স্বপ্ন-রঙিন অমরাবতীর উদ্দেশ্যে কিছুটা ছুটেছিলেন, কিন্তু কি কারণে কেন যেন শেষ পর্যন্ত পথ ছেড়ে চলে এসেছিলেন। চলে এলেও সাইরেনের কুহক তাঁদের অন্তরে যে মোহ জাগিয়েছিল, তা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি।

এঁরাই মাঝে মধ্যে আফসোসের সুরে প্রশ্ন তুলেন মার্কস কি মার্কসবাদী ছিলেন ? অর্থাৎ মার্কসের নামে এ দেশে ও বিদেশে যে সব ক্রিয়াকাণ্ড চলেছে, কার্ল মার্কস সত্যিই কি তাই চেয়েছিলেন ? উত্তরে বলতে হয়, "ওরে মন কত তোরে নাচায় নয়ন !" প্রশ্নের উত্তর আর একটি প্রশ্ন করেও দেওয়া যায়। তা হল, যিশুখৃষ্ট কি খৃষ্টান ছিলেন ?

কার্ল মার্কসের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'ডস ক্যাপিটাল,' যা কিনা কমিউনিষ্টদের বাইবেল, মার্কসের জীবনকালে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি। এই গ্রন্থে উপস্থাপিত অর্থ ও সমাজ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের সমালোচনার উত্তর মার্কস দিয়ে যেতে পারেন নি। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও নয়। সে ভালই হয়েছে। ব্যাখ্যা থাকলে তত্ত্ব নিয়ে মার্কসপন্থীদের মধ্যে এমন চুল ছেঁড়াছিঁড়ির সুযোগ থাকত না।

মার্কস তত্ত্ব জড়বাদ নির্ভর। জড়বাদ বলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতিই চরম সত্য, চৈতন্য জড় প্রকৃতি উদ্ভূত ও নিয়ন্ত্রিত। আধুনিক বিজ্ঞানও জড়বাদ নির্ভর। জড়বাদ নির্ভর বিজ্ঞান যেমন নৈসর্গিক পরিপার্শ্ব তত্ত্বের নব নব আবিষ্কার ও বীক্ষণ অনুযায়ী তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, জড়বাদ নির্ভর সমাজ দর্শনকেও তাই করা দরকার হয়। সেজন্য মার্কসের সূত্র ও সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটছে। কার্ল মার্কসের অনুসিদ্ধান্তগুলি ঊনবিংশ শতকের প্রথম ও মধ্য পর্বের ইউরোপীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, দেড়শো বছর পরে সেগুলির কিছুটা যে ইরেলিভ্যাণ্ট হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। শোধনবাদ এ ছাড়া আর কিছু নয়।

জড়বাদ বলে, "We know how but we do not know why." এই 'কেন'-র উত্তর জড়বাদ সমাজ দর্শনে নেই, তা খুঁজতে হলে যেতে হবে অন্যত্র, অধ্যাত্মবাদের দুয়ারে। 'কেন' -র উত্তর যার একতিয়ারে নেই, তার কাজ তা যত মহৎ উদ্দেশ্যেই হোক একসপেরিমেণ্ট ধর্মী। বিজ্ঞানী জৈব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন গিনিপিগ নিয়ে, মার্কসবাদীরা তাই করছেন মানুষ গিনিপিগ নিয়ে। যাক সে কথা।

'ডস ক্যাপিটাল' রচনার অনেক আগে, মার্কস রচিত এবং মার্কস ও তাঁর সহযোগী বন্ধু এঙ্গেলসের নামে ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত ইস্তাহার Communist Manifesto. সংক্ষিপ্ত হলেও পুস্তিকাটি মার্কস তত্ত্বের সারমর্ম বহন করে। এটিকে কমিউনিজমের 'বার্থ ক্রাই' বলা হয়। Communist

Manifesto-র উপসংহারে কার্ল মার্কস একটি ঘোষণা দিয়েছেন। ঘোষণাটি হল : "The communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions." লক্ষ্য যাই হোক, সাধনের পন্থা সম্বন্ধে মার্কসবাদের বিশদ ব্যাখ্যা এরপর কি দরকার থাকে ?

এবার দেখা যাক মার্কস তত্ত্বের প্রথম প্রয়োগ ক্ষেত্র রাশিয়ায় কি ঘটেছিল। রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর ৬৫ বছর কেটে গেছে। কমিউনিষ্ট সরকার এখনো স্বীকার করেন, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। লেনিনের রথ কোনদিকে চলেছে তাও বলা কঠিন। তবে সমাজতন্ত্র এখনো যে একসপেরিমেন্টাল স্টেজ পার হতে পারে নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শোধন তত্ত্ব তার প্রমাণ।

বোলশেভিক বিপ্লব কালে রাশিয়া শিল্পোন্নত ছিল না, মার্কস অনুসারে সেখানে কমিউনিস্ট বিপ্লব হওয়ার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে জারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম অনেক আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে রাশিয়ার বিপর্যয় সেই সংগ্রামকে দুর্দম করে তোলে এবং জারতন্ত্রের পতন ঘটায় গণতন্ত্রবাদী বিপ্লবীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু হারা-যুদ্ধকে জিইয়ে রাখার ফলে বিপ্লবী গণতন্ত্রবাদীরা দেশের অভ্যন্তরে ও সেনা বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে বসেন। সেই সুযোগে একতাবদ্ধ ও সংখ্যায় বোলশেভিকরা গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করেন। সৈন্যবাহিনীর একাংশ এবং সংগঠিত শ্রমিকরা বোলশেভিকদের সাহায্য করে। এই তো রুশ বিপ্লবের অতি সংক্ষিপ্ত ছবি।

লেনিন ছিলেন বোলশেভিকদের নায়ক। ক্ষমতা লাভের পর, রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে যে কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয় তাতে সকলেই ছিলেন মধ্য ও উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ। লেনিন নিজে ছিলেন অভিজাত বংশীয়। এই সরকারকেই নাম দেওয়া হয় Dictatorship of the Proletariat. লেনিন নিজেই স্বীকার করেছেন, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য থেকে নেতৃত্বে আসার মত লোক না থাকায় এ ব্যবস্থা করতে হয়। অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে ? এ রাজ্যের মার্কসবাদী নেতাদের শ্রেণীচরিত্র বিচার করুন।

লেনিনের শাসন কাল ১৯১৮-২২। এটি ছিল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন পর্ব। লেনিনের পরে মার্কসের সঙ্গে লেনিনের নাম যোগ করে, লেনিনের অনুসৃত ও নির্দিষ্ট পথে সোভিয়েত রাষ্ট্রথ এগিয়ে চলেছে। সুতরাং লেনিন মার্কসবাদকে কিভাবে প্রয়োগ করেছিলেন রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে, তা জানবার জন্য কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক আনুপূর্বিক বলতে গেলে অনেক বলতে হয়, তাই স্বল্প পরিসরে সংক্ষেপে দু একটা বিষয়ই উল্লেখ করব।

লেনিনের স্বল্পকাল শাসনে সরকারীভাবে স্বীকৃত মৃত্যুদণ্ডিতের সংখ্যা তের হাজার এবং সাইবেরিয়ায় নির্বাসিতের সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ। সাইবেরিয়ায় বন্দীদের কঠোর শ্রম শিবিরে পাঠানোর কাজও লেনিন আমলে শুরু হয়। বন্দীদের অধিকাংশই দেশে ফিরে আসেন নি। তারা নির্বাসনেই তুষার সমাধিতে মুক্তি লাভ করেন। এরা কারা ? কি

ছিল এদের অপরাধ ? বন্দীদের মধ্যে ছিলেন শ্রমিক কৃষক, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, শিক্ষক, অফিসার, অধ্যাপক, দার্শনিক প্রভৃতি। তাঁদের অপরাধ— তাঁরা অ-কমিউনিস্ট, সুতরাং প্রতিবিপ্লবী।

কমিউনিস্টদের বিচারে যাঁরা তাঁদের সঙ্গে নেই তাঁরাই বিরোধী তাঁরাই প্রতিবিপ্লবী, প্রতি-বিপ্লবী মানে শ্রেণী শত্রু। তাঁদের দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই। ১৯১৮ সালের ৭ই জানুয়ারী মহান লেনিন এক নির্দেশনামা জারি করেন তাতে বলা হয় "Purge the Russian land of all kinds of harmful insects." ক্ষতিকর পোকা-মাঁকড় হল চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি। বিপ্লবের নেশায় উদ্বেল কমিউনিস্টদের নিকট একজন শেকস-পীয়র, গোটে কিংবা ভার্জিলের কোন মূল্য নেই, মূল্য আছে একজন মুচির। কারণ জীবনে কবিতার চেয়ে জুতার প্রয়োজন বেশি।

লেনিনের নির্দেশেই প্রথমে 'চেকা' সর্ব রাশিয়া শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করে। যারা ছিলেন বিপ্লবের শরিক, শক্ত হাতিয়ার। N.K.V, D, পার্টির ইউনিটগুলিকে নির্দেশ দেয়, "Use maximum initiative in localities, not excluding confiscations, compulsions and arrests." এ কথা না মেনে উপায় নেই যে সন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন যে ভাবে হয়, তার পরিচালনাও চলে ঠিক সেইভাবে। এই তো মহর্ষি (?) কার্ল মার্কস এবং বিশ্বমানব বন্ধু (?) লেনিনের স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ।

এখন সুধীবৃন্দ ভেবে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গে সি,পি, এম রাজত্বে যে খুন ডাকাতি গৃহদাহ ধর্ষণ ঘটছে, তার প্রতিরোধে সরকার নিষ্ক্রিয় আছেন কেন ? ভরংকর এই ঘটনাগুলি কি জনমনে সন্ত্রাস সৃষ্টির সুপরিকল্পিত কৌশল নয় ? মার্কসবাদী বামফ্রন্ট সরকার সমাজবিরোধীদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে যাবেন কেন ? সরকার যথেষ্ট শক্তিশালী, সরকারের পিছনে আছে সুগঠিত সি, পি, এম ক্যাডার ও সমর্থকবৃন্দ। ফ্রন্টনেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত রুশ বিপ্লব কালীন লেনিন কিংবা চীন বিপ্লব কালীন মাও সে তুংয়ের চেয়ে কম ক্ষমতাশালী নন। এ কথা আমাদের নয়, বলেছে বিলাতের ম্যানচেস্টার গার্ডেন ও অন্য পত্র পত্রিকা। বাম-ফ্রন্ট সরকার ইচ্ছা করলে, এক মাসের মধ্যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পালটে দিতে পারেন। লোকে বলে, সমাজ বিরোধীরা পার্টি এবং পুলিসের আশ্রয়ে দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। কথাটি কি অমূলক ?

মার্কস লেনিন মতে সমাজ বিপ্লব করতে হলে নিছক তাত্ত্বিক মতবাদ প্রচার নয়, চাই শক্তি প্রয়োগ, চাই বন্দুকের নল, চাই সর্বস্তরে সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি। বামফ্রন্ট সেই কাজই করছেন। এতে অ-মার্কসীয় কিংবা অ-লেনিনীয় কিছু আছে কি ?

মার্কসবাদীদের মতে End justifies the means. উদ্দেশ্য যখন মহৎ, রক্তারক্তির পথে সে উদ্দেশ্য লাভে এগিয়ে যেতে বাধা নেই, দ্বিধা নেই। বাধা শুধু একটি, পশ্চিম বাংলা স্বশাসিত স্বাধীন রাজ্য নয়, ভারতের অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। এই বাধাটুকু না থাকলে মার্কস-লেনিন তত্ত্বের ধারক বাহকগণ কি করতেন তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। রাজ্যের 'Harmful insects' দুটি পাঁচটি করে নয়, হাজারে হাজারে

(এর পর ১২পৃঃ)

বন্যা ও খরা প্রতিরোধের উপায়

—বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনোত্তর ভারতে পালা করে হয় বন্যা আর না হয় খরা যেন নিয়মিতভাবে লেগেই আছে প্রতিকারহীন চরম অব্যবস্থার মধ্যে, কেন? বহু নদ-নদী পরিকল্পনা বন্যা রোধে কার্যকরী করা সত্ত্বেও কেন এখনো এদেশের মানুষ বন্যার হাত থেকে রেহাই পায় না প্রায় প্রতি বছরই? বন্যা ও খরার প্রকোপ উত্তরোত্তর যেন বেড়েই চলেছে, আর মানুষ অসহায় অবস্থায় দারিদ্রের প্রান্ত সীমায় পৌঁছাতে বাধ্য হচ্ছে ঐ সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে বারে বারে বিধ্বস্ত হয়ে। সরকার বন্যা ত্রাণে অকৃপণ হস্তে রাজকোষের অর্থ ব্যয় করে জনগণকে রক্ষা করার মানবিক তাগিদে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মাষ্টার প্ল্যান রচনা ও তা রূপায়ণের ব্যবস্থা হয় কৈ? এককালীন মোটা রকম অর্থব্যয়ে এর প্রতিকার বাস্তবে সম্ভব, তবুও সরকার সেরূপ উদ্যোগ নিতে আগ্রহান্বিত নয় কেন? সরকারী খয়রাতি সাহায্যে মানুষ বারে বারে পরিত্রাণের পথ খোঁজে কেন এবং সরকারই বা ঐরূপ ভুল পথে চলতে সর্বদাই উন্মুখ কেন? এর মূল কারণ সরকার মানুষের মনে এমনই একটা ধারণা করে দিতে চায় যে সরকারের দয়া ও দাক্ষিণ্যেই মানুষ বন্যা ও খরার বিপদ থেকে বারে বারে বেঁচে যায়।

প্রকৃত সত্য কিন্তু তা নয়। যে কোন সভ্য দেশে তথাকার সরকার জনগণের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্যই ও সে দেশবাসীকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করার জন্যই বিভিন্ন ধরণের পঞ্চবার্ষিক বা দ্বিবার্ষিক বা কমপক্ষে বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তাকে কার্যকরীভাবে সফল করে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। একই কাজে বারে বারে কোন সরকার প্রভূত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে না। কিছু বেশী মাত্রায় খরচ করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়িয়ে যাবার জন্য অন্যান্য সরকার বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত স্থায়ী ব্যবস্থা নেয় এমন বুদ্ধিমত্তার সাথে যে, পৌনঃপুনিক ব্যয়ের হাত থেকে দেশ বেঁচে যায়। এদেশে কিন্তু সেরূপ সুষ্ঠু ব্যয়ের কার্য্য প্রণালী আজো গড়ে ওঠে নি সরকারের প্রচেষ্টায় বা সরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে।

খরা প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে প্রতিবছর বর্ষাকালে বৃক্ষ রোপণ, বন জঙ্গলে বা যত্র-তত্র বৃক্ষ ছেদন নিবারণ, জনগণকে বৃক্ষরোপণে উপযুক্ত মাত্রায় উৎসাহ দান, বিনামূল্যে শীতাতপ নিবারণী বৃহৎ বৃক্ষের সারিবদ্ধ চারা প্রতিটি সড়কে লাগাবার জন্য স্থানীয় পৌরকর্তৃপক্ষকে দান, প্রতিটি বনবাসী মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন, যাতে তারা বৃক্ষ ছেদন না করে এবং যদি করে তবে যেন সমপরিমাণ বৃক্ষ, লতা-পাতা, গুল্ম প্রভৃতি নানা ধরণের গাছ পালা আকাশস্থ মেঘকে আকর্ষণ করে। ফলে মেঘ সহজেই ঊর্দ্ধ গগন থেকে ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি নেমে আসে ও বৃষ্টিপাত ঘটে। আবার বৃক্ষরাজি ভূমিক্ষয় রোধে পরম সহায়, তাই বাঁধের ধারে বা বাঁধ উপরিস্থিত সড়কের দুপাশে ফণিমনসা অশথ, বট, শিশু, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, ঝাউ, বাবলা, জিওল, নিম, কামিনী, শিমুল, সেগুন আসন, বক, জাম, শিরিষ প্রভৃতি বৃক্ষ রোপন একান্তভাবে প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন শান্তি নিকেতনে প্রতি বছর বৃক্ষ রোপণ উৎসব পালন করতেন নিয়মিত ভাবে বেদ পাঠের মাধ্যমে, যা মানব সমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক মূল্যবান অবশ্য করণীয় কার্য্য ছিল। সরকার খুবই ঘটা করে বৃক্ষ রোপণের

ব্যবস্থায় হালে উদ্যোগী দেখা যায়. কিন্তু ঐভাবে রোপিত বৃক্ষ সমূদয় ঠিকমত বর্দ্ধিত হল, না অঙ্কুরে বিনাশ প্রাপ্ত হল, তা দেখার কোন সুব্যবস্থা নেই সরকারের।

ভারতে অত্যধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় খরার আধিক্য দেখা দিতে শুরু করেছে; কারণ বর্দ্ধিত জন সংখ্যার প্রাত্যহিক প্রয়োজনে আলানী আহরণের জন্য মানুষ গাছ-পালা নির্মূল করতে আরম্ভ করেছে একদিকে, আবার অপরদিকে বসবাসের প্রয়োজনে বন জঙ্গল কেটে তথায় লোকালয় তৈরীতে মানুষ বাস্ত এবং আসবাব পত্রের দরকার হওয়ায় মূল্যবান সব নামী দামী কাঠ আহরণের জন্য বড় বড় মহীরুহ বিনাশে তৎপর দেখা যায়। এই দুটকারী কার্য্যের ফলেই ভারতের বনাঞ্চল ক্রমশই নিঃশেষ হতে চলেছে মানুষের অত্যাচারে-অবিচারে প্রতিদিন। এর উপর আবার কল কারখানা বাড়ার ফলে ঐ সব কল-কারখানার দূষিত জলে ও উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত বিষ বাষ্পের এবং ডিজেল বা অন্যান্য তেলের বিষাক্ত ধোঁয়ায় বহু গাছপালা ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে চলেছে পরিবেশ দূষণের ফলেই।

বাঁচার ও জনগণকে বাঁচাবার জন্য সরকারকেই সক্রিয় পন্থায় খরা তথা অনাবৃষ্টি এবং বন্যা তথা অতিবৃষ্টি রোধে বৈজ্ঞানিক পন্থায় অগ্রসর হতে হবে, অন্যথায় ভারত মনুষ্য বাসোপযোগী থাকবে না সুদূর ভবিষ্যতে। অন্যথায় দেশে মরুভূমি বিস্তৃতি লাভ করতে করতে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হবে অদূর ভবিষ্যতে যে মানুষ আর এখানে বসবাস করতে না পেরে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে। সরকার এ ব্যাপারে যত শীঘ্র সচেতন হয় ততই মঙ্গল, কারণ সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়া এ বিপদ থেকে বাঁচা অসম্ভব। ●

(১০ পৃঃ পর)

তখন ভবলীলা সাঙ্গ করত। আর এ লেখাও তখন ছাপা হত না।

কমিউনিস্টদের মধ্যে গুণী, জ্ঞানী, বিদ্বান অনেক আছেন কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে তাঁরা প্রথমে কমিউনিস্ট, তারপর পাঁচজনের একজন। তাঁদের দেখতে হয় দলের দৃষ্টি দিয়ে, শুনতে হয় দলের শ্রবণপথে প্রাক্তনমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র যখন বলেছিলেন 'তিনি কমিউনিস্ট, তিনি ভদ্রলোক নন,' তিনি ঠিকই বলেছিলেন। এ অবস্থায় এইসব গুণী জ্ঞানীর বিবেকের নিকট আবেদন করে কিছু লাভ আছে কি? যাঁরা আবেদনের কথা ভাবেন, তাঁরা মোহগ্রস্ত, সাইরেনের সম্মোহনী প্রভাব থেকে এখনো মুক্ত হতে পারেন নি বোধহয়।

কমিউনিস্ট শাসন সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক কেটেলবি বলেছেন :"The Bolshevist regime was upheld only by a policy of terrorization, by the suppression of criticism, the conscription of labour, the proclamation of martial law, the extensive use of spies, seizure of hostages and by wholesale execution. ..... The mood of terrorization has now largely subsided, but the communist party keeps itself in power by arbitary political methods" —A History of Modern Times.

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সত্য ভাষণের জন্য কেটেলবি বিশ্ব সমাজে সমাদৃত। এখন সুধীজনকে বলব, হাত তুলে বলুন মার্কস-লেনিন জিন্দাবাদ, মার্কস-লেনিন যুগ যুগ জীয়ো। (চলবে)

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

JULY—1952

Dist - CALCUTTA

19, Dr. Akshay Paul Road, Calcutta—34.

Dist—24 Parganas

Barman Kamari Sankari D O. L. Manterni Barman. Dayalnagar.
Biswas Smt. Gitarani Wd L. Anil Kumar Biswas. Kurulia, Hat-Kurulia.
Chakraborty Matilal PL 2/5, Asokenagar,
Debi Smt. Suniti Bala Wd/L. Mano Ranjan Mukherjee
Dey smt. Pusparani P-51 Basenagar, Madhyamgram.
Dutta Smt. Bela B-9, Chiran Park. Basdroni.
Ghosh Kumari Sikha D/o L. Maya Ghosh, Brotachari Camp, Koka.
Ghosh Dustidar Smt. Lekha Wd/L. Pabitra, 82A, Kananga Park.
Mazumdar Smt. Anupama Wd/L, Abani Mohan 87 Beehive Gardens, Belghoria.
Sen smt. Bijon Bala Wd/L. Gopal Chandra Sen. 1/1 Ashokenagar.

Dist—Howrah

Banerjee Smt. Prabashini Wd/L. Sibnath Banerjee. 63/1, Kali Banerjee Lane,
Dutta Gupta Smt. Bimala Wd/L. Satya Ranjan Dutta Gupta
Hazra Smt. Sushama Wd/L. Bibhuti Bhusan Hazra, Sibpore.
Karar Smt. Mater Mala Wd/L. Mriganka Karar, Joypur.
Sreemai Smt. Subodhbala Wd/L. Kamkanti Sreemani, Purisnapara, Makardah.

Dist—Hooghly

Mukherjee Smt. Bina Wd/L. Tinkari Mukherjee, Natibpur.
Sengupta Smt. Parulbala Wd/L. Ajit Kr. Sengupta, 47, Dwarik Road

Dist—Burdwan

Banerjee Smt. Aparna Wd/L. Phani Bhusan Banerjee
Karmakar Smt. Tulsi Wd/L. Panchanan Karmakar, Ajodhyay P.O. & VILL.

Dist—Midnapore

Acharjee Smt. Snehal ta Wd/L. Hrishikesh Acharjee, Midnapore.
Bera Byomkesh Anarpur, Kukrahati,
Bhattacharjee Smt. Sarala Wd/L. Sudhir Ch. Midnapore
Das Smt. Jnanadamoyee Wd/L. Durgapada Das Ichhapur, Raghurampur.
,, Smt. Siburani Wd/L. Indu Bhusan. P.O. Deulpara.
Das Mahapatra Kshitish Kalyanpur
Jana Upendra Nath Ajoy, Khejuri
Manna Smt. Hemangini Wd/L Amulya Kumar, Kumarpur, Contai.
Mondal Smt. Brikshbala Wd/L. Bipin Behari Mondal. Vill. Udhambal, P.O. Gopalchak,
Smt. Manjusree Wd L. Gour Prasaad Mandal, Panskura
,, Smt, Prabhabati Wd-L. Ajodhyanath Mondal, P.O. & Vill. Gopalpur.
Roy Smt. Kamala bala Wd/L. Balailal Roy, Lakshikundu.

Dist—Purulia

Haldar Smt. Pusparani Wd-L. Bholanath Haldar, Tulia.
Mahato Briodaban Ichag,
Modak Smt. Abala Wd-L. Satish Modak Burabazar (Purulia).
Roy Smt. Anjali Wd-L, Haripada Roy, Charrah.

Regd No. R. N. [illegible]
DAVP—Regd.
বার্ষিক :—ডাক ৮.০০ টাকা

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
বাণ্মাসিক :—১০.০০ টাকা

P. Regd. WB/NC 77
মূল্য—৩৫ পয়সা

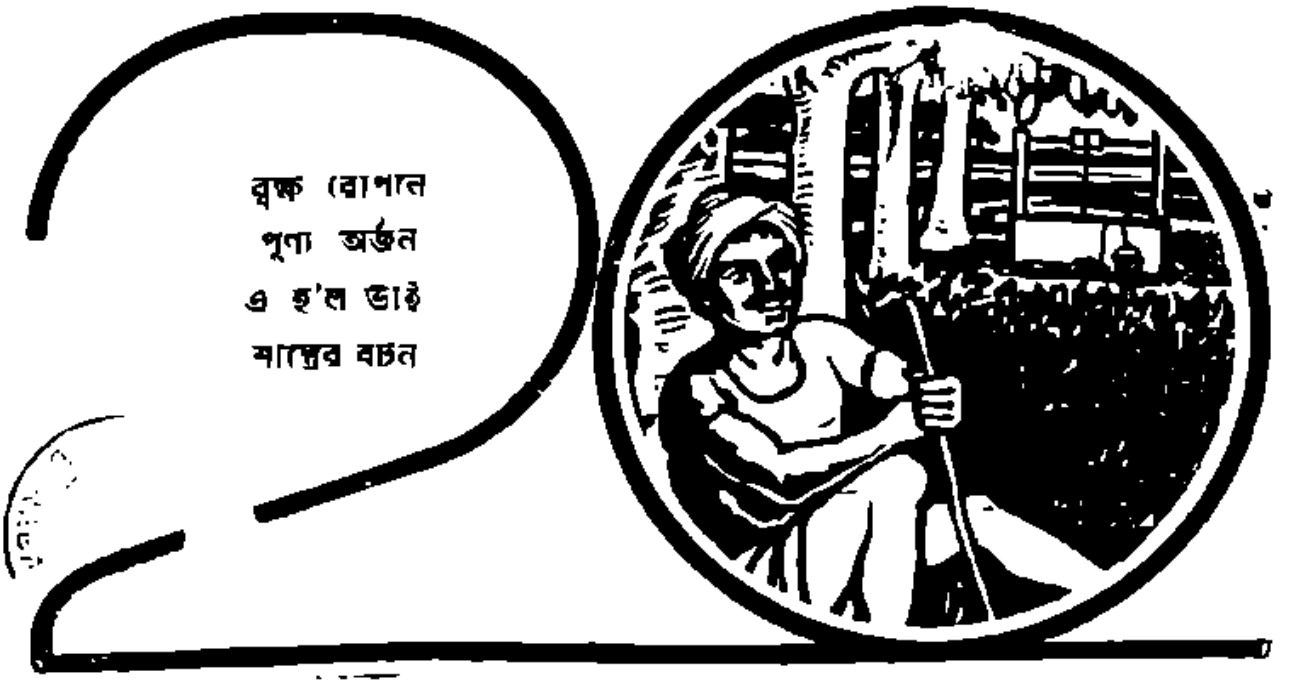

● পাঁচ বছর আগে বনমালী কুয়ো তলার আশে পাশে গোটা পাঁচেক আমের চারা বসিয়ে ছিলেন। আজ শ্রান্ত পথিক ও পথ দিয়ে যাওয়ার সময়ে কুয়োর ঠাণ্ডা জলে তৃষ্ণা মেটায়, গাছের ছায়ায় গা জুড়োয়। গাছের ফল এতো হয় যে বনমালীর পরিবার ভরপেট খায় আর বাকী ফল বেচে দেয়।

● একদিকে পুণ্যলাভ অন্যদিকে অর্থলাভ। এর চেয়ে বেশি আর কি চাই ?

● আমাদের দেশে শতকরা ২৩ ভাগ জমিতে গাছ পালা আছে। এই মাত্রা বাড়িয়ে ৩৩ শতাংশে করা দরকার।

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন ঃ

এস কে ঘোষ
অ্যাসিসটেন্ট প্রোডাকশান ম্যানেজার
রিজানাল ডিস্ট্রিবিউশান সেন্টার
৩৯, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা—৭০০০৭৩

আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা/ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম.....

ঠিকানা.....

.....—..... .....পিন.....

গাছপালাই খাদ্য, ফলমূল, ইন্ধন প্রভৃতি উৎস

নতুন ২০ দফা কর্মসূচী

DAVP 82/192

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

একাদশ বর্ষ	শনিবার ১১ই ভাদ্র ১৩৮৯ ২৮শে আগষ্ট ১৯৮২	৪৭ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

বিপ্লবের দ্বারা আনীত পরিবর্তন সব সময়েই মূলগত পরিবর্তন। অল্প সল্প উপর উপর সাধিত পরিবর্তনকে কোন মতেই বিপ্লব বলা যেতে পারে না। সরকারের বা মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিবর্তনও বিপ্লব নয়, কারণ তার দ্বারা জাতির জীবনে কোন পরিবর্তন আসে না।

—নেতাজী।

সম্পাদকীয়

আত্মপ্রতিষ্ঠা না আত্মহত্যা ?

বিগত কয়েকদিন ধরে পশ্চিমবাংলার প্রশাসক দলগুলির মধ্যে যে বিরক্তিজনক ও হাস্যকর দৃশ্যগুলি অভিনীত হচ্ছে, সেটা একটি বিয়োগান্ত নাটকের অন্তত পূর্ব্বাভাস মাত্র। এই যে দপ্তর বিভাগের নামে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়েছে এ কোনদিন থামতে পারে না, যদি না এদের নিয়ন্তরের রিপুগুলিকে দমিত করে, দেশসেবার মানসিকতার ফুরণ ঘটে। কিন্তু সে আশা আজ দুরাশার রূপই গ্রহণ করছে। অনৈক্যের যে ব্যাধি এদের আক্রমণ করেছে, সেটা একটা অস্থায়ী উপশমকারী ঔষধ প্রয়োগ করে, রোগটাকে আপাতত: ধামাচাপা দেবার হাস্যকর প্রচেষ্টা মাত্র। আলাপ আলোচনার অভিনয় দৃশ্যের পর দৃশ্যে। রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন বিভিন্ন নায়কেরা। কিন্তু নাটকের গতি শেষ পর্য্যন্ত যে বিয়োগান্ত হবে, এই বোধটার জাগরণের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। প্রকৃত রোগটা নিরুপণ না করে, বা করতে অসক্ষম হলে যেমন কোন চিকিৎসক রোগীর রোগ নির্মূল করে তাকে তার হৃত স্বাস্থ্যকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, এক্ষেত্রেও তাই দেখা যাচ্ছে। একটা উপসর্গকে সাময়িক ভাবে চাপা দিলেও, নতুন আর একটা উপসর্গ আত্মপ্রকাশ করছে, এবং রোগীকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে। শুধু যদি প্রশাসক দলগুলির ভালমন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত পরিস্থিতিটা, তবে সে দৃশ্যকে অন্তের ব্যাপারে নাক না-গলাবার ব্যাপার বলে গণ্য করা যেত। কিন্তু এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সম্ভব নয় কোন দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর পক্ষে। কারণ এই ব্যাপারটির সঙ্গে শুভাশুভ জড়িত আছে গোটা জাতির।

এ পর্য্যন্ত যে সব ঘটনার নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে, তার মধ্যে রাজনীতির কোন বালাই নেই। নেই মিলে মিশে দেশ সেবা করার কোন মানসিকতা। নেই দেশপ্রেম, মানবীয় মূল্যবোধের কোন স্বাক্ষর। আছে গাণিতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মৎস-ন্যায়নীতির প্রবর্ত্তন করার অশোভন প্রয়াস। আছে দেশের জনগণের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে দলগত ও ব্যক্তিগত মুনাফা শিকারের উদগ্র বাসনা। দপ্তর বণ্টনের যে সিদ্ধান্ত, এদের বড় শরিকেরা গ্রহণ করেছে, তার পেছনে কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ দেখাতে পারছেনা।

এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করতে গোটা পরিস্থিতির একটু সংক্ষিপ্ত বিচার বিশ্লেষণ করাটা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। মুখে এরা বলছে বড় বড় দপ্তরগুলির পুনর্বিন্যাস করা দরকার, সুষ্ঠু এবং দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করতে। কিন্তু এদের দখলে যে বড় বড় দপ্তর আছে, সেগুলি ভাগ করা যাবে

না। সেগুলি যেমন আছে, তেমনিই রাখতে হবে। ভাগ করতে হবে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলগুলির দপ্তরগুলি এবং সেখানে তাদের দলীয় লোক দেওয়া হবে না. সেখানে বসাতে হবে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের লোকদের। এর নির্গলিত অর্থ দাঁড়ায় যে সর্বত্রই নিজেদের লোক বসিয়ে, নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখা। অন্য দুই শরিকদলগুলি দপ্তর পুনর্বিন্যাস করতে গররাজী নয়, তবে তারা চায় যে এই কাজ হোক যুক্তি-যুক্ত পথে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। এরা গণতন্ত্রের ধারকবাহক বলে অহরহ ঢাক পেটাচ্ছে। কিন্তু কমিউনিস্টরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, এ সংবাদ বিশ্বভুবনে অজ্ঞাত। বিশ্বজনের কাছে এই প্রচার হাসির খোরাক যোগার মাত্র। তবে কমিউনিস্টমার্কা গণতন্ত্র বলে যদি কিছু উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে তার চরিত্র ও রূপ আলাদা। আমরা যা বলব, সেটাই মেনে নেওয়াটাই হল এদের এই নতুন গণতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ।

পশ্চিমবঙ্গে এই কৌদলের মূলে আছে একটিই কারণ, যাকে কোন বিখ্যাত একটি পত্রিকার প্রতি-বেদক বলেছেন 'মধু আহরণ।' যদি প্রশাসন যন্ত্রকে সুষ্ঠু পরিচালনার সদিচ্ছা থাকত, তবে ত প্রত্যেকের-অতীত দিনের কাজকর্মের পরীক্ষা নিরিক্ষা হত। মুখ্যমন্ত্রীর যতগুলি দপ্তর ছিল, সেগুলিতে ব্যর্থতা এবং অযোগ্যতার পরিচয়, এত সুস্পষ্ট এবং পর্বত প্রমাণ যে তার হাত থেকে সব দপ্তর শুধু কেড়ে নেওয়াই নয়, তার হাতে কোন দপ্তরের ভার দেওয়াই কর্তব্য নয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টনের কথাও শোচনীয়। সংবাদে প্রকাশ, খুন ও ধর্ষণে বিগাশি সালের প্রথম ছ মাস পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববর্তী সব বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।' পশ্চিমবাংলার মুখে এই মন্ত্রীর অধীন বিভাগগুলি কলঙ্ক কালিমা লেপন করে দিয়েছে এমব ভাবে, যার জন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আজ লজ্জায় ও ক্ষোভে ম্রিয়মান। দীর্ঘ পাঁচ বছরের মধ্যে বামফ্রন্টের কোন সভায় বা মন্ত্রীসভায় এ নিয়ে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করা হয়নি। এর জন্য দায়ী সি. পি. এম দল ও দলীয় মন্ত্রী। সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্চা না করে, অন্যের হাত থেকে দপ্তর কেড়ে নিয়ে, সেগুলি আবার এই বিশেষ দলীয় লোকেদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য জিদ্‌করা হচ্ছে। আকাশচুম্বী নির্লজ্জতা ছাড়া আর একে কি বলা যায় জানিনা। এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে দপ্তর পুনর্বন্টন করার ধুয়াটা কোন সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। যেখানে রুধির আছে, সেটাই করতলগত করার হীন প্রচেষ্টা বলে মনে করলে এদের কি বলবার আছে, সেটা আজ বাঙ্গালী মাত্রেই জানবার দাবী করে।

এদের এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত চালচলনের সঙ্গে অন্য দলগুলি কি ভাবে মোকাবিলা করবেন, সেটা তাদের বিবেচ্য। কিন্তু জোড়াতালি দিয়ে মুখরক্ষা করার পরও যে অবস্থার ইতর বিশেষ হবে, এটা যাদের সামান্য একটু কাণ্ডজ্ঞান আছে, তারাই বুঝতে পারবেন। তাদেরও পরিস্থিতির সমীক্ষা করার সময় বয়ে যাচ্ছে। জনগণের নিকট তাদেরও কৈফিয়ৎ দিতে হবে এই সব অপকর্ম করার কাজে সহায়তা করার জন্য তাদের বুঝতে হবে এই ভাবে চললে তাদের নিজ নিজ দলের ভবিষ্যৎ কি হবে। অবশ্য কলকাতার সুরক্ষিত অঞ্চলে বসবাস করে, দুতিনটি মন্ত্রীত্ব লাভের আশায় যদি অন্যায়ের সঙ্গে তারা আপোস করেন। তবে সেদিন খুব বেশী দূরে আছে বলে মনে হয়না। যখন তাদের দলের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে একদিন বিস্ফোরণ ঘটবে। কারণ অকুস্থলে তারাই আহত এবং নিহত হচ্ছেন। নিজেদের এবং দলীয়

কর্মীদের জন্য তাদের অবশ্য কর্তব্য আছে এবং সেটা পালন না করলে, তারাই একদিন কৈফিয়ৎ দাবী করবে। দলের ভাঙ্গনের গতি তারা রুদ্ধ করতে সমর্থ হবেন না কোন রকমেই। দেওয়ালের লিখন না পড়তে পারলে ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে উঠবে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

গ্রামে গঞ্জে নারীদের উপর, যে অত্যাচার চলছে, যে ভাবে ভিন্নদলীয় লোকদের খুন করা হচ্ছে, সেটা বেশীদিন নির্বিঘ্নে করা যাবে যদি কেউ ভেবে থাকে, তবে তাদের বদ্ধ উন্মাদ বলা ভিন্ন অন্য কিছু বলা যাবে না। এ সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত যে এ কাজ করছে, বামফ্রন্টের সংযোগবিষ্ঠ লোকেরা ও তাদের সমর্থকেরা। আরামবাগের গোঘাট এলাকায় বিস্তীর্ণ অত্যাচার চলছে সেটা যে সি, পি, এম দলের লোকেরাই করছে। তদন্তকারী পুলিশ রিপোর্টও তাই বলছে। শরিকদলের কর্মীরাও নিহত হচ্ছেন এদের দ্বারাই। তবু ও যদি এদের চেতনা না জাগে, তবে স্বঘাত সলিলে ডুবে মরা থেকে. এদের কেউ বাঁচোতে পারবেনা। সি, পি, এম দলের সঙ্গে আঁতাত থাকার ফলে যদি এরা এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না করেন. এমন কি প্রয়োজন হলে এদের সঙ্গত্যাগ না করেন, তবে এই সব নৈন্দ চক কাজ কর্মের দায় ভাগ এদেরও অবশ্যই নিতে হবে। অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, উভয়েই সমান ভাবে দোষী সাব্যস্ত হবে গণ আদালতে। বিগত পাঁচ বছর ধরে এদের বশম্বদ হয়ে কাজ করে, নিজ নিজ দলের ভাবমূর্তি মলিন করা ভিন্ন, একটুও উজ্জল করতে পারেন নি তারা। পশ্চিম বাংলার মানুষ আগ্রহের সঙ্গে এদের ভূমিকার পরীক্ষা নিরিক্ষা করছে এটা ভুলে যাওয়াটা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে। এই আত্মঘাতী নীতি পরিত্যাগ করে, এরা নিজেদের স্বাধীনতা ও দেশ প্রেমের স্বাক্ষর রাখবেন, সব শুভানুধ্যায়ীরাই তাই প্রত্যাশা করে। শুধু ইন্দিরা বিদ্বেষী। কংগ্রেস বিদ্বেষী নীতি অনুসরণ করলে, রসাতলে যাবার পথই প্রশস্ত করবেন। সি, পি, এম দল তাদের এতাবৎকালের নীতির আমূল পরিবর্তন না করলে আবেরে তাদেরও কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এটাও যেমন সত্য, অন্যান্য দল গুলিও যদি তাদের মত ও পথের পরিবর্তন না করেন, তবে তাদেরও সহমরণে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম বাংলার চরম সর্বনাশ করার দায়িত্বের ভাগও নিতে হবে। অন্তিম হিসাব নিকাশের দিন এদেরও সমর্থন যোগ্য ও দেবার মত কোন কৈফিয়ৎ থাকবে না বলে দেশের রাজনৈতিক সচেতন মানুষ বিশ্বাস করে। দেশের মানুষ আরো মনে করে এরা সকলেই জীবন ও মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। আত্মপ্রতিষ্ঠা না আত্মহত্যা কি তারা করবেন, ভবিষ্যৎ কালই তা নিরূপণ করবে। সি, পি, এম ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মিলন প্রস্তাব লিখনের কালি শুখাতে না শুখাতেই দলীয় সংঘর্ষে একজন খুন, অনেকে আহত। মিলনের প্রস্তাবটির মূল্য কতটুকু, সুধীজনই তার বিচার বিশ্লেষণ করবেন।

———

আনন্দ মঠ মুক্তি যজ্ঞের সংহিতা

—কাজীপদ সরকার

টেরেন্স ম্যাকসুইনি বলেছেন—"A nation's Literature is an index to its mind. Literature is the shrine of Freedom, its fortress, its banner, its charter."—Principles of Freedom.

'আনন্দমঠ' আমাদের জাতীয় সংগ্রামের পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদ। বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। বর্তমান ১৯৮২ তে আনন্দ মঠের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালিত হচ্ছে। কবি বঙ্কিমের ধ্যান দৃষ্টিতে শত বৎসর পূর্বে যে স্বাধীন ভারতমাতার প্রতিমা প্রতিভাসিত হয়েছিল আজ তিনি বাস্তব মূর্তিতে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে দীপ্যমান। প্রণাম।

আনন্দমঠ উপন্যাস গ্রন্থ, বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর রচিত। উপন্যাসের নায়ক নায়িকা, পার্শ্ব-চরিত্রগুলি এবং ঘটনাবিন্যাস সবই কল্পিত। বঙ্কিম চন্দ্র ভবিষ্যতের মুক্তি সংগ্রামের চিন্তা মনে রেখে আনন্দমঠ লিখেছিলেন, একথা বললে কিছুমাত্র ভুল হবে না। আনন্দমঠের আত্মনিবেদিত সন্তানদল এবং তাঁদের মাতৃমুক্তি পণ পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল এবং ত্যাগব্রতে উদ্দীপিত করেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন আনন্দমঠ গীতার বিস্ময়কর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, গীতা প্রথম যুগের বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল পর্যন্ত দেশসেবকদের হাতে হাতে ঘুরত এবং প্রেরণার উৎস ছিল। নেতাজী নিয়মিত গীতা পড়তেন।

বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি আনন্দমঠ রচনার দু-এক বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন। খুব সম্ভব ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। সঙ্গীতটিকে তিনি আনন্দমঠের ঘটনা পরিপার্শ্বের সহিত যুক্ত করে দেন। মনস্কাম সিদ্ধ করতে হলে জীবণ করে সংগ্রামে নামতে হবে, এ বাণী আনন্দ মঠের। গৃহপরিবার ত্যাগী মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানদল ভবানন্দের সহিত কণ্ঠ মিলিয়ে বলছেন—'আমরা অন্য মা জানিনা, জন্ম-ভূমিই আমাদের মা, সে মা মৃন্ময়ী নন, তিনি চিন্ময়ী। তিনি সুহাসিনীং, সুমধুর ভাষিণীং, সুখদাং, বরদাং, মাতরম্।'

আনন্দমঠের সন্তান দলের দেশজননী ছাড়া মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, নেই স্ত্রী পুত্র কন্যা। আছেন শুধু দেশমাতা, 'সুজলাং সুফলাং, মলয়জ শীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।' সন্তানকে শপথ নিতে হত ত্যাগের মন্ত্রে। বলতে হত, যতদিন দেশজননীর মুক্তি না ঘটছে ততদিন গৃহধর্ম এবং দৈহিক সুখ সাচ্ছন্দ্য পরিত্যাজ্য। পালন করতে হবে ব্রহ্মচর্য্য। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে প্রায়শ্চিত্ত আত্মাহুতি।

আনন্দমঠে দেশপ্রেমকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, নিঃস্বার্থ দেশসেবা, মানব কল্যাণ ভক্তি যে সেবার মূলমন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন, জাতীয় আদর্শকে ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্মীয় অনুশাসনের ওপর স্থাপিত না করলে আদর্শ প্রাণবন্ত হয় না এবং ধর্ম-শক্তি শূন্য আদর্শের দ্বারা জনমনকে প্রভাবিত করাও সম্ভব নয়।

পদচিহ্ন গ্রামে মহেন্দ্রের প্রাসাদে গোপনে কামান বন্দুক তৈরী করে, রক্ষী সিপাহীদের কাছ

করে রাজস্ব লুট করে এবং নবাব ও ইংরাজদের যৌথ সরকারের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রাম করে সন্তান ব্রতের যে আদর্শময় আলেখ্যটি বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে তুলে ধরেছেন, তাই কি আমাদের প্রথম পর্বের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কল্পনাকে জাগিয়ে তুলে নি?

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সন্তানের মুখ দিয়ে বলেছেন—যে অপদার্থ সরকার দেশ শাসন করে না, প্রজার মঙ্গলে রাজস্ব ব্যয় করে না এবং যে ইংরাজ কোম্পানী দেওয়ানী নিয়ে নিঃস্ব প্রজাদের লুট করে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে, সেই সরকারের রাজস্ব লুট করে জন কল্যাণে ব্যয় করা অপরাধ নয়। এমন চরমপন্থী মতবাদ প্রচার তা যত সাহিত্যের ছদ্ম আবরণেই হোক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমের পক্ষে কম দুঃসাহসিক ছিল না। স্বদেশী ডাকাতির পরিকল্পনাও হয়ত, আনন্দ মঠের দৃষ্টান্ত থেকে গৃহীত হয়েছিল। সে কারণে 'আনন্দমঠ' নিষিদ্ধ ছিল।

আনন্দমঠের সন্তানদলের নায়ক ধ্যানমূর্তিতে দেখিয়েছিলেন – আমাদের দেশমাতৃকা কি ছিল, কি হয়েছেন এবং মা কি হবেন। বহুবল ধারিণীং যে শক্তিময়ী মাতৃমূর্তি সে তো জাতির সমবেত আত্মশক্তির প্রতীক – বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে তাঁকেই উদ্‌বোধন করেছেন। তাই আনন্দমঠের সন্তান-দলের মুখ থেকে উচ্চারিত 'বন্দেমাতরম' শত সহস্র লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাসংগ্রামীর মুক্তি মন্ত্র হয়েছিল। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে সংগ্রামীরা নির্ভয়ে ব্রিটিশের লাঠিচার্জ ও গুলীবর্ষণ বুকে পেতে নিয়েছিলেন। 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে তরুণ বিপ্লবী ফাঁসীর রজ্জু হাসিমুখে গলায় তুলে নিয়ে আত্মবলিদান করেছিলেন।

তাই 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি ইংরাজ শাসককে উত্তেজিত করত ক্রোধে, কম্পিতচিত্ত করত অজানা পরাভবের আশংকায়। বন্দে মাতরমের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে আনন্দমঠের শত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আমরা শতকোটি প্রণাম জানাই।

দুঃখের বিষয়, এদেশে কিছু মানসিক মোহগ্রস্ত ক্রীতদাস আছে যাদের কাছে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি অবাঞ্ছিত। তারা বন্দে মাতরমের পরিবর্তে বাঘাকে লাল সেলাম দিতে অতিশয় ভালবাসে। মাতৃবন্দনার চেয়ে প্রভুর উদ্দেশ্যে সেলাম জানানো কি অধিকতর সম্মানের কাজ? কে জানে?

আনন্দমঠে আছে মহেন্দ্রকে সন্তানব্রতে দীক্ষা দেবার জন্য যখন পূজাবেদীমূলে এনেছিলেন সত্যানন্দ তখন তমসাময়ী নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে অন্তরীক্ষ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল—কি তোমার প্রতিজ্ঞা, ব্রতসাধনে কি তোমার পণ? মহেন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন, 'আমার জীবন সর্বস্ব।' অন্তরীক্ষ থেকে পুনরায় ধ্বনিত হয়েছিল—'জীবন তুচ্ছ, অনেকেই উৎসর্গ করতে পারে। চাই ভক্তি।' মহেন্দ্র ভক্তিমন্ত্রেই দীক্ষা নিয়েছিলেন।

দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনার ভিত্তি ছিল তাই দেশভক্তি। প্রকৃত প্রস্তাবে সকল সাধনার মূলমন্ত্রই ভক্তি। উত্তেজনা বশে মৃত্যুবরণ খুব বেশি কঠিন নয়, পেশাদার সৈনিকরাই অসীম বীরত্বের সঙ্গে তা করে থাকেন। কিন্তু সকল সত্তা দিয়ে ভক্তিকে আয়ত্ত করা সুকঠিন। অন্তরতলে ভক্তি বিকশিত হলেই শুধু—নিঃস্বার্থ জনসেবা ও আত্মবলিদান অনায়াসলব্ধ হয়। জীবন তখন দেহসীমার আকর্ষণ কেটে বিশ্বজীবনের উপলব্ধিতে সজাগ হতে পারে। আনন্দমঠে ভক্তিকে তাই দেশসেবক সন্তানের জীবনে বৃহত্তম লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং সেই বিচারে আনন্দমঠের আদর্শ ও লক্ষ্য দেশ ও কালের সীমাবন্ধন উত্তরণ করেছে। আনন্দমঠ তাই বাঙ্গালী তথা ভারতীয় মনের চিরন্তন ভাবনার স্বাক্ষর বহন করে। Just an index to our national mind, banner and charter.

স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা

—অতুল্য ঘোষ

কোন অঞ্চলকে বাদ দিয়ে তো নয়। ইংরাজ সরকারের শোষণের পরেও যাকে ব্রিটিশ ভারত বলত সেখানে কিছু কিছু কাজ হয়েছিল। যেগুলি ছিল দেশীয় রাজ্য, সেখানে রাজরাজড়ার বাস যে অঞ্চলে তার বাইরে কোন সমৃদ্ধি ছিল না। পশ্চিম-বঙ্গের কোচবিহার ছিল ওইরকম একটি দেশীয় রাজ্য। কিন্তু কোচবিহার শহরটিকে বাদ দিলে রাজ্যের অন্য কোথাও আধুনিকতার চিহ্নমাত্র ছিল না।

ওড়িষ্যায় গেলে এই অবস্থা আরও ভাল বোঝা যায়। বর্তমানে তেরটি জেলার রাজ্য এই ওড়িষ্যা। স্বাধীনতার আগে এর মাত্র ছয়টি ছিল ব্রিটিশ ভারত, বাকি সাতটি দেশীয় রাজ্য। ওই সব রাজ্যের বেশীর ভাগ গাঁয়েই একখানা গোটা কাপড় পরত এমন একজন লোকও ছিল না বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। লোকে লজ্জা নিবারণ করত পাতার আচ্ছাদনে। এইসব জায়গা তো আজ ভারতের অঙ্গ। সেই সব জায়গাকেও আজ অবশ্য কর্তব্য বোধে উন্নত করার চেষ্টা করতে হচ্ছে।

এসব কাজ কেবল ব্যয়সাধ্যই নয়। অসীম ধৈর্য ও পরিশ্রমের দরকার এ কাজ সার্থক করতে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, সৌরাষ্ট্র এর যে কোন একটা রাজ্যে গেলেই জানা যাবে তখনকার ও এখনকার পার্থক্য।

এই পশ্চিমবঙ্গেই বহু মহকুমা ছিল যেখানে একটিও জুতোর দোকান ছিল না। আর দর্জির দোকান তো ছিল বহু রাজ্যে। গ্রামাঞ্চলে গেলে দশ হাত ধুতি কিনতে পাওয়া যেত না। কিনতে হত পাঁচহাত দু' হাত ধুতি। এখন?

অথচ তখন বলা হত:

গলায় গলায় গান ছিল ভাই
গোলায় গোলায় ধান।

এর চেয়ে মিথ্যা আর হয়! পাঁচখানা গ্রাম ঘুরলে হয়ত তিনজনের গোলায় ধান দেখা যেত। পাঁচ গাঁয়ের বাকি লোককে খেতে হত ধার করে। বাকী জীবনে আসল দূরে থাক, সুদও শোধ হতো না। যতদিন না সুদে আসলে শোধ হত, ততদিন যিনি ধার দিয়েছিলেন তাঁদের সংসারে 'বেগার' খাটতে হত যাঁরা ধার নিতে বাধ্য হতেন তাঁদের এটা চলত বংশানুক্রমে।

ভারতের শতকরা একটি গাঁয়েও যাতায়াতের ভাল রাস্তা ছিল না। এখন শতকরা ৭৫টি গাঁয়ে যাবার রাস্তা হয়েছে শতকরা ৫০টি, গাঁয়ে বাসে বা অন্য যানবাহনে যাওয়া যায়। এ সবই দারুণ ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু তা নিয়ে তো চিন্তা ভাবনা নেই। হতাশা প্রচার করা সহজ, কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করা তো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব হলে হাহাকারবাদ প্রচার করা হবে কি করে?

দেশের যে কোন অঞ্চলে গেলেই তো এখন জুতোর, দর্জির বা রেডিয়োর দোকান পাওয়া যাবে অনেকগুলি। বড় মহকুমার দোকানগুলি বছরে কয়েক হাজার ট্রানজিস্টর রেডিয়ো বিক্রী করে গাঁয়ের ক্রেতাদের।

এ কথা তো ঠিক যে ভারতের স্বাধীনতার আগে এ দেশের লোকের গড় পরমায়ু ছিল সাতাশ বছর। এখন তা হয়েছে আটচল্লিশ। এ হিসাব শুধু ভারত সরকারের নয়, আন্তর্জাতিক যে সব সংস্থা আছে

তাদের হিসাবও তাই। বোঝা খুবই শক্ত যে, অর্ধভুক্ত ও অভুক্ত ভারতবাসী না খেয়ে কি করে পরমায়ু বাড়াল। যে নেতাই বক্তৃতা দেন, তিনি সরকারীই হোন বা বিরোধী হোন, নিরন্ন ভারতবাসীর কথা বলেন। তা হলে কি কোন ম্যাজিক আছে? এ তথ্য শিক্ষাভিমানী সকলেরই জানা, কিন্তু বলা তো চলবে না।

ভারতের সংগে চীন বা রাশিয়ার তুলনা একটা প্রকাণ্ড পরিহাস মাত্র। রুশ দেশ কবে লুণ্ঠীত হয়েছিল? চীন দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া অত বিরাট দেশে বিদেশী লুণ্ঠনের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় কি? এই দুটি দেশে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে। ১৯০ বছর ধরে তাদের কেউ শোষণ করেনি তো। ইংরাজ ঐতিহাসিকের কথা মনে পড়ছে, তিনি লিখেছেন: ভারতের একটি ছোট্ট শহর মুর্শিদাবাদ থেকে যে ধনরত্ন লুণ্ঠীত হয়ে ইংলণ্ডে এসেছিল তা তখনকার দিনের মহাসমৃদ্ধ লণ্ডন শহরের মত সতেরটি শহরেও ছিল না। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তা হলে চীন বা রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের তুলনা কি করে হবে?

আজকাল দুটি সমৃদ্ধ দেশের কথা প্রায়ই শোনা যায়: জাপান আর পশ্চিম জার্মানি। শিক্ষিত লোকেরা সকলেই জানেন, ১৯৪৫ সাল থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর থেকে প্রায় পঁচিশ বছর অবধি পশ্চিম জার্মান এবং জাপানকে দেশ রক্ষা খাতে কোন খরচ করতে হত না। এটাই ছিল পরাজিত শক্তি হিসাবে তাদের সাজা। আর ভারতকে তার রাজস্বের শতকরা কত ভাগ প্রতিরক্ষা খাতে খরচ করতে হয় তা অন্তত শিক্ষিত লোকেরা জানেন। তা হলে ওদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হবে কি করে?

সব চেয়ে দুঃখের কথা যাঁরা এ সব তথ্য জানেন তাঁরাও হাহাকারে নৈরাশ্য ও হতাশা ছড়ান। অথচ ভারতের যা অবস্থা তাতে প্রতিরক্ষা খাতে খরচ করতেই হবে। পনের আনা দাবি করে সব চিন্তাশীল ও শিক্ষিত ব্যক্তির এই সব বিষয়ে সম্যক আলোচনা। তা না করে আলোচনা হয় হতাশার কথা, ব্যবস্থা হয় নৈরাশ্য ছড়াবার।

দুর্নীতির কথায় তো দিঙমণ্ডল মুখরিত হয়ে ওঠে। ঠিকই। আবার শোনা যায়, ওপরতলায় দুর্নীতি বেশী। তা যদি সত্য হয় তা হলে দায়ী কারা। ওপরতলায় যারা আছেন তাঁরা আমাদেরই কারো ঘরের সন্তান। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। তাঁরা কেন দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছেন সে বিচার কে করবে? স্কুল-কলেজের দোষ দেওয়া হয়। সেখানেও তো তারা থাকে ছয় ঘণ্টা। বাকী আঠার ঘণ্টা থাকে নিজেদের বাড়ি এবং তার পরিবেশে। তা হলে দায়ী কারা? বর্তমানে সমস্ত হয়েছে, ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিজেদের সাধারণ ভাবা যায় পার্লামেন্ট এবং আইনসভা নিয়েও সমালোচনা হয়। সমালোচনার অধিকার নিশ্চয়ই আছে তবে পৃথিবীর মধ্যে ভারতকে রেখে সমালোচনা করতে হয়। জাপান ও ইতালির পার্লামেন্টে অধিবেশন চলাকালে এমন রক্তপাত হয় যে, সেনাদল ডাকতে হয়। এ ঘটনা যে কদাচিৎ হয় তা নয়, প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। আর ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট? সেখানে বিরোধী পক্ষের কেউ যখন বক্তৃতা দিতেন তখন প্রধানমন্ত্রী বুটজুতো পরা পা টেবিলের ওপর রেখে নাচাতেন। তাঁদের দিকে জিভ দেখাতেন। দুর্নীতির দায়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর

(এর পর ৯ পৃঃ দেখুন)

সংবাদ বিচিত্রা

ধনঞ্জয় বৈরাগী

॥ সাত বিরোধীর বারোয়ারী, কাজের বেলা নবডংকা
শুধুই ঢাকে বাড়ি ॥

গত ১৬ই আগস্ট বিরোধী দলগুলির উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব একটানা দশ ঘণ্টা বিতর্কের পর ৩২৭-১১০ ভোটে নাকচ হয়েছে অনাস্থার পরিবর্তে লোকসভা সরকারের প্রতি আস্থাই প্রকাশ করেছে বিপুল ভোটের সংখ্যাধিক্যে তাহলে হোলটা কি? পরস্পরের প্রতি কিছু গালমন্দ ছোড়াছুড়ি? নিরর্থক এই বারোয়ারীতে যা হয়েছে তা হল সময় ও অর্থের অপচয়। কারণ, বিরোধী পক্ষগুলি যে সব বিষয়ে বক্তৃতা করেছে, তা গত বাজেট ও বর্ষাকালীন অধিবেশনে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছিল, নতুন কোন বিষয় তাতে ছিল না। অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন এইস, এন বহুগুণা। ইন্দিরা সরকারে মন্ত্রীর আসন না পেয়ে বহুগুণা কংগ্রেস ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর মনে যে ক্ষোভের বারুদ জমা ছিল, তিনি এই সুযোগে তার কিছুটা জ্বালাতে চেয়েছিলেন। হয়ত বারুদ কিছুটা জ্বলেছিল, কিন্তু তাতে কংগ্রেসের ক্ষতির বদলে তিনি নিজেই পুড়েছেন। একদা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কিছু কালের জন্য প্রধান মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং যে বহুগুণাকে কে-জি, বি-র গুপ্তচর আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন সেই গুণধর এবং দল বদলের পেশাদার খেলোয়াড়কে বারোয়ারী প্রস্তাবের ধ্বজিক করে বিরোধীরা ভালই করেছিলেন। কথায় বলে শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। ১৬ই তারিখের কনসার্ট পার্টিতে একজনের অনুপস্থিতি কিন্তু চোখে লেগেছে। তিনি হলেন বাবুজী, বাবুজী গভীরে বিচরণ করেন কিনা।

কলঙ্কী বলিয়া তাকে সবলোকে,
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥

বামফ্রন্টের দুই শরিক আর, এস, পি, এবং ফরোয়ার্ড ব্লক মাস তিনেক ধরে মন্ত্রী দপ্তর বণ্টন নিয়ে সি, পি, এম-এর সহিত যে নকল লড়াই-এর অভিনয় করলেন, তা হল আসলে বৃন্দাবনী ঢঙের মান-অভিমান লীলা। দুই দলের পাঁচজন মন্ত্রী তাঁদের পদত্যাগ পত্র তুলে নিয়েছেন। অন্তরঙ্গ সঙ্গে পাঁচ বছর ধরে যাঁরা রস আস্বাদন করেছেন, তাঁরা এখন রসের কাঙাল। কানু বিনে তাঁদের গতি নেই। ধৈরজ ধরা আর সম্ভব হল না। শেষে দয়িতের পাদমূলে পড়ে, 'মাধব কাহে কান্দাওসি হামে' বলে দরবিগলিত ধারা হলেন। 'আনন্দ বাজার' বলছে প্রমোদ দাশগুপ্তের জয়। এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? 'আজল প্রেম পহিল নহি জানলুঁ' বলে প্রেমিকাদের খেদ করার সময় আর নেই। বাহুডো'র ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার সামর্থ্যও আর নেই। অনুগ্রহের দানকে অমূল্য বলেই বুকে তুলে নিতে হবে।

•

॥ ঘরে বাইরে থাকলে সাট কি করবে লৌহ কপাট ॥

গত ১৮ই আগষ্ট বুধবার বালিগঞ্জ টেরেসে ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের গোল পার্ক শাখায় তিন লক্ষ দশহাজার টাকা ডাকাতি হয়েছে। বিনা বাধায় মিনিট পনেরর মধ্যে কাজ হাসিল করে ডাকাতরা চলে যায়। ইউ-বি-আই ব্যাংকের ক্যানাল ইষ্ট রোডের শাখায় যে ডাকাতি হয় তাতে লুট হয় দশ লাখ টাকা। চলতি বছরে (১৯৮২) এ পর্যন্ত

এ রাজ্যে ব্যাংক ডাকাতি হল ১৯টি, এর মধ্যে ৮টি কলকাতায়।

সব গুলি ডাকাতির ধরণ প্রায় একই। ডাকাতি হয় কেবল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক গুলিতে। কোথাও ডাকাতরা বাধার সম্মুখীন হয় না। অনেকের ধারণা কিছু ব্যাংক কর্মচারীদের সঙ্গে ডাকাতদের সাট আছে ডাকাতদের সঙ্গে আছে কিছু পুলিসের বোঝাপড়া এবং তারপর আরো গভীরে আছে গোপন যোগসূত্র ব্যাংক ডাকাতি সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন বসালে ভাল হয় না কি ?

*

॥ মধুরেণ সমাপয়েৎ ॥

খবর রাখেন কলিকাতায় নতুন একটা মিষ্টি বেরিয়েছে নাম মন্ত্রীভোগ ? খুব কিফ্রী হচ্ছে। রাজ ভোগেরই নব-সংস্করণ। দামও পিস প্রতি ৫০ পয়সা। স্বাদেও কোন পার্থক্য নেই। রঙটা একটু লালচে এবং আকারে চলতি রাজভোগের চেয়ে আরো একটু ছোট। আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের এক নামী দোকানে বসে মন্ত্রীভোগ টেস্ট করলাম। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাজভোগের নাম পালটে দিলেন কেন আর সাইজই বা ছোট করলেন কেন ? দোকানদার একটু মুচকি হেসে বললেন— দেশে রাজা নেই, রাজভোগ নামটা সামঞ্জস্যহীন। মন্ত্রী আছেন অনেক, তারাই রাজত্ব করেন, তাই আমরা নামটা পালটে দিয়েছি। তাছাড়া, চিত্র-তারকাদের নামে যদি শাড়ি চালু হতে পারে, মন্ত্রী ভোগ নামের মিষ্টিতে দোষ কি ? সাইজের কথা যদি বলেন, তাহলে বলব আমাদের সীমিত সামর্থ। দুধ-ছানার বাজার চড় চড় করে চড়ছে কি করবো বলুন। মন্ত্রীভোগ জিন্দাবাদ। 'নামের ফেরে ভোলে মানুষ, তা বই আর কিছুই নয়।'

(৭ম পৃ: পর)

জেল হয়েছিল। ইউরোপের এক দেশের রাণীর মহামান্য স্বামীর সমস্ত সরকারী খেতাব ও সম্মান কেড়ে নেওয়া হয়েছে ওই দুর্নীতির দায়ে। দৃষ্টান্ত বাড়াবনা।

ভারতকে পৃথিবীর মাঝে বসালেই চিন্তার ক্ষুদ্রতা আসতে পারে। আবার দলবদলের ঘটনার সমালোচনা হয়। তা আমাদের দেশে জওহরলাল, কি বল্লভভাই কি মৌলানা, কি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা আরও অনেক খ্যাতনামা নেতার কথা বলা যায়, যাঁরা কখনও দলবদল করছেন বলে শোনা যায়নি। ওদিকে সুসভ্য ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক দলের অন্যতম স্রষ্টা এবং ওই দলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ডে দল বদল করে প্রধানমন্ত্রীর বজায় রেখেছিলেন। আর আধুনিক কালের সব চেয়ে বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল ? উনি তো দুবার দল বদল করেইছিলেন, তার চেয়ে বেশী করেছিলেন কিনা ঠিক লেখা যাচ্ছে না আর হরিয়ানার বা অন্য কোন রাজ্যের কে কোথায় গেল না গেল তাই নিয়ে যত গোলমাল।

সেই জন্য বলছি অন্তত স্বাধীনতার দিনটিতে ভাবুন, ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে একটা দেশ। তার মানে এ নয় যে, অন্য দেশে যখন অনাচার হচ্ছে তখন ভারতে কেন হবে না। দুঃখ এই যে, একপেসে আলোচনাই হচ্ছে। যেখানে যা অন্যায় হচ্ছে নিশ্চয়ই দূর করতে হবে। কিন্তু সামগ্রিক ছবিটা মানুষের চোখের সামনে ধরাও তো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। পনেরই আগস্ট আমরা আনন্দ করব উৎসব করব। কারণ দেশকে সমৃদ্ধ করার সব রাস্তা খুলে দিয়েছে এই পনেরই আগস্ট।

সংকলন—যুগান্তর

নির্বাচন সমীক্ষণ

জীবানন্দ ভট্টাচার্য

গত বিধান সভা নির্বাচনের পর (১৯শে মে ১৯৮২) জয়পরাজয়ের অনেক প্রকার সমীক্ষা হয়েছে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলির পক্ষ থেকে যেমন হয়েছে তেমন হয়েছে পরিসংখান বিশেষজ্ঞদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমীক্ষা। এবং তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে অনেক। ১৯৭৭-৮০-৮২ তিন নির্বাচনের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা দেখিয়ে কার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি কার হ্রাস এনিয়েও বিতর্ক হয়েছে। সাল তারিখ পরিসংখান নিয়ে এমন বিতর্কতো আছেই কারণ 'পণ্ডিতেরা তর্ক করে নিয়ে তারিখ সাল। সাধারণ মানুষের কাছে যা ঘটেছে তাইই ঘটনা। সমীক্ষা অন্যভাবেও হতে পারে যেমন সবদলের কৃতকর্মের সমীক্ষা এবং জয়পরাজয়ের পর 'আত্মসমীক্ষা।

বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গে বিতর্ক দু'দলের প্রভাব নিয়ে—কমুউনিষ্ট ও কংগ্রেসদল। নির্বাচনে দু'দলেরই সঙ্গে অন্যদল আছে, তবে প্রথমটি ফ্রন্ট, কংগ্রেসের তা নয় নির্বাচনী আঁতাত মাত্র। বাম ফ্রন্ট 'সম ভাবাপন্ন' দল নিয়ে গঠিত তাও নয়,—একথা রাজনীতিকরা যেমন বুঝতে পারেন তেমন বিভিন্ন দলের কিষান সংগঠন ও শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ মানুষও বুঝতে পারেন। তা না হলে সঙ্গে আছেন অথচ গত পাঁচ বছর, তাই বা কেন? যুক্ত ফ্রন্টের আমল থেকেই পরস্পরের 'কিষাণ ফ্রন্ট, শ্রমিক ফ্রন্টে এত সংঘর্ষ রক্তপাত কেন? এ নির্বাচনের পরই এক নেতা বললেন—আমরা শরিক কর্মচারী নই। সেই পুরাতন কথা 'তব কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে মাত্র পরিচয়'। সঙ্গে যখন তখন সংঘর্ষ কেন। নানা স্থানে শরিকদের মুখ্যত বড় শরিকের সাথে অন্য শরিকের কিষান সংগঠনে সংঘর্ষ খুন জখমের জের হিসাবে মিছিল সমাবেশ প্রতিবাদ সভা হয়েছে, একবার তো প্রতিবাদ জানাতে দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজ্যপালের কাছে স্মারক লিপি দিলেন দুজন মন্ত্রী। তবু এই অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া আপাত দৃষ্টিতে নির্বাচনের উপর পড়ে নাই। তার কারণ বড় শরিকের সুপরিকল্পিত নির্বাচন কৌশল পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির ফলশ্রুতি। প্রশাসনকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার নামে দলগত সংগঠনে পরিণত করা।

ভোটে মিথ্যাচার কিছু কিছু অতীতেও ঘটেছে যেমন একের ভোট অন্যে দেওয়া অনুপস্থিত বা মৃত ব্যক্তির ভোট পড়া বা ভোট দিতে গিয়ে দেখলেন আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে গেটেই শুনতে পেলেন যাচ্ছেন কেন? আপনাদের ভোট হয়ে গেছে ইত্যাদি। কিন্তু এবারের কারচুপি অভিনব। ভোটার তালিকায় নাম বাদ দেওয়া, ভুয়া ভোটার তালিকাভুক্ত করা ভোট পত্র বাইরে হস্তগত হওয়া। এসব ভোট কর্মীদের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়।

ভোটার তালিকা প্রস্তুত, বা নির্বাচন পরিচালনা নির্বাচন কমিশনার করেন তাতে শাসক দল বা রাজ্য সরকারের কোন হাত নেই, এটা ন্যায়ের ফাঁকি। তালিকা প্রস্তুত, সংশোধন এবং নির্বাচন পর্বে যে লক্ষাধিক লোক প্রয়োজন হয় তা আকাশ থেকে পড়ে না। সাময়িক নিযুক্ত এবং রাজ্য সরকারি ও আধা সরকারি কর্মচারীদের মধ্য থেকেই তা বাছাই হয়। ভোটের পর ভোট বিশ্লেষন তত্ত্বে Psephology) ভোট কিভাবে পড়ল তা ধরা হয়না। সুতরাং পণ্ডীতদের সমীক্ষা পণ্ডিতেরাই বোঝেন, সাধারণ লোক বিভ্রান্ত।

বামফ্রন্ট সংখ্যাধিক্যে জয়ী হয়েছেন, সরকার গঠন করেছেন। বিজয়োৎসবে অনেক কথার ভিতর একথাও ঘোষণা করেছেন 'এবার কাজ করতে হবে'। কর্মচারিদের দাবির সাথে দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী অতীতেও কয়েক বার অফিসে অনুপস্থিতি, দেরীতে আসা, ছুটির বহু পূর্বেই অফিস ছেড়ে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসন থেকে দলের সমর্থক কর্মচারিদের বিশেষ আবেদন জানিয়েছেন। ফল কী হয়েছে তাঁদেরই তা জানার কথা। প্রথম দিকে ঘোষিত হয়েছিল মন্ত্রীরের বা ক্ষমতার লোভে তারা ক্ষমতায় আসেন নি—বা বিপ্লবের পথ ছেড়ে অবিপ্লবী হয়েও জাননি, প্রশাসনকে বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে চান। বিপ্লব কথাটি আজকাল নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে জনতা পার্টির কেউ কেউ বলেছিলেন এটা একটা মহান বিপ্লব। নির্বাচনে জয় বিপ্লব হলে সেই বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে শাসন যন্ত্র ব্যবহার করলে কথার কাজে সঙ্গতি থাকে বটে। তবে নিশ্চয়ই তারা সে অর্থে বি ব শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। তারা সেই অর্থে করেছে যে বিপ্লবের লক্ষ্য শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা যে ব্যবস্থায় মুক্ত সমাজ, মুক্ত জীবনে সে বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে তা হল মিছিল, সমাবেশ ও প্রদর্শনের দাপা দাপি। পক্ষান্তরে সবমিলিয়ে রাজ্য এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন—রাজ্যের আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত, কৃষি উৎপাদন, খাদ্য সংগ্রহ শিল্পে উৎপাদন, বন্দরে মাল ওঠা নামার পরিমান কোন দিকেই অগ্রগতির চিহ্ন মাত্র নেই বরং অনেক ক্ষেত্রে গতি নিম্নমুখী। রাজ্য সরকারের পরিচালনায় ২২ টির মধ্যে ২০টিতে বৎসরে কয়েক কোটি টাকা লোকসান। বছরে কয়েক কোটি টাকা ভর্তুকি যাচ্ছে। কলকারখানায় লোকসান সাধারণের চোখের সামনে বড় একটা আসে না। কিন্তু সেবামূলক সংস্থা গুলির কাজে মানুষের প্রতিদিনের অবস্থিতি—যেমন রাষ্ট্রীয় পরিবহন, হরিণঘাটার দুগ্ধ সরবরাহ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার সরকারে আসীন হয়ে নিজসৃষ্ট পরিস্থিতির মোকাবেলা তাদেরই করতে হবে। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য সরকারের আর্থিক অবস্থায় যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার জট ছাড়াতে হবে। অন্য দিকে কাজ করতে বললেই বকেয়া ডি, এ, মিটিয়ে দিয়ে বলতে হবে, 'ওভারটাইম' দক্ষিণা ছাড়া ষ্টেট বাসের মেরামৎ হবে না, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বয়লারে কয়লা দেওয়া হবেনা....এমন অনেক কিছু। অনেক নিরপেক্ষ দর্শকের অভিমত হচ্ছে, ভালই হয়েছে, এরা ক্ষমতায় এসে ভালই হয়েছে এবোঝা অন্যের ঘাড়ে না পড়ে নিজেদের ঘাড়েই পড়েছে।

(চলবে)

প্রধান মন্ত্রীর মার্কিন সফর

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর মার্কিন সফর নিয়ে দেশী বিদেশী রাজনৈতিক সমীক্ষকগণ ও সংবাদপত্র নানা দৃষ্টি ভঙ্গীর সৃষ্টি করেছেন। আমেরিকা হতে ফিরে প্রধানমন্ত্রী লোকসভার সদস্যদের দাবী সত্ত্বেও স্বয়ং বিবৃতি দেন নি, এতে রাজনৈতিক মহলে নানা জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে। ইন্দিরাগান্ধী ও রোনাল্ড রেগনের সাথে শীর্ষ বৈঠকের ফলে ভারত মার্কিন সম্পর্ক কোথায় দাড়াবে এই বিষয়ে কৌতূহল উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জনগণ পরিচিত হচ্ছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও পশ্চিমইয়োরোপের পত্র পত্রিকাগুলি এক সুরে রায় দিয়েছেন যে ভারতের অর্থনৈতিক বিপাক ইন্দিরাগান্ধীকে রেগন সকাশে উপস্থিত হতে বাধ্য করেছিল। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ভারতকে কিছুটা সরিয়ে এনে ভারতে পশ্চিমী মূলধন প্রবেশের জন্য রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করতে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে রাজী করতে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের দেশের পত্র পত্রিকাগুলি বিপরিত কথা বলছে। ওয়াশিংটনের ভারতীয় সংবাদদাতা এবং দেশস্থ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখকরা এক বাক্যে ঘোষণা করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী ভারতের জাতীয় বৈদেশিক নীতির সূচাগ্রও ছাড়েন নি। প্রধানমন্ত্রী নিজেও মার্কিন সফর কালে বার বার বলেছিলেন তিনি অগ্রগামী হয়ে প্রেসিডেন্ট রেগনের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেননি। রেগনের নিমন্ত্রন পেয়ে তিনি ওয়াশিংটন এসেছেন।

ইন্দিরাগান্ধী মার্কিন মুলুক থেকে কি নিয়ে ফিরেছেন তা নিয়েও রাজনৈতিক সমীক্ষকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইন্দিরাগান্ধী কিন্তু স্বচ্ছ পরিষ্কার বোঝাবুঝি ছাড়া অন্য কোন সাফল্য দাবী করেন নাই।

ইন্দিরাগান্ধীর সফরের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাৎপর্য্য হল উভয় দেশ তাদের বর্তমান বৈদেশিক নীতির কাঠামোর মধ্যেই ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতা সৃষ্টি করতে হবে অর্থাৎ আমেরিকা তার অনুসৃত সোভিয়েত বিরোধী বৈদেশিক নীতির বিশ্বব্যাপি প্রয়োগে ক্ষান্ত হবে না। ইজরাইল, পাকিস্থান, চীন, কাম্পুচিয়া, আফগানিস্থান, এল সালভাদর, ক্যুবা, নিকারেগুয়া ইত্যাদি দেশ সম্বন্ধে যে নীতি অনুসরণ করে এসেছে তাই করে যাবে। দুনিয়াকে পারমানবিক যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যাবার নীতি পরিবর্ত্তন হবে না। ভারত ও তার চলতি বৈদেশিক নীতি থেকে বিচ্যুত হবে না। যে নীতির স্তম্ভগুলি সোভিয়েতের সঙ্গে সদ্ভাব ও সহযোগিতা বিশ্বপ্রাঙ্গনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার সুস্থিরতা এনে দিয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থিক ও রাজনৈতিক দাবী দাওয়ার আন্দোলন সমর্থন করে। আমেরিকা ও ভারত উভয়ই যদি স্ব স্ব বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে চলে তা হলে মৈত্রী ও সহযোগিতার ক্ষেত্র

কি করে তৈরী হবে এই প্রশ্ন রাজনৈতিক সমীক্ষকদের।

ভারত ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্ভাবনা পাকিস্থান বাংলাদেশ ও চীনের শাসককুলকে দুশ্চিন্তিত করছে না বরং আশ্বস্ত করছে। পাকিস্থানের শাসককুল ধরে নিয়েছে যে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সলাপ করতে গিয়ে ইন্দিরাগান্ধী নিশ্চয় এমন কোন কথা দিয়েছেন যাতে পাকিস্থান দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারে। চীনের সংবাদপত্রে যে মন্তব্য ও রিপোর্ট বের হয়েছে তার মধ্যে যে উপসংহার নিহিত আছে তা হল ভারত মোটেই সোভিয়েত তাঁবেদার রাষ্ট্র নয়। আমেরিকার সঙ্গে সদ্ভাব ও সহযোগিতা ভারতকে মস্কো থেকে আরোও বেশী স্বাধীন করবে আমাদের দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও দৃষ্টিভেদ দেখা যায়। সি, পি, এম সি, পি, আই উভয়ই একই উত্তাপে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী উত্তাপ পার্টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা দেখতে পেলে সমান বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু ইন্দিরাগান্ধীর সফর নিয়ে দুই পার্টির দৃষ্টিভেদ বেশ পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে। আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সি, পি, এম এর নেতা ই, এস, এম নাম্বুদ্রিপাদ রেগনের চাপ সত্বেও ভারতবর্ষের প্রগতিবাদী বৈদেশিক নীতি থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে প্রশংসা করেছেন; কিন্তু সি, পি, আই নেতা এন, কে কৃষ্ণন নিউএজে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার সুর অন্যরকম। কৃষ্ণন মোটেই নিশ্চিত নন যে ইন্দিরাগান্ধী মার্কিন সরকারের সন্তুষ্টি ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য পথ করতে গিয়ে অন্তত কিছুটা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সরে আসার এবং প্রগতিশীল বৈদেশিক নীতির কিছুটা পরিবর্তনের আভাস দেন নি। কৃষ্ণন প্রশ্ন করেছেন ভারতের বৈদেশিক নীতির ওপর টু নন-এলাইনমেন্ট এবং নন- ব্লক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এই দুই লেবেল লাগিয়ে দিয়ে ইন্দিরাগান্ধী কি ইঙ্গিত দেননি যে ভারত সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতায় নিষ্ক্রিয় ও নমনীয় হতে প্রস্তুত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পত্র পত্রিকা গান্ধী রেগন সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রেখেও এখনও কোন বিশেষ মন্তব্য করে নাই।

যুগান্তরের বিশেষ প্রবন্ধ লেখক ভবানী সেন গুপ্ত বিদেশমন্ত্রকের কোন উচ্চতম অফিসারকে প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটন বৈঠক সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রীর অসন্ন মস্কো বৈঠকের আগে কোন মূল্যায়ন করা যাবে না।

আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরাও কোন মন্তব্য না করে ভারতের প্রগতিশীল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতি অটুট রাখার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালান উচিৎ। আমরা কামনা করব আসন্ন ইন্দিরাজীর মস্কো বৈঠক ভারত সোভিয়েত মৈত্রী ও সহযোগিতা দৃঢ়তর হউক।

১১-৮-৮২ ইং

বিঃ দ্রঃ—আগামী সংখ্যা ১লা সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইবে। —সঃ বিঃ বাঃ

সে দিন আর এদিনে অনেক তফাৎ

- সে একদিন ছিল, যখন বৃষ্টি নামত কি না নামত ঘর ছেয়ে একাকার হ'ত। ভাঙা ঘর জুটো হাট, পরনেও জোটাই দিত না, শীতেও বিছিয়ে মারত।
- কিন্তু আজ একটা পাকা ঘর হয়েছে। ছোট ছেলে আছে। দিন স্বস্তিতে কাটছে। হয়তো আরও সুদিন আসবে এমন আশাও আজ মনে জাগে।
- ১লিন শ' আশীর মধ্যে মাসের মধ্যে ৭৭ লক্ষ পরিবার ঘরবাড়ী বানাবার জমি পেয়েছিল আর তার মধ্যে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার পরিবার নিজস্ব জমিতে ঘর তুলেছে। এক কোটি ৬০ লক্ষ পরিবারকে বাড়ী তৈরী করার জন্য সাহায্য দেওয়া হবে।
- ১৫ লক্ষ ভূমিহীনকে চাষবাসের জমিও দেওয়া হয়েছে।

এই হ'ল দারিদ্র্য দূর করার কার্যকর পন্থা

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন :

এস. কে. ঘোষ
ডাইরেক্টর (প্রোডাকশন মনোরঞ্জন)
বিজ্ঞাপন ডিরেক্টরেটের সেন্টার
৬৯, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা—৭০০০১৩

আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ তথ্য জানতে আগ্রহী অনুগ্রহ করে এই সম্পর্কে আমায় বাংলা/ইংরেজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম _____

ঠিকানা _____

_____ পিন _____

নতুন 20 সূত্রী কার্যক্রম

davp. 82/194

Regd No. R. N. 24511/71
DAVP—Regd.
বার্ষিক :—ডাকে ১৮.০০ টাকা

Diptabi Bangla
Phone : 34-1795
বাণ্মাসিক :—১০.০০ টাকা

P. Regd. WB/NC 77
মূল্য—৩০ পয়সা

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

(সম্পাদক—)

শ্রীশান্তিদরণ রায়চৌধুরী

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী

শ্রীকালীপদ সরকার

শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

শিল্পীর বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীবারীন ঘোষ

ব্যবস্থাপনা—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

[redacted]

পড়ুন

ও

পড়ান

3C

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—কীরোদ কুমার দত্তের

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—২.৫০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। দৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। জলতা বাঘার সংগ্রাম কাহিনী—.৫০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৫০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৫০ ১২। ভারতের জনজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.১৫, ১৩। দেশ যাদে তোদেনি (১)—১.০০, ১৪। দেশ যাদের তোদেনি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯ই এপ্রিল আততায়ী শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাতির ভত্যা প্রচেষ্টা—.১৫, ১৮। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৩.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

টেলিগ্রাফী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০

মূল কার্যালয়—৪,নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত